বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন

গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ

ড: রামদুলাল বসু

এম.এ, ডি ফিল

চলন্তিকা প্রকাশক :: প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৪, কলেজ রো, কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ : ৫ এপ্রিল, ১৯৫৪

প্রকাশনায় : চলন্তিকা প্রকাশক, ৮, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রণে : শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদে : শ্রীব্রজেন চৌধুরী

গ্রন্থনে : শ্রীবিদ্যাসাগর বাইণ্ডিং ওআর্কস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

দাম : পঁচিশ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

প্রয়াত পিতৃদেব

৺শৈলভূষণ বসুর

স্মৃতির উদ্দেশে—

॥ পরিচায়িকা ॥

অধ্যাপক রামদুলাল বসু আমার প্রাক্তন ছাত্র। বাংলা সাহিত্যের কোনো একটি প্রদেশ সম্বন্ধে তিনি যখন গবেষণার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন আমি তাঁকে বঙ্কিম-যুগের গৌণ ঔপন্যাসিকদের রচনাবলীর আলোচনায় উদ্যত হতে বলি। বিষয়টি তাঁর ধাতের অনুকূল হওয়ায় তিনি এটি পছন্দ করেছিলেন এবং অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার কাজে তাঁর নিরলস নিষ্ঠা দেখে আমার ভারি ভাল লেগেছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. ফিল্ (আর্টস) ডিগ্রি দিয়েছেন। তাঁর যে শ্রম ও মনোযোগ এ-বইয়ে নিহিত, গুণগ্রাহী পাঠককে বলে দিতে হবে না যে, তাতে তাঁর ডি. লিট্. পাওয়া উচিত ছিল। বিষয়বুদ্ধিহীন তাঁর এই শিক্ষকের এ বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান কম থাকায় তিনি ডি. ফিল্ হয়েছেন। এখন সান্ত্বনা এই যে, ডক্টরেট ডিগ্রিটা বাহ্য ব্যাপার। আজকালকার মূল্য-হ্রাসের দিনেও যথার্থ একজন গবেষক যে ডিগ্রি-নিরপেক্ষ ভাবে বিদ্যমান থাকতে পারেন, তিনি ডক্টরেট না পেলে তা অবশ্যই বোঝা যেতো। অধ্যাপক রামদুলাল বসু যে ডক্টর বসু হয়েছেন, এ তাঁর শ্রমার্জিত গৌরব। তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

এ-বইয়ের সূচীপত্র দেখলেই ডক্টর বসুর অধ্যায়-পরিকল্পনার কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যাবে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সময় থেকে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' প্রকাশ অবধি প্রায় আটচল্লিশ বছরের বিস্তারে আমাদের যেসব গৌণ কথাসাহিত্যিকের রচনা পাওয়া গেছে, লেখক তাঁদের গৃহীত বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, আঙ্গিকের বিশ্লেষণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্য দিয়েছেন। 'গৌণ' কথাটির অভিপ্রেত অর্থনির্দেশ সূত্রে লিখেছেন, বঙ্কিম-সমসাময়িক সেইসব লেখকরাই গৌণ, যাঁরা বঙ্কিমের পথ অনুসরণ ক'রে, বা না করলেও সমকাল বা উত্তরকালকে প্রভাবিত করতে পারেন নি।

তাহলে তাদের বিষয়ে এরকম দীর্ঘ নিবন্ধমালার আয়োজন কেন? ইতিহাস মানুষের সঞ্চিত স্মৃতি। স্মৃতি কি উপেক্ষার বস্তু? বাংলা উপন্যাস-ধারা যাঁরা দেখতে চাইবেন, ডক্টর বসুর এ গবেষণা তাঁদের কাজে লাগবে।

তিনি প্রায় আড়াইশ' লেখকের কথাসাহিত্যচর্চার ধারক হয়ে রইলেন। আটত্রিশ জনের কথা অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে বলা হয়েছে। সেইসূত্রে তৎকালীন যে সমাজ ছিল,—যা আজ আর নেই,—সেই অতিক্রান্ত সমাজের স্মৃতি-সংগ্রহ হিসেবেও এ বই সমাদরণীয়।

ইতিহাস, বাস্তব সমাজ,—আর, কল্পনালব্ধ জীবনচিত্র—এই তিন বিষয়-বিভাগে এঁদের রচনা-পরিচিতি সাজাবার চেষ্টা করেছেন ডক্টর বসু। তাছাড়া সমাজচিত্রের মধ্যেও কতো যে ব্যঙ্গপরিহাস ছিল, সে-পরিচয়ও অনুচ্চারিত নয়। প্রসঙ্গতঃ মহিলা-সাহিত্যিকদের রচনাও আলোচিত হয়েছে। যাঁরা অন্যান্য লেখকের বিশেষ বিশেষ রচনার অনুবৃত্তিকার, তাঁরাও আলোচিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায় সুপরিচিত; স্বল্প-পরিচিতদের মধ্যে আছে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ বিশ্বাস, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

'পরিশিষ্ট' অংশের গ্রন্থ-তালিকাটি বিশেষ সমাদরণীয়।

পি ২৫৩/এ, লেকটাউন, ব্লক 'বি', কলিকাতা ৫৫ } হরপ্রসাদ মিত্র

।। মুখবন্ধ ।।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ অনেক আগেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নানান কারণে তা সম্ভব হয়নি। এই নামের নিবন্ধটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ ফিলজফি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের জগতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। উপন্যাস-শাখাটি জন্মলাভ করার অনতিকালের মধ্যেই অজস্রতায় এর ডালি ভরে উঠেছিল। ঐ শতকের ছোটবড়ো নামী-অনামী বহু লেখক উপন্যাসরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাদের রচনার বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিচয় তুলে ধরাব প্রয়াস আছে এই গ্রন্থে।

বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে আগ্রহান্বিত করেন আমার অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র। তাঁর নির্দেশনায় নিবন্ধটি রচিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কাজটির সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি শুধু আমাকে নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, সমালোচকের দৃষ্টিতে ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করে আমাকে সদা-সচেতন করে দিয়েছেন। কোনো কোনো বিষয়ে মত-পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সেই পার্থক্যকে

স্বীকার করে নিয়ে আমার প্রতি তিনি অশেষ আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং নিবন্ধটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করেছেন। তিনি এই গ্রন্থের জন্য একটি পরিচায়িকা লিখে দিয়েছেন। আমার গ্রন্থটির প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আমার প্রতি তাঁর স্নেহের কথা স্মরণ করে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। নিবন্ধটির অপর দুজন পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। আমার এই গ্রন্থটির সঙ্গে এই দুজন শিক্ষাচার্য ও মনস্বী সমালোচকের নাম যুক্ত হয়ে থাকার জন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। এই অবকাশে তাঁদের কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ডঃ শিশিরকুমার দাশ পরিকল্পনার কাল থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজটি সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন। গ্রন্থ-পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ পত্রে তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। ডঃ ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক পরিমল সরকার, শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ ও শ্রীশান্তনু ঘোষের নিরন্তর উৎসাহ ও অনুসন্ধান আমাকে কর্তব্যসচেতন রেখেছে। অধ্যাপক কমলেশ লাহিড়ী ও শ্রীশুভেন্দু বসুর সহায়তার কথা স্মরণ করতে আনন্দ বোধ করছি।

শ্রীচিত্তরঞ্জন মজুমদার (অধ্যক্ষ), অধ্যাপক অমলচন্দ্র রায়, অধ্যাপক ননীগোপাল চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে আমার কাজটি সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ। শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু, শ্রীসন্তোষদুলাল বসু, শ্রীশান্তিদুলাল বসু, শ্রীমতী ইরা বসু, শ্রীপ্রমোদবন্ধু সেনশর্মা ও শ্রীমতী রেবা সেনশর্মার নিরন্তর প্রেরণা আমার অনেক পরিশ্রমের ভার লাঘব করেছে। এঁরা সকলেই আমার পূজনীয়। শ্রীমতী দীপ্তি বসুর তাগিদ, কাজটা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমার অতৃপ্ত মনকে কর্মমুখী করে রেখেছে। এ ছাড়া অনেক বন্ধু ও আত্মীয়ের প্রীতিদীপ্ত

প্রসন্ন মুখ আমার কর্মপথকে সুগম করেছে। এত হিতৈষীর স্নেহ-প্রীতি-সহৃদয়তার কথা স্মরণ করে আনন্দিত বোধ করছি। গ্রন্থটির নির্দেশিকা তৈরী করেছেন অধ্যাপক প্রভঞ্জন দ্বিবেদী ও আমার স্নেহাস্পদ ছাত্রদ্বয় অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ দীক্ষিত ও শ্রীমহীধর চট্টোপাধ্যায়, এম. এ.। এই শ্রমসাধ্য দায়িত্বটি তাঁরা আনন্দের সঙ্গে পালন করেছেন।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের সহৃদয়তা ও সহায়তার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এছাড়া সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিবিভাগ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং রানীগঞ্জ টি. ডি. বি. কলেজের গ্রন্থাগার থেকে সাহায্য পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট কর্মিগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে পুঁথিবিভাগের মধ্যমণি শ্রীসুকুমার মিত্র, টি. ডি. বি. কলেজের শ্রীঅতুল চন্দ্র দে এবং শ্রীতপনকুমার ঘটককে, যারা আনন্দের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন।

চলন্তিকা প্রকাশকের কর্ণধার শ্রীশীতলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। যথেষ্ট যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই অখ্যাতকীর্তি গ্রন্থকারের প্রতি তিনি সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন। এই অবকাশে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ, শ্রীউমাশঙ্কর সরকার, শ্রীস্বপন পাল ও শ্রীমনোরঞ্জন মাইতির সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। শ্রীসত্য চক্রবর্তীর সহযোগিতা না পেলে গ্রন্থটির প্রকাশ হয়ত আরও বিলম্বিত হত। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থটির মধ্যে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে গেছে। নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জীতে ভুলক্রমে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা-সাহিত্য বইটির নাম বাদ পড়েছে। এ সবের জন্য আমি দুঃখিত। সামান্য পরিবর্তন ও সংযোজন ছাড়া নিবন্ধটি প্রায় অবিকৃত আকারে গ্রন্থরূপ পেয়েছে। এখন সুধী পাঠকবর্গের কাছে গৃহীত হলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।

আমার পিতৃদেব নিবন্ধটি সম্মানিত হবার সময় জীবিত ছিলেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে দেখলে তিনি খুব খুশী হতেন। তাঁর নামে গ্রন্থটি উৎসর্গ করতে পেরে অনেকখানি সান্ত্বনা বোধ করছি।

নববর্ষ

রামদুলাল বসু

॥ সংক্ষিপ্ত রূপ ॥

প্র = প্রথম

দ্বি = দ্বিতীয়

তৃ = তৃতীয়

চ = চতুর্থ

খ = খণ্ড

স/সং = সংস্করণ

সা = সামাজিক

ঐ = ঐতিহাসিক

কা = কাল্পনিক

কা—গা = কাল্পনিক গার্হস্থ্য

ধ = ধর্মমূলক

র = রহস্যমূলক

এ্যা = এ্যাডভেঞ্চার

পৃ = পৃষ্ঠা

বা সা. ই. = বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

ভা = ভাগ

সা, সা, চ, মা, = সাহিত্য সাধক চরিতমালা

ক—বি = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

॥ ১ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের কাল থেকেই বঙ্কিমযুগের সূচনা[১]। বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পূর্বে উপন্যাস-শিল্প যেমন কোন নির্দিষ্ট মানে উন্নীত হতে পারেনি, তেমনি কোন ঔপন্যাসিকের আদর্শও উপন্যাস-শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-শিল্পকে পূর্ণতা দান করে, তার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ ও প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে এবং তার ধারা নিয়ন্ত্রিত করে যেমন সাহিত্যসাধনা করে গেছেন, তেমনি সেই সঙ্গে আদর্শ-অনুসারী লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি করে যুগস্রষ্টার মর্যাদালাভের অধিকারী হয়েছেন।

উনিশ শতকের উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র নেতৃত্ব দিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র কেবল পাশ্চাত্য উপন্যাসের রসিক পাঠক মাত্র ছিলেন না, উপন্যাসের গঠন-পদ্ধতিও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। অনুশীলন ও প্রতিভার রাসায়নিক সমন্বয়ে তাঁর হাতেই উপন্যাস-শিল্প সার্থক সৃষ্টির গৌরব লাভ করে, অবয়ব ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন নিয়ে এল। বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শে এসে অনেকেই সে যুগে উপন্যাস-রচনায় হাত দিলেন। দৃশ্য ও অদৃশ্য গ্রহপুঞ্জের মত তাঁরা বঙ্কিমের কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করলেন। এঁদের কেউই বঙ্কিমের দীপ্তিকে ম্লান করতে পারলেন না। বঙ্কিম-প্রতিভার 'পরশমণি' প্রাণে ছুঁইয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির ইচ্ছার জাগরণ ঘটিয়ে সাধনায় সিদ্ধ হতে চাইলেন। এইসব গৌণ-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ব্যতিক্রম যে কেউ ছিলেন না এমন নয়। তবে এই জাতীয় ব্যতিক্রমকারী কোন কোন ঔপন্যাসিক তাঁদের সাহিত্য-আদর্শকে অপরের কাছে ততখানি অনুকরণীয় করে তুলতে পারেন নি, যতখানি পেরেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস সীতারাম-এর

১. যথন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল তথন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩০১, পৃ. ৪)।

প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির সংস্কারসাধনে ব্যস্ত ছিলেন। এই কালে তাঁর কোন কোন উপন্যাসকে সুসংস্কৃত হয়ে নবরূপ ধারণ করতে দেখা যায়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে পূর্ণচ্ছেদ পড়লেও তাঁর সাধনধারার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পরও কিছু কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর সমকালে যেসব লেখক তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে উপন্যাস রচনা করেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা সেই ধারারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে। প্রত্যক্ষ প্রভাবপুষ্ট একটি ধারা সৃষ্টির পথ ধরে চলতে চলতে যেমন অবসিতপ্রায় হয়ে গেছে, তেমনি পরোক্ষভাবে তাঁর সাহিত্যাদর্শ বিবর্তনের পথ ধরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে পরবর্তী যুগধারায়। বঙ্কিম-যুগধারার সূত্র ধরেই বঙ্কিম-যুগোত্তর ধারার আবির্ভাব। এ যেন এক প্রদীপের আলো থেকে অন্য প্রদীপের আলোয় সংক্রমণ, ঐতিহ্য উদ্ভূত অনিবার্য আবির্ভাব। বঙ্কিম-প্রভাবিত প্রত্যক্ষ ধারার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি বঙ্কিমযুগের পূর্ণচ্ছেদ টানতে হয়, তাহলে বঙ্কিম-আদর্শবাহী সর্বশেষ প্রতিনিধির মৃত্যুকাল পর্যন্ত বঙ্কিমযুগকে সীমায়িত করতে হয়। পরোক্ষ ধারায় তাঁর সাহিত্যাদর্শকে খুঁজতে গেলে বিবর্তনের পথ অনুসরণ না করে উপায় নেই।

কোন প্রতিভাবান শিল্পী যদি একটি কালের সাহিত্যাদর্শের ঊর্ধ্বে নতুন কোন আদর্শের প্রবর্তন করেন, তাহলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগত সেই ধারা পূর্ববর্তী সাহিত্যাদর্শের আবেদনকে লঘু করে দিয়ে, পূর্বযুগাবসানের ও নবযুগের আসন্ন আবির্ভাব ঘোষণা করে। এই সত্যের সূত্র ধরে বঙ্কিমকালের সীমাঙ্কন করতে বাধা নেই। বঙ্কিমকালের সীমাঙ্কনে যে বিষয়টি তাই প্রধান ভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে, সেটি হল, বঙ্কিমের জীবদ্দশায় উপন্যাসকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) প্রভৃতি উপন্যাস-রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত বালক। বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত উপন্যাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় পরিচয় ছিল। প্রথমবার বিলাতযাত্রার (১৮৭৮) পূর্বকাল পর্যন্ত বোধ হয়, পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে কটা ছিল সমস্তই তিনি শেষ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ-পরাজয় (১৮৬৯) থেকে বউঠাকুরাণীর হাট রচনার প্রেরণা লাভ করেন। প্রতাপচন্দ্রকে

অনুবর্তন করার চিহ্ন উপন্যাসটিতে বর্তমান। তৎসত্ত্বেও তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসদ্বয়ের (বউঠাকুরাণীর হাট, ১৮৮৩ ও রাজর্ষি, ১৮৮৭) উপর বঙ্কিমের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বউঠাকুরাণীর হাট রচনার পর, অযাচিত-ভাবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে একটি প্রশংসাপত্রও পান। বউ-ঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত হলেও ইতিহাস এখানে গৌণ হয়ে একান্তই মানবজীবনের ব্যক্তিগত স্তরে নেমে এসেছে। অসফল ও অপরিণত শিল্পের চিহ্ন ধারণ করে উপন্যাস দুটি বঙ্কিমকালের বৃত্তে আবৃত হয়ে পড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের হাতেই সামাজিক উপন্যাসে সূক্ষ্মতর বাস্তবতার প্রবর্তন ঘটতে দেখা গেল। ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতা, তাঁর পরিণত মনে নবতর সৃষ্টির দ্বারমুক্তির সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করল। বঙ্কিমের জীবিতকালে পূর্বোক্ত উপন্যাস-দুটি ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করতে তাঁকে দেখি না।[২] বঙ্কিমের মৃত্যুর (২৬চৈত্র, ১৩০০) সাত বছর পরে রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির[৩] প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রোমান্স বহির্মুখী। তাঁর উপন্যাস-গুলিকে তিনি কল্পনার রঙিন আলোকে ধৌত করে নিহিত আদর্শ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির রোমান্স অন্তর্মুখী। অনায়াসেই তা চরিত্র বিশ্লেষণ ও উন্মোচনের সহায়ক হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত সামাজিক রীতি ও নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে উপন্যাসে সেই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র রচনা করেন নি। একটি সংস্কারমুক্ত পক্ষপাতশূন্য মনে রবীন্দ্রনাথ নরনারীর হৃদয়ের বিচিত্র আশা-নিরাশার তরঙ্গগুলির সার্থক বিন্যাস ঘটিয়েছেন। চোখের বালিতে বর্ণিত প্রেম, প্রচলিত সমাজনীতি-বিগর্হিত হলেও নীতি-শাসিত নয়। এই প্রণয়ধারার (মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী) অসারত্ব কিংবা গর্হিতত্ব প্রতিপাদনের জন্য নীতির যষ্টি তিনি প্রয়োগ করেন নি। বরং এই প্রেমের পূর্ণবিকাশের পথ

২ ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস করুণা সম্পূর্ণ বলে দাবি করেছেন। তাঁর মতে চোখের বালি করুণার সম্প্রসারণ। অথবা করুণা চোখের বালির খসড়া। —রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়, পৃ. ১২ (ভূমিকা), ৭১—৭২।

৩. বঙ্গদর্শনে প্রকাশ : বৈশাখ ১৩০৮—কার্তিক ১৩০৯, গ্রন্থপ্রকাশ : ১৩০৯, ১৯০৩।

তিনি মুক্ত করে দিয়েছেন। চোখের বালির এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য 'চোখের-বালিকে উপন্যাস-সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে'।[৪] তাই দুর্গেশনন্দিনীর মত চোখের বালিও যুগপরিবর্তনের দাবিদার। 'দুর্গেশনন্দিনীর পর যদি কোন গ্রন্থ . উপন্যাসের চোখে নতুন যুগ-পরিবর্তনের দাবি করিতে পারে তবে সে চোখের বালি'।[৫] এই বিচারে চোখের বালির প্রকাশকাল অর্থাৎ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বঙ্কিমোত্তর যুগের যাত্রা শুরু। আলোচনার এই ভিত্তিতে আমরা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্কিমকাল রূপে গ্রহণ করেছি। এই সীমাবৃত্তে (১৮৬৫—১৯০৩) আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের রচনাবলীর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

॥ ২ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালের গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে গৌণ কথাটির সংজ্ঞা নির্ণয় ও ব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ অবকাশ আছে। গৌণ আমরা কাকে বলব? যিনি বা যাঁরা মুখ্য নন তিনি বা তাঁরাই কি গৌণ? বঙ্কিমযুগে বঙ্কিমচন্দ্রই যে উপন্যাস-সাহিত্যের সাম্রাজ্যে রাজাধিরাজ একথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বঙ্কিমকালে বঙ্কিমের আদর্শে আস্থাবান কথাশিল্পীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বঙ্কিমের পথ অনুসরণ করে উপন্যাস-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এঁদের অনুশীলন ও প্রতিভা বঙ্কিমকে অনুসরণ করে শিল্পসৃষ্টির চেষ্টায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাভাবনার ও পদ্ধতির পথ ধরে এঁরা বেশিদিন চলতে পারেন নি। এইসব শ্রেণীর লেখকদের আমরা কি বলব? বঙ্কিম-অনুসারী ঔপন্যাসিক, না গৌণ ঔপন্যাসিক? আলোচ্যকালের প্রেক্ষিতে আমরা এই শ্রেণীর লেখকদের দুনামেই অভিহিত করতে পারি। তবে গৌণ ঔপন্যাসিক-এর অভিধায় এঁদের চিহ্নিত করবার অবকাশ বেশি। কারণ, বঙ্কিম-আদর্শপুষ্ট এইসব ঔপন্যাসিকেরা বঙ্কিম-প্রতিভার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি।

৪. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৫ম সং) পৃ. ১৪৯।

৫. শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত: শরৎচন্দ্র (৬ষ্ঠ সং), পৃ. ১১।

বঙ্কিম-আদর্শবাদকে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বঙ্কিম-নির্দেশিত সাহিত্যস্রোতকে প্রসারিত করেছেন মাত্র।

বঙ্কিমের জীবনে সত্যতার স্বীকৃতি বলিষ্ঠ ছিল বলেই তিনি সমকালীন ঔপন্যাসিকদের জন্য একটি বলিষ্ঠ ভিত্তিভূমি রচনা করতে পেরেছিলেন। এইসব মানুষদের মনেও তিনি আত্মবিশ্বাস ও শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে আদর্শ ও সত্য সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয় দিকটি নির্দেশ করেছেন। বঙ্কিমযুগে উপন্যাসরচনায় যাঁরা মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের কেউ কেউ বঙ্কিম-প্রভাববহির্ভূত হলেও বঙ্কিমযুগের আবরণে আবৃত হয়ে পড়ে গৌণ ঔপন্যাসিকেরই দলভুক্ত হয়েছেন।

শিল্পের যদি যুগ অতিক্রম করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে যুগের আধারেই তার আবেদন নিঃশেষিত হয়ে যায়। যুগের দাবি মিটিয়ে যুগকে অতিক্রম করার এবং প্রভাবিত করার শক্তি যদি শিল্পের না থাকে ত তার স্রষ্টা প্রধান শিল্পী হবার গৌরববঞ্চিত হতে বাধ্য। একথা অক্ষম অথবা সচেতন-অনুকারী এবং মৌলিক রচনাকার উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বঙ্কিম-সমকালে কোন কোন ঔপন্যাসিকের রচনায় আমরা মৌলিকতার পরিচয় পাই। এঁদের বলা চলে স্বতন্ত্র সাধক। এক্ষেত্রে অন্যতম মুখ্য ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁদের বিচারের প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক। একটি বিশেষ যুগের আবহাওয়ায় যাঁরা যুগনেতার পথ অনুসরণ না করে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র পথ বেছে নিয়েছেন তাঁরা কৃতিত্বের তথা স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হতে পারেন, কিন্তু তাদের সৃষ্ট সাহিত্য যদি সমকালকে কিংবা উত্তরকালকে প্রভাবিত করে, সৃষ্ট স্বতন্ত্র ধারাটিকে অব্যাহত রেখে নতুন দিক নির্দেশ করতে না পারে, তাহলে সেই রচনায় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ থাকা সত্ত্বেও সেইসব ঔপন্যাসিক, গৌণ ঔপন্যাসিক রূপেই গণ্য হবেন।

আরও একটি বিষয় বিচারসাপেক্ষ। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, একজন ঔপন্যাসিক তাঁর অসফল ও অসার্থক রচনার মধ্যে যে সার্থকতার ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত রেখে গেলেন, তার সূত্র ধরে পরবর্তীকালে কোন শিল্পী তাঁর শিল্পে পরিপূর্ণ সাফল্য ও সার্থকতা আনলেন; যা একটি নতুন-ধারার সৃষ্টি করল কিংবা গতানুগতিক ধারায় পরিবর্তন আনল। এক্ষেত্রে মুখ্য

ও গৌণের বিচারে পরবর্তী শিল্পী সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে স্থানই লাভ করুন না কেন, পূর্ববর্তী শিল্পীকে গৌণ বলেই অভিহিত করতে হয়।

এবারে উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে গৌণ কথাটির সংজ্ঞা নির্ণয় করা যেতে পারে।

(১) একটি কালের সাহিত্যিক নেতার অনুসরণকারিগণ গৌণ। প্রতিভা ও অনুশীলনের দীনতার জন্য যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন প্রত্যয় সৃষ্টি করে সাহিত্যিকগোষ্ঠী ও নতুনধারা সৃষ্টি করতে অক্ষম তিনি গৌণ।

(২) রচনায় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ থাকা সত্ত্বেও কাল-অতিক্রমণে ও যুগসৃষ্টিতে অক্ষম শিল্পের স্রষ্টা গৌণ। রচনার মধ্যে মৌলিকতা ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকলেই রচনাকারকে মুখ্য বা প্রধান অভিধায় চিহ্নিত করা যায় না। শিল্পবিচারের ভিত্তিতে মুখ্য ও গৌণ স্থির করা সম্ভব। তাই শিল্পবিচারে অপরিণত ও অসার্থক শিল্পের স্রষ্টা গৌণ।

বিচারের এই সূত্রে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া সকল ঔপন্যাসিকই গৌণ।

॥ ৩ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বভাবতই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রেরণা ও তৎকালের সাহিত্যাদর্শের কথা এসে পড়ে। একথা স্মরণ রেখে গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের রচনা আলোচনা-কালে তাঁদের রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ও প্রভাবমুক্ত স্বকীয়তার বিষয় লক্ষ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলাদেশে চিন্তাশীল সামাজিকদের মধ্যে বঙ্কিম ছিলেন অন্যতম। সমাজ আন্দোলন-অন্তে সামাজিক পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সনাতন আদর্শের আলোক-বর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত হন।

প্রধানত শিল্পসাধনার মধ্য দিয়েই বঙ্কিম সেই পরিচয় রেখে গেছেন প্রগতিবাদী সামাজিকদের সমাজসংস্কারকে হিন্দুধর্ম ও সমাজের সনাতন আদর্শের নিরিখে বিচার করে, প্রচলিত সনাতন-রীতির পক্ষেই তিনি রায় দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী মন এই বিশ্বাস পোষণ করেছিল যে, সভ্যতার অগ্রগমনে সামাজিক মূল্যবোধের নিশ্চিত পরিবর্তনজাত সত্যের

মূল্যকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যবাদী দৃষ্টি তাঁর এই মানসিকতাকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে ছিল। সেই দৃষ্টি দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রাচীন সমাজ ও ধর্মাদর্শকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ক্রমযুগান্তরশীল সমাজের নববিধান, তাঁর এই দৃষ্টিকে প্রভাবিত করেনি। এই ঐতিহ্যবাদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেমন সমর্থন করলেন প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক বিধানকে, তেমনি আবিষ্কার করলেন সেই হিন্দু অতীতকে। পরিবর্তমান সমাজধারায় সেই হিন্দু অতীতকেই তিনি গতিদান করতে চেয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর শিল্পকর্ম কোন কোন ক্ষেত্রে নীতিমূলক ও আদর্শ-পীড়িত হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম-সমকালীন কোন কোন ঔপন্যাসিকের রচনায় নীতি ও আদর্শের বাহুল্য শিল্পের সীমা লঙ্ঘন করেছে। প্রচলিত সমাজ-আদর্শে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র সনাতন নীতিধর্মবোধের প্রতি আস্থার ভিত্তিতেই উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসে বেপথু চরিত্র যেমন সনাতন বিধান অনুসারী শোধিত হয়ে সমাজে পুনঃপ্রবেশের অধিকার পেয়েছে, তেমনি আদর্শচরিত্র নীতিধর্মপুষ্ট হয়েই মাহাত্ম্য বিস্তার করেছে। আবার অন্যদিকে, নীতিধর্মহীন কিংবা লঙ্ঘনকারী মানুষ নির্মমভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। তিনি ধর্মীয় সত্যের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যের ঐক্য কল্পনা করেছেন ; এবং সাহিত্যকে ত্যাগ না করে 'সাহিত্যকে নিম্নতম সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ' করতে বলেছেন (ধর্ম ও সাহিত্য, বিবিধ প্রবন্ধ)। আবার 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'-এ ঐ একধরনের কথাই তিনি উচ্চারণ করেছেন,—'সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের আদর্শ। অন্য উদ্দেশে লেখনী ধারণ করা মহা পাপ' (প্রচার, মাঘ ১২৯১)। বঙ্কিমচন্দ্রের উপলব্ধ এই ধর্ম, মানবধর্মের নামান্তর ; মানুষের মহিমায় তিনি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। 'তিনি মানবপ্রীতি ও চরিত্রনীতি এই দুয়েরই অসম্পূর্ণতা ঘুচাইয়া, যতকিছু ব্যর্থতা ও সংকীর্ণতা সত্ত্বেও মানুষের মহিমাকে আধুনিক যুগধর্মের অনুরূপ করিয়া পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন'।[৬] কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'সুখের উপায় ধর্ম আর মনুষ্যত্বই সুখ'। বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ তাঁদের রচনায় মনুষ্যত্বের অনুকূলে গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, মানবিক

৬. মোহিতলাল মজুমদার, বঙ্কিমবরণ ১৩৫৬, পৃ. ২০।

মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী উভয় শ্রেণীর লোকেরা স্ব স্ব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

বঙ্কিম-সমকালের ঔপন্যাসিকেরা একদিকে সমাজ ও ব্যক্তি-সমালোচনা, অপরদিকে মত ও আদর্শ প্রচারকে রচনার অন্যতম প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছেন। তাই অনিবার্যভাবে সাহিত্যাদর্শের মূলে নীতি প্রাধান্য পেয়েছে। নীতি-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পাঠকের চিত্তশুদ্ধিবিধানই যে উপন্যাসের অন্যতম ধর্ম, বঙ্কিম-সমকালীন সমালোচক সে-কথা বলেছেন—'পাঠকের চিত্তকে সৌন্দর্য অনুভব করাইয়া ইহার চিত্তশুদ্ধিবিধানই কাব্যের ধর্ম—আমরা কাব্যকথার অর্থগোলে না পড়িয়া বলিব—উপন্যাসের ধর্ম।...হৃদয়ের স্থায়ী ভাবমাত্রই লোকের নীতি হইতে পারে। চরিত্রও এই স্থায়ী ভাব লইয়া। তবে উপন্যাস নীতিমূলক বলিতেই বা কি আপত্তি হইতে পারে? নীতির উল্লেখ অবশ্য উপন্যাসের কার্য নহে—নীতির ব্যাখ্যা করা বা তাহার কার্যাকার্য প্রদর্শনই উপন্যাসের কার্য।...উপন্যাস মনুষ্যজীবনের সমস্যার ব্যাখ্যা মাত্র।... যাহাকে আমরা সচরাচর নীতি বলি, সেই নীতি এই ব্যাখ্যা হইতে সংগৃহীত। এই নীতিতে যুক্ত হইয়াই উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্ট হয়—উপন্যাস সৃষ্ট হয়'।[৭] সমাজ ও ব্যক্তি-সমালোচনার মধ্য দিয়ে জাতিগঠনের দায়িত্বের বিষয় সম্পর্কে প্রধান এবং গৌণ উভয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক সচেতন ছিলেন। ব্যক্তি নিয়ে সমাজ এবং সমাজ নিয়েই জাতি। বঙ্কিম-সমকালে, জাতির মঙ্গলসাধন ও জাতি-গঠনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত। বঙ্কিমের অন্যতম পার্ষৎ চন্দ্রনাথ বসু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতিগঠনের দায়িত্বের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন,—'সমগ্র জাতির মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্য রচনা করিলে সাহিত্যের সাহায্যে বড় বৃহৎ বড় মহৎ বড় সুন্দর বড় পবিত্র কার্য করা যায়।...যে সাহিত্যের ফল কদর্য ও বিষময়, যে সাহিত্য জাতি ভাঙ্গে জাতি গড়িতে দেয় না, তাহা—জাতীয় সাহিত্যও নহে, প্রকৃত সাহিত্যও নহে'।[৮] সমকালীন অনেক গৌণ ঔপন্যাসিককে রচনার মধ্য দিয়ে পাঠকের 'চিত্ত-শুদ্ধিবিধান' ও জাতিগঠনের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকতে দেখা যায়।

৭. নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯৪, পৃ. ৪৬—৪৮।

৮. বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, দ্বি.—সং. পৃ ৭।

॥ ৪ ॥

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে আমরা বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের রচনায় কয়েকটি বিভাগ করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে যে আড়াই শতাধিক উপন্যাস-লেখকের সন্ধান পেয়েছি তাঁদের রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য ভিত্তি করেই এই বিভক্তিকরণ। বঙ্কিম-সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনার যে একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, বঙ্কিম-পরবর্তীকালে সেই প্রবণতায় ভাটা পড়েছিল। সামাজিক উপন্যাসরচনায় কিন্তু লেখকদের আগ্রহের অভাব লক্ষ করা যায় না। উনিশ শতকের যুগসংকট ও সামাজিক সমস্যা সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের উপন্যাসগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। পারিবারিক উপন্যাসে যৌথ জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য উদ্‌ঘাটিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ মূলত তিন শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করেছেন।

(১) সামাজিক-পারিবারিক (২) ঐতিহাসিক (৩) কাল্পনিক।

বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকরা এই তিন শ্রেণীর উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয়গত বৈচিত্র্য-সৃষ্টিতে তৎপর থেকেছেন। সমাজ ও পরিবারকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির কয়েকটি বিভাগ করা যায়। (ক) বিধবা-সমস্যা (খ) নারীর স্বাতন্ত্র্য, প্রণয় ও সতীত্ব (গ) কৌলীন্য-প্রথা ও বহু-বিবাহ (ঘ) যৌথ-পরিবার (ঙ) বিচিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন সমাজে বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনের (১৮৫৬) বহু পূর্ব থেকেই সমস্যাটি সম্পর্কে সমাজে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্যাটির মূলে আছে বিধবা-বিবাহের বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন। উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই এই প্রশ্ন মানুষের মনে জাগতে থাকে।[৯]

৯. (ক) সমাচার-দর্পণ (১০ মার্চ ১৮৩৭, পৃ. ৮৮)-এ কাচিৎ শান্তিপুর-নিবাসিনী লিখিত একটি পত্রে 'ইঙ্গরেজ বাহাদুরের কাছে' আইন-অনুসারে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের আবেদন করতে দেখা যায়।

(খ) সমাচার-দর্পণ (১৮ আপ্রিল ১৮৩৭, পৃ. ১২৭–২৮)-এ বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের অনুরোধে 'কাস্যাং শান্তিপুর নিবাসানেক বিরহিণী নাম্'-এর পত্র।

(গ) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৮)-এ, বিধবা-বিবাহকে আইনত কার্যকরী করার সম্ভাবনা সম্পর্কে জনৈকের সংশয়—'ফলতঃ জ্ঞান ও সভ্যতার বর্দ্ধনক্রমে ঐ নির্দয় ব্যাপারও ক্রমশ লোপ হইবেক।'

আলোচ্যকালে এই জাতীয় সামাজিক সংস্কার সমর্থিত হয়েছিল ব্রাহ্মদের দ্বারা। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের সমাজ-সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তও অনেকটা এই জাতীয় মতের পোষক ছিলেন। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন, 'বিধবা-বিবাহ ভালও নহে মন্দও নহে, সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব-পতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্র স্বভাববিশিষ্টা স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।' তাঁর উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে উক্তিটির দ্বিতীয় অংশই প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের রচনায় বিধবা-সমস্যা প্রতিফলিত হতে দেখি। এই বিধবা-সমস্যা মূলত বিধবা-প্রণয় ও বিধবা-বিবাহ সমস্যা। সমকালীন ওপন্যাসিকদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শৈশব সহচরী (১০৭৮), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯)-র মেজবউ (১৮৭৯), যুগান্তর (১৩০১), রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮—১৯০৯) সংসার (১৮৮৬), দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩—১৯০৭)-এর বিমলা (১৮৭৭), দুই ভগ্নী (১৮৮১), দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৫৪—১৯২০)র মুরলা (১২৯৯), বিরাজমোহন (১৮৭৮), ভিখারী (১২৮৮), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭ ?—১৯৩২)-র স্নেহলতা (প্র—খ ১৮৯০ দ্বি—খ ১৮৯৩), তারকনাথ বিশ্বাস (১২৬৫—১৩৪৪)-এর কমলা, (১৮৮৩), কুসুমকুমারী দেবীর প্রেমলতা (১৮৯২), প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের কুমারী না বিধবা (১৮৯১), খগেন্দ্রনাথ রায়ের শ্রী (১৮৯৩), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখানি ছবি (১৮৮৮), কমলকুমার (১৮৯৯), মনোরমার গৃহ (১৯০০), সত্যচরণ মিত্রের অবলাবালা (১৮৮৭), শরৎ-এর শরৎকুমারী (১২৯১), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের কণক প্রতিমা (১৮৯০) প্রভৃতি উপন্যাসে, বিধবা-সমস্যার জটিলতার দিকটি উন্মোচিত হতে দেখি। স্বর্ণকুমারী দেবী ও কুসুমকুমারী দেবীর রচনায় বিধবা-প্রণয়ের চিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত হলেও লৌকিক বিবাহের চিত্র পাই না। কুসুমকুমারী প্রেমলতায় বিধবার একজাতীয় আধ্যাত্মিক বিবাহের কথা বলেছেন। শরৎ-এর শরৎকুমারীতেও

বিধবার আধ্যাত্মিক বিবাহের চিত্র দেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় বিবাহ নরনারীর দৈহিক সম্পর্কের উর্ধ্বে স্থাপিত। রমেশচন্দ্র সংসার-এ বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় অনুমোদনের প্রসঙ্গ তুলে বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে মত জ্ঞাপন করেছেন। সংসার-এ বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মেজবউ ও যুগান্তর-এ বিধবা-প্রণয়ের সংযম-মধুর চিত্র তুলে ধরেছেন। ঘটনাবিপর্যয়ের ফলে মেজবউ-এ বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন না হলেও যুগান্তর-এ বিধবা-বিবাহ ঘটতে দেখি। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতাকে এত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছেন যে, তাঁর উপন্যাসে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে কোন সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিন্দুমাত্র পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। শিবনাথ ও দেবীপ্রসন্নের উপন্যাসে বিধবা-প্রণয়ের লালসাপূর্ণ দিকটি অত্যন্ত কঠোরভাবে শাসিত ও ঘৃণিত হয়েছে। খগেন্দ্রনাথ রায়ের শ্রীতে বিধবা-বিবাহজাত সন্তান-সমস্যা উত্থাপিত হতে দেখি। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁর উপন্যাসে বিধবা-প্রণয়ের লালসাপূর্ণ দিকটি চিত্রিত করে তার চরম প্রায়শ্চিত্তের চিত্র দিয়েছেন।

নারীর স্বাতন্ত্র্য, প্রণয় ও সতীত্বের প্রসঙ্গও গৌণ ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের রচনার বিষয়ীভূত করেছেন। বিধবা-বিবাহের মত স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা বঙ্গসমাজে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই এই বিষয়টি সামাজিকদের মনে প্রশ্ন তুলেছিল।[১০] সমকালে কিছুসংখ্যক

১০. (ক) সমাচার-দর্পণ, (১৮৩১, ৪ঠা জুন, পৃ. ১৮৫)-এ প্রকাশিত একটি পত্রে লেখক 'বিদ্যাপ্রাপ্ত' হিন্দু স্ত্রীলোকদের সমাজে আগমনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের মঙ্গলের সম্ভাবনাকে লক্ষ্য করেছেন।

(খ) সমাচার-দর্পণ (১৮৩৭, ২৮শে জানুয়ারি পৃ. ৩১—৩২)-এ প্রকাশিত আর একটি পত্রে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী পুত্রের মত কন্যাকে পালন ও শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন লেখক।

(গ) সমাচার-দর্পণ (১৮৩১, ১৮ জুন পৃ. ১৯৮)-এ প্রকাশিত পত্রে লেখক স্ত্রীশিক্ষার অযৌক্তিকতার কথা বলেছেন।

(ঘ) সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় (১৮৫০, ১৪ই মে)-এর একটি সংবাদে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য 'কৌনসেল আব এডুকেশনের সভাপতি' মহাশয়ের প্রচেষ্টা অভিনন্দিত হয়েছে।

(ঙ) স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব রচনা করে শতমুদ্রা পারিতোষিক লাভ করার সংবাদ পাই, সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় (২৩শে কার্তিক ১২৫৭)-এ। সম্পাদক 'ঐ পুস্তক ক্রমশ কিঞ্চিৎ ২ করিয়া স্বীয় পত্রমধ্যে উদ্ধৃত করত পাঠকবর্গের গোচর' করার ইচ্ছাও জানিয়েছেন।

(চ) 'অবলাকুলকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া'র বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হয়েছে। তদেব (২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮)। (পরপৃষ্ঠায় দ্র.)

সংস্কারবাদী মানুষ নারীর শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যকে সর্বাংশে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। বাল্যবিবাহ, বিধবা-সমস্যা, কৌলীন্য-প্রথা প্রভৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নারীর শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যলাভের অধিকার। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, স্বাতন্ত্র্যবোধ উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার-প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের মধ্যে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারের প্রশ্নে মতদ্বৈধ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নারীর স্বাতন্ত্র্যের মূলে যে শিক্ষা, তার মধ্যে প্রায় সকলেই সংযম ও কর্তব্যপরায়ণতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অবশ্য ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর নয়নতারা (১৮৯১), রমেশচন্দ্র দত্তের সমাজ (১৮৯৪), স্বর্ণকুমারী দেবীর কাহাকে (১৮৯৮), পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের চিরসঙ্গিনী (১৮৮৫) প্রভৃতি উপন্যাসে নারীর স্বাতন্ত্র্যের দিকটি সংযমের মন্ত্রে দীক্ষিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর নয়নতারায় নারীর বিকশিত ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিগত জীবনে আকাঙ্ক্ষাসিদ্ধির অন্তরায়ের সম্মুখীন হলেও ধর্ম ও সত্য নির্দেশিত পথে জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুপমা (১৮৮৯) স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রচিত উপন্যাস। বীরেশ্বর পাণ্ডের অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব (১৮৮৮)-ও অনুরূপ রচনা। স্ত্রী-শিক্ষার পারিবারিক প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে রচিত কেদারেশ্বর সেনের স্মৃতি-মন্দির (১৯০০)।

এই সূত্রে নারীর প্রণয় ও সতীত্বের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বঙ্কিমকালের চিন্তাশীল সামাজিক ও সমালোচক, নরনারীর হৃদয়জাত প্রণয়কে সামাজিক-প্রথার অধীনে দেখতে চেয়েছেন। বিবাহোত্তর প্রণয়কে ইংরাজভাবপ্রসূত বলে রক্ষণশীল সামাজিক মনে করেছেন। 'বিবাহের পরেও প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর ভালবাসা হৃদয়জাত, নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দেরও তাই। এসব ভাব

(ছ) 'বিদেশীয় অবলাগণের স্বাতন্ত্র্য দেখে যাঁরা 'স্বদেশীয় নারীনিকরের স্বাধীনতা বাসনা করেন' তাঁদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মত দেখতে বলা হয়েছে। তদেব (২৭শে আষাঢ় ১২৫৮)।

(জ) অনুরূপ পত্র, তদেব. (১০ আশ্বিন ১২৫৯)।

(ঝ) বিবিধার্থ সংগ্রহ (১ম খণ্ড, ১১ সংখ্যা শকাব্দ ১৭৭৪ ভাদ্র)-এ প্রকাশিত 'সতীত্ব' নামক প্রবন্ধে 'ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশীয় প্রমদাগণের' সঙ্গে 'বঙ্গদেশীয় দুর্ভাগাকন্যাগণের' তুলনামূলক আলোচনায়, শৈশব-বিবাহ, বৈধব্য-যন্ত্রণা ও কৌলীন্য-প্রথার দুঃসহ যাতনার কথা বলা হয়েছে (পৃ. ১৭৫—৭৬)।

ইংরেজদের'।[১১] আমাদের দেশের প্রণয়কে সমাজ-প্রথার অধীন করে, হৃদয়কে সমাজের বশে রেখে চলতে হবে বলে, তিনি দৃঢ় মত জ্ঞাপন করেছেন। এবং একেই বঙ্গদেশের প্রণয়ের লক্ষণ বলে মনে করেছেন তিনি। বিধবা-প্রণয় তাঁর যুক্তিতে অযৌক্তিক। বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকরা, যাঁরা উপন্যাসে বিধবা-বিবাহের সমর্থন করেছেন, তাঁরা বিধবা-প্রণয়ের স্নিগ্ধ-মধুর চিত্র দান করে, পাঠকের সহানুভূতি আদায়ে তৎপর হয়েছেন। প্রণয়ের সঙ্গে সতীত্বের সম্পর্ক গভীর। সতীত্ব সম্পর্কে আলোচ্যকালের সামাজিকের অভিমত, 'বৈজ্ঞানিকেরা সতীত্বকে মনের ভ্রম বলিয়া বুঝাইতে পারেন, দার্শনিকেরা সতীত্বকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সতীত্ব আমাদের কলঙ্কিত মস্তকের একমাত্র উজ্জ্বলমণি।... সতীত্বের রক্ষিতে যে সমাজের সুখবৃদ্ধি হয় তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি এই প্রণয় হইতে এই সতীত্বটুকু বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে পশুভাব ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না'।[১২] চারিত্র্য-নীতি, সমাজ-ধর্মনীতির নির্দেশ অনুসৃত হবে, এটাই বঙ্কিমযুগের রায়। বঙ্কিমচন্দ্রও এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধে স্ত্রী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সতীত্ব ও সংযমকে তিনি প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন,—'পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল, পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল।' প্রণয় সামাজিক বিধিনির্দেশিত হবে এবং স্ত্রী ও পুরুষের সতীত্ব ও সংযমকে আশ্রয় করে বর্ধিত হবে, এই নীতিই প্রাধান্য পেয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিক-বৃন্দের রচনায়। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠমালা (১৮৭৭), মাধবীলতা (১৮৮৫), দামোদর মুখোপাধ্যায়-এর যোগেশ্বরী (১৮৯৮), দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরীর পুণ্যপ্রভা (১৩০৩), যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯০৯)-এর প্রসন্নকুমারের উইল (১৯০০), প্রেম-প্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা (১৮৮৬), অম্বিকা-চরণ গুপ্তের সংসারসঙ্গিনী (১৮৮৫), নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০)-এর

১১. নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য : বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৭ (১৮৮১)।

১২. তদেব।

তমস্বিনী, হেমাঙ্গিনীর প্রণয়প্রতিমা (১২৮৪) সত্যচরণ মিত্রের সহমরণ (১৮৯৫), সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তীর সাবিত্রী (১৮৯৮), নারায়ণ দাস মৌলিকের দলিতকুসুম (১৮৯৫), কুমুদবিহারী মল্লিকের সৌদামিনী বা হিন্দুসতী সৌদামিনী (১৮৯৩), শ্যামলাল মজুমদারের দেবী না মানবী (১৮৯৪), যদুনাথ কাঞ্জিলালের নির্মলা (১৮৯৪), অতুলানন্দ গুপ্তের যোগিনী (১৮৯৪), উমেশচন্দ্র বিশ্বাসের কুটীরকুসুম (১৮৭৯), কৃষ্ণধন চক্রবর্তীর বৌরাণী (১৮৮৯) প্রভৃতি রচনায় নারীর সতীত্ব ও প্রণয়ের সততার বিষয় স্বীকৃতি পেয়েছে। বিবাহিতা নারীর প্রেমিকের জন্য স্বামিত্যাগ ও পুনঃ-প্রত্যাবর্তন নিয়ে রচিত উপন্যাস বসন্তকুমার ভট্টাচার্যের রমণী-হৃদয় (১৮৮৯)। হারাণশশী দের রাণী মৃণালিনী (১৯০০)-তে বিবাহিতা-নারীর পুনর্বিবাহ সমর্থিত হয়েছে।

কৌলীন্য-প্রথার সঙ্গে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বঙ্কিম-কালের সামাজিকেরা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এইসব প্রথার বিরোধী ছিলেন। 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে তিনি কুপ্রথা জ্ঞানে বহুবিবাহের বিরোধিতা করেছেন এবং এই প্রথার বিরোধী ব্যক্তি কৃতজ্ঞতাভাজন বলে জানিয়েছেন। সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকরা কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথার কুফল প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তাঁদের উপন্যাসে। বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য-প্রথা ও বহু-বিবাহ এই তিনটি সমস্যা একই সূত্রে জড়িত। শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর (১৩০১), রমেশচন্দ্র দত্তের সংসার (১৮৮৬), সমাজ (১৮৯৪), দেবী-প্রসন্ন রায়চৌধুরীর শরৎচন্দ্র (১৮৭৭—৭৮), যোগজীবন (*১২৮৯), প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়-এর সমাজকালিমা (১৮৮৫), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখানি ছবি (১৩০৫), কুসুমকুমারী দেবীর স্নেহলতা (১৮৯০), নগেন্দ্র বসুর একটি চিত্র (১৮৮৬), জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের নবদুর্গা (১৮৮৪), পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের কুলবালা (১৮৮৫), রামনৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়ের সুরেন্দ্রনলিনী, (১৮৮৫) সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের কুলীনকুমারী নির্মলা (দ্বি. সং. ১৯০০), শ্যামলাল মজুমদারের প্রভা (১৮৯৬), সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তীর নিরাশ প্রণয় (১৮৮৮) প্রভৃতি রচনায় সমস্যাটি প্রতিফলিত হতে

দেখি। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিমাতা (১৩০০)-য় একাধিক বিবাহের কুফল প্রদর্শিত হয়েছে।

উনিশ শতকের সামাজিক জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে ঢেউ এসেছিল, তা বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনকেও স্পর্শ করেছিল। বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে যে যৌথ জীবনযাত্রার প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই প্রথায় ক্রমশ ফাটল ধরতে দেখা গেল। কর্মজীবনের সঙ্গেও অবশ্য এই প্রথার সমৃদ্ধি ও বিনাশের সম্পর্ক জড়িত। যৌথ-পারিবারিক জীবন এককালে বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার অঙ্গ ও আদর্শ ছিল। সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের রচনায় এই প্রথাজনিত পারিবারিক জীবনের সমৃদ্ধি ও বিনাশের চিত্র উদ্ঘাটিত হতে দেখি। এই যৌথজীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ত্যাগ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩—১৮৯১) স্বর্ণলতা (১৮৭৪), যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনে বউ (১২৯৭), মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের (ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র) অনাথবন্ধু (১৮৯৬), সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর রায়-পরিবার (১৮৯৫), অজ্ঞাতনামা লেখকের মডেলকাকা বা বসন্তকুমারী (১৮৯৩), পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের ছায়া (১৮৯০), প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের আনন্দকানন (১৮৮৮), পশুপতি মিত্রের উন্মাদিনী (১৮৯২), প্রভৃতি রচনায় যৌথপরিবারের ভাঙ্গন ও সমৃদ্ধির বিষয় লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমসমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকেরা বিষয়নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের সন্ধানপর হয়েছেন। সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস-রচনাকালে কেবল-মাত্র উপরি-উক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি যে কত বিচিত্র বিষয়ের প্রতি প্রসারিত হয়েছিল, তার পরিচয় পাই এঁদের রচনায়। অসবর্ণ বিবাহকে বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সমাজ (১৮৯৪) উপন্যাসে। বর্ণভেদ-প্রথাকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে নিশিকুমার ঘোষ শরৎশশী (১৮৮১) এবং দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নব্যবঙ্গ (১৮৯৩) রচনা করেন। রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯) জ্যোতির্ময়ী (১২৯৫) উপন্যাসে পণপ্রথার মারাত্মক কুফলের দিকটি তুলে ধরেছেন। বৈষ্ণবচরণ বসাক নারীর প্রেম-প্রতিহিংসাপরায়ণতার চিত্র তুলে ধরেছেন পাষাণময়ী (১৮৯৫) উপন্যাসে। প্রায় অনুরূপ চিত্র পাই, রাধিকাপ্রসাদ হালদারের বিরাজ-মোহিনী (১৮৯৫)-তে। তারও পূর্বে তারকনাথ বিশ্বাসের (১২৬৫-১৩৪৪)

সুহাসিনী (১৮৮২) উপন্যাসে। কুমারী মাতাকে কেন্দ্র করে রচিত রাধানাথ মিত্রের তারাতীর্থ (১৮৮৯) ও সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের ভিখারিণী (১৮৯১)। বিধবাবিবাহজাত সন্তানসমস্যার বিষয় উত্থাপিত হয়েছে খগেন্দ্রনাথ রায়ের শ্রী (১৮৮৩) উপন্যাসে। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিকুমারী (১৮৮৩)-র বিষয়বস্তু স্ত্রী-ব্যবসা। কন্যা কলকাতা-নিবাসিনী হবার জন্য, প্রণয় ও পরিণয়-বিপত্তির বিষয় নিয়ে লিখেছেন ভুবনমোহন শর্মা তাঁর বঙ্গোপন্যাস বা চারুশীলা (১৮৮১) উপন্যাসে। অনুরূপ বিপত্তির কারণ ঘটতে দেখি বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতিয়া (১৮৮৭)-য়। এক্ষেত্রে বিপত্তির কারণ খ্রীষ্টানধর্ম। তারকনাথ বিশ্বাসের কমলকুমারী (১৮৮৬) অপর উদাহরণ। এখানে হিন্দুধর্ম মিলনের অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। মূক ও বধির বালিকার স্বামিসন্ধানের বিচিত্র কাহিনী স্থান পেয়েছে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভারতীয় রহস্য (১৮৮৭) উপন্যাসে। হিন্দু নারীর সঙ্গে মুসলমান পুরুষের প্রণয় এবং মেয়েটির মুসলমানধর্ম গ্রহণান্তর পুরুষটিকে বিবাহের কাহিনী পাই আজ্জামান্দ আলীর প্রেমদর্পণ (১৮৯১) উপন্যাসে। পতিতা-জীবন ও সমস্যা স্থান পেয়েছে নগেন্দ্রনাথ পালের স্বর্ণবাঈ (১৮৮৮), অসতী সন্ন্যাসিনী (১৮৮৫), কালীপ্রসন্ন দত্তের দলিতকুসুম (১৮৮৯), প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের পাহাড়ে মেয়ে (১৮৮৯) উপন্যাসে। স্মৃতি-ভ্রংশকে কেন্দ্র করে রচিত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পারুল (১৮৯৩)। চিরঞ্জীব শর্মার বিংশ শতাব্দী (১৮৯১) উপন্যাসে বিশ শতকের শেষে রাশিয়া কর্তৃক ভারত আক্রমণ ও ব্যর্থতা এবং ভয়ঙ্কর প্লেগে জনসংখ্যা হ্রাস পাবার বিষয় কল্পিত হয়েছে। ধর্মকে কেন্দ্র করেও ঔপন্যাসিকরা এই কালে উপন্যাস রচনা করেছেন। বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত যাদবচন্দ্র রায়ের পটল দাস মহাপ্রভুর লীলা-সম্বর্ধন (১৮৯২), কেদারনাথ দত্তের প্রেমপ্রদীপ (১৮৮৫), সুরদাসের মাতাজী আশ্রম (১৮৮৮)। শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের পটভূমিতে লেখা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের শক্তিকানন (১৮৮৭) ও অধরচন্দ্র দাসের ত্রিবেণী (১৯০০)। মহিলা সন্ন্যাসিনীর নেতৃত্বে হিন্দু-সম্প্রদায় গঠনের গল্প পাই ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়-এর আনন্দ-আশ্রম (১৮৯৩) উপন্যাসে। খ্রীষ্টানধর্ম বিষয়ক উপন্যাস, জগবন্ধু ভট্টাচার্যের কুসুমকুমারী (১৮৮৩) ও হারানচন্দ্র রাহার বাল্যসখী (১৮৮৩)। উনিশ

শতকের গৌণ ঔপন্যাসিকদের এভাবে বিচিত্র উপকরণে শিল্পের আধার সাজাতে দেখি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭) প্রকাশের কাল থেকে বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনার যাত্রা শুরু হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর পূর্ব পর্যন্ত দ্বিতীয় একখানি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম করা কষ্টসাধ্য। শিক্ষাব্রতী ভূদেবের গ্রন্থে উপদেশ দুলক্ষ্য নয়। গল্পচ্ছলে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমকালের শুরু থেকেই মূলত ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনায় জোয়ার এল। আরম্ভকাল থেকেই দেখা যায়, ঐতিহাসিক তথ্যের দীনতা। টডের রাজস্থান, কণ্টারের রোমান্স ছাড়াও ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে লেখা কিছু কিছু ইংরাজী কবিতা ছিল ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনার উৎস। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল থেকে তথ্য আহরণের প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাছাড়া কিংবদন্তীর সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে সেকালের লেখকরা ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। স্থানীয় ইতিহাসকে অবলম্বন করেও বঙ্কিম-সমকালে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনার পশ্চাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যে প্রেরণাকে সক্রিয় দেখা যায় তা হল ইতিহাসের শিক্ষা। ঐতিহাসিক কাহিনীচিত্রণের মধ্য দিয়ে, দেশের অতীত অধ্যায়ের চিত্র পাঠকচিত্তে জাগ্রত করে তোলাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। চণ্ডীচরণ সেন তাঁর উপন্যাস মহারাজা নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা (১৮৮৫) গ্রন্থের ভূমিকাংশে বলেছেন, 'বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠ করিতে জনসাধারণের রুচি হয় এই নিমিত্তই উপন্যাসের আকারে এই পুস্তক লিখিত হইল।' হারাণচন্দ্র রক্ষিত, তাঁর বঙ্গের শেষবীর (১৩০৪) উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন, 'বাঙালী পাঠক সহজে ইতিহাস পড়িতে চাহেন না,--তাই এ ঐতিহাসিক উপন্যাসের অবতারণা।' ভূদেব থেকে শুরু করে বঙ্কিমসমকালের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের ইতিহাসপাঠে পাঠকের আগ্রহ জাগাবার জন্যই ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনায় ব্রতী হতে দেখি। ঐতিহাসিক কাহিনী-বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমকালীন ঔপন্যাসিকরা ইতিহাসপাঠে পাঠকের আগ্রহ সঞ্চার করেছেন, এটাই তাঁদের কৃতিত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের ঐতিহাসিক উপন্যাস-গুলিকে বিষয় অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) অতীত গৌরব, স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতা-উদ্দীপক কাহিনী

(খ) বিদ্রোহমূলক কাহিনী

(গ) স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক কাহিনা

বঙ্কিমযুগে হিন্দু জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র করেই স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতার উদ্দীপন ঘটে। সর্বভারতীয় ঐক্যচেতনার মূলে এইকালে হিন্দুত্ববোধই প্রাধান্য পেয়েছে। এইকালে ইতিহাসের সূত্র ধরে যেমন অতীত গৌরবকে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা দেখা দিয়েছিল, তেমনি সমকালীন ঘটনার সূত্র ধরে জাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা-চেতনা ইতিহাস ও কল্পনার পথ ধরে উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়েছে। সুদূর অতীত-গৌরবময় কাহিনী অবশ্য এই কালের রচনায় প্রায় অনুপস্থিত। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাঞ্চনমালা ছাড়া অনুরূপ কোন রচনা পাওয়া যায় না। অবশ্য মধ্য-যুগের গৌরবের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ। জাগ্রত-জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা-চেতনা অতীত-গৌরব-রসসিঞ্চিত হয়ে আরও ভাবদীপ্ত ও ঘনীভূত রূপলাভে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, আত্মবিস্মৃতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ। তাই তিনি পরিবর্তনশীল সমাজের মধ্যে সুদূর অতীত-আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিক-বৃন্দ ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনার ক্ষেত্রে অনেকেই বঙ্কিম-প্রদর্শিত ভাবধারাকে শিরোধার্য করেছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের জনমানসে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ ঘটতে দেখা যায়[১৩]। দ্বিতীয়ার্ধের

১৩. কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—

(ক) ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর পারীমোহন বসুর বাড়িতে 'কলকাতা লিটরেরি সাব'-এর সভায় 'ইংরাজেরা এদেশের যথার্থ উপকারী কিনা এই প্রস্তাব'-এর উপরে তর্কবিতর্কের খবর পাই। ('কস্যাচিৎ দর্শকস্য' প্রেরিত পত্র, সংবাদ-প্রভাকর ২৯শে মে ১৮৫২) (খ) ১৮৬৫—উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ। বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তির সেবাকার্য—স্বাজাত্যবোধের বিকাশ। (গ) ১৮৬৭—হিন্দুমেলায় জাতীয় ভাবধারার উদ্বোধন। নবগোপাল মিত্রের নবনামকরণ ন্যাশনাল মিত্র। (ঘ) ১৮৭৫—শিশিরকুমার ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠা। (ঙ) ১৮৭৬ ভবানীপুরে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যুবরাজ-সম্বর্ধনা,

(পরপৃষ্ঠায় দ্রঃ)

শুরু থেকে বঙ্কিম-সমকালের ঘটনাবৃত্তে এর উদাহরণ মেলে। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) এর গান (স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় ...ইত্যাদি) বাঙ্গালী-মানসে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতাচেতনার উদ্দীপন ঘটিয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুরকে স্নেহ করবার মনোভাবও এক্ষেত্রে স্মরণ করার মত। রঙ্গলালের (এবং বঙ্কিমচন্দ্রেরও) স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা যে গুরুর সূত্রে আসেনি একথা কে বলতে পারে? ১২৫৫ সালের ১লা বৈশাখ 'সংবাদ-প্রভাকর-এ 'দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি মনের স্বরূপাভিপ্রায় প্রকাশ' নামক প্রবন্ধে-র মূলে ছিল স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা। এই প্রবন্ধে পরিস্ফুট স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতা-চেতনা হিন্দুত্ববোধক[১৪]। এই হিন্দু স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতাচেতনা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীতে স্বাজাত্যবোধের সার্থক স্ফুরণ ঘটল। সপ্তদশ তুর্কী অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গদেশ-বিজয়ের কাহিনীকে তিনি বিশ্বাস করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-এ কমলাকান্তের মাধ্যমে বাঙ্গালীজাতিকে স্বদেশপ্রেমমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। 'আমার দুর্গোৎসব-এ বঙ্গদেশের অস্তমিত অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করে

জগদানন্দ প্রহসনের অভিনয় বড়লাটের অর্ডিন্যান্স বলে বন্ধ। বঙ্গমঞ্চের স্বাধীনতাহরণ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে ভারতসভা গঠন। (চ) ১৮৮৩, ভারতসভার ন্যাশানাল কনফারেন্স—রাজপদে বেশিসংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের দাবি। (ছ) ১৮৮৫—নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। প্রজাস্বত্ব ও স্বায়ত্তশাসন আইন পাস। (জ) ১৮৮৬—কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। হে চন্দ্রের গান রচনা,—'কি আনন্দ আজি ভারতভুবনে—ভারত-জননী জাগিল'।

১৪. হে দেশীয় মনুষ্যগণ, আপনারা ভ্রান্তিনিদ্রায় আর কত কাল যাপন করিবেন? আলস্যই কি আপনাদিগের এত প্রিয় হইয়াছে যে তাহার অনুরোধ প্রযুক্ত সৎকর্মের অনুরাগকে মানস-মন্দিরে আহ্বান করিবেন না? একবার আপনাদিগের পূর্ব অবস্থা স্মরণ করা কি উচিত হয় না? বিবেচনা করুন আমরা পূর্বে কি ছিলাম, এইক্ষণেই বা কি হইয়াছি, এই দেশ যখন স্বাধীন ছিল, অর্থাৎ আমরা স্বজাতীয় রাজার অধীনে অবস্থান করিতাম, তখন হিন্দুজাতির গৌরব জগন্ময় কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল আমারদিগের রাজাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজা ছিল এবং আমরাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যরূপে বিখ্যাত ছিলাম,..... দুঃখের কথা কি কহিব এইক্ষণে যে সকল লোক এতদ্দেশের উপর প্রভুত্ব করিয়া সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠরূপে অভিমান করিতেছেন তাঁহারা পূর্বে বস্ত্র কাহাকে বলে তাহা জ্ঞাত ছিলেন না, বারি এবং অগ্নিসহকারে মনুষ্য দ্রব্যাদি পাক করিয়া আহার করে তাহাও জানিতেন না, প্রায় সকলেই নাগা সন্ন্যাসীর ন্যায় দিগম্বর মূর্তি ধারণ করিতেন।...... (পরপৃষ্ঠায় দ্রঃ)

কালস্রোতে নিমজ্জিতা বঙ্গজননীকে উদ্ধার ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীর কাছে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। এর অনতিকাল পরে 'বন্দে মাতরম্'-এর রচনা (১৮৭৫)। আমার দুর্গোৎসব দেশাত্মবোধের স্বপ্নগান। আনন্দমঠ তার পরিপূর্ণ বাণীরূপ। বঙ্কিমযুগের অন্যান্য ঘটনাবলী ও বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় চেতনা, এ যুগের গৌণ ঔপন্যাসিকদেরও স্বাজাত্য-বোধ ও স্বাধীনতা-চেতনাকে বলিষ্ঠতা দান করেছে। মুসলমান শাসনের কোন গৌরবময় চিত্র ঔপন্যাসিকদের সামনে ছিল না। মোগল পাঠান শাসনের কোন উজ্জ্বল চিত্র সমকালে না থাকায়, বাঙ্গালী, মুসলমান-শাসনের তিক্তকর অতীত অভিজ্ঞতার কথাই মনে রেখেছিল। তাই স্বাজাত্য ও স্বাধীনতা বোধের উদ্দীপনের সহায়ক রূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ হিন্দু-মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বেষের বিষয়ই ঐতিহাসিক উপন্যাসে গ্রহণ করলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত 'শতবর্ষ'এ রাজপুত ও মহারাষ্ট্র শক্তিরই জয়গান রচনা করলেন। মোগলদের সঙ্গে রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় শক্তির বৈরিতা, হিন্দুর স্বাধীনতা রক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জনের নিষ্ঠাপূর্ণ সংগ্রামের চিত্র উদ্ঘাটিত হল তাঁর উপন্যাসে। স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতাচেতনা উদ্দীপনের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের প্রয়াস স্মরণীয়। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের প্রতাপ সিংহ (১৮৮৪) মিবারেশ্বর বাবর মহারানা প্রতাপ সিংহের চরিত্র অবলম্বনে রচিত উপন্যাস। হারাণচন্দ্র রক্ষিতের বঙ্গের শেষ বীর (১৩০৪) ও মন্ত্রের সাধন (১৩০৫) উপন্যাসদ্বয়ে প্রতাপাদিত্য ও প্রতাপ সিংহের

পদ্য। জননী ভারতভূমি আর কেন থাক
তুমি ধর্মরূপ ভূষাহীন হোয়ে।
তোমার কুমার যত সবলেই জ্ঞান
হত, মিছে কেন মর ভার বোয়ে॥

* * *

মনেতে জেনেছি সার আমাদের
ভাগ্যে আর, পোহাবে না দুঃখের যামিনী
অতএব বাক্য ধর, বৃথায় বিলম্ব কর,
হও মাগো পাতালগামিনী॥

সকলদেশীয় মনুষ্যগণ এমত প্রার্থনা করেন যে আমারদিগের দেশ সভ্য হউক, আমারদিগের বিদ্যা সকলদেশেই প্রচলিতা হউক, আমারদিগের ভাষা যাবতীয় লোকের রসনারাজ্যের অধিকারিণী হউক এবং আমরা স্বাধীন হইয়া সকলের উপর কর্তৃত্ব করি, কিন্তু এই হতভাগা দেশের মানববর্গের মধ্যে ঐ সকল বিষয়ে কোন আদপই নাই।……

মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকাহিনী ও গৌরব-গাথা রচিত হতে দেখি। চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬)-এর উপন্যাসগুলি হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের ভিত্তিতে রচিত নয়। চণ্ডীচরণ ইংরাজ-অত্যাচার ও শোষণকেই তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু রূপে গণ্য করেছেন। ইংরাজ অত্যাচার ও শোষণের জ্বালাময় চিত্র অঙ্কন করে তিনি স্বদেশবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতাচেতনাকে বলদান করেছেন। দীনেন্দ্র রায়ের হামিদা রচনার উৎস লেখকের স্বাজাত্যবোধ।

বিদ্রোহমূলক কাহিনীগুলি মূলত দুটি বিষয় অবলম্বনে রচিত। সিপাহী-বিদ্রোহ ও স্থানীয় বিদ্রোহ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত সিপাহী-বিদ্রোহ বাঙ্গালীর মনে স্বাধীনতার প্রেরণা সঞ্চার করেনি। কারণ শিক্ষা-সংস্কৃতির প্লাবনকে রুদ্ধ করে বাঙ্গালী আবার মধ্যযুগীয় মুসলমান শাসনের ক্ষেত্রে হয়ত প্রত্যাবর্তন করতে চায়নি। সমকালে রচিত সিপাহী-বিদ্রোহমূলক উপন্যাস-গুলিতে তাই বিদ্রোহের সমর্থন বিশেষ পাওয়া যায় না। একথা সত্য যে, ইংরাজ বণিকের শোষণের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের সৃষ্টি। সিপাহী-বিদ্রোহমূলক উপন্যাসগুলিতে ইংরাজশোষণের চিত্র বর্ণিত হলেও সিপাহী-বিদ্রোহ সমর্থিত হতে দেখা যায় না। নগেন্দ্র গুপ্তের অমর সিংহ (১৮৯৮) সিপাহী-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত বৃহৎ উপন্যাস। তাছাড়া গিরিশচন্দ্র ঘোষের চন্দ্রা (১৮৮৭) গোবিন্দচন্দ্র রায়ের চিত্তবিনোদিনী (১৮৭৪ দ্বি. সং. ১৮৮৪), কালীপ্রসন্ন দত্তের বিজয় (১২৯১), বরদাকান্ত সেনগুপ্তের হেমপ্রভা (১৮৯৪), প্রভৃতি গ্রন্থ সিপাহী-যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। চণ্ডীচরণ সেনের ঝান্সীর রানী (১৮৮৮, দ্বি. সং. ১৩০১) ও প্রসন্নময়ী দেবীর অশোকা (১২৯৬)-তে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শঙ্কর (১৮৮৮) সিপাহী-যুদ্ধের পটভূমিতে প্রতিশোধমূলক কাহিনী। স্বর্ণকুমারীর বিদ্রোহ (১২৯৭)-এর কাহিনী মেবাররাজ নাগাদিত্য ও ভীলদের দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত। প্রবোধচন্দ্র সরকারের শালফুল (১৮৯৭) মেদিনীপুর জেলার 'নায়েক' বিদ্রোহের কাহিনী।

স্থানীয় ইতিবৃত্তকে কেন্দ্র করে সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকরা কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন। এইসব উপন্যাসের তথ্য অনেকটা কিংবদন্তীনির্ভর। রামগতি ন্যায়রত্নের (১২৩৮—১৩০১) ইলছোবা (১২৯৫) তাঁর স্বগ্রামের

ইতিবৃত্তনির্ভর রচনা। হারাণচন্দ্র রাহার রণচণ্ডী (১৮৭৬) কাছাড়ের ইতিবৃত্তমূলক কাহিনী। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রাজবালা (১৮৭০), তাঁর স্বগ্রাম গোস্বামী দুর্গাপুরের ইতিবৃত্তমূলক কাহিনী। এইসব রচনায় ভৌগোলিক বিবরণের সঙ্গে স্থানীয় প্রবাদ ও প্রচলিত কিংবদন্তী তথ্যের কারণ হয়েছে। এইসব উপন্যাসগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল প্রেরণা, স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতাচেতনার সুর অনুপস্থিত। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের শক্তি-কানন (১৮৮৭)-কে ইতিবৃত্তমূলক কাহিনীর পর্যায়ে ফেলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি গ্রামীণ জীবনের ইতিকাহিনী।

সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ কাল্পনিক ঘটনা অবলম্বনে কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন। এই রচনাগুলি উপাখ্যান-জাতীয়। এই কাল্পনিক কাহিনীনির্ভর উপন্যাসগুলিতে অলৌকিকতা ও অবাস্তবতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন রচনা আজগুবিজাতীয়। আবার কাল্পনিক কাহিনীকেন্দ্রিক কোন কোন উপন্যাসে মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নৈরাশ্যের চিত্র উদ্ঘাটিত। রাজকৃষ্ণ রায়ের শান্তিকুটীর (১২৯৫), অনুপমা (১৮৮৫) এই শ্রেণীর। শান্তিকুটীর-এর ঘটনাকাল, যে সময়ে আর্যেরা ভারতের রাজা ছিল সেই কাল। অনুপমা উপকথাজাতীয় রচনা। রাজকৃষ্ণ রায়ের দুই শিবারী (১২৮৯) খোসগল্পবিশেষ। অবিনাশ দাসের পলাশবন (১৮৯৬) কাল্পনিক গার্হস্থ্য চিত্র। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বিষবিবাহ (১৮৮৮)-এর কাহিনী, কাল্পনিক। এইরকম রচনা শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাঞ্চনমালা (১৮৭৯)। শশিভূষণ পালের কমলমঞ্জরী (১৮৮৪) এক রাজ্যবঞ্চিত রাজার কাহিনী। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর মুরলা (১৮৮০) এক কল্পিত পরিবেশে রচিত কাল্পনিক প্রণয়কাহিনী। এইসব কাল্পনিক উপন্যাসের জগৎ ও পরিবেশ লেখকের কল্পনার রঙে রচিত। কখনও বা রাজারাজড়ার কল্পিত প্রসঙ্গ এনে এইসব উপন্যাসে ঐতিহাসিক বর্ণ দেবার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

॥ ৫ ॥

সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন ব্যঙ্গ-উপন্যাস-রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৪৭—১৯১৯), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮—১৯১১) ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর (১৮৫৪—১৯০৫) নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ইন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে ব্যঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। বয়োজ্যেষ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথ এলেন এঁদের পরে এবং ভিন্ন পথ ধরে। অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র যে যে বিষয়কে উপলক্ষ করে ব্যঙ্গ-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, ত্রৈলোক্যনাথের উপলক্ষ বিষয় ভিন্ন। প্রথম দুজন ধর্মমত ও সমাজনীতিকে গ্রহণ করলেন ব্যঙ্গের উপাদান রূপে, শেষোক্ত জন, ব্যক্তিস্বার্থ ও মানবনীতি।

ঊনিশ শতকের শুরু থেকে বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হল, তা মানুষের জীবনবোধের মূলেও তরঙ্গের সৃষ্টি করল। ইংরাজী শিক্ষার ফলস্বরূপ যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধজাত যুবমানসের আশা ও আশাভঙ্গজনিত নৈরাশ্য ও ক্ষোভ, ধর্ম সম্পর্কে বাদানুবাদ, বিদেশী শাসন-জনিত আত্মগ্লানি, ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার্থে হৃদয়হীনতা প্রভৃতি বিষয় জনচিত্তে চাপা অশান্তি ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করল। মানুষের হাসি, ক্ষোভ ও অন্তর্জ্বালার কঠিন আবরণের গভীরে ঘনীভূত হয়ে অগ্নিকণার জন্ম দিল। এই ঘনীভূত হাস্যরসকে যখন সাহিত্যিকবৃন্দ শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হলেন তখন তা নির্মল নিরঞ্জন আনন্দরূপে অভিব্যক্ত হল না। কৌতুককে আশ্রয় করে ব্যঙ্গরস নির্ভর হয়ে পড়ল এবং স্নিগ্ধ আনন্দ, উত্তেজিত আমোদে পরিণত হল। এই সূত্রে কৌতুকের মধ্যে নিষ্ঠুরতার অস্তিত্ব পাওয়া গেল।

মধ্যযুগের সাহিত্যে হাস্যরস অনেকটা স্থূল আনন্দের স্তরে ছিল। নিজে হেসে অপরকে হাসানোই ছিল শিল্পীর উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নারদ ও বড়াই-এর চিত্রে হাস্যরস পরিবেশনই ছিল কবির লক্ষ। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায় তা অনেকটা অবস্থাঘটিত। মুকুন্দরাম হাস্যরসের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করলেন। তিনি দুঃখের উপাদানে হাস্যরসের ডালি সাজালেন। মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্ত মুরারী শীলে অভিব্যক্ত হাস্যরস একান্তভাবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। সমাজ ও ধর্ম-নীতির বিরুদ্ধতার চিত্র এখানে অনুপস্থিত। ব্যক্তি ও সমাজ সমালোচনা

এবং সংস্কারেচ্ছার প্রেরণায় এই যুগে হাস্যরস সৃষ্ট হয়নি। মধ্যযুগের শেষ পর্বে ভারতচন্দ্র হাস্যরসসৃষ্টিতে পরোক্ষভাবে তির্যক সমালোচনার শর নিক্ষেপ করেছেন। কবির শ্লেষ তীক্ষ্ণতর হয়ে দেবদেবীর চরিত্রকে পর্যন্ত আঘাত করেছে। 'কবির বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা, তাঁহার নাগর সংস্কৃতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষ তীক্ষ্ণতার পোষকতা করিয়াছে। সমগ্র যুগচেতনায় একটা বাস্তববোধ ও চিন্তা-স্বাধীনতার পূর্বাভাস, ভক্তিরসের সহিত ব্যঙ্গরসের সংযোজনা পরিব্যাপ্ত হইয়া একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা দেখা দিয়াছে ও ইহা ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে'।[১৫]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনে যে আধুনিকতার প্রবর্তন ঘটল তা বাঙ্গালীর মানসিকতার রূপান্তরসাধনে তৎপর হল। সমাজ ও ধর্মনীতির নবমূল্যায়নের কালে, সামাজিক সংক্ষোভের ফলে যে অসঙ্গতির সৃষ্টি হল তা ব্যঙ্গসাহিত্য-রচনার পটভূমি রচনা করল। সমকালীন সামাজিক পরিবেশ ব্যঙ্গসাহিত্য-রচনার উপাদান যোগাল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সকলেই হাস্যরসাশ্রিত ব্যঙ্গ-সাহিত্যে কিছু অবদান রেখেছেন। হিন্দু-ব্রাহ্ম-বিরোধের সূত্রে ভবানীচরণ হিন্দুধর্মত্যাগী আচারবিরোধী ধনীসন্তানকে ব্যঙ্গের বিষয় করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের কিছু কিছু রচনায় জ্বালাময় ব্যঙ্গ অপেক্ষা রঙ্গরসেরই প্রাধান্য ঘটেছে। ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করেছেন প্রচলিত দেশাচার-বিরোধী ইংরাজ-অনুকারীদের প্রতি। লঘু কৌতুকরসই তাঁর রচনায় পরিস্ফুট। প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ, আলালের ঘরের দুলাল ও হুতোমপেঁচার নকশায় এক বিস্তৃত সামাজিক পটভূমিতে উদ্ভূত অসঙ্গতি ও জীবনাচরণের বিকৃতিকে ব্যঙ্গবাণে জর্জারিত করেছেন। নাটকের ক্ষেত্রে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন, দীনবন্ধু যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তা ব্যঙ্গরসসিক্ত। একটি সমাজসচেতন মন নিয়ে তাঁরা সামাজিক কদর্যতা, কুরুচি ও কুপ্রথার বিদ্রূপাত্মক সমালোচনার সূত্রে ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করেছেন।

বঙ্কিমপূর্ব হাস্যরসাশ্রিত ব্যঙ্গরচনার এই বিভিন্ন ধারাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রে এসে শিল্প-সংহতি লাভ করেছে। সামাজিক অসঙ্গতি, জাতির আত্মবিস্মৃতি

১৫. ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী—(প্রথম খণ্ড)-র ভূমিকা।

ও ইংরাজবিদ্বেষ, মূলত এই তিনটি ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট ব্যঙ্গরস প্রবাহিত। অব্যর্থলক্ষ ব্যঙ্গবাণ-প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র আক্রান্ত বিষয়ের মর্মভেদ করেছেন। ব্যঙ্গশিল্পী রূপে বঙ্কিমচন্দ্র ছদ্মনামের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে ব্যঙ্গবাণ-নিক্ষেপের বঙ্কিম-আবিষ্কৃত পদ্ধতি এক নবতর শিল্পকৌশল বিশেষ।

•

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন ব্যঙ্গশিল্পীদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুবর্তন করেছেন। হাস্যরসাশ্রিত ব্যঙ্গ-উপন্যাসরচনায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু শিল্পরীতির ক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথ-নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছেন। বঙ্গবাসীর লেখক পঞ্চানন্দ নামধারী ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের বিষয়-নির্বাচনে বঙ্কিমচন্দ্রকেই মূলত ভর করেছেন। তাঁর প্রথম ব্যঙ্গ-রচনা, উৎকৃষ্টকাব্যম্ (১৮৭০) ও ব্যঙ্গ-উপন্যাস কল্পতরু (১৮৭৩) রচনাকালে বঙ্কিম-প্রতিভা পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ না করলেও বঙ্কিমসৃষ্ট হাস্যরস, জীবনাচরণ এবং ঘটনাবলীর প্রতি বঙ্কিমের বক্রদৃষ্টির দিকগুলি, বঙ্কিম-সমকালীন অন্যতম ব্যঙ্গ-ঔপন্যাসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণার উৎস রূপে গৃহীত হবার মত। ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরচনার মধ্যে সমালোচনার প্রবৃত্তিই প্রধান। কৌতুকরসপ্রবণতা ইন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার সরস টিপ্পনী কৌতুকরসে স্নাত হয়ে পাঠকের মনে যে আবেদন আনে তা সাময়িকভাবে গল্পের মূল সূত্রটিকে বিচ্ছিন্ন করে গল্পকে গৌণ করে দেয়। ইন্দ্রনাথের লক্ষ্য গল্পের প্রতি যত না, তদোধিক গল্প উপলক্ষে খুঁটিনাটি ঘটনা, সমাজ ও ব্যক্তি চরিত্রের অসঙ্গতির প্রতি। ব্রাহ্মসমাজ বাংলাদেশের তৎকালীন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে দলাদলি ও অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছিল ইন্দ্রনাথ তার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন। এক্ষেত্রে যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁর সহযোগীরূপে আক্রমণের গতিবেগকে বর্ধিত করেছেন। ব্রাহ্মমতবাদের ক্ষেত্রে দলাদলি ও কলহ, ব্রাহ্মমত প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ক্ষেত্রে ভণ্ডামি, নারী-স্বাধীনতার সমর্থনজনিত সামাজিক শৈথিল্য প্রভৃতি বিষয় ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র আক্রমণের লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম ঘোষিত হয়েছে ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায়। ইন্দ্রনাথের কল্পতরু, ক্ষুদিরাম, যোগেন্দ্রচন্দ্রের মডেল ভগিনী,

কালাচাঁদ, চিনিবাস চরিতামৃত প্রভৃতি উপন্যাস তার উদাহরণ[১৬]। হিন্দুমানসের সমর্থনপুষ্ট হয়ে হিন্দুধর্মের উপযুক্ত প্রতিনিধি রূপে ইন্দ্রনাথ ও সহযোগী যোগেন্দ্রচন্দ্র হাস্য ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে হিন্দুসমাজের চাপা ও ক্ষুব্ধ প্রতিবাদকে বাঙ্‌ময় করে তুলেছেন। এইখানেই তাঁদের রচনায় যুগপ্রবণতার একটি ধারার সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে। এঁদের সৃষ্ট হাস্যরসের আবেদন ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সর্বজনের অভিমুখী হওয়ায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থানলাভ করেছে।

ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় ব্রাহ্ম-বিদ্বেষের বিষয় প্রাধান্য পায় নি। মানবনীতি তথা মানবিক চেতনার শুভকর দিকটি প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মানুষের হৃদয়হীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থই ত্রৈলোক্যনাথের আক্রমণের বিষয়। মানুষ যদি একটু সহৃদয় ও স্বার্থত্যাগী হয় তাহলে এ সংসার আরও একটু সুস্থ ও ভদ্রভাবে বাসের উপযোগী হতে পারে। সামাজিক অসঙ্গতির দিক ও মানুষের ভণ্ডামির বিষয় তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। মানুষ যে দেবতা হতে পারে না একথা তিনি জানতেন; তাই মানুষের ভণ্ডামির উপর তাঁর যত ক্রোধ। আর একটি কথা, ইতর প্রাণীর প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের সহানুভূতি ছিল অসীম। এইসব প্রাণীর প্রতি মানুষের হিংস্র আচরণ তাঁর মর্মপীড়ার অপর কারণ। মানুষ ও ইতর প্রাণী নির্বিশেষে দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি করুণা, ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গরচনার অন্যতম প্রেরণা। তাঁর হাস্যরসে উত্তাপের অভাব উদ্ভট রসের সৃষ্টি করেছে।[১৭] কঙ্কাবতীতে এই উত্তাপহীন কৌতুকরসের সাক্ষাৎ মেলে।

একথা স্বীকৃত সত্য যে, ব্যঙ্গ-সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক। উদ্দেশ্যমূলক বলেই এর প্রচারধর্মিতার কথা অনস্বীকার্য। মনুষ্যত্বের অনুকূলে ব্যঙ্গ চিরকাল প্রচার-প্রয়াসী। সময়ের আনুকূল্য ও ব্যক্তির গুণের সমন্বয়ের ফলে অন্যান্য শিল্পের মত ব্যঙ্গ-শিল্পেরও সৃষ্টি। 'সাধারণত দেখা যায়, কোন একটা মহৎ আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত যুগের অবসানকালেই ব্যঙ্গের প্রাদুর্ভাবের সময়। রেনেসাঁসের ক্ষয়িত প্রভাবের যুগে ভলটেয়ার, বৈষ্ণব

১৬. ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগীদের চরিত্রের অসঙ্গতি ও আতিশয্যের প্রথম ব্যঙ্গ-চিত্র দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২) প্রহসনে।

১৭. শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত কঙ্কাবতী, ভূমিকা ৩।০

সাহিত্যের উন্মাদনার পরে বিদ্যাসুন্দর; বিদ্যাসুন্দর রাধাকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন স্যাটায়ার মাত্র'।[১৮] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যঙ্গ-শিল্পীদের আবির্ভাবের পেছনকার কারণও যুগধর্মের তাগিদ ছাড়া আর কিছু নয়। এই তাগিদের বশবর্তী হয়েই ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাব।

সমকালীন অন্যান্য ব্যঙ্গ-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের কুমারী না বিধবা (১৮৯১) উপন্যাসে তৎকালীন সামাজিক দুর্নীতির বহুবিধ বিষয় ব্যঙ্গবাণ-বিদ্ধ হয়েছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের মডেল ভগিনীর অনুকরণে অজ্ঞাতনামা লেখকের মডেল ভ্রাতা বা আদর্শ যুবক (১৮৮৭)-এ পত্নী সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিবাহের বিড়ম্বনার কৌতুককর চিত্র পাওয়া যায়। চন্দ্রনাথ বসুর পশুপতি-সংবাদ (১২৯০) ইন্দ্রনাথ-অনুসৃত রচনা। শ্রীযুক্ত পথিকচন্দ্র কবিরত্ন (ওরফে) বিষ্ণুশর্মা জুনিয়ার বিরচিত ভজহরি 'সমাজচিত্র উপন্যাস' (১২৯৩)-এর ব্যঙ্গ-কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক।

॥ ৬ ॥

সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কয়েকজন মহিলার আত্মপ্রকাশ এইকালের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। এঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, (১৮৫৭-১৯৩২) কুসুমকুমারী দাসী (দেবী), হেমাঙ্গিনী ও মহামায়ার নাম উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারী ছাড়া অপর তিনজন লেখিকা সামাজিক উপন্যাসের রচয়িত্রী। স্বর্ণকুমারী সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয়বিধ উপন্যাস রচনা করেছেন। আলোচ্য কালের পুরুষদের রচনায় নারীর মনোভাব পরিস্ফুটনে যে একটি ব্যর্থতার দিক লক্ষ্য করা যায়, সমকালীন মহিলা ঔপন্যাসিকরা সেই ব্যর্থতার সূত্রটি কুড়িয়ে এনে, তাকে সার্থকতাদানে প্রয়াসী হয়েছেন। পুরুষদের রচনায় প্রণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের একচেটিয়া প্রাধান্য, নারীমনের আশা-আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ তরঙ্গসঙ্কুল মানসিকতাকে আদৌ প্রকাশযোগ্য করে তোলেনি। নারীর এই মানসিকতা, দাবি ও অধিকারের মর্যাদা অনেকটা রক্ষিত হয়েছে মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচনায়। মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচনায় নারীদেহের সৌন্দর্য-বর্ণনা অপেক্ষা নারীর স্বাতন্ত্র্য, অধিকার এবং

১৮. প্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক (প্রথম খণ্ড) পৃ ২৫—২৬।

আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার স্বর ধ্বনিত হতে দেখি। বিধবা-সমস্যা, কৌলীন্য-প্রথা এবং সতীত্ব-চেতনা এঁদের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে ! সমাজ ও সংসারের ক্ষেত্রে নারীর স্নেহকাতর, কর্তব্যসচেতন এবং স্বার্থত্যাগী মনটি সমকালীন মহিলা গৌণ ঔপন্যাসিকদের রচনায় অভিব্যক্ত। সমকালে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে (দীপনির্বাণ ১৮৭৬, ফুলের মালা ১৮৯৫, মিবাররাজ ১৮৮৭, বিদ্রোহ) নারীর বৈশিষ্ট্য বিশেষ ধরা পড়েনি। ঐতিহাসিক তথ্য ও কল্পনার সংমিশ্রণে রচিত এই উপন্যাসগুলিতে স্বর্ণকুমারীর মৌলিকতাও নগণ্য। প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ-এ, ঐতিহাসিকপটে প্রণয়-কাহিনীগুলিতে প্রভা, চন্দ্রপতি, কিরণ-শৈলবালা, রাজকন্যা-কল্যাণ-বিজয়, বিজয়-গোলাপ) নারীমন-বিকশনে সুযোগ থাকলেও তিনি কার্যকরী করতে পারেন নি, সম্ভবত প্রথম সৃষ্টির পশ্চাতে সংশয়জনিত মানসিক সংস্থিতির অভাবহেতু। স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসগুলিতে (ছিন্নমুকুল, ১৮৭৯, হুগলীর ইমামবাড়ী ১৮৮৮, স্নেহলতা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১২৯৯ ও কাহাকে) ধর্ম ও সমাজসংস্কারের স্রোত বহমান। হুগলীর ইমামবাড়ী ধর্মতত্ত্বালোচনায় স্ফীত ; তারই ফাঁকে ছিন্নমুকুলের মত ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্কটি একটি স্বতন্ত্র ধারায় উপস্থাপিত। উভয় উপন্যাসেই ভগ্নীর চরিত্রে স্বার্থহীন কর্তব্যসচেতন অথচ স্নেহকাতর হৃদয়টি অনাবৃত। স্নেহলতায় ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক বাগ্‌বিতণ্ডার জাল বিস্তৃত। চারু ও বিধবা স্নেহলতার পারস্পরিক প্রেমসঞ্চারের বিষয়টি মূলত প্রধান হলেও বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে যুক্তিতর্কই প্রাধান্য পেয়েছে। কাহাকে উপন্যাসে একটি শিক্ষিতা মহিলার প্রণয়জনিত ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনা বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, নারী-হৃদয়ের একটি সূক্ষ্মতন্ত্রীর স্বর সমগ্র ঘটনাবলীকে যেন আবৃত করে রেখেছে। তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে একটি নারীমনের নির্যাস উপন্যাসটিকে আনায়াস মাধুর্য দান করে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী করেছে। কুসুমকুমারী দাসীর স্নেহলতা (১২৯৬) ও প্রেমলতা (১৮৯২) এই দুই সামাজিক উপন্যাসের মূলে আছে ব্রাহ্ম-ধর্মাদর্শের প্রতি বিশ্বাস। কৌলীন্য-প্রথার যূপকাষ্ঠে একটি বালিকার জীবনবিনাশের কাহিনী প্রথমটিতে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে বিধবা-প্রণয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত। ধর্মশিক্ষামূলক এই উপন্যাসদ্বয়ে বিধবার পক্ষে একজাতীয়

আধ্যাত্মিক বিবাহ (!) সমর্থিত হয়েছে। উভয় উপন্যাসে নারী-মানসিকতার রূপ অকৃত্রিমভাবে পরিস্ফুট। হেমাঙ্গিনীর মনোরমা (১২৮১) ও প্রণয়প্রতিমা (১৮৮৪) উপন্যাসদ্বয়ে, নারীর প্রণয়িনীরূপের সার্থকতা এবং ভালবাসার আন্তরিকতার দিকটি আবেগের সঙ্গে বর্ণিত। পাতিব্রত্যের প্রতি আনুগত্যবোধই লেখিকার রচনার প্রেরণা। মহামায়া-রচিত সতীত্ব সরোজ (১২৯৩) উপন্যাসেও নারীর প্রেমাদর্শের বিষয়ই মূলত কাহিনী-গ্রন্থনের কেন্দ্রে অবস্থিত। এইসব মহিলা গৌণ ঔপন্যাসিকরা সকলেই অল্পবিস্তর বঙ্কিম-প্রভাবপুষ্ট।

॥ ৭ ॥

বঙ্কিমসমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের মধ্য কয়েকজন বঙ্কিমচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রীর কয়েকটি উপন্যাসের পরিশিষ্ট রচনা করে, উপন্যাসের অনুবৃত্তি ঘটিয়েছেন। এঁরা হলেন দামোদর মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ বিশ্বাস এবং দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রথম তিনজন বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্যাসের এবং শেষোক্ত জন শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি উপন্যাসের অনুবর্তন করেছেন। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মৃন্ময়ী (১৮৭৪) কপালকুণ্ডলার, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শান্তিমঠ (১৮৮৭), শিবনাথ শাস্ত্রীর মেজবউ-এর অনুবৃত্তি। বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়েষা (১৮৯৭) দুর্গেশনন্দিনীর, কেদারনাথ বিশ্বাসের ভবানী পাঠক (১৮০০। দেবী চৌধুরাণীর, শ্রী বা বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের পূর্ণচন্দ্র (১৮০২) বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের উপসংহার। এইসব লেখকেরা মূলত উল্লিখিত কয়েকটি জনপ্রিয় উপন্যাসের পরবর্তী আখ্যানভাগ রচনা করে পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। এই সমস্ত ঔপন্যাসিকের রচনায় আকরগ্রন্থগুলির কাহিনীর পল্লবিত রূপ সমকালীন পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করলেও উন্নততর শিল্পী-নৈপুণ্যের পরিচয় দান করে না। এগুলির মধ্যে কাহিনীভাগে, অক্ষম অনুস্মৃতি ছাড়া কিছু পাওয়া না। তবে, এগুলির আখ্যানভাগে নতুন চরিত্র ও ঘটনার সংযোজন ঘটিয়ে লেখকেরা রচনায় অভিনবত্ব আনতে চেয়েছেন। দামোদরের মৃন্ময়ীতে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার পুনর্মিলন, মতিবিবির সতীধর্মের প্রতি আনুগত্য,

তার মৃত্যুকালে দিল্লীশ্বর কর্তৃক নবকুমারকে জায়গিরদান প্রভৃতি ঘটনা ছাড়াও নবকুমারের বন্ধু উমাপতির উপাখ্যান এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির অন্যতম প্রয়াস। বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়েষা, দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা কাহিনীর ছিন্নসূত্র অবলম্বনে রচিত। কেদারনাথ বিশ্বাসের ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠকের পরবর্তী জীবনের কাহিনী। অনশনের মধ্য দিয়ে তার প্রাণত্যাগের ঘটনা কাহিনীর পরিণতিতে আকস্মিকতা এনেছে। শ্রী উপন্যাসে 'মহম্মদপুর শত্রুর করতলগত হইলে অদ্বিতীয় প্রতাপশালী মহারাজ সীতারাম যেরূপ ভাবে, যেরূপ অবস্থায় জীবনযাপন করিয়াছিলেন, যে প্রকার কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে' (ভূমিকা)। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শান্তিমঠ-এ শিবনাথ শাস্ত্রীর মেজবউ-এর নায়িকা প্রমদার জীবনের উত্তর-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কাশীতে শান্তিমঠ স্থাপন করে গৈরিক বস্ত্রপরিহিতা প্রমদার ঈশ্বর-চিন্তায় মৃত্যুবরণ-কাল পর্যন্ত, কাহিনী বিস্তৃত। প্রমদার মাহাত্ম্যকীর্তনই এই গ্রন্থরচনার কারণ। এইসব অনুসরণকারী গৌণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একমাত্র দামোদর ছাড়া, আর কেউ কাহিনীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। এঁদের সকলের উপরে বঙ্কিম-প্রভাবও স্পষ্ট।

॥ ৮ ॥

সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কয়েকজন উপন্যাসের গঠন-বৈচিত্র্য-সম্পাদনে সচেষ্ট ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও উপন্যাসের গঠনরীতির ক্ষেত্রে অভিনবত্ব এনেছেন। ইন্দিরা (১৮৭৩) ও রজনী (১৮৭৭) তার উদাহরণ। সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের এই জাতীয় প্রচেষ্টার প্রেরণাস্থল যে বঙ্কিমচন্দ্র, একথা বলা বাহুল্য। শিল্পরীতির ক্ষেত্রে আঙ্গিকের নব অনুশীলনে যাঁরা হস্তক্ষেপ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, সতীশচন্দ্র বসু, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধারমণ মাহাত, দীনেন্দ্রকুমার রায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রভৃতির নাম করা যায়। এঁদের রচিত উপন্যাসগুলির আঙ্গিক-বৈচিত্র্যকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। (১) উত্তম পুরুষে লেখা আত্মকাহিনী-মূলক উপন্যাস (২) পত্রোপন্যাস (৩) কথোপকথনের সূত্রে বিবৃত উপন্যাস

(৪) পত্র ও নথি প্রভৃতির সাহায্যে রচিত উপন্যাস। (৫) কাহিনী ও সমালোচনার সমবায়ে রচিত উপন্যাস। প্রথম শ্রেণীতে আছেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (অদৃষ্ট), স্বর্ণকুমারী দেবী (কাহাকে)-ও সতীশচন্দ্র বসু (পল্লীগ্রাম)। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন, নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বসন্তকুমারের পত্র) ও রাধারমণ মাহাত (শরতের চিঠি)। তৃতীয় শ্রেণীতে আছেন দীনেন্দ্রকুমার রায় (হামিদা)। চতুর্থ শ্রেণীতে আছেন অম্বিকাচরণ গুপ্ত (পুরাণ কাগজ বা নথির নকল)। পঞ্চম শ্রেণীতে আছেন জনৈক নামহীন লেখক নবদুর্গা বাঁশরী প্রভৃতি পুস্তকের গ্রন্থকার (গোস্বামীর সাগরযাত্রা)। আত্মকাহিনীমূলক উপন্যাসরচনার পথপ্রদর্শক বঙ্কিমচন্দ্র। ইন্দিরায় ইন্দিরাই একমাত্র বক্তা। ইন্দিরা উপন্যাসটি ক্ষুদ্রায়তন হলেও (পঞ্চম সংস্করণ বৃহদায়তন ১৮৯৩, পৃ. ১৭৭) তার রচনারীতিতে প্রবর্তিত নতুন প্রণালীর ধারাটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে কয়েকজন ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অদৃষ্ট-এ, যদুর আত্মকাহিনী বিবৃত হয়েছে। যদু তার জীবনের অদৃষ্টনির্ভর উত্থানপতনের কাহিনী নিজেই ব্যক্ত করেছে। উত্তম পুরুষে লিখিত হলেও কাহিনীগ্রন্থনে লেখক সচেতন মনের পরিচয় দিয়েছেন। স্বর্ণকুমারীর কাহাকে (১৮৯১) উপন্যাসে মণিনাম্নী একটি শিক্ষিতা নারী তার প্রণয়-বিড়ম্বিত আত্মকাহিনী বিবৃত করেছে। এই উপন্যাসটিও রচনাবৈশিষ্ট্যে সার্থক। তারকনাথ ও স্বর্ণকুমারী, ইন্দিরার গঠনবৈশিষ্ট্য যে যথাযথ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তার নিদর্শন ইন্দিরার ঢংএ রচিত তাঁদের দুটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। উত্তম পুরুষে লেখা যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আমাদের ঝি (১৩০২, দ্বি. সং. ১৩০৭) উপন্যাসটি আত্ম-অভিজ্ঞতার কাহিনী। বৈচিত্র্যহীন কাহিনীটি সরলরেখায় সমাপ্ত। সতীশচন্দ্র বসুর পল্লীগ্রাম (১৮৯২) একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বসন্ত-কুমারের পত্র (১৮৮২), মোট উনিশটি পত্রের সাহায্যে লিখিত একটি উপন্যাস। নতুন আঙ্গিকে লেখা এই উপন্যাসটির প্রেরণা হয়ত বা বঙ্কিমের রজনী। রজনীতে যেমন বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর বক্তব্যের সমবায়ে কাহিনী গ্রথিত হয়েছে, এ ক্ষেত্রেও তেমনি বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর লিখিত পত্রের সমবায়ে কাহিনী গ্রথিত। তৎসত্ত্বেও নটেন্দ্রনাথ যে তাঁর উপন্যাসে শিল্পরীতির ক্ষেত্রে

নবতর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, একথা বলতে বাধা নেই। নটেন্দ্রনাথের বসন্তকুমারের পত্র বাংলার প্রথম পত্রোপন্যাস। তবে, এই প্রণালীর ত্রুটি কাহিনীর গতিমন্থরতা, এই উপন্যাসেও বর্তমান। রাধারমণের শরতের চিঠি, (১৮৮৭) বৈচিত্র্যহীন রচনা। শরতের অভিজ্ঞতার কাহিনী উপন্যাসটিতে বিবৃত হয়েছে। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের হামিদায় কথোপকথনের সূত্রে কাহিনী বিবৃত হয়েছে। লেখক ও গল্পের নায়ক নেহালসিংহের কথোপকথনের ভিত্তিতে বিষয়বস্তু পরিবেশিত। গল্পটির অগ্রগমনে এই রীতি কোন বাধাসৃষ্টি করেনি। এইজাতীয় রচনা, বৈশিষ্ট্যের ক্ষীণ দাবি রাখে। অম্বিকাচরণ গুপ্তের পুরাণ কাগজ (১৮৯৯) অনেকটা পত্রোপন্যাস জাতীয়। তবে উভয় শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য এই যে, একটি পত্রাবলীর সাহায্যে রচিত, অপরটি পত্রাবলী ছাড়াও অন্য জাতীয় তথ্যের সাহায্যে রচিত। পত্র, অর্পণনামা, চিরকুট, বন্দোবস্তনামা, হুকুমনামা, একরারনামা, ইয়াদদস্তের নকল, মোকর্দমা নং, পলিটিকাল এজেন্টের রিপোর্ট প্রভৃতির সাহায্যে রচিত উপন্যাসটি আদৌ গঠনসংহতি লাভ করেনি। তবে এই জাতীয় প্রচেষ্টা যে অভিনব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নবদুর্গা বাঁশরী প্রভৃতি পুস্তকের গ্রন্থকার দ্বারা বিরচিত গোস্বামীর সাগরযাত্রা বা বাঙ্গালা বই (১২৯১) গ্রন্থটিতে কাহিনীসূত্রে সমালোচনাকেও বিষয়ীভূত করা হয়েছে। রচনারীতির ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা অভিনব হলেও সার্থকতামণ্ডিত নয়। প্রথম দুটি শ্রেণী ছাড়া, অপর শ্রেণীগুলির গঠনরীতি যুগবৃত্তেই আবদ্ধ হয়ে আছে।

॥ ৯ ॥

সমকালীন ঔপন্যাসিকদের রচনায় গঠনরীতি ও কাহিনীর ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অল্পপরিসর প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছেন। এইসব ভিন্নপন্থী সাধকেরা তাঁদের রচনায় বিষয়নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্য এনে বঙ্কিমসমকালে স্বতন্ত্র পথের সন্ধানপর হয়েছেন। এঁদের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তারকনাথ প্রদর্শিত পথ বঙ্কিম-চন্দ্রের সমকালে অন্যান্য ঔপন্যাসিকেরা যে অনুবর্তন করেন নি, তার প্রধান কারণ মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বব্যাপী প্রভাব ও জনপ্রিয়তা। তারকনাথের

স্বর্ণলতা (১৮৭৪)-য় বাঙ্গালী প্রথম খুঁজে পেল তার ঘরের ছবি। সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা সংসারবৃত্তের মধ্যে বাঙ্গালী আত্মহৃদয়ের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হতে দেখল। স্বর্ণলতার জনপ্রিয়তা কিছুসংখ্যক বঙ্কিম-অনুরাগীকে অসহিষ্ণু করে দিল। সাধারণী পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সমালোচনা তার উদাহরণ[১৯]। যৌথ পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে তারকনাথ যে উপন্যাস রচনা করলেন, কাহিনীনির্বাচনের অভিনবত্বে তা অনায়াসেই স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। স্বর্ণলতার শশিভূষণ, বিধুভূষণ, প্রমদা, সরলা, গদাধর, নীলকমল প্রভৃতি চরিত্র বাঙালীর ঘরের চরিত্র। শশিভূষণ ও বিধুভূষণের পারিবারিক কাহিনী বাঙ্গালীর ঘরের কাহিনী। প্রচলিত উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে স্বর্ণলতার অভিনবত্ব সহজেই বাঙ্গালীর চিত্তজয়ে সক্ষম হল। স্বর্ণলতার আবির্ভাবের পূর্বকাল পর্যন্ত বঙ্কিমের উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে বাস্তবতা অনুসৃত হয়েছে তা নির্ভেজাল নয়; বরং কল্পনার বর্ণবিস্তারে ও আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তা রচিত। স্বর্ণলতায় আহৃত বাস্তবতার ভিত্তিভূমি আমাদের বেষ্টিত অতিপরিচিত সুখদুঃখপূর্ণ সংসার। এইখানেই তারকনাথের স্বাতন্ত্র্য। তাঁর হরিষে বিষাদ অথবা নায়কনায়িকাশূন্য উপন্যাস (১৮৮৭) এবং অদৃষ্ট উপন্যাসদ্বয়ও বাস্তবনির্ভর রচনা। হরিষে বিষাদ এ 'দুই-চারিটি ঘটনা ভিন্ন সমস্তই সত্য'। এই উপন্যাসটির পটভূমি অবশ্য একটু স্বতন্ত্র এবং প্রধান চরিত্র লালবিহারীর কর্মধারা ও চারণক্ষেত্র সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে কিছুটা অপরিচিত। অদৃষ্ট উপন্যাসে তারকনাথ যেন আবার স্বর্ণলতার ভিত্তিভূমিতে নেমে এসেছেন এবং পারিবারিক জীবনের বহু বিচিত্র ধারায় গ্রন্থের বিষয় ও চরিত্রকে অবগাহন করিয়েছেন। কম্পাউণ্ডার যদুকে কেন্দ্র করে যে কাহিনীর বিস্তার, সেই কাহিনীর আধারে ধৃত বিভিন্ন পরিবার ও চরিত্রের কার্যকলাপের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বিদ্যমান। অদৃষ্ট বাস্তবরসসিক্ত পরিচিত জীবনের কাহিনী। এই উপন্যাসেও তারকনাথের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। এই ধারার সঙ্গে যুক্ত অপর ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। যোগেন্দ্রনাথের উপন্যাসে তারকনাথের প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁর রচিত কয়েকটি উপন্যাস

১৯. সাধারণী, ৩০শে কার্তিক, ১২৮১।

পারিবারিক জীবনের কাহিনীভিত্তিক বাস্তব রসাশ্রিত। তারকনাথ-সৃষ্ট পারিবারিক উপন্যাসের এই বিশেষ ধারাটি বঙ্কিম-সমকালে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনায়াসেই স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হতে পেরেছে। যোগেন্দ্রনাথের অনেকগুলি সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে কনেবউ (১২৯৭), বড়ভাই, (১৩০১), বিমাতা (১৩০০), ঠাকুরঝি প্রভৃতি উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের যে চিত্র পাই, তা অনেকাংশে বাস্তবনিষ্ঠ। যোগেন্দ্রনাথ অবশ্য শিল্পরীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিম-প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর রচিত পারিবারিক কাহিনী ও চরিত্র অনেকটা তারকনাথের গোত্রীয়। তারকনাথের রচনাদর্শের সঙ্গে পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের সাদৃশ্য অস্বীকার করার নয়। এমনকি যোগেন্দ্রনাথের উপন্যাসেরও দু একটি চরিত্র নিশ্চিতভাবে শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্রের সাদৃশ্যবাহী। অথচ, শরৎচন্দ্র যে তারকনাথ-যোগেন্দ্রনাথ প্রভাবিত ছিলেন না এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আলোচ্য কালের তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সঙ্গে পরবর্তী কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের কিছুসংখ্যক গার্হস্থ্য উপন্যাসের সাদৃশ্য থাকার কারণ, সম্ভবতঃ উভয় শিল্পীর জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে কোনি একটি দৃষ্টি-কোণের অভিন্নতা। বঙ্কিমসমকালে উপন্যাসেব বিষয়নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারকনাথের স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ ১১ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের আলোচনাকালে আমরা তাঁদের স্বকীয়তা ও প্রভাবানুবর্তিতার দিকে লক্ষ্য রেখেছি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে তাঁদের যেসব রচনা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, বা পরবর্তীকালে যেসব সাময়িক পত্রে সমালোচিত হয়েছিল, আলোচনাকালে তার প্রাসঙ্গিক উল্লেখও করেছি। আলোচ্য কালে প্রায় আড়াই শতাধিক গৌণ ঔপন্যাসিকদের সন্ধান পাই। তাঁদের সকলকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। সকলের রচনা বিস্তৃত আলোচনার উপযুক্তও নয়। সেজন্য তাঁদের মধ্য থেকে মোট আটত্রিশ জন ঔপন্যাসিককে বেছে নিয়ে, যথাসম্ভব কালানুক্রমিক আলোচনা করেছি। এইসব ঔপন্যাসিকদের রচনামূল্যও এক স্তরের নয়। তৎসত্ত্বেও এঁদের রচনাবলীর

আলোচনা বঙ্কিমসমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের সৃষ্টিধারার পতন-অভ্যুদয়ের বিচিত্র রূপটি পরিস্ফুট করার পক্ষে যথেষ্ট। স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা থেকে বাদ পড়েছেন যাঁরা, তাঁদের সংখ্যাই বেশি। যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। অন্যান্যদের আলোচনাকালে প্রসঙ্গত প্রয়োজনবোধে, এঁদের উপন্যাসের আলোচনাও উল্লেখ করেছি। তাছাড়া স্বতন্ত্রভাবে অনালোচিত এইসব ঔপন্যাসিকবৃন্দের নাম ও রচনাবলীর যথাসম্ভব বর্ণনামূলক তালিকা পরিশিষ্টে সন্নিবেশ করেছি।

বঙ্কিম-সমকালে যেসব গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ শিল্পের ধারাটিকে অজস্রতায় ভরে তুলেছিলেন, সেইসব বিস্মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় লেখকদের রচনা-ধারার বিস্তৃত পরিচয় লোকচক্ষুর গোচর করাই বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য। এঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই অদ্যাবধি অনালোচিত। সাহিত্যের ইতিহাসে ও সমালোচনা-গ্রন্থে[২০] এঁদের কিছু-সংখ্যকের নাম, রচনাবলীর পরিচয় বা আলোচনা পাওয়া গেলেও বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের রচনাবলীর সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস এই প্রথম।

বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত রচনাবলী এই গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। এঁদের কারও কারও উপন্যাস ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত হলেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ আমাদের আলোচনা কালের সর্বশেষ সীমা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অবশ্য এইসব লেখকদের ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত রচনাবলীর যথাসম্ভব তালিকা পাদটীকায় সন্নিবেশ করেছি।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (প. সং.) ১৩৭২

ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, (তৃ. সং.). ১৯৪৯।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বি খ. (তৃ সং.) ১৩৬২।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী : বাংলার লেখক (প্র. খ.) ১৯৫০।

শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত : বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৯৬০।

ডঃ বিজিত দত্ত : বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৯৬২।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রামগতি ন্যায়রত্ন (১২৩৮-১৩০১)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় রামগতি ন্যায়রত্ন আজ বিস্মৃতপ্রায় লেখক। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মূলত শিক্ষাবিদ হলেও ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও প্রবণতা তাঁর রচনাধারায় বর্তমান। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন রিচার্ডসন প্রণীত 'হিস্টরী অব্ দি ব্লাক হোল' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ—'অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস' রচয়িতা তিনি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে 'বস্তুবিচার', ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের অনুরোধে 'বাঙ্গালা ইতিহাস'-এর প্রথম ভাগ, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ঋজু ব্যাখ্যা', ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', তিনি রচনা করেন। কিন্তু যে গ্রন্থটির জন্য মূলত তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্যাপি স্মরণীয় সেটি হল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'। তাঁর রচনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ইতিহাস ও সাহিত্যই ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। শেষোক্ত গ্রন্থটি রচনার প্রেরণার মূলে ছিল ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ। রামগতি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক।

রামগতির দুটি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম গ্রন্থ 'রোমাবতী'[১]র প্রকাশকাল 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের তিনবছর পূর্বে। রোমাবতী আমাদের আলোচ্য-কালের গণ্ডিতে পড়ে না। গ্রন্থটিকে উপন্যাসের মর্যাদাও দেওয়া যায় না। সংস্কৃত চম্পূকাব্যের মত অধ্যায়গুলির নাম 'উচ্ছ্বাস'। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বনে' লিখিত গ্রন্থটি একটি নীতিমূলক কাল্পনিক আখ্যায়িকা। রাজকন্যা রোমাবতীর সঙ্গে রঞ্জনের প্রণয় ও বিবাহ। রঞ্জনের প্রতি রাজমহিষীর অবৈধ [illegible]াকাঙ্ক্ষা ও প্রণয় স্থাপনে ব্যর্থতা প্রদর্শিত হয়েছে এই গ্রন্থে। পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় ঘোষণাই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য।

১. রোমাবতী (আখ্যায়িকা), ১৮৬২ পৃঃ ১৬৯।

রামগতি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ভূদেবের অনুবর্তন করলেও তাঁর ভাষা বিদ্যাসাগরীয়। রামগতির অপর উপন্যাস 'ইলছোবা'[২] রচনার মূলে আছে তাঁর ইতিহাসের প্রতি অনুরক্তি। ইলছোবা স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস। স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যানটির উৎস প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, 'ইলছোবা নিবাসী যে ব্রাহ্মণ বটবৃক্ষমূলে বসিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই মুখে যেরূপ যেরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পণ্ডিতেরা কহেন 'স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র' (বিজ্ঞাপন)। লেখক 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমির ইতিকাহিনীমূলক উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রচলিত স্থানীয় ইতিহাস ও জনশ্রুতি অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত। ইলছোবা, আটটি 'উচ্ছ্বাস'-এ বিভক্ত। কাহিনী পরিকল্পনায় সংস্কৃত আখ্যায়িকার অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। শকুন্তলা থেকে লেখক শ্লোক উদ্ধার করে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের প্রমাণ রেখেছেন। উপন্যাসটির প্রথমে 'ভূসংস্থান' শিরোনামায় ইলছোবার ভৌগোলিক বর্ণনা আছে। তারপর 'উপক্রমণিকা'য় কাহিনীর শুরু। ইলছোবাবাসী কোন ব্রাহ্মণ গ্রামান্তর থেকে নিজ গ্রামাভিমুখে যাবার কালে, ভগবতীতলার প্রান্তরে বটবৃক্ষের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়েন এবং প্রগাঢ় নিদ্রায় একেবারে অভিভূত হয়ে স্বপ্ন দেখেন, বটগাছের শাখায় রমণীমূর্তি। তিনি স্বয়ং ভগবতী। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এবং 'তিনি অদূরবর্তিনী আর একটি বট-শিখার উপর উপবেশন' করে কাহিনী শুরু করেন। 'কথারম্ভ' শিরোনামায় গ্রন্থের প্রথম উচ্ছ্বাস শুরু। প্রতিটি উচ্ছ্বাসের শুরুতে 'দেবী কহিলেন', বলে ঘটনার পুনরুত্থাপন ও বর্ণনা। উপসংহার অংশও এই রীতি থেকে বাদ পড়ে না। কাহিনীর ঘটনাকাল রাজা গণেশের আমল। গণেশের পুত্র চেৎমল ওরফে যদু উপন্যাসটির নায়ক। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র লক্ষ্মীকান্ত যখন যশোরবাসী, তখন সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ গৌড়ের সুলতান। রাজ্যে অত্যাচার শুরু হলে লক্ষ্মীকান্ত এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সোনা তৈরী করার উপায় জেনে নিয়ে পত্নী গোবিন্দমণি ও কন্যা ইলবিলাসহ যশোর ত্যাগ করে ঝিঁটকীপোতায় উঠে এল। লক্ষ্মীকান্তের প্রতিবেশী রামধনের বিধবা কন্যা

২. ইলছোবা অথবা স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান, ১২৯৫, পৃঃ ১৪৪।

দামিনীকে করীম অপহরণ করলে, দামিনী করীমকে হত্যা করল এবং পরে আত্মহত্যা করে কলঙ্কমুক্ত হল। যশোর ত্যাগ করার কালে রামধন লক্ষ্মীকান্তের সঙ্গ নিল।

লক্ষ্মীকান্ত সোনার বড বাজার পেল। একদিন সন্ন্যাসীর কথামত সে গৌড়রাজ গণেশের কাছে গেলে, গণেশের কাছ থেকে সে 'প্রাড়্‌বাকে'র পদ পেল। লক্ষ্মীকান্তের নামানুসারে লক্ষ্মীকান্তপুর এবং পুত্র হরিদাসের নামানুসারে দাসপুর গ্রামের সৃষ্টি হল। এদিকে রাজপুত্র 'চিত্রমল্ল' বা চেৎমলের সঙ্গে ইলবিলার প্রণয় হলে উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার সংকল্প গ্রহণ করল। উজিরকন্যা সোনাবিবির সঙ্গে হরিদাসের প্রণয় সম্পর্ক স্থাপিত হল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ দেশাচারবিরুদ্ধ বলে অন্য পাত্রের সঙ্গে ইলবিলার বিবাহ স্থির হল। বিবাহের দিন বিবাহসভায় হঠাৎ গোলমাল দেখা দিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণে যে পাগল ইলবিলার বরমালা প্রার্থনা করত, সে অজস্র সশস্ত্র লোক নিয়ে এসে বিবাহসভা থেকে ইলবিলাকে হরণ করে নিয়ে গেল। অপহরণকারী রাজপুত্র চেৎমল। প্রদ্যুম্ন নগরে সে ইলবিলাকে বিবাহ করে পাণ্ডুয়া যাত্রা করল। ইলবিলার বিবাহ-সভা যেখানে হয়েছিল সেই স্থানের নাম হয় ইলাসভা বা ইলছোবা।

পাণ্ডুয়ার হরিদাস মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে সোনাবিবিকে বিয়ে করে। রাজা গণেশের মৃত্যু হলে, চেৎমল অধিপতি হয়ে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে, 'জেলালউদ্দীন নামে খ্যাত হইয়া অতি সুন্দররূপে রাজপালন করিতে লাগিলেন।'

পাণ্ডুয়ার অনতিদূরেই ইলছোবা-গুলাই গ্রাম। তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম দাসপুর। লক্ষ্মীকান্তের গৃহদেবীর নামানুসারে ভগবতীতলার নামকরণ। লক্ষ্মীকান্তের প্রতিবেশী নীলমণি পালের কন্যাদ্বয় মালতী ও মাধবীকে বিয়ে করেন দেবপাল। তাদের শ্বশুরগৃহ যে স্থানে, তার নাম হল দোসতীনা; ইলছোবার কিয়দংশের নাম 'হঠনগর'। কারণ ইলাসভার জাঁকজমক মানুষের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে মনে হয়েছিল ইলছোবা বুঝিবা নগর!

রামগতির উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিক তথ্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। ইলছোবার পুরাকীর্তি এই উপন্যাস রচনার প্রেরণা। কাহিনীর গঠন পরিকল্পনায় ঐক্য রক্ষিত হয়েছে। বহু ঘটনাকে একসূত্রে গ্রথিত করে, মূল

কাহিনীটিকে লেখক পরিণামমুখী করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। রামগতির এই-খানেই কৃতিত্ব। গণেশের রাজা হওয়ার পশ্চাতে এক সন্ন্যাসীর ভূমিকা লেখকের কল্পনাজাত। চরিত্রচিত্রণে লেখক বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি। উপন্যাসটিতে ঘটনা-প্রাধান্য পাওয়ায় চরিত্রগুলি ঘটনার প্রয়োজন সিদ্ধিকল্পে স্ব স্ব ভূমিকা গ্রহণ করেছে মাত্র। ইলবিলার আচার আচরণ রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। রোমাবতীর ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা। কিন্তু 'ইলছোবা'র ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। রচনাদর্শে ভূদেবের প্রভাব লক্ষণীয়। রচনার নমুনা :-

"একদা বৈশাখ মাসের অপরাহ্ন সময়ে কয়েকজন পথিক নীলমণি পালের বাটীর দরজায় পিঁড়ায় আসিয়া বসিল, তাহাদের সঙ্গে সামান্য গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি সমেত কয়েকটি পুটুটলিকা। পথিকদিগের মধ্যে প্রৌঢ় বয়স্ক দুইটি পুরুষ, দুইটি স্ত্রী, দুইটি বালিকা ও একটি কিশোর" (পৃঃ ৪৩-৪৪)। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে, স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাসরচনায় একাধিক লেখকের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[৩]

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪–১৮৮৯)

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র আজ বিস্মৃতপ্রায় ঔপন্যাসিক। পেশায় তিনি ছিলেন সরকারী কর্মচারী, কিন্তু নেশায় রসজ্ঞ সাহিত্যিক। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা প্রশংসিতও হইয়াছিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন, আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না।—১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর, তিনি আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন'।[৪]

৩. (ক) হারাণচন্দ্র রাহা, রণচণ্ডী, (১৮৭৬) কাছাড়ের ইতিবৃত্তমূলক কাহিনী।
   (খ) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজবালা, (১৮৭০) লেখকের স্বগ্রাম গোস্বামী দুর্গাপুরের ইতিমূলক কাহিনী।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র : সঞ্জীবনী সুধা।

'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণের পূর্বেই সঞ্জীবচন্দ্র 'ভ্রমর' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন (বৈশাখ ১২৮১)।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'কণ্ঠমালা'[৫] তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'মাধবীলতার'[৬] পরিশিষ্ট : মাধবীলতার পর কণ্ঠমালা আলোচনাই শ্রেয়। কারণ মাধবীলতার ঘটনার পরিশিষ্ট, কণ্ঠমালা। সঞ্জীবচন্দ্রের এই উপন্যাস দুটি ঐতিহাসিক না হলেও অতীতাশ্রয়ী। অনুমান, আঠারশ শতকের শেষার্ধের বাংলা দেশই এই উপন্যাসের ঘটনাকাল। দুই জমিদারবাড়ির চক্রান্ত নিয়ে অনেকটা উপকথা-জাতীয় রচনা।

সিংহশত গ্রামে রাজা ইন্দ্রভূপের বাস। চতুর চূড়াধন ইন্দ্রভূপের পাশা খেলার সাথী। পিতম পাগলা রাজানুগৃহীত। পিতম বলে, রাজা তার প্রহ্লাদ আর চূড়াধন হিরণ্যকশিপু। রাজা এক বছরের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী মেয়েকে পালিতা কন্যারূপে গ্রহণ করলেন। নাম মাধবীলতা। ডাকনাম পুঁটু। চিকের আড়াল থেকে পিতমকে দেখে রাজভগিনী জ্যোৎস্নাবতী পরিচারিকা মাতঙ্গিনীর কাছ থেকে জানলেন পিতমের পরিচয়।

রাজা পুত্রক্রোড়ে সভায় এলে অধ্যাপক দশরথ শর্মা ছেলেটি তাঁর বলে দাবি করলেন। বললেন, সূতিকাঘর থেকে তাঁর সন্তান চুরি গিয়েছে। জ্যোৎস্নাবতীর কাছ থেকে মাতঙ্গিনী জানল যে, ডাকাত মারার পর একদিন রাত্রে তাঁর স্বামী গৃহত্যাগী হন। জ্যোৎস্নাবতী শুনেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর নদীতীরে তাঁর সংকার হয়েছে। মাতঙ্গিনী কাজে ইস্তফা দিয়ে ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে জানল, রাজ-জামাতার নাম বিজয় রাজ। সে ব্রহ্মচারীসহ তক্ষপুর যাত্রা করল।

পুঁটুর মায়ের সঙ্গে রাজার অবৈধ সম্পর্ক আছে এরকম কলঙ্ক রটলে পুঁটুর মা পুঁটুকে নিয়ে গৃহত্যাগ করল। পিতমের কথায় প্রতিবেশীদের ধারণা হল ছেলেটি দশরথের নয়। জ্যোৎস্নাবতী রানীর গঞ্জনায় গৃহত্যাগ করলেন।

৫. কণ্ঠমালা, ১৮৭৭, পৃঃ ১৮৪। 'ভ্রমর' নামক মাসিক পত্রিকায় সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল'---প্রথমবারের বিজ্ঞাপন। ভ্রমর-এ সর্বশেষ প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১২৮২। দ্বি সং ১৮৮৬, এই সংস্করণের 'অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও পরিবর্তিত হয়।'

৬. মাধবীলতা, ১২৯১ সাল (২০ এপ্রিল ১৮৮৫) পৃঃ ১৮৭। 'বঙ্গদর্শন'-এ (১২৮৫-৮৭) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

রাজা মহেশচন্দ্রের সঙ্গে ব্রহ্মচারীবেশী মাতঙ্গিনী দেখা করে সব কথা বলল। এদিকে রানী মাধবীলতাকে রাজবাড়ীতে স্থান দেবেন না স্থির করলেন। পুঁটুর মা আগুনে পুড়ে মরে গেল। পিতম যে বিজয়রাজ ঘটনাচক্রে তা জানা গেল। জ্যোৎস্নাবতীর সঙ্গে পিতমের মিলন হল। রাঘব শর্মার খবরমত মহেশচন্দ্র পিতমের সঙ্গে সাক্ষাৎ-মানসে যাট পৈঠায় গিয়ে জানলেন, মন্দিরের মুমূর্ষু বৃদ্ধই মহেশচন্দ্রের পিতা। বৃদ্ধকে অন্তর্জলি করা হল। মাধবী মাতঙ্গিনীর কাছে মানুষ হতে থাকল। দাদাকে মহেশচন্দ্র রাজ্য ফিরিয়ে দিতে গেলে পিতম ভাইকে সব দান করল। পরদিন পিতম ও জ্যোৎস্নাবতী কারও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। মহেশচন্দ্র খবর পেলেন রাজা ইন্দ্রভূপ আশ্রম ত্যাগ করেছেন, দেওয়ান কর্মচ্যুত হয়েছেন, চূড়াধন রানীর বিশ্বস্ত পাত্র হয়ে রাজকার্য চালাচ্ছেন।

অজস্র ঘটনা ও চরিত্রের ভিড়ে মূল কাহিনীর গতি পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। অসংখ্য শাখাকাহিনীর জালে মূল গল্প তাই আচ্ছন্ন। রচনারীতি বঙ্কিম অনুসারী। কাহিনীর মধ্যে স্থানে স্থানে উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল সৃষ্টি করা হয়েছে। কাহিনীর বিচিত্র ধারায় ঘটনা সংঘটন মাঝে মাঝে নাট্যিক হয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্নাবতীর সঙ্গে পিতমের মিলন, পিতম ও মহেশের সঙ্গে ভগ্নমন্দিরে মুমূর্ষু পিতার সাক্ষাৎলাভ ইত্যাদি উদাহরণ। প্লটের পরিকল্পনার ও রূপায়ণের শৈথিল্য অন্যতম ত্রুটি। কয়েকটি আদর্শ চরিত্রের পাশে খল চরিত্র, সাধুতা ও সততার পাশে দুর্নীতি ও হিংসার চিত্র এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। ঘটনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে অনুমিত হয় যে কাহিনীর ঘটনাকাল আঠারশ শতকের শেষ ভাগ, নবাবী রাজত্বের অন্তে ইংরাজ রাজত্বের কাল। ইন্দ্রভূপের আচার-আচরণ ক্রিয়াকলাপ ও শাসন-পদ্ধতি অনেকটা স্বাধীন হিন্দু রাজার মত। লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বিশ্লেষণধর্মিতার পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও চিন্তাশীলতার ছাপ প্রকট। লেখক অবকাশমত তাঁর চিন্তার ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। যার ফলে, উপন্যাসটি পরিণামমুখী হতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে আকস্মিকতাকে নিভর করেছে।

রাজা ইন্দ্রভূপ সত্যবাদী ও কর্তব্যপরায়ণ। উপন্যাসের রোমান্সসুলভ পরিমণ্ডলে কোন কোন চরিত্রের বাস্তবিকতা সঞ্জীবচন্দ্রের মানব-চরিত্র সম্পর্কে

বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। চূড়াধন বাঙ্গালীর অতি পরিচিত চরিত্র বলে মনে হয়। মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্তের সে নিকট আত্মীয়। পিতম উপন্যাসটির সর্বোত্তম সৃষ্টি। এই ধরনের জীবন্ত চরিত্র এই উপন্যাসে আর নেই। আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে সে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে। প্রধান ঘটনাবলীর মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে পিতম কাহিনীকে পরিণামমুখী করে তুলেছে। পিতমের (বিজয়রাজ) মৃত্যু ঘটনা ও বটনা অনেকটা প্রতাপচাঁদের[৭] মৃত্যুর মত রহস্যময়। পিতম-চরিত্রের মধ্যে গ্রন্থকারই যেন আত্মপ্রকাশ করেছেন।[৮] রানী ঈর্ষাপরায়ণা, অবিবেকী, জেদী ও ক্রোধী। রাজা মহেশচন্দ্র পাঠকমনে শ্রদ্ধার স্থান গ্রহণ করে। ভ্রাতৃদরদী, প্রজাবৎসল, বিদ্বান এই রাজা মনুষ্যত্বের অশেষ গুণাধিকারী। সাধ্বী পুঁটুর মার অহেতুক কলঙ্কজনিত মৃত্যুর দৃশ্য কষ্টকল্পিত হলেও এ যেন সমাজ-নির্দেশিত নিশ্চিত পরিণাম। মাতঙ্গিনীর আচরণ মানবিক ও কর্তব্য বোধদীপ্ত। এই চরিত্রটি ত্যাগ ও প্রেমে পূর্ণ। জ্যোৎস্নাবতীর স্বামিপ্রীতি ও আনুগত্য, রাজার প্রতি রানীর হৃদয়হীনতা ও সন্দেহপরায়ণতাকে প্রকট করে তুলেছে।

মাধবীলতার পরিশিষ্ট কণ্ঠমালার ঘটনাকাল, ইংরাজ শাসনের কালরূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই দুই উপন্যাসের ঘটনাকালের মধ্যে সঙ্গতির অভাব স্পষ্ট। এই অসঙ্গতির জন্য লেখকের নিস্পৃহ ও নির্বিকার চিত্তই দায়ী। এই উপন্যাসদ্বয়ের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনায় লেখকের নিশ্চেষ্টতা লক্ষণীয় ত্রুটি।

কণ্ঠমালা, 'ভ্রমর' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার কাল পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল। 'পরে বাঙ্গালার কোন শ্রেষ্ঠ লেখক সেই লিখিত অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি পড়িয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন যে, গল্পটির যদি শতদোষ ঘটে, তথাপি এই এক পরিচ্ছেদের সে সকল দোষের মার্জনা হইবে। বলিতে কি, আমি, সেই অবধি গল্পটি বাড়াইতে আরম্ভ করি'।[৯] গ্রন্থটির দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে (১৮৮৬) কণ্ঠমালা রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেন, 'অন্যের দোষে আমাদের কি অনিষ্ট হয়, তাহা কিয়দংশে বর্ণিত করিবার উদ্দেশ্যে মাধবীলতা লিখিত

৭. জালপ্রতাপচাঁদ : ১৮৮৩।

৮. সুকুমার সেন : বাসাই (তৃসং ১৩৬২) পৃঃ ২১০।

৯. কণ্ঠমালার প্রথমবারের বিজ্ঞাপন। কাঁঠালপাড়া ১৮৭৭।

হইয়াছিল, নিজের স্বভাবদোষে কি অনিষ্ট ঘটে, তাহা দেখাইবার জন্য কণ্ঠমালা লিখিতে আরম্ভ হয়।'

নিজের স্বভাবদোষে স্বেচ্ছাচারিণী শৈলর জীবন-পরিণতি চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই অপরাপর চরিত্রের সংযোগ ও ঘটনার গ্রন্থন। শৈল রাজা মহেশচন্দ্রের কন্যা। এই উপন্যাসে রাজা মহেশচন্দ্র ছদ্মবেশী শম্ভু। মাধবীলতা শম্ভুর আশ্রিতা। মাধবীলতার সঙ্গে মাতঙ্গিনীকেও দেখা যায়। সে দীর্ঘদিন ধরে মাধবীলতাকে সঙ্গ ও সাহচর্য দান করেছে। পিতম ও জ্যোৎস্নাবতীকেও কিছুক্ষণের জন্য ভিখারী ও ভিখারিণী বেশে দেখা যায়।

এই উপন্যাসের ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস্তবতার অভাব স্পষ্ট। ঘটনা-সংস্থানের কোন কোন ক্ষেত্রে আকস্মিকতা, অবাস্তবতার পর্যায়ভুক্ত। যথা, বিনোদকে ভূপ্রোথিত করবার পূর্বে প্রাচীরগাত্রে দীর্ঘাকার পুরুষ, বিলাসের ফাঁসির পূর্বকালে শৈলর আবির্ভাব এবং নিজেকে অপরাধীরূপে ঘোষণা, মাধবীর অসুস্থতাকালে ভিখারী ও ভিখারিণী বেশে পিতম ও জ্যোৎস্নাবতীর আবির্ভাব ও রোগমুক্তির অব্যর্থ ঔষধদান ইত্যাদি।

শম্ভু-কয়েদীর আচরণ, তার শাসন-ব্যবস্থা পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি-দানের বিধি, গুপ্তগৃহ-নির্মাণ, জেলে যাতায়াতের পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত। কণ্ঠমালা অধিক মাত্রায় রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, কণ্ঠমালায় রোমান্স-সুলভ অসম্ভাব্যতার ছড়াছড়ি।[১০] কথাটি নিঃসন্দেহে সত্য।

শৈলর নৈতিক পতন ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণের কাহিনীই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয়। বিনোদ ও তার স্ত্রী শৈলর সংসারে দারিদ্র্য থাকলেও ভালবাসায় দারিদ্র্য ছিল না। গোপালবাবুর পুত্রের কণ্ঠমালা শৈলর বাক্স থেকে বের হলে, বিনোদের কয়েদ হল। জেলখানায় শম্ভু-কয়েদীর সঙ্গে তার আলাপ। জেল থেকে ফিরে এসে সে শৈলর অবৈধ প্রণয়ী বিলাস কর্তৃক নিগৃহীত হল এবং শৈলর আদেশানুসারে তাকে কবরস্থ করার কালে শম্ভুর হস্তক্ষেপের ফলে সে রক্ষা পেল। শৈলর স্থান হলো পাষাণ কক্ষে।

বিনোদ এক যুবতীর কাছে জানল, শৈল মহারাজ মহেশচন্দ্রের কন্যা এবং

১০. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, প-সং ১৩৭২, পৃঃ ১৩২।

রাঘবরামের পালিতা কন্যা। যুবতীর অঙ্গসৌরভে বিনোদ যেন শৈলর অঙ্গসৌরভ আঘ্রাণ করে। যুবতী মাধবীলতা। জেলখানায় শম্ভু কয়েদী আনন্দে ঘানি ঘোরায়। দারোগার সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থা মত প্রতিরাত্রে সে ছাড়া পায়। রামদাসের সহায়তায় মাধবী শৈলর কাছে যায়। মাধবীকে পেয়ে শৈলর নিঃসঙ্গ জীবনে আনন্দ আসে। শৈল কঠিন আত্মযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন কাটায়। মাধবী চলে এলে সে উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠে। স্বামীকে পাবার আশায় ব্যাকুল হয়। অবশেষে সে মুক্তি পায়। কিন্তু আত্মযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি না পেয়ে সে পাগল হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। শম্ভুর ইচ্ছানুযায়ী বিনোদের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে হয়।

শৈল এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও চরিত্রটি স্বাভাবিকতা লাভ করেনি। তার চারিত্রিক দুর্বলতার কোন লক্ষণ তার অবৈধ প্রণয়ের পূর্বে পর্যন্ত জানা যায় নি। বরং তার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল বলে জানা যায়। অবৈধ প্রণয়ী বিলাসের সহায়তায় স্বামীকে জীবন্ত কবরস্থ করার চেষ্টাও তার চরিত্রের পূর্ব ও পরবর্তী আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। শৈলর প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্য ভয়ঙ্কর। শম্ভুর গৃহান্তর্গত পাষাণকক্ষে শৈলর অবস্থিতি তাকে নব চৈতন্য দান করেছে। আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মযন্ত্রণা ও আত্মশাসনের মধ্য দিয়ে সে তার পাপের শাস্তি ভোগ করে আত্মশুদ্ধি ঘটায়। মুক্তি পেলেও চিত্তদংশন থেকে সে রেহাই না পেয়ে পাগল হয়ে যায়। প্রায়শ্চিত্তের পর তার স্বামীকে পাবার আকাঙ্ক্ষা ও পাগল হয়ে যাবার ঘটনা শৈবলিনীর (চন্দ্রশেখর) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শৈলর অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রণে লেখকের শৈল্পিক কৃতিত্ব পরিস্ফুট। শৈলর মৃত্যু অনেকটা সামাজিক অনুশাসনসম্মত। প্রায়শ্চিত্ত অন্তে তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করার কোন লক্ষণ বিনোদের মধ্যে দেখা যায়নি। মনে হয় শৈলর পরিণতি চিত্রণে তৎকালীন সামাজিক নীতিই লেখকের মনকে প্রভাবিত করেছিল। তাই আত্মনিগ্রহ ও নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মৃত্যুই হল কুলটা শৈলর পরিণাম। মাধবী এই উপন্যাসে নিঃসঙ্গচারিণী। বিনোদের সঙ্গে বিবাহের কথায় তার মানসিক সংঘাতের চিত্রটি সুন্দর। একদিকে কর্তব্যবোধ, অন্যদিকে বিবাহের ইচ্ছা এই অন্তর্বিরোধের ফলে তার অসুস্থতা।

শম্ভু এই উপন্যাসের ঘটনা-নিয়ন্ত্রণের প্রধান কারণ। মোহান্তকে লেখা

শম্ভু-কয়েদীর চিঠিতে ‘মহাকুলীন’ সম্প্রদায় গঠন পরিকল্পনার বিষয়টি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায়ের পূর্বরূপ। রামদাস ও মোহান্ত শম্ভুর অস্ত্রস্বরূপ, শম্ভুর চরিত্র পরিস্ফুটনের সহায়ক। বিনোদ, ক্ষমা ও ভালবাসার প্রতিমূর্তি। শৈলর প্রতি তার গভীর প্রেম ও বিশ্বাস তার চরিত্রকে অপূর্বতা দান করেছে। শৈলর প্রেমকে সে বিস্মৃত হতে পারেনি বলেই মাধবীকে বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভবপ্রায় ছিল। বিনোদের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধুমতী (১২৮০)-র গোপালের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে গোপালের প্রণয় আরও গভীর। আদরিণীর সঙ্গে সেও নদীতে আত্মবিসর্জন করেছিল।

কণ্ঠমালার পরিণতিতে ব্যস্ততার ছাপ বর্তমান। ‘আর্যদর্শন’[১১] পত্রিকায় কণ্ঠমালার সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক পূর্ণচন্দ্র বসু বলেছেন, ‘কোন ধনবান ব্যক্তি অট্টালিকা নির্মাণ করিতে করিতে যদি সহসা দুরবস্থায় পতিত হন তবে সেই অট্টালিকার যে দুর্দশা ঘটে, তাহার সেই অসম্পূর্ণ অবস্থায় যেন-তেন-প্রকারেণ যেরূপ কুৎসিত আকারে তাহার পরিশেষ করা হয়, সেই অট্টালিকার প্রতি চাহিলে দর্শকদের যে প্রকার দুঃখবোধ হয়, কণ্ঠমালা পাঠেও আমাদিগের সেই প্রকার মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল।

‘ইহার পরিসমাপ্তিকে নিতান্ত দোষার্হ বলি এইজন্য যে যখন এই উপন্যাসের চরম ভাগ পরম প্রীতিকর হইয়া আসিবে বলিয়া আশা হইতেছিল, তখন গ্রন্থকার একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিলেন। তিনি কূলের নিকট আসিয়াই তরী ডুবাইয়া দিলেন।’

‘জাল প্রতাপচাঁদ’ ‘বর্ধমান রাজে’র গল্পরূপে চিহ্নিত। গ্রন্থটি একটি ঐতিহাসিক কাহিনী বিশেষ। উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক হলেও উপন্যাস নয়। ঘটনাসংস্থানে ও কৌতূহলরক্ষায় লেখক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ‘রামেশ্বরের অদৃষ্ট’ (১২৮৩) ও ‘দামিনী’ গল্পজাতীয় রচনা। শেষেরটিকে, ‘বাংলা ছোট গল্পের প্রকৃত অগ্রদূত বলা যাইতে পারে’।[১২] সঞ্জীবচন্দ্রের অপর দুই গ্রন্থ যাত্রা[১৩] (প্রবন্ধ) ও পালামৌ।[১৪]

১১. আর্যদর্শন: ভাদ্র ১২৮৪।
১২. সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য. তৃ সং পৃঃ ১২২।
১৩. ১৮৭৫।
১৪. বঙ্গদর্শনে (১২৮৭—৮৯) প্রকাশিত।

সঞ্জীবচন্দ্রের সাধ্য থাকা সত্ত্বেও সাধের অভাবে উপন্যাসগুলি যেন অযত্নলালিত। শুরুতে রচনায় লেখকের যে উদ্যম লক্ষিত হয় শেষাংশের দিকে তার বিপরীত ধারা গ্রন্থের আকস্মিক পরিণতি ঘটিয়ে গ্রন্থকারের নির্বিকার চিত্ততার পরিচয় দান করে। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য—'তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না……তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই; তাহার কারণ, সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী, কিন্তু গৃহিণী নহে'।[১৫] এই 'গৃহিণী-পনা'র অভাবই তাঁর শিল্পী-জীবনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

সঞ্জীবচন্দ্রের তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং চিন্তাশীলতা সার্থক ঔপন্যাসিকরূপে আত্ম-প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর প্রতিভা যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত কিছুটা আবৃত। সঞ্জীবের প্রতিভার সম্যক স্ফুরণের এটা অন্যতম অন্তরায়।

কালীময় ঘটক (১২৪৭—১৩০৭)

কালীময় ঘটকের উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কাব্য-কবিতার সঙ্গে এককালে বাঙালী পাঠকের পরিচয় থাকলেও আজ তিনি স্মৃতির অন্তরালে। শিশুকাল থেকেই পাঠের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। শিক্ষা আরম্ভের পাঁচ ছয় বছর পরে তাঁর পিতা তাঁকে জমিদারী সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু পুত্রের পাঠের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ দেখে আবার তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেন।[১৬] দুখানি উপন্যাস এবং 'কৃষি-শিক্ষা', 'কৃষিপ্রবেশ', 'সুরেন্দ্র-জীবনী' ছাড়াও 'মিত্র-বিলাপ' ও 'মেলা' নামে কালীময়ের দুটি কবিতা পুস্তক আছে।

কালীময় ঘটকের 'ছিন্নমস্তা'[১৭] স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির বিষয় নিয়ে রচিত উপন্যাস। তাছাড়া পাপের শাস্তি ও সতীত্বের জয় ঘোষণাও উপন্যাসটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

দেবেশ কলকাতার একজন ধনবান ব্যক্তি। বর্ধমানের এক ভট্টাচার্যের

১৫. রবীন্দ্রনাথ: আধুনিক সাহিত্য।

১৬. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক।

১৭. ছিন্নমস্তা, ১৮৭৮, পৃঃ ১৯৫।

পাঁচ বছরের মেয়ে কপালিনীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কপালিনীর বাবা বিয়ের সময় মেয়ের বয়স বাড়িয়ে সাত বলেছিল। কিছুকাল পরে স্বামীর প্রতি কপালিনীর অসন্তোষবোধ জাগে। তার স্বামী তাকে কলকাতায় নিয়ে যায়। সেখানে সে তার স্বামীর এক আত্মীয়ার সাক্ষাৎ পায় এবং তার স্বামীর উপর সন্দেহ প্রকাশ করে। তার ফলে কপালিনীর সঙ্গে দেবেশের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং কপালিনী রাগ করে পিত্রালয়ে চলে যায়। কিছুকাল পরে দেবেশ সংসার ত্যাগী হয়।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে কপালিনী নিজের ভুল বুঝতে পারে। এবং কৃতকর্মের জন্য দুঃখ অনুভব করে। শেষে সেও গৃহত্যাগ করে। কয়েক বছর পরে আকস্মিকভাবে ছিন্নমস্তার মন্দিরে তাদের মিলন হয় কিন্তু একে অপরকে চিনতে পারে না। তারা পরস্পরের জীবনকাহিনী জানবার জন্য মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করে। তারপর একদিন রাত্রে শ্মশানে উভয়ের পরিচয় প্রকাশ পায়। কপালিনী নিজেকে ছুরিকাহত করে ছিন্নমস্তা হয়। কারণ সে আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে যদি স্বামীর ক্ষমা পায় ত জীবনের সমস্ত আশা পূর্ণ হয়েছে জেনে মৃত্যুবরণ করবে।

এই কাহিনীর সূত্রে আরও কয়েকটি দম্পতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাপের শাস্তি ও সতীত্বের জয় অনিবার্য, পাঠকের চিত্তে লেখক বারবার এই সত্য প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। ঘটনা সংযোজনার ক্ষেত্রে আকস্মিকতা ও নাটকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। কপালিনীর মানসিক পরিবর্তন অনেকটা স্বাভাবিক। দেবেশ কর্তব্যসচেতন অভিমানী পুরুষরূপে চিত্রিত। উপন্যাসটির কাহিনী পরিকল্পনায় লেখকের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

কালীময়ের অপর উপন্যাস 'সর্বাণী'র[১৮] কাহিনী রোমান্টিক। প্রায় তিরিশ বছর আগে জমিদারদের মধ্যে একটা অভ্যাস প্রচলিত ছিল যে, ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি ক্লাবগুলির সহায়তায় করা হবে। ক্লাবের দলপতিকে বলা হত ক্যাপ্টেন। এই উপন্যাসে এই ধরনের একজন তৎকালীন ক্যাপ্টেনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই ক্যাপ্টেনটি একটি জমিদারের অধীনে কর্ম গ্রহণ করে। এই জমিদারটি আবার এই ক্যাপ্টেনের শ্বশুর নদীয়ার এক

১৮. সর্বাণী, ১৮৯০, পৃঃ ১৯২।

জমিদারের সঙ্গে নিত্যদ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। ক্যাপ্টেনের শ্বশুর বারবার তাকে খুনের দায়ে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত সে অবশ্য ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয় এবং বিচারে তার দশ বছরের কারাবাস হয়। সর্বাণী এর স্ত্রীর নাম।

কালীময়ের এই উপন্যাসটিতে জমিদারদের মধ্যে বিরোধের স্পষ্ট চিত্র পাই। তাছাড়া তৎকালীন ক্লাব ও দলপতি ক্যাপ্টেনদের সামাজিক ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসটিতে নতুন বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটলেও বৈশিষ্ট্যহীন রচনা।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (?–১৯২১)

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের একমাত্র উপন্যাস 'বঙ্গাধিপপরাজয়'[১৯] এককালে শিক্ষিত পাঠক সমাজে আদৃত হয়েছিল। আজ লেখক ও শিল্প উভয়েই বিস্মৃতপ্রায়। প্রতাপচন্দ্র এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তাঁর গবেষণাস্পৃহার একটি উজ্জ্বল শিল্পস্বাক্ষর তাঁর উপন্যাস। সতের ও আঠার শতকের বাংলাদেশ, আরাকান ও পর্তুগীস হার্মাদদের ইতিহাস সংগ্রহে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁর তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাই তাঁর রচনায়। অবশ্য বর্তমানে আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের রচনায় গৃহীত তথ্যাবলীর কিঞ্চিৎ তফাত লক্ষিত হয়।

প্রতাপকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনার কারণ প্রতাপ ও বসন্তরায়ের পরিবার সম্পর্কে লেখকের কৌতূহল। এই কৌতূহলের উৎসভূমি সরশুনায় তাঁর পূর্বপুরুষের বিনির্মিত বাসগৃহ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা তাঁদের গোবিন্দপুরের বাড়ির পরিবর্তে সরশুনায় রাজা বসন্ত রায়ের ভিটাবাড়িসহ সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। সেই ঐতিহাসিক বসতগৃহ প্রতাপচন্দ্রকে প্রতাপ ও বসন্ত রায়ের ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগায়। তারই ফল 'বঙ্গাধিপপরাজয়'।

বঙ্গাধিপপরাজয়-এর পূর্বনাম ছিল 'বঙ্গেশ বিজয়'। ঐ নামে কালীপ্রসন্ন সিংহের একটি গ্রন্থ ছাপা হবার কথা শুনে গ্রন্থের নাম পরিবর্তিত হয়।

প্রথম খণ্ডে 'বঙ্গেশ বিজয় পর্যন্ত আছে'। এবং 'রায়গড়ের ব্যাপার আশ্রয় করিয়া আদ্যোপান্ত প্রকটিত' হয়েছে। বঙ্গাধিপপরাজয়ে উল্লিখিত ঘটনা

১৯. বঙ্গাধিপপরাজয় (বঙ্গেশ বিজয়), প্রথম খণ্ড ১৭৯১ শক (১৮৬৯), দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০৬ শক।

অনেকে 'অমূলক' বলে পরিহাস করেছিলেন সেজন্য দ্বিতীয় খণ্ডে লেখক "পাঠকবর্গের তর্পণেচ্ছায় 'ক্ষিতীশ বংশাবলি' নামক পুরাতন মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বঙ্গাদিবিষয়ক কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত" করেছেন। তাছাড়া 'বৃত্তান্ত মূল মানচিত্র, চিত্র ও নির্ঘণ্ট' দিয়ে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ক্রোড়পত্রে লেখক একটি সংস্কৃত শ্লোক তুলে ধরেছেন— 'অত্রাপ্যুদাহরন্তী মিমং ইতিহাসং পুরাতনম্'। প্রতাপচন্দ্রের গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব নেই। ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশে পাঠান-শক্তিকে পরাভূত করে মোঘলের অধীনস্থ করার কাল, এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমি। মোঘলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু সেনাপতি মানসিংহই এই কাজে বৃত হন। এই জাতীয় ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রতাপাদিত্যের জীবনের বাস্তবভিত্তিক কাহিনী লেখক বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন যুগের সামাজিকসংস্কার রীতিনীতির বিষয় ছাড়াও বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে পর্তুগীস উৎপাতের বিষয় ও গ্রন্থটির ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনা করেছে।

প্রতাপাদিত্যের খুড়া বসন্ত রায়ের রায়গড় দুর্গের যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থের শুরু। বসন্ত রায়ের পুত্র কচুরায় দিল্লী পলায়ন করে এবং সেখানে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করতে থাকে। রায়গড়ের অধিবাসীরা এবং তার মা কমলা ধারণা করেছিলেন কচু রায়ের মৃত্যু হয়েছে। প্রতাপাদিত্য রায়গড় দুর্গ অধিকার করতে অভিলাষী হয়। জয়ন্তিয়ার রাজা শিবচন্দ্রের কন্যা ইন্দুমতীকে, রাজা বসন্ত রায়ের বিধবা পত্নীদ্বয় কমলা ও বিমলা পালিতা কন্যারূপে গ্রহণ করে। ইন্দুমতীর রূপযৌবনমগ্ধ প্রতাপ তাকে পাবার আশায় রায়গড় দুর্গ অধিকার করতে চায়। এই উদ্দেশ্য মনে রেখে বেশ জাঁকজমক সহকারে প্রতাপ পুরীর দেববিগ্রহ দর্শন ও দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে পাঠানদের সঙ্গে চুক্তি করার মানসে যাত্রা করে। উড়িষ্যার যাত্রাপথে রায়গড়ের কাছে প্রতাপ যমুনা পরুইএ সৈন্যসজ্জা করে। সেখানে সেনাপতিদের মধ্যে মল্লযুদ্ধের আয়োজন হলে, জয়ন্তী রাজকুমার সূর্যকুমার বীরশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হয়। এখান থেকেই প্রতাপ পাঠান সেনাপতি হজুরমলকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন মধ্যরাত্রে রায়গড় দুর্গে। উদ্দেশ্য, ইন্দুমতীকে হরণ করে আনা। পর্তুগীস দস্যু সেবাসটিয়ান গঞ্জালিস একটি পর্তুগীস দস্যুদল সহ একই উদ্দেশ্যে

প্রেরিত হয়। গঞ্জালিসকে এই কাজে নিযুক্ত করার কারণ উক্ত ঘটনার উপর একটি স্বতন্ত্র বর্ণ দেবার চেষ্টা। প্রতাপাদিত্য পরে এই কথা রটাতে পারবে যে, পর্তুগীসরা ইন্দুমতীকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণের পুত্র মালিকরাজ ও সূর্যকুমার এই দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারে। তারা গোপনে ইন্দুমতীকে রক্ষা করতে যায়। ইতিমধ্যে কচুরায় সহ মানসিংহ সসৈন্যে বঙ্গদেশে আসেন, পাঠানদের দমন করে প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যেতে। কচুরায় ইন্দুমতী সন্দর্শনে রায়গড়ে এলে, কৃষ্ণবর্মপরিহিত কচুরায়কে মালিকরাজ ও সূর্যকুমার চিনতে পারে না। সূর্যকুমার ও মালিকরাজ বুঝতে পারে যে, তাদের আগমনের পূর্বেই কিছুসংখ্যক অপরিচিত ব্যক্তি দুর্গে প্রবেশ করেছে। অপরিচিত দস্যুদল ইন্দুমতী ও প্রভাবতী (বসন্ত রায়ের মন্ত্রী আনন্দগোপাল দেবের কন্যা)-কে হরণ করতে সমর্থ হয়। গঞ্জালিস মেয়ে দুটিকে নিয়ে সন্দীপে চলে যায়। সূর্যকুমার, মালিকরাজ ও কচুরায় সমস্ত বিষয় বুঝতে পারে এবং বজবজে মানসিংহ স্থাপিত মোঘল ছাউনিতে আসে। তারা মানসিংহ কর্তৃক আশ্বস্ত হয়ে, সন্দীপে এসে গেডিজদুর্গ আক্রমণ করে এবং ইন্দুমতী, প্রভাবতী এবং আরও কয়েকজন বন্দীকে উদ্ধার করে। এর মধ্যে প্রতাপ রায়গড় দুর্গ অধিকার করে। সন্দীপ থেকে ফিরে এসে দিল্লীর নির্দেশানুসারে সূর্যকুমার, মালিকরাজ ও কচুরায় শেষ পর্যন্ত রায়গড় দুর্গ অধিকার করে। প্রতাপাদিত্য বন্দী হয় এবং মানসিংহের দরবারে প্রেরিত হয়। বসন্ত রায়কে হত্যার প্রবোচনা দানের জন্য বল্লভ এবং হজুরমলের মৃত্যু দণ্ড হয়। প্রথম খণ্ডের এখানেই শেষ।

বল্লভের দণ্ড প্রত্যাহৃত হয়েছিল। কারণ, গ্রন্থশেষে প্রভাবতীর সঙ্গে তার বিবাহ হতে দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনীর ধারা বজায় থাকলেও জয়ন্তিয়া রাজ্যের কলহপ্রসঙ্গ, আরাকানের পুঙ্গীদের বিষয় ও রায়গড়দুর্গ কেন্দ্র করে, পারিবারিক কাহিনীর জাল বিস্তৃত হয়েছে। প্রতাপকে লোহার খাঁচায় বন্দী করে দিল্লী চালান দেওয়া হয়। তার স্ত্রী, কন্যা সরমা, সূর্যকুমার, কচুরায়, মালিকরাজ এবং আরও অনেকে তাকে অনুসরণ করে। প্রতাপাদিত্য কচুরায়কে বলে, কাশীতে কয়েকদিন থাকবার জন্য মানসিংহকে অনুরোধ করতে। কাশীতে থাকাকালে পূর্বকথিত নির্দিষ্ট দিনে প্রতাপ দেহত্যাগ

করে। কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে জাঁকজমক সহকারে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তারপর প্রতাপের আত্মীয়-পরিজনরা দেশে ফিরে যায়। কচুরায় গদিপ্রাপ্ত হয় এবং ইন্দুমতীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সূর্যকুমার জয়ন্তীরাজ্য ফিরে পায়। পিতৃশোকে রোগাক্রান্ত সরমার মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থটির মধ্যে অনাবশ্যক প্রসঙ্গের অবতারণা ও বর্ণনা কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। একটি সরলরেখায় মূলকাহিনীটি পরিণতি লাভ করলেও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে এবং তৎকালের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীর অহেতুক অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, লেখক গল্পরসকে ব্যাহত করে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন।

মধ্যযুগের বাংলা দেশের সমাজের বহু বিচিত্র চিত্র পাই এই উপন্যাসে। এই গ্রন্থের অনেক ঘটনা অনৈতিহাসিক বলে আধুনিক ইতিহাস মনে করে। বিশেষ, লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে দিল্লীযাত্রার পথে বারাণসীতে প্রতাপের মৃত্যুর ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা সন্দেহাতীত নন। জয়ন্তিয়ার রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র সূর্যকুমারের প্রতাপের নিকট প্রতিভূরূপে থাকার বিষয়টিও অনৈতিহাসিক। মনে হয় লেখক বৈচিত্র্য-সৃষ্টিমানসে এই জাতীয় প্রসঙ্গ সংযোজিত করেছেন।

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক গ্রন্থটির ভাষা সম্পর্কে বলেছেন—'গ্রন্থের ভাষায় একটিও অশ্লীল কথার প্রয়োগ নাই। পবিত্র সংস্কৃতজাত শব্দই অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে; কেবল যেখানে সামান্য বাঙ্গালা কথা ব্যতীত প্রকৃত ভাব প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, সেইখানেই অপভ্রংশ শব্দই নিযুক্ত হইয়াছে। স্বভাবত যাহাদিগের যেরূপ বাক্য সম্ভব, তাহাদিগের মুখ হইতে সেই রূপেই বাক্য নিঃসৃত হইতে দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু একান্ত গ্রাম্য বিকৃতি পরিত্যাগ করা হইয়াছে'। এই রীতি অনুসরণের ফলে উপন্যাসটির ভাষা গল্পের রসাস্বাদনের অন্যতম অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তৎসম শব্দের আধিক্য, গল্পের গতিধারাকে স্থূল করে তুলেছে,—তাছাড়া যতি-চিহ্নের ব্যবহারের ত্রুটি বিরক্তির অন্যতম কারণ। বঙ্গাধিপপরাজয়ের বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্তির জন্য ভাষা অন্যতম কারণ। একটি রসগ্রাহী কাহিনী এই উপন্যাসে থাকা সত্ত্বেও, ভাষার দুরূহতা গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করে তুলতে পারেনি।

এই উপন্যাসে লেখক অজস্র চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। প্রতাপাদিত্য চরিত্রটি

বহুলাংশে ফেনায়িত। প্রতাপকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী স্বার্থপর ও কামুক রূপে চিত্রিত করেছেন লেখক। খুড়িমা বিমলার সঙ্গে প্রেমালাপ এবং তাঁর অভাবে বিমলার দাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা, প্রতাপের চরিত্রের হীনতার দিক। কচুরায়ের ধাত্রী রেবতীর প্রতি অসদাচরণ ও তার চরিত্রের এই জাতীয় ত্রুটির অপর উদাহরণ। রেবতী চরিত্রটি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। প্রভাবতীর যোদ্ধার সাজে সজ্জা, তৎকালীন বঙ্গসমাজের প্রেক্ষিতে কল্পনাতীত। তেমনি বৈদ্যনাথের সন্দীপের বাগানবাড়িতে, বরদার সঙ্গে অরুন্ধতীর প্রণয়-প্রসঙ্গও কষ্টকল্পিত। অজস্র চরিত্রের কর্মধারা এই উপন্যাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। দ্বিতীয় খণ্ডে, প্রতাপের মধ্যে মানবিক গুণের আভাস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই জাতীয় মানসিক পরিবর্তনসাধনে লেখক কোনও মনস্তত্ত্বের পথ অনুসরণ করেন নি। সূর্যকুমারের চরিত্র স্বাভাবিকতার বর্ণে উজ্জ্বল। অন্যান্য চরিত্র উপন্যাসটির বৈচিত্র্যসাধনে যেমন সহায়তা করেছে তেমনি গ্রন্থের মেদবৃদ্ধি করে তার অঙ্গশ্রী ও চলার ছন্দকে ভারি করে তুলেছে। উপন্যাসটিতে গঞ্জালিসের চরিত্র ঐতিহাসিক। সন্দীপকে কেন্দ্র করে তার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে গঞ্জালিস কর্তৃক রায়গড় দুর্গ আক্রমণের বিষয়টি শৈল্পিক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। কিছু কিছু অনৈতিহাসিক বিষয়ের অবতারণা করা হলেও 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ের ঘটনাবলী ইতিহাসের অনুগত'। 'ক্যালকাটা রিভিউ'[২০] পত্রিকায় উপন্যাসটির দীর্ঘ সমালোচনায় গ্রন্থটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে, পরিশেষে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। সমালোচক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে উপন্যাসটিকে বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি উপন্যাসটির রচনাশৈলী ও বর্ণনানৈপুণ্যেরও প্রশংসা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গ্রন্থকারের 'সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বর্ণনা'র যথেষ্ট ক্ষমতার কথা বলেছেন, এবং লেখক চিত্রিত নরনারীর চরিত্রগুলির প্রশংসা করেছেন[২১]। রামরাম বসুই 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) গ্রন্থরচনা করে বাংলা ভাষায় প্রথম প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেন। তার বহুকাল পরে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এর আবির্ভাব। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও তথ্যনিষ্ঠা কিন্তু সমকালীন অনেক লেখককে আকৃষ্ট করেছিল।

২০. *The Calcutta Review*, No. XCIX, January 1870.

২১. বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৮৭, ('বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রবন্ধ)।

'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র (প্রথম খণ্ড) সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট' (১৮৮২)-এর আবির্ভাব। পরবর্তীকালে হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষ বীর' (১৩০৪)-এ প্রতাপকে দেশপ্রেমিকরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

'বঙ্গাধিপপরাজয়'-এর শেষে বিস্তৃত 'নোটস'-এ ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে। এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের নোটস-ই বেশি। তাছাড়া Extract from the proceedings of the Asiatic Society for December 1868, H. J. Rainey on Sundarban, Extract from Colonel Sir Arthur/Phayre's History of Arrakan, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩—১৮৯১)

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তারকনাথের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তাঁকে প্রভূত জনপ্রিয়তা দান করেছিল। তারকনাথ পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। ইনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এস. উপাধিলাভ করেন। সরকারী কাজে যশোহে অবস্থানকালে তিনি 'কল্পলতা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা সুরু করেন (আগস্ট ১৮৮১)। পত্রিকাটি তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল। মেডিকেল কলেজে তাঁর ছাত্রাবস্থার কালে বঙ্কিম-চন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) প্রকাশিত হয়। দুর্গেশনন্দিনী হেন রোমান্স পাঠে তারকনাথ তৃপ্ত হননি। এর কিছুকাল পরে তারকনাথের বাস্তবধর্মী একটি উপন্যাস রচনার ইচ্ছা জাগতে থাকে। ছাত্রাবস্থায় হিন্দু হোস্টেলে অবস্থানকালে 'দুর্গেশনন্দিনী' সমালোচনা করে তারকনাথ বন্ধুদের কাছে হাস্যাস্পদ হন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার (পরে সাধারণী সম্পাদক) তারকনাথকে উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত করেন।

তারকনাথ ইংরেজীসাহিত্যানুরাগী ছিলেন। *Friend of India* নামক পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় তাঁর বাংলা কবিতা রচনার পরিচয় মেলে।

কর্মসূত্রে দার্জিলিং-এ অবস্থানকালে তারকনাথ 'স্বর্ণলতা'[১] রচনায় হাত দেন। উপন্যাসটির অধিকাংশ চরিত্রই বাস্তব-নির্ভর। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই স্বর্ণলতা রচনা শেষ হয়। তাঁর ডায়েরীতে এই কথার উল্লেখ আছে। —"Finished my tale in the evening at about 8 P. M. It was melancholy pleasure to see it completed as I was to part company with my friends forever (Monday 7th July, 1873).

১. স্বর্ণলতা, কলিকাতা, ১২৮১ সাল। প্রথম তিনটি সংস্করণে লেখকের নাম ছিল না। লেখকের জীবদ্দশায় সাতটি সংস্করণ হয়। ৭ম সংস্করণের প্রকাশকাল, ১৮৮৯। জ্ঞানাঙ্কুর (আশ্বিন ১২৭৯ —ভাদ্র ১২৮০)-এ সাতাশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

তারকনাথের বাস্তববাদী মন ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা স্বর্ণলতার চরিত্রগুলিকে বাস্তব জীবনের পটভূমি থেকে সংগ্রহ করতে সহায়তা করেছে।

তিনি ডায়েরীতে এ সম্পর্কে লিখেছেন—"Some characters of my novel are from the real life...My friend Suresh and Paresh two figures under the name of Ramesh and Debesh" (11th July 1873).

সরকারী কাজে তাঁকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পর্যটন করতে হতো। সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' রচনার পরিবেশের চিত্র তুলে ধরেছেন, —'পল্লীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ী যোটে না। সুতরাং গোরুর গাড়ীই ভরসা। মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কিয়দ্দূরে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ সদ্য নির্মিত ইষ্টকের চুল্লীতে হাঁড়ি চাপাইয়াছে। ডাক্তারবাবু গোরুর গাড়ীর তলায় সতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া 'স্বর্ণলতা' লিখিতেছেন, স্বর্ণলতার অধিকাংশ এইরূপে গোরুর গাড়ীর তলায় রাজপথের উপর রচিত হইয়াছিল।'[২]

স্বর্ণলতার নামপত্রে (টাইটেল পেজ) তিনটি মটো তিনি ব্যবহার করেন। প্রথমটি হোরেসের কাব্য থেকে "Ficta Voluptatis Causa Sint Proxima Veris". দ্বিতীয় বাক্যটি উদ্ধৃত করেন তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং এর টমজোনস উপন্যাস থেকে, "Fictions to please should wear the face of Truth" এবং তৃতীয় শ্লোকটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন "ঠিক এরূপ (ল্যাটিন ও ইংরেজী মটো) ভাব প্রকাশ করে এরূপ কোন শ্লোক না জানা থাকাতে নবীন পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়া শ্লোকটি রচনা করাইয়াছিলাম। শ্লোক যদি হইল ত কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে সেই গ্রন্থ অথবা গ্রন্থকারের নাম দিতে হইবে। আমি বলিলাম 'কল্লুকভট্ট' অথবা 'মহানির্বাণতন্ত্র' এমন একটা কোনও বদখৎ নাম বলিয়া দিন যাহা সাধারণ লোকে সচরাচর পড়ে না। তাহাতে নবীন পণ্ডিত মহাশয় শ্লোকটির নিম্নে 'হরিবংশম' নামটি বসাইয়া দিয়াছিলেন।"

স্বর্ণলতা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই গ্রন্থটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ

২. দাসী ১০ই আগস্ট ১৮৯৬।
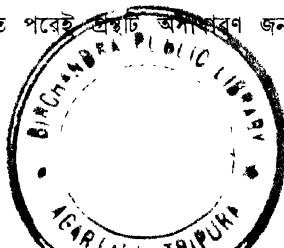
করে। বঙ্কিমের রচনাধারার সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী এতদিন পরে বাংলাদেশের ঘরের কথা ও বাঙ্গালীর প্রাণের কথা পেল উপন্যাসের পাতায়। বাঙ্গালীর যেন আত্মরূপ-দর্শন ঘটল।

'জ্ঞানাঙ্কুর'-এ প্রকাশিত সাতাশ পরিচ্ছেদটির নাম ছিল, 'সরলার মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ'। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার কালে পরিচ্ছেদটির নূতন নামকরণ হয়, 'বিধুভূষণের দেশে প্রত্যাগমন ও সরলার ঋণ পরিশোধ'। স্বর্ণলতা গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালে কোন কোন পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হয়। স্বর্ণলতার কাহিনী সংক্ষেপে দিলাম।

শশিভূষণ ও বিধুভূষণ দুই ভাই। বিধুভূষণের পনের বছর আগে বিয়ে হয়। তার পাঁচবছর পরে মায়ের মৃত্যু হয়। বিধুভূষণের তখন এক পুত্র। জ্যেষ্ঠ শশিভূষণের এক পুত্র ও এক কন্যা। মায়ের মৃত্যুর পর সংসারে ফাটল ধরে। বিধুর স্ত্রী সরলা শান্ত স্বভাবের। শশীর স্ত্রী প্রমদা তার বিপরীত। বাড়ির পুরানো ঝি শ্যামা সরলার অনুরাগিনী। শশিভূষণ জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করে। বিধুভূষণ বেকার। দেবরের অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে মুখরা প্রমদা বাক্যবাণ বর্ষণ করতেন। সরলা সংসারে আশাতীত শ্রমদানে স্বামীর অকর্মণ্যতার ঋণ শোধ করত।

শশিভূষণ স্ত্রৈণ। স্ত্রীর কথায় ভাই ও ভাজের প্রতি সে অনায়াসে বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করে। স্ত্রীর প্ররোচনায় শশিভূষণ পৃথক হয়ে গেল। আত্মভোলা বিধুভূষণ প্রথমে ভাবতে পারেনি দাদার সিদ্ধান্তের কথা। তার সংসারে চারটি প্রাণী। সে, সরলা, পুত্র গোপাল ও ঝি শ্যামা। আয় নেই এক কপর্দকও। কোন কোন দিন তার দিন কাটে গাছের তলায়, অর্থচিন্তায়। অবশেষে সে শ্যামার হাতে স্ত্রী-পুত্রকে সমর্পণ করে, শ্যামার সঞ্চিত টাকা থেকে পাঁচটি টাকা নিয়ে চাকুরির সন্ধানে কলকাতার পথে বেরিয়ে পড়ল। যাত্রাপথে গাছতলায় বিধুর সঙ্গে পরিচয় হলো নীলকমলের। নীলকমল বেহালা বাজায়। বেসুরো গানও গায়। তার 'পদ্ম আঁখি' গানটি শ্রোতার কাছে হাস্যোদ্দীপক হলেও সে গানটি সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করে।

বিধুভূষণ চলে যাবার পর প্রমদা সরলার সঙ্গে ঝগড়া করার আর সূত্র খুঁজে পায় না। তার মাকে আনে এবং ভাই গদাধরচন্দ্রকেও। গদাধর জীর্ণ-শীর্ণ রোগা কালো। 'ত' কে 'ট' বলে। মাকে দিয়ে তার তামাক

সাজায়। নীলকমলকে নিয়ে বিধুভূষণ কলকাতায় এল। কালীঘাটে ভিড়ের মধ্যে বিধুভূষণ টাকার থলি হারাল। নীলকমলও হারিয়ে গেল। বিধুভূষণ এক পাণ্ডার সহায়তায় এক পাঁচালী দলের বাদ্যকরের কাজ পেল।

এদিকে প্রমদা ও তার মা গদাধরের দ্বারা সরলার ঘরে শ্যামার সঞ্চিত টাকা চুরি করাল। শ্যামার কাছে শশিভূষণ সব শুনে তিনি গোপালের বেতন ও শ্যামার টাকা দিলেন।

হুগলী জেলার দেবীপুরে এক যাত্রার আসরে হনুমান বেশী নীলকমলের সাক্ষাৎ পেল বিধুভূষণ।

সরলা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এদিকে গোপালের নামে প্রেরিত বিধুভূষণের টাকা জাল সহি করে গদাধর আত্মসাৎ করতে লাগল। বিধুভূষণ বাড়ি আসার পরদিন সরলার মৃত্যু হল। বিধুভূষণ গদাধরকে চোরের দায়ে অভিযুক্ত করলে বিচারে তার জেল হল।

বিধুভূষণ একটি কাজের সন্ধান পেয়ে ঢাকায় চলে গেলে, শ্যামা গোপালকে নিয়ে কলকাতায় গেল। শ্যামা ও গোপাল যথাক্রমে দাসী ও পাচকের কাজ করতে থাকে। গোপাল ঐভাবে পড়াশুনা করতে লাগল। স্কুলে গোপালের সঙ্গে হেমচন্দ্রের আলাপ হলে হেমের অনুরোধক্রমে শ্যামা ও গোপাল তাদের বাড়িতে বাস করতে লাগল। বর্ধমান জেলার বিপ্রদাস চক্রবর্তীর ছেলে হেমচন্দ্র। বিপ্রদাস ধনী ব্যক্তি। তাঁর কন্যা স্বর্ণময়ীকে তিনি পুত্রের সমান অধিকার দিয়ে, উইল করে তাঁর সম্পত্তি ছেলেমেয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে হেম-এর সঙ্গে গোপাল তাদের বাড়ি এলে স্বর্ণর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। গোপালের সঙ্গে স্বর্ণের বিয়ে দেবার প্রস্তাবে বিপ্রদাস গোপালের দারিদ্র্যের জন্য মত স্থির করতে পারলেন না। পিতার মৃত্যুর পর হেম বসন্তরোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। হেমকে সুস্থ করে তুলল গোপাল। হেম-এর অসুস্থতাকালে তাদের গুরুঠাকুর স্বর্ণকে অর্থলোভে এক মূর্খ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবে স্থির করলে, দাসীর সাহায্যে স্বর্ণ পালিয়ে গেল। গোপাল তাকে অনুসন্ধান করে নিয়ে এলো কলকাতায়। তারপর গোপালের সঙ্গে স্বর্ণলতার বিয়ে হল। বিধুভূষণ পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে বাস করতে লাগল।

তহবিল তছরুপের দায়ে শশিভূষণের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেলে পুত্র ও কন্যাসহ তিনি গোপালের বাড়ী আশ্রয় নিলেন। প্রমদা বাপের বাড়ি

থাকেন। ব্যয়ভার বহন করে গোপাল। শ্যামা সংসারে গৃহিণীর মর্যাদা নিয়ে বাস করতে থাকে।

স্বর্ণলতায় দুটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম কাহিনীর সঙ্গে দ্বিতীয় কাহিনীর যোজনা দৃঢ়তর হতে পারেনি। প্রথম কাহিনীটি সরলাকে কেন্দ্র করে রচিত। সরলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিসমাপ্তি। দ্বিতীয় কাহিনীটি গোপালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্বর্ণলতা ও হেমচন্দ্র দ্বিতীয় কাহিনীর অন্য দুটি মুখ্য চরিত্র। একটি কাহিনীর সঙ্গে অপর কাহিনীর বলিষ্ঠ যোগসূত্র রচনা করার জন্য তেমন কোন কেন্দ্রীয় চরিত্রকে খুঁজে পাওয়া যায় না। গোপালকে এবং শ্যামাকে দুটি কাহিনীর মধ্যে আমরা পাই বটে, কিন্তু প্রথম কাহিনীতে গোপালের চরিত্র সম্যকভাবে বিকশিত হতে পারেনি। এবং শ্যামা প্রথম কাহিনীতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করলেও দ্বিতীয় কাহিনীতে তার স্থান সংকীর্ণ। প্রথম কাহিনী দুটির প্রধান চরিত্রের মধ্যে সরলা মৃত এবং বিধুভূষণ নিরুদ্দিষ্ট। এক্ষেত্রে গোপালকেই কাহিনীর সংযোগ সূত্র বলে মেনে নিতে হয়। লেখক দ্বিতীয় কাহিনীর নায়িকার নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করেছেন। দ্বিতীয় কাহিনীতে তারকনাথ প্রেমের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমটিতে প্রেমের প্রসঙ্গ সংযোজনের কোন অবকাশ ছিল না। স্বর্ণলতার দ্বিতীয় কাহিনীতে প্রেমপ্রসঙ্গ অবতারণার পেছনে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তারকনাথের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন।[৩] 'দেশের লোকের প্রকৃত চরিত্র এবং দেশের সম্যক পরিচয়' প্রকাশ করাই উপন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে তারকনাথ মনে করতেন। স্বর্ণলতার প্রথম কাহিনীতে লেখকের উক্ত মনোভাবই রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় অনাবশ্যক দ্বিতীয় কাহিনীটিতে প্রেমের প্রাধান্য দিয়ে তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মত শিল্পের কাল-জয়ী শক্তিকেই জয়যুক্ত করতে চেয়েছেন।

স্বর্ণলতার জীবনদর্শন আবিষ্কার করা কঠিন। বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের বহুবিধ তথ্য ও পরিচয়ের সঙ্গমক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে স্বর্ণলতা। তারকনাথ এই উপন্যাস রচনায় বিচক্ষণ স্রষ্টা অপেক্ষা দ্রষ্টার ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন। অনাবশ্যক ঘটনা সংযোজন ও চরিত্র-সৃষ্টি উপন্যাসটির কাহিনী-সংহতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি।

৩. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিত 'স্বর্ণলতা' (ভাদ্র ১৩৬৯)-র ভূমিকা দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০।

এই উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে তারকনাথ তাঁর দৃষ্টি শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। স্বর্ণলতার অন্যতম প্রধান চরিত্র শশিভূষণ, স্ত্রৈণ। তিনি অপ্রমত্ত ভাইকে স্ত্রীর কথায় তিরস্কার করেন, ভাইকে পৃথক করে দেন। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন শশিভূষণ স্ত্রীর কাছে একটি অসহায় জীবরূপে পরিচয় রাখলেও বিধুকে পৃথক করে দিয়ে নিজের সংসারে শ্বশুরবাড়ির আধিপত্য দেখা দেবার প্রারম্ভে নিজের ভুল বুঝতে পারেন ('কেনই বা বিধুকে পৃথক্ করিয়া দিলাম')। শশিভূষণের চরিত্র উপন্যাসটিতে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি। শশিভূষণ ভাই বিধুভূষণকে স্নেহের অধিকার দানে মানুষ করেছেন, বিবাহ দিয়েছেন। অথচ স্ত্রীর একটি মিথ্যা কথায় আস্থা স্থাপন করে বিধুভূষণের প্রতি হৃদয়হীন আচরণ করা, এবং বিধুভূষণকে পৃথক করে দেবার পর নিরুদ্দিষ্ট বিধুভূষণেব পরিবারের চরম দারিদ্র্য ও অনটন প্রত্যক্ষ করেও সংবাদ না নেওয়া প্রভৃতি ঘটনা শশিভূষণের চরিত্রকে অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে টেনে এনেছে। তৎসত্ত্বেও শশিভূষণের চরিত্রে মানবিক চেতনার স্পন্দন মাঝে মাঝে অনুভব করা যায় (বিধুর জন্য বেদনাবোধ, শ্যামার টাকা চুরি যাবার পর গোপালের স্কুলের বেতনদান, গদাধরের বিচারের আশ্বাস দান ও শ্যামার হৃত টাকা স্বেচ্ছায় দান প্রভৃতি ব্যাপার তার উদাহরণ)। মালদহের এক নবীন জমিদারের নায়েব-চরিত্রই শশিভূষণ চরিত্রের উৎস। শশিভূষণ চরিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতির' শ্যাম চরিত্রের সুদূর সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য।[৪] শেষের দিকে শশিভূষণ চরিত্র বাস্তব ও জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

প্রমদা চরিত্র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকতার বর্ণে উজ্জ্বল। ঈর্ষা ও স্বার্থচেতনা প্রমদা চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিধুভূষণের পরিবারকে পৃথক করে দেওয়া, দিগম্বরী ঠাকুরণের সহায়তায় কার্যোদ্ধার করে তাকে তাড়ান, মা ও ভাইকে এনে সরলাকে সর্ববিষয়ে জব্দ করার চেষ্টা, স্বামীর চরম বিপদের দিনে গহনার বাক্স ও কাপড়ের পুটুলি নিয়ে বাপের বাড়ি যাত্রা প্রভৃতি আচরণ তার চরিত্রের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। প্রমদার এই জাতীয় আচরণ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 'মণিহারা'র প্রেরণাস্বরূপ। প্রমদার চরিত্র যেন 'মণিমালিকা'র পূর্বরূপ। বাপের বাড়ি যাবার কালে নদীতে গহনার বাক্সসহ 'নৌকা জলমগ্ন' হওয়ার বিষয়টি গভীর অর্থবাহী।

৪. তদেব (পৃঃ ৩৸০—৩৷৹)

বিবাহিতা নারীর জীবনে গহনা অপেক্ষা যে স্বামী অনেক বড়, লেখক এই সত্যটি এই ইঙ্গিতমূলক চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন। পারিবারিক জীবনে স্বামী-বিচ্যুত গহনা-নির্ভর জীবনযাপনপ্রয়াসী নারীর অন্তঃসার-শূন্যতার প্রতি যেন বঙ্কিম কটাক্ষ! এই ধরনের চিত্র পাই হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হেমচন্দ্র' (১৮৯৬) উপন্যাসে।

বিধুভূষণের চরিত্র স্বাভাবিক। তার আচরণ স্বভাবানুগ। সে আত্ম-ভোলা সরল অমায়িক গ্রাম্য যুবক। মায়ের স্নেহে ও দাদার প্রশ্রয়ে লালিত। দাদার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। তাই পৃথক হবার সংবাদকে সে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি কর্তব্যের দায়ে সে গৃহ-ত্যাগী। সরল বিশ্বাসে রেজেষ্ট্রিচিঠিও মনিঅর্ডারের রসিদের জাল স্বাক্ষর, নিজের পুত্রের স্বাক্ষর জ্ঞানে সে প্রবঞ্চিত হয়েছে। এই সারল্যই বিধুভূষণের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিধুভূষণ যেন জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে। তাই তার সারল্য, তার জীবনকে যে বেদনার ও বঞ্চনার কূপে নিক্ষেপ করেছিল, সেই বেদনা ও বঞ্চনার হাত থেকে সে মুক্তি পেতে চেয়েছে।

সরলা স্বামিগতপ্রাণা সাধ্বী রমণী। বাংলার পারিবারিক জীবনের স্নেহ-শীলা নারী-চরিত্রের মাধুর্যটুকু যেন প্রতিফলিত হয়েছে সরলার চরিত্রে। স্বামী, সন্তান ও সংসারের প্রতি তার কর্তব্য, চরম দুঃখের দিনে নীরব সহনশীলতা, স্বামীর অকর্মণ্যতার জন্য বীতরাগ না হয়ে স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ প্রভৃতি সদ্গুণ সরলার চরিত্রকে অনায়াসমাধুর্য দান করেছে। নারীর সৃষ্টিশীল রূপটি, তারকনাথ সরলার চরিত্রে প্রতিফলিত করেছেন। বাঙালীর যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ও গঠনের জন্য নারীই যে মূলত দায়ী, তারকনাথ সে কথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। সেই কারণে প্রমদার মত, সরলা চরিত্রটি ও স্বাভাবিকতার বর্ণে ও সহানুভূতির আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের যূপকাষ্ঠে তার প্রতিবাদহীন মৃত্যু মর্মস্পর্শী। সরলার মৃত্যুদৃশ্য রচনাকালে তারকনাথ স্বয়ং অশ্রুর বেগ সংবরণ করতে পারেন নি। তাঁর ডায়েরী থেকে এ বিষয়ে জানা যায়[৫]। সরলা তারকনাথের

৫. I am very sorry and shed tears for the death of Sarala. Very sorry to part with her. I feel as if I am a murderer! What an awful thing death is. (21st June, 1873)

নিজের দেখা চরিত্র। সরলা, গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল নাটক রচনার প্রেরণার উৎসস্থল।

গোপাল উভয় কাহিনীর সংযোগসেতু। সরলার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত গোপাল অপরিণত বয়স্ক। দ্বিতীয়ার্ধে গোপাল কিছু কর্মতৎপর হলেও আদর্শবাদের প্রভাব তার চরিত্রটিকে সম্যকরূপে বিকশিত করতে পারেনি। শ্যামার চরিত্র পরিকল্পনায় লেখক বাস্তববাদিতার পরিচয় দিয়েছেন। বাঙ্গালীর পরিবারে কর্তব্যবোধসম্পন্না এই জাতীয়া ঝি নিতান্ত বিরল নয়। কর্ম ও অর্থ দিয়ে, সরলার সংসারে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করে শ্যামা যেন সরলার পরিবারভুক্ত একজন ব্যক্তিরূপে মর্যাদা পেয়ে আত্মচরিতার্থতা লাভ করতে চেয়েছে।

নীলকমল চরিত্রটি উপন্যাসের প্রয়োজনসিদ্ধির ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। উপন্যাসটিতে নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির তাগিদে এই চরিত্রটির সৃষ্টি। নীলকমল আসলে তারকনাথের স্বগ্রামবাসী এক আধপাগলাজাতীয় লোক। সে জাতিতে ছিল গোয়ালা। এই চরিত্রটিও বাস্তব সংসার থেকে আহৃত। ভাঙ্গা বেহালার সুরে বেসুরো গান 'পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব', সম্পর্কে নিজের গর্ব, যাত্রার দলে হনুমান সাজা ও হনুমান বলে সম্বোধিত হবার আশঙ্কা প্রভৃতি ব্যাপার হাস্যোদ্দীপক। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত'-এ অঙ্কিত যাত্রার দলের চিত্রের সঙ্গে নীলকমল-এর যাত্রার দলের অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

গদাধর এই উপন্যাসে হাস্যরস সৃষ্টির ফাঁকে একটি স্থূল চরিত্ররূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ব্যক্তিত্বহীন কাপুরুষ রূপেও চরিত্রটি উল্লেখ করার মত। একটি বিশ্বাসঘাতক ভণ্ড পুরোহিতের চরিত্ররূপে শশাঙ্ক স্মৃতিগিরি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তারকনাথ কর্মব্যপদেশে রংপুর থাকার কালে এই পণ্ডিতের বৃত্তান্ত শুনে চরিত্রটিকে গ্রন্থে স্থান দেন।

গ্রন্থের নায়িকা স্বর্ণলতার সঙ্গে উপন্যাসটির সম্পর্ক ক্ষীণ। প্রেমিকারূপে এই চরিত্রটির পরিকল্পনা একান্তই কাল্পনিক। তৎকালে বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনের পটভূমিতে এই চরিত্রটি তাই একেবারেই বেমানান। কারণ স্বাধীন প্রেমের বিকাশ তখনও সমাজে ঘটেনি। স্বর্ণলতার আদর্শবাদ চরিত্রটিকে স্বাভাবিক স্তরে উন্নীত করতে পারেনি।

চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ঘটনা সংযোজনের ক্ষেত্রেও

তারকনাথের বাস্তববাদী মন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে তুলে ধরেছে। কলকাতা যাবার পথে বিধুভূষণ ও নীলকমলের এক মুদির দোকানে রাত্রিবাস করার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন,[৬] তার উৎস তারকনাথের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ভূমিতে। একথা তাঁর ডায়েরী থেকে জানা যায়।[৭] বন্ধু ইন্দ্রনাথের নির্দেশে তারকনাথ অভিজ্ঞতাটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।

দশম পরিচ্ছেদে, মুদিবাড়ীতে মুদিনীর সঙ্গে কলেজে পাঠরত দুটি ব্রাহ্ম যুবকের আচরণের প্রতি লেখক কটাক্ষপাত করেছেন। ব্রাহ্মদের সম্পর্কে লেখকের ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই পরিচ্ছেদে।[৮]

বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং মানবজীবনের প্রতি সহানুভূতিই লেখকের 'স্বর্ণলতা' রচনার মূল প্রেরণা। বাংলা সাহিত্যে প্রথম পারিবারিক জীবনাশ্রিত উপন্যাসরূপে শিল্পের ক্ষেত্রে স্বর্ণলতা বিশিষ্ট। তারকনাথের জীবদ্দশায় স্বর্ণলতার সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। স্বর্ণলতার জনপ্রিয়তার এটি অন্যতম প্রমাণ। স্বর্ণলতার কয়েকটি ইংরাজী অনুবাদও হয়।[৯]

স্বর্ণলতার নাট্যরূপ এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। রসরাজ অমৃতলাল বসু স্বর্ণলতার প্রথমাংশের নাট্যরূপ দিয়েছেন 'সরলা' নামে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর নাট্যরূপদাতার পরিচালনায় স্টার থিয়েটারে সরলার প্রথম অভিনয়

৬. দশম পরিচ্ছেদ 'প্রবাসে প্রথম রাত্রি'।

অম্বিকা চরণ গুপ্তের 'বঙ্গের গুপ্তকথা' (১৮৮৫)-য় এই ধরনের একটি মুদির দোকানের উল্লেখ আছে।

৭. Started from Tetalyah (Rajshahi) in the morning. Break-fasted at Bhagwanpore and passed the night in a Mudi-Khana; Moody altogether a goodman, but Moodini a troublesome woman' (27th Feb. 1873)

৮. ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেঁদে কেঁদে চক্ষের জল দ্বারা সে অগ্নিটুকু সত্বরই নির্বাণ করিয়া ফেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার কিঞ্চিৎ পূর্বে এই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে; আড়াই বৎসর মিটমিট করিয়া জ্বলিয়া পরে চক্ষের জলে নিবিয়া যায়। (দশম পরিচ্ছেদ)

৯. ১৮৮৩—৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস জে. বি. নাইট *Journal of the National Indian Association* পত্রিকায় স্বর্ণলতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণলতার দক্ষিণারঞ্জন রায় কৃত ইংরাজী অনুবাদ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এডওয়ার্ড টমসন কৃত 'দি ব্রাদার্স' নামে স্বর্ণলতার ইংরাজী অনুবাদ।

হয়। প্রায় একবছর ধরে স্টার থিয়েটারে সরলার অভিনয় প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিত্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর জে. ডি. এণ্ডারসন, স্বর্ণলতাকে ইংরাজী সিভিলিয়ানদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেছিলেন।[১০] ইনি তারকনাথকে বাংলা সাহিত্যের গোল্ডস্মিত বলে অভিহিত করেছেন।

তারকনাথের জনপ্রিয়তা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগীদের কাছে নিরানন্দের কারণ ঘটিয়েছিল। বঙ্কিম অনুরাগী অক্ষয়চন্দ্র সরকার গ্রন্থটির সমালোচনায় প্রশংসা যেমন করেছেন, তেমনি অনুকরণের উপস্থিতিকে লক্ষ্য করেছেন।[১১] স্বর্ণলতার প্রথম তিনটি সংস্করণে লেখকের নাম ছিল না। তারকনাথের 'প্রণয়গর্বিত বন্ধু' ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে লেখককে একটি পত্রে তাঁর পত্রটি স্বর্ণলতার বিজ্ঞাপনরূপে ব্যবহার করতে অনুরোধ করায় চতুর্থ সংস্করণে (১২৯০) লেখক ইন্দ্রনাথের পত্রটি প্রকাশ করেন।

স্বর্ণলতার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'দি ক্যালকাটা রিভিউ'[১২] পত্রিকায় গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষায় লিখিত একমাত্র উপন্যাস বলে অভিহিত করে সমালোচক বলেছেন—"This is perhaps the only novel (as distinguished from romance or political tale) yet written in Bengali. The incidents of everyday Bengali life constitutes its subject and are described with remarkable accuracy. The phases of Bengali life touched upon various and the whole forms a panorama of great and moral and artistic interest."

তারকনাথের স্বর্ণলতা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু বলেছেন,[১৩] 'তাঁহার (তারকনাথ) রচিত উপন্যাসের একটি প্রধান গুণ এই যে, তাহার কোন স্থানে জাতীয় ভাবের ব্যয় হয় নাই অর্থাৎ যে বিদেশীয় ব্যক্তিগণ আমাদের

১০. It was I who induced the Civil Service Commissioners to make it a text book for the probationers going to Bengal···(*Preface to Swarnalata*, translated by D. Roy)

১১. সাধারণী ৩০শে কার্তিক ১২৮১।

১২. NO CXLIX, ১৮৮২, পৃঃ ২৬—২৭।

১৩. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ১৯৩৫, পৃঃ ৫৪।

হিন্দুজাতির রীতিনীতি অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা তাঁহার পুস্তক পাঠ না করিয়া তাহা ঠিক অবগত হইতে পারিবেন না।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থটি ইংরাজী 'নবেল'-এর অনুরূপ 'বাংলায় সর্বপ্রথম নবেল' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে 'বাঙ্গালি সমাজের এরূপ সুন্দর চিত্র অতি বিরল'।[১৪] এইচ. এ. ডি. ফিলিপস স্বর্ণলতা আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করার কারণ নির্ণয় করেছেন। স্যার হেনরী কটনকে গদাধর চক্রবর্তীর চরিত্রের স্বাভাবিকতা বিস্মিত করেছে। অধ্যক্ষ চার্লস এইচ. টনি শ্যামাদাসীর চরিত্রকে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বলে অভিহিত করেছেন এবং স্বর্ণলতায় পরিবেশিত মার্জিত হাস্যরসের এবং উচ্চতম সাহিত্য কর্ম হিসাবে জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন।[১৫]

স্বর্ণলতা বঙ্কিমযুগে একটি স্বতন্ত্রশ্রেণীর শিল্পকর্মরূপে গণ্য হলেও এই গ্রন্থ রচনাকালে তারকনাথ সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি। গ্রন্থটির গঠনরীতি বঙ্কিম-অনুসৃত। যেমন, প্রতিটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম, গ্রন্থমধ্যে পাঠককে আহ্বান ইত্যাদি। ভাষা এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে ও লেখক বঙ্কিমপন্থা অনুসরণ করেছেন।

দিগম্বরী ঠাকরুণের রূপগুণের বর্ণনারীতিও অনায়াসেই বঙ্কিমকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর বর্ণটি জবাফুলের মত নয়, গোলাপ ফুলের মত নয়, বেলফুলের মত নয়, মল্লিকা ফুলের মত নয়, আয়েসার মত নয়, আশমানির মত নয়, প্রদীপের আলোকের মত নয়, মোমবাতির মত নয়। এসমস্ত মিশ্রিত করিলে যেমন হয়, তাহার মতও নয়। কেমন পাঠকবর্গ বুঝেছেন ত এখন ঠাকরুণ দিদির বর্ণটি কেমন।' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

তারকনাথের পরবর্তী উপন্যাস 'হরিষে বিষাদ'[১৬]-এর বিষয়বস্তুর ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। লেখক উপন্যাসটিকে 'নায়ক-নায়িকা-শূন্য' বলে অভিহিত করেছেন। উপন্যাসটির অধিকাংশ ঘটনাই সত্য বলে লেখক জানিয়েছেন (পরিশিষ্ট)। তবে, 'এক জনের বিষয় আর একজনের নামে আরোপিত হইয়াছে। অর্থাৎ ভেড়ার মুণ্ড ঘোড়ায় দেওয়া হইয়াছে।' সাহেবিয়ানার ভক্ত ডেপুটি

১৪. বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮৭ ('বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রবন্ধ)।

১৫. অমৃত, ২৫ মাঘ ১৩৬৯।

১৬. হরিষে বিষাদ অথবা নায়ক-নায়িকা-শূন্য উপন্যাস, ১৮৮৭ পৃঃ ৩৩৮।

লালবিহারীই উপন্যাসটির মূল চরিত্র। স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিজের পুত্রের বিবাহান্তে লালবিহারী কলকাতায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। স্ত্রী বিধুমুখী। লালবিহারী সাহেব। গড়ের মাঠে বাজি দেখতে গিয়ে সাহেবদের জন্য সংরক্ষিত জায়গায় যাবার ফলে অপদস্থ হলে শ্বশুরবাড়ি শ্যালকের ঠাট্টার সম্মুখীন হয়। বিধবা মনোরমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। কৌশলে বাড়িতে এনে তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। ঘটনাচক্রে ট্রেন দুর্ঘটনায় লালবিহারীর মৃত্যু হয়। নলিনের দিদি মনোরমাও আত্মহত্যা করে। কাহিনীর সূত্রে আরও অনেক চরিত্র ও ঘটনা সংযোজিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

উপন্যাসটির প্লট বিশৃঙ্খল। গঠন-সংহতির অভাব গল্পের মূলধারাকে স্থূল করে তুলেছে। লেখকের রক্ষণশীল মনোভাব উপন্যাসটিতে অভিব্যক্ত। মনোরমার চরিত্র লেখকের সহানুভূতিপুষ্ট। চরিত্রচিত্রণে ও ঘটনা যোজনায় বাস্তববোধের পরিচয় থাকলেও এই উপন্যাসে তারকনাথ যেন নিঃশেষিত অভিজ্ঞতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

তারকনাথের পরবর্তী উপন্যাস 'অদৃষ্ট'।[১৭] 'পাক্ষিক অনুসন্ধান'-এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হবার আগেই তারকনাথের মৃত্যু হয়। অনুসন্ধান-এর সম্পাদক লেখেন—'হঠাৎ তাঁহার মৃত্যুসংবাদে আমরা ভাবিয়াছিলাম অদৃষ্টও বুঝিবা অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। কিন্তু এখন তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অদৃষ্টের শেষাংশ প্রাপ্ত হইয়া বড়ই আশ্বস্ত হইলাম।' (৩০শে কার্তিক ১২৯৮)।

অদৃষ্ট একটি সুখপাঠ্য পারিবারিক উপন্যাস। অর্থ ও ভূয়া বিদ্যার কৌলীন্য ও অভিমান মানুষকে যে কতখানি হৃদয়হীন ও মনুষ্যত্ববোধহীন করে তোলে অদৃষ্ট তারই পরিচয় বহন করে। মানুষ কর্মক্ষেত্রে যে জাতীয় পেশাই গ্রহণ করুক না কেন, তার মানবিক চেতনার মধ্যেই যে তার মনুষ্যত্বের পরিচয় নিহিত, লেখক এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উপন্যাসটির মধ্যে। উত্তম পুরুষে লেখা উপন্যাসটির ঘটনা সন্নিবেশে লেখক সচেতন মনের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটির কাহিনী পরের পৃষ্ঠায় বলা হল।

১৭. অদৃষ্ট (সামাজিক উপন্যাস) ১২৯৯ সাল (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯২) পৃঃ ৩১৫। কিয়দংশ প্রথমে 'মালঞ্চ'-এ প্রকাশিত হয়। পরে সমগ্র অংশ পাক্ষিক 'অনুসন্ধান'-এ (১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮—১৫ই আষাঢ় ১২৯৯) মুদ্রিত হয়। চতুর্থ সং ১৯১২।

বাবার মৃত্যুর পর মা ও কুলীনপত্নীবোনকে বাড়ি রেখে 'জমাজমি' বিক্রি করে ঋণ শোধ করে, যদু ভাগ্যান্বেষণে বের হল। এনট্রান্স-পাস যদু কলকাতার কাছে এক ডাক্তারের কাছে ১০৲ টাকা বেতনে চাকুরি নিল। ডাক্তারের বিধবা কন্যা অসুস্থা সুলোচনা (১৮।১৯)-র সেবা করে, সে টাইফয়েডে পড়লে, তার স্থান হলো আস্তাবলে। অসুখ কমলে যদু সুলোচনার অনুরোধ উপেক্ষা করে উকিল দাদার বাসায় এসে উঠল।

বৌদিদির বিসদৃশ আচরণে যদু অশান্তি ভোগ করত। অবশেষে সে ৭৲ টাকা বেতনে দ্বিতীয় কম্পাউণ্ডারের একটি কাজ পেলে, বাসা করল। গরীব রোগী পরীক্ষা করে কিছু আয় বাড়লে দুবছর পরে, দুমাসের ছুটি নিয়ে সে বাড়ি গেল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম শিবপুরেব কন্যাদায়গ্রস্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্যের বড মেয়ে মহামায়ার সঙ্গে যদুর বিয়ে হল। দুবছর পরে পঞ্চাননের ছোট মেয়ে জয়দুর্গার সঙ্গে এক বি. এ., বি. এল. ছেলের বিয়ে হলে শ্বশুর-বাড়িতে কম্পাউণ্ডার জামাই যদু অপদস্থ হতে থাকল। বি. এ., বি. এল. জামাই শ্বশুরের ধ্যানজ্ঞান হল।

যদু কর্মস্থলে এসে মফঃস্বলে ডাক্তাররূপে ছমাসের মধ্যে ২০০০৲ টাকা আয় করে তা থেকে মহামায়ার জন্যে ১৫০০৲ টাকার গহনা গড়িয়ে মায়ের হাতে দিল। জয়দুর্গা ঈর্ষাপরবশ হয়ে একবার মহামায়ার রান্নায় নুন লঙ্কা মিশিয়ে এবং আর একবার তাকে মাছ চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে অপদস্থ করল। দ্বিতীয় কম্পাউণ্ডারের পদটি 'এবলিস' হলে যদুর চাকুরি গেল। জামাতা জয়গোপালের দয়ায় পঞ্চানন গ্রামের নায়েবি পেয়ে অবস্থা ফিরিয়েছেন। জয়গোপালের পিতা, জয়গোপাল নামে শিবচন্দ্রের মৃত পুত্রের সার্টিফিকেটগুলি এনে পুত্রের পরিচয় দিতেন বি. এ., বি. এল. রূপে।

মহামায়া মারা গেল। কিছুকাল পরে যদুর মাও মারা গেল। পুত্র হরিপদকে নিয়ে সে মুসকিলে পড়ল। ইতিমধ্যে শ্বশুরবাড়ি থেকে জয়গোপালকে পুলিস ধরে নিয়ে গেল। যদু মোকর্দমার তদ্বির করে সুলোচনার কাছে চলে গেলে সুলোচনা যদু ও তার ছেলে হরিপদকে সাদরে গ্রহণ করল। ডাক্তারবাবু সুলোচনার সঙ্গে যদুর ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিয়ে কাশী যাত্রা করলেন। জেলখানার কয়েদী-মজুর দিয়ে কাজ করানর কালে যদু একদিন মজুরদের মধ্যে তার শ্বশুরকে আবিষ্কার করল। জয়গোপালের তিন

বছর ও ভট্টাচার্য মশায়ের একবছর সশ্রম মেয়াদ হয়েছে। জয়গোপাল রক্ত-আমাশা রোগে মারা গেল। হরিপদ ও সুলোচনাকে নিয়ে যদু নতুন বাড়িতে বসবাস শুরু করল।

অদৃষ্টের ঘটনাবলী ও চরিত্র কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বর্ণলতার তুলনায় সুগ্রথিত। স্বর্ণলতার অভিজ্ঞতাই যেন অদৃষ্টে প্রতিফলিত। যদুই কাহিনীর নায়ক। তার জীবনের অদৃষ্ট-নির্ভর উত্থানপতনের কাহিনীই উপন্যাসটিতে বিবৃত। উত্তম পুরুষে লেখা যদুর জীবনকাহিনী অনেকটা আত্মজীবনীমূলক।[১৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা (১৮৭৩,—পঞ্চম সং ১৮৯৩)-য় এই রীতির সূত্রপাত।

জয়দুর্গা মহামায়ার সহোদরা হওয়া সত্ত্বেও বিবাহোত্তর জীবনে জয়-দুর্গার অর্থগর্ব ও দিদির প্রতি অহেতুক ঈর্ষাবোধ তাকে নিম্নরুচির স্তরে প্রেরণ করেছে। জয়দুর্গা ও মহামায়াকে নিয়ে কাহিনী দানা বেঁধে উঠলেও গ্রন্থের আদি ও অন্তে সুলোচনার প্রসঙ্গও স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত। উকিল ও কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনে যেমন কোনও সংশ্রব থাকার কারণ সংকীর্ণ, তেমনি পারিবারিক জীবনে ও উভয়ের মধ্যে বৈষম্যের কারণ দেখিয়ে তারকনাথ মানুষের ভেদবুদ্ধির স্বরূপটি কৌশলে উপস্থাপিত করেছেন।

মহামায়ার চরিত্রে আদর্শ স্ত্রীর গুণ বর্তমান। সে স্বর্ণলতার সরলার অনুরূপ, স্বামী ও সংসারের প্রতি তার কর্তব্য ও আনুগত্যের বর্ণে উজ্জ্বল। চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের দিনে নিরভিমানিনী মহামায়া, বারবার সরলার কথা মনে করিয়ে দেয়। একটি শিশুপুত্র রেখে তার মৃত্যু ও সরলার মত বেদনা-দায়ক। তবে, মহামায়া সরলাকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। মহামায়া তারকনাথের অভিজ্ঞতার দীন রূপায়ণ। যদুর চরিত্রে বিধুভূষণের প্রভাব স্পষ্ট। তবে সুলোচনার সঙ্গে বিধুভূষণের সম্পর্ক রচনা করে লেখক চরিত্রটিতে বৈচিত্র্য এনেছেন। সুলোচনা ও যদুর প্রেম সংযমের বারিসেকে স্নিগ্ধ ও পবিত্র। জয়দুর্গার সঙ্গে প্রমদার সাদৃশ্য কষ্টকল্পিত নয়। তার স্বামীপ্রেম অপেক্ষা অলঙ্কার-প্রীতি প্রমদার অনুরূপ। স্বামীর বিপদের কালে গহনাপ্রেমী

১৮. স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে' (১৮৯৮)-র রচনারীতি এই জাতীয়। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'আমাদের ঝি' (১৩০২) উপন্যাসটিও এই রীতিতে রচিত। এর পূর্বে 'আমার জীবনের ইতিহাস' নামে উত্তম পুরুষে লিখিত একটি উপন্যাস 'আর্যদর্শন' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭)-এ প্রকাশিত হয়।

জয়দুর্গার গহনা-চুরির প্রসঙ্গ, প্রমদার নৌকা-দুর্ঘটনাহেতু গহনা-হারানর ঘটনার মত তাৎপর্যপূর্ণ। যদুর দাদার চরিত্রে শশিভূষণের প্রভাব প্রতিফলিত। পঞ্চানন ভট্টাচার্য, স্বার্থপর পিতারূপে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। যদুর প্রতি ডাক্তারের দুর্ব্যবহার ও পরবর্তীকালে জামাতারূপে বরণ স্বার্থবোধজাত আচরণ।

অদৃষ্ট স্বর্ণলতায় পরিবেশিত অভিজ্ঞতার অবশিষ্ট শিল্পরূপ। এই সঙ্গে তারকনাথের অভিজ্ঞতার নতুন সঞ্চয়ও যুক্ত হয়েছে। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেনি। স্বর্ণলতার মত কাহিনী শিথিলবিন্যস্ত নয়। অদৃষ্টের ঘটনাধারা স্বর্ণলতার মত অজস্রমুখীও নয়। কাহিনী-গ্রন্থনের শিথিলতা এটি অন্যতম কারণ। এই গ্রন্থে তারকনাথ স্বর্ণলতার চেয়ে আরও একধাপ এগিয়ে এসেছেন। ব্রাহ্মমতে বিধবাবিবাহ (সুলোচনা-যদু) এই উপন্যাসের অন্যতম লক্ষণীয় ঘটনা। ঘটনা সংস্থাপন ও সংঘটনের ক্ষেত্রে এবং কাহিনীর বিন্যাসে, তারকনাথ অদৃষ্টে শিল্পপ্রতিভার পরিচয় রেখেছেন।

তারকনাথের সর্বশেষ উপন্যাস 'বিধিলিপি'[১৯] শেষ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাস-লেখক হিসাবে তারকনাথের স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে একথা উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তারকনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল। দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনার সূত্র ধরেই তারকনাথের আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতি তাঁর বিরক্তিভাব স্পষ্ট। 'কেহ যদি বঙ্কিমের নিন্দা ও স্বর্ণলতা'র সুখ্যাতি করিল ত মহাখুসী। তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পোলাও-কালিয়ার বন্দোবস্ত করিতেন।'[২০] বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব এত স্পষ্ট না হলেও তারকনাথ সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে অনুকূল ছিল না, তার প্রমাণ বঙ্কিমের জীবদ্দশায় স্বর্ণলতার সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, বঙ্গদর্শন বা অন্য কোথাও স্বর্ণলতা সম্পর্কে তাঁর নীরবতা। স্বর্ণলতার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনায় তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

বিষয়-বৈচিত্র্য থাকলেও তারকনাথের রচনারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবকে

১৯. বিধিলিপি 'সখা' পত্রিকায় (মার্চ ১৮৯১—সেপ্টেম্বর ১৮৯১) উপন্যাসটির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

২০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'দাসী', ১০ই আগষ্ট, ১৮৯৬, পৃঃ ৪৩৮।

অস্বীকার করার নয়। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের ঊর্ধ্বে তারকনাথের স্বাতন্ত্র্য, ঐতিহাসিক স্বীকৃতিলাভে সক্ষম হয়েছে। বঙ্কিমযুগে আবির্ভূত হয়েও তারকনাথের এই স্বতন্ত্রসাধনা, উপন্যাস-শিল্পের ক্ষেত্রে যে বাস্তব-চেতনার প্রবর্তন করেছিল, তা ব্যর্থ হয়নি। গভীর পর্যবেক্ষণবোধ ও মানবজীবনের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি তারকনাথের রচনার প্রধান প্রেরণা। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিমণ্ডলের বাইরে থেকেও তারকনাথ বঙ্কিম-সমকালে যে জনপ্রিয়তাব তুঙ্গে উঠতে পেরেছিলেন, ঔপন্যাসিক হিসাবে সেটাই কেবল-মাত্র তাঁর কৃতিত্ব নয়। তিনি বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনকে বাস্তবজীবনের পটভূমি থেকে উদ্ধার করে বাস্তববাদিতার প্রতি আনুগত্যের স্বাক্ষর রেখে যে নতুন পথ প্রদর্শন করেছেন, সেখানেই শিল্পী হিসাবে তাঁর অভিনবত্ব ও কৃতিত্ব। এই সূত্র ধরে বঙ্কিম-সমকালে কোন কোন শিল্পীর বাস্তববাদ-নির্ভর এই জাতীয় কাহিনী-রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তারকনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এক অদৃশ্য যোগসূত্রও দুর্লক্ষ্য নয়। তারকনাথ শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের নান্দী গেয়েছেন।[২১]

২১. অন্যান্য রচনা: ললিত সৌদামিনী, ১৮৮২, কৌলীন্য-প্রথা ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত বড় গল্প; তিনটি গল্প, ১৮৮৯ (ললিত সৌদামিনী, সুখ ও দুঃখ, নিধিরাম)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫—১৯০৬)

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতারূপে চণ্ডীচরণ সেনের নাম আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্তপ্রায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনায় তিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছেন। ইতিহাসের প্রতি তথ্যনিষ্ঠাই তাঁর উপন্যাসে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। চণ্ডীচরণ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পেশায় তিনি মুনসেফ ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী এবং সত্যনিষ্ঠ। চণ্ডীচরণের তীব্র স্বাজাত্যবোধই উপন্যাসরচনার প্রেরণা। চণ্ডীচরণের প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি বিদ্রূপাত্মক কাব্য, 'লঙ্কাকাণ্ডং'। এরপরে টমকাকার কুটীর (১২৯১—১৮৮৫) অনুবাদ করে তিনি উপন্যাস-রচনায় শিক্ষানবিসি করেন। তাঁর রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল 'ইতিহাস চর্চার সঙ্গে ধর্ম ও নীতি প্রচার'।[১] উপন্যাসগুলির পরিশিষ্টে তিনি বিস্তৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করেছেন।

চণ্ডীচরণ সেন যখন ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনায় হাত দেন, তার পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে গেছে। চণ্ডীচরণ সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণায় উপন্যাস রচনা করেন নি। ভারতীয় ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক যুগকে উপন্যাসের আবরণে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ইংরেজ সরকারের আচরণের তীব্র নিন্দা করে, তাদের স্বার্থবোধ ও শোষণবাদের মুখোশ মুক্ত করে লেখক শাসকদের সচেতন করে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'মহারাজ নন্দকুমারাদি'—লিখে তিনি সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হয়েছিলেন।

মোগল রাজত্বের দুর্বলতার কালে কূট ও কুশলী ইংরাজ বণিক সমগ্র পূর্ব ও উত্তর ভারতে শোষণজাল বিস্তার করে, জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারাকে যেভাবে বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিয়েছিল, তারই কাহিনী বিবৃত হয়েছে চণ্ডীচরণের উপন্যাসগুলিতে। ইংরাজের অত্যাচার দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদকে অস্থির করে তুলেছিল। শোষণ ও অত্যাচারের

১. কামিনী রায়, শ্রাদ্ধিকী।

বেদনায় পিষ্ট মানুষ পাথরে নিষ্ফল মাথাকুটে ব্যর্থতার অশেষ যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছে।

চণ্ডীচরণের উপন্যাসগুলিতে অত্যাচারিত মানুষের সেই যন্ত্রণাকাতর রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। মোগল শাসনের কালে এবং ব্রিটিশ অত্যাচারের ফলে ভারতীয় সমাজজীবন, ধর্মের বাহ্যিক কঠোরতার আচরণে অন্তরে সংশয়সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার পরিচয়ও উপন্যাসগুলির মধ্যে বর্তমান। চণ্ডীচরণের উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রগুলি প্রায় সবই ঐতিহাসিক। তথ্যের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য উপন্যাসগুলিকে যথার্থ শিল্প-পদবাচ্য করে তুলতে পারেনি। চণ্ডীচরণ সে সম্পর্কে সচেতনও ছিলেন না। কারণ যুগসন্ধির ইতিহাসকে উপন্যাসাকারে প্রকাশ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই উপন্যাসরচনায় চণ্ডীচরণ প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করে এবং ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে অবিকৃত রেখে গল্পরচনা করতে চেয়েছেন। ফলে ঘটনা-সংস্থানের ত্রুটি অনিবার্যভাবে উপন্যাসে গঠন-শৈথিল্য এনেছে।

'মহারাজা নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা'[২] ও 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ'[৩] এই দুটি উপন্যাসের একই ঐতিহাসিক পটভূমি। আঠারশ শতকের শেষপাদে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসিত ক্ষয়িষ্ণু বঙ্গই উপন্যাসদ্বয়ের দেশকাল। পলাশী-যুদ্ধের পরবর্তী বিশবছর কাল নবাবের শাসন-অধিকার থাকলেও নবাব ক্ষমতাহীন ছিলেন। কোম্পানির দৃষ্টি ছিল শোষণের দিকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে এইকালের বিক্ষুব্ধ ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে। এই যুগ সম্বন্ধে মেকলের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

'...against misgovernment such as then afflicted Bengal it was impossible to struggle. The superior intelligence and energy, of the dominant class made their power irreristible.'

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপয়িতা ওয়ারেন হেস্টিংস। চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি যে চরম জঘন্যতার পরিচয় রেখেছেন তা ইতিহাসস্বীকৃত।

২. মহারাজা নন্দকুমার, ১৮৮৫, পৃঃ ৩৯২।

৩. দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১২৯২ (১৮৮৬), পৃঃ ১০৮ (অবতরণিকা ও উপসংহার সহ ১৮৮ পৃষ্ঠা) দ্বিসং ১২৯৭, পৃঃ ১৮৫।

এইসব ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থসংগ্রহ করা। কোম্পানির কর্মচারীদের অনুগৃহীত দেশীয় কিছু লোক তাদের সহায়তায় বঙ্গদেশে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল। কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ অপেক্ষা লোভী ও প্রতিপত্তিশালী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত স্বার্থই তখন প্রকট হয়ে উঠেছিল। তারই বশে তারা নির্বিচারে শোষণ করে চলেছিল প্রকৃতিপুঞ্জের উপর। দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম ইংরাজদের ভয়ে ভীত ছিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি সম্রাটের কাছ থেকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করল। এর অব্যবহিত পর অনুগৃহীত দেশীয় অনুচরবর্গের সহায়তায় এরা অত্যাচারে দেশে বিভীষিকার সৃষ্টি করল। এই অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে মহারাজা নন্দকুমার ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা উপন্যাসটি ঐতিহাসিক তথ্যভারাক্রান্ত। লেখক জেমস মিল আবিষ্কৃত 'কর্তন ও ঘর্ষণ প্রণালী অবলম্বনপূর্বক' নন্দকুমারের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন (পৃঃ ২০০)। ভূমিকায় গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন 'সিরাজ-উদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক এবং বঙ্গের কৃষকদিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

'বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠ করিতে জনসাধারণের রুচি হয়, এই নিমিত্তই উপন্যাসের আকারে এই পুস্তক লিখিত হইল।'

নির্যাতিত জনগণের প্রতি লেখকের অনুকম্পা ও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ইতিহাসপাঠে জনগণকে আগ্রহী করে তোলা, এই উভয় উদ্দেশ্যসাধনেই লেখক সাফল্য লাভ করেছেন।

আকৃতিতে উপন্যাস হলেও প্রকৃতিতে শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। এই পর্বের ইতিহাসবর্ণনায় লেখকের একটি সহানুভূতিশীল মন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নবাবী রাজত্ব অবসানের কালে একটি সঙ্কটপূর্ণ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলাদেশের তাঁতি, সোনার বেনে ও কৃষকদের উপর অত্যাচারের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে এই গ্রন্থে। ইংরাজদের দুর্দমনীয় লোভ, ব্যবসাযক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিনাশের প্রচেষ্টা উৎকট হয়ে

উঠেছিল। লবণের ব্যবসায়কে হস্তগত করে একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত করার নির্লজ্জ অপচেষ্টার চমকপ্রদ কাহিনীও এই উপন্যাসে পাই। এইসব অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিবিধানকল্পে অগ্রণী মহারাজা নন্দকুমারের অন্যায় বিচারে ফাঁসি হয়।

কুটীর সাহেবদের আদেশানুসারে বাঙ্গালী গোমস্তারাই সাহেবদের সর্বাধিক সহায়তা করেছে। লেখক শতবর্ষ পূর্বে লোভী বাঙ্গালীদের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন '......শতবর্ষ পূর্বে যে সকল অর্থগৃধ্নু কঠিন হৃদয় ও স্বার্থ-পরায়ণ ইংরাজদিগের অর্থলোভ পরিতৃপ্ত্যর্থ বঙ্গের সহস্র সহস্র নিরপরাধিনী রমণী সাবিত্রীর ন্যায় দুরবস্থাপন্না হইয়াছিল, যাহাদের অর্থগৃধ্নুতানিবন্ধন সহস্র সহস্র অসহায় নির্দোষী বালকবালিকাদিগকে জগদম্বা ও অহল্যার ন্যায় বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইতে হইয়াছিল, পরম ন্যায়বান মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ন্যায়বিচারে তাহারা কি ধুন্দপন্থ নানা[৪] অপেক্ষা সমধিক অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই?......শতবৎসর পূর্বে যে সকল বঙ্গকুলাঙ্গার কাপুরুষতানিবন্ধন সহানুভূতি-পরিশূন্য হইয়া দূরস্থিত দর্শকের ন্যায় এই সকল অত্যাচার অম্লানবদনে দর্শন করিতে লাগিল ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে তাহাদিগকেও নিশ্চয়ই নীরয়গামী হইতে হইয়াছে' (পৃঃ ১৯৭—৯৮)।

এই শাসনহীন যুগে বাঙ্গালী-চরিত্রের অধঃপতনও অতি সহজে ঘটেছে। বীর্যহীন বাঙ্গালী ধর্মের ভণ্ডামিতে আত্মশক্তি ক্ষয় করে মানুষকে বঞ্চিত ও নারীর সতীত্ব অপহরণ করতে চেয়েছে। নিয়মশৃঙ্খলাহীন যথেচ্ছাচারের কালে, বাঙ্গালীর নৈতিক অধঃপতন যেমন ঘটেছে, তেমনি বিড়ম্বিত জীবনের অভিশাপ বহন করে, দাসত্বের চরমস্তরে আত্মসমর্পণ করে, বাঙ্গালী আত্মবিলুপ্তির পথ বেছে নিয়েছে। অর্থের বিনিময়ে জাতিভেদ-প্রথার সুযোগ নিয়ে, কৌলীন্য অর্জন করেছেন কেউ কেউ। ছিদাম বিশ্বাস ও জগন্নাথের জাতে ওঠার জন্য অর্থব্যয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখক ভেকধার্মিক বৈষ্ণবদের মুখোশও খুলে দিয়েছেন। বৈষ্ণবের সম্পর্কে লেখকের ব্যক্ত মনোভাব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত।[৫] এদের অর্থ ও নারীলোলুপতার কদর্য দিকটি লেখক বিস্তৃত আকারে তুলে ধরেছেন।

৪. সিপাহী-বিদ্রোহের অত্যাচারী নায়ক।

৫. কামিনী রায়, শ্রাদ্ধিকী।

বৈধব্য-জীবনের করুণতম চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। অত্যাচার-অধ্যুষিত শৃঙ্খলাহীন সমাজে ধর্মের বাহ্যিক আচরণের সঙ্কীর্ণতা কিভাবে মানুষের মনে সন্দেহ সংশয় জাগায় এবং সন্দেহাতুর পিতার ইচ্ছানুসারে ব্রতচারিণী বিধবা কন্যার মৃত্যু ঘটায় তার মর্মস্পর্শী চিত্র পাই এই উপন্যাসে। বিধবা সুদক্ষিণা এই সন্দেহের পিতৃপ্রদত্ত বলি।

নন্দকুমারের সঙ্গে গ্রন্থের নামসংযুক্ত হলেও শতাধিক পৃষ্ঠার মধ্যে নন্দকুমারের কার্যকলাপ বড় পরিলক্ষিত হয় না। সমগ্র বইটির মধ্যে নন্দকুমারের প্রসঙ্গ খুব অল্প। বাপুদেব শাস্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী বারো বছর পরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। হলধর তাঁতির নিরাশ্রয় বালকের প্রতিপালন সম্পর্কে কথা হবার কালে বাপুদেব বলেছিলেন, 'নন্দকুমার তোমার ফাঁসির কাষ্ঠ প্রস্তুত হইল'। অন্যায়পূর্বক ইম্পিকর্তৃক নরহত্যা, মেকলের নিন্দাবাণী অর্জন করেছিল। বার্ক তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন ফাঁসির। বাপুদেব বলেছিলেন, 'বাঙ্গালী যখন বাঙ্গলার ইতিহাস লিখবে তখন লোকে জানবে নন্দকুমার বিনাবিচারে দণ্ডিত হয়েছিলেন'।

এই উপন্যাসের প্রধান ঘটনা হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের কলহ এবং পরিণামে নন্দকুমারের ফাঁসি। ধনী তন্তুবায় সভারাম বসাকের কাহিনী মূল-কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। এক দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক আবর্তে সভারাম বসাকের শান্তিপূর্ণ পরিবার কিভাবে ধ্বংসের পথযাত্রী হল, সেই কাহিনী নন্দকুমারের কাহিনীর সঙ্গে গ্রথিত হয়ে প্রাধান্য পেয়েছে এই উপন্যাসে। এই কাহিনীর সূত্রে অজস্র ক্ষুদ্র কাহিনীর জাল বিস্তৃত হয়েছে। অত্যাচারিত সভারামের কন্যা সাবিত্রীকে লুণ্ঠন করবার চেষ্টা হলে, আর্মানিয়ান লবণ-ব্যবসায়ী ক্যারাপিট আরটুনের স্ত্রীর কৃপায় সাবিত্রী রক্ষা পেল। তারপর কলকাতার পথে সে পা বাড়াল ভাইকে উদ্ধার করার জন্যে। যাত্রাপথের বর্ণনার ধারায় কাহিনী গড়িয়ে চলে। ক্যারাপিট আরটুনের পরিবার, ছিদাম বিশ্বাসের পরিবার, মদন দত্তের পরিবার, কৃষ্ণহরির কৌলীন্য, কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর লাঞ্ছনা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রভৃতি ঘটনা পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত হলেও সাবিত্রীর কাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করেছে। নন্দকুমারের ফাঁসির বিষয় বিস্মৃত হলেও এস্থার বিবি, সাবিত্রী, রামা প্রভৃতি চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকদের সহানুভূতি আকর্ষিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। লেখক

অবক্ষয়ী সমাজের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরে শতবর্ষ পূর্বের বঙ্গের সামাজিক তৎকালীন অবস্থার আরও বিস্তৃত রূপ দান করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু বৈষ্ণবদের আখড়াগুলি ছিল ব্যভিচারের কেন্দ্র। সাবিত্রীর দুরবস্থার সুযোগে তাকে সাধন-সঙ্গিনী করার যে জঘন্য চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, তা সে যুগের অস্থির নৈতিকতা প্রকাশ করে। ব্রতচারিণী বিধবা সুদক্ষিণার মৃত্যুর চিত্র মর্মান্তিক। গৃহের অনতিদূরে আম্রকুঞ্জে প্রতিবেশী সুবল মিত্র তার সঙ্গে কথা বললে, পিতা তর্কপঞ্চাননের কাছে এই দৃশ্য সন্দেহের সৃষ্টি করল। ঔষধের সঙ্গে বিষ দিয়ে তিনি কন্যাকে হত্যা করলেন। তারপর দেবী দুর্গার প্রতি চরম অনাস্থা প্রকাশ করে ও কলির ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল গণ্য করে, কন্যার শোকে মায়ের মৃত্যুবরণের দৃশ্যও সমান মর্মভেদী। অবিশ্বাস অনাস্থা ও অস্থিরতার সুরটি যে সে যুগের নাড়িতে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল তার নিদর্শন এইসব ঘটনায় পাওয়া যায়। সুদক্ষিণার মৃত্যুপ্রসঙ্গ উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা-বিবাহ’ নাটক’কে স্মরণ করিয়ে দেয়। উপন্যাসটির শেষে APPENDIX-এ ২৪টি NOTE-এ ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করেছেন লেখক।

মহারাজা নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা উপন্যাসাকারে শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থার ঐতিহাসিক দলিল।

চণ্ডীচরণের দ্বিতীয় উপন্যাস দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ পূর্ব উপন্যাসের পটভূমিতে রচিত পূর্বানুরূপ অত্যাচার-কাহিনী। ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সময়ে পাঁচসনা বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজা ও জমিদারবর্গের উপর, দেওয়ান ও রাজস্ব আদায়কারীদের নির্মম অত্যাচারের বাস্তব-ভিত্তিক কাহিনী এঁকেছেন লেখক এই উপন্যাসে। এই কাজে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের যে প্রশ্রয় ছিল এবং বিশেষ গভর্নর জেনারেল হেষ্টিংসই যে উস্কানিদাতা একথা লেখক জোরালো ভাষায় ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করে প্রমাণ করেছেন। এর অব্যবহিত ফলস্বরূপ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গপুরে প্রজা-বিদ্রোহ ঘটে। এই রঙ্গপুরের বিদ্রোহ অবলম্বন করেই এই উপন্যাসের কাহিনী-গ্রন্থন। ‘ভূমিকা’য় লেখক একথা জানিয়েছেন এবং আরও বলেছেন যে, ‘এই উপন্যাসের উল্লিখিত প্রায় সমুদয় ঘটনাই সত্য’। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও রাজস্ব-আদায়কারী দেবী সিংহের নির্মম অত্যাচারে পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বহুমানুষের অত্যাচার ও অনাহারজনিত মৃত্যু ঘটে। লেখক এই উপন্যাস-

রচনায় ইতিহাসকে নিষ্ঠাপূর্ণ ভাবে অনুসরণ করে যে কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন, সেই কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ চরিত্র শেষ পর্যন্ত অত্যাচারের ফলভাগী হয়ে বঙ্গদেশ ত্যাগ করে পাঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গল্পের নায়ক প্রেমানন্দ, দেবীসিংহের অত্যাচারের চক্রে আপনাকে সমর্পণ করেও শেষ পর্যন্ত মাথা নত করেনি। সেকালে প্রেমানন্দের মত দেশপ্রেমিক যুদ্ধ পরিচালনা না করলেও অত্যাচারিত কৃষককুলের বিদ্রোহের ইতিহাস বহন করে এনেছে। উত্তরবঙ্গে দেশবাসীকে সংগঠিত করে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, প্রেমানন্দের লড়াই-এর মধ্য দিয়ে লেখক দেশপ্রেমের উদ্দীপনা জাগাতে চেয়েছেন। প্রেমানন্দের এই ভূমিকা আনন্দমঠের যোদ্ধাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রঙ্গপুরের প্রজাবিদ্রোহের নায়ক প্রেমানন্দ, আপনার তরুণী স্ত্রী ও বৃদ্ধ পিতাকে ছেড়ে প্রজাবিদ্রোহেব নেতৃত্ব দান করেছে। তাকে অধিকাংশ সময় আটক থাকতে হয়েছে। 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' নামে বইটি চিহ্নিত হলেও দেবীসিংহই উপন্যাসটির অধিকাংশ স্থল অধিকার করে রয়েছে। দেবী-সিংহ ইংরাজ কর্তাদেব ('প্রবিনিয়াল কৌন্সিলের ইংরাজ কর্মচারী') ও দেওয়ানের জন্য সর্বদাই ১০।১২টি স্ত্রীলোক সংগ্রহ করে রাখত। এইসব স্ত্রীলোকদের কুৎসিত ও উত্তেজক নামে (দেলখোস, তপ্তকাঞ্চন, রসের ডালি, টাটকা মধু) অভিহিত করা হত। কুঠির সাহেবরা বিলাতে ও চীনে প্রেরণের জন্য 'গছান প্রথায়' পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করলে বাংলার শতশত ব্যবসায়ী নিরন্ন হয়ে পড়ল। ১৭৭০ সালে বঙ্গদেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ হল। পূর্ণিয়ার অন্তর্গত পরগনায় দেবী সিংহ অত্যাচার শুরু করল। 'কোন কোন জমিদার তালুক-দারকে অপমান করিবার নিমিত্ত তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে বিবস্ত্রাবস্থায় কাছারিতে দাঁড় করিয়া রাখিতে লাগিল'। দিনাজপুরের কালেকটর গুডল্যাণ্ডের দেওয়ানরূপে দেবী সিংহ শোষণ শুরু করলে অনেক কৃষক স্ত্রী-পুত্র নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। দেবীসিংহ নিযুক্ত হরেরাম, সূর্যনারায়ণ ও ভেকধারী সিংহের অত্যাচারে রঙ্গপুরের জমিদার প্রজা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ল। শেষবারের অত্যাচারে প্রজারা বলল—'যায় প্রাণ যাউক অত্যাচারীর রক্ত দ্বারা মৃত বন্ধুবান্ধবদিগের তর্পণ করিতে হইবে।' নেতা প্রেমানন্দ নূরাল মহাম্মদকে নবাবের পদে বরণ করে কোম্পানির প্যাদা ও বরকন্দাজকে গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়।

গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য বিভিন্ন জেলার কালেকটরদের কাছে, হেষ্টিংস উৎকৃষ্ট আহার্য দ্রব্য পাঠাতে নির্দেশ দিলে, শ্রীহট্টের পূর্ব সীমানা থেকে, বিহারের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এবং রঙ্গপুর দিনাজপুরের উত্তর প্রান্ত থেকে, সমুদ্র-তটস্থ ডায়মণ্ডহারবারের দক্ষিণ প্রদেশ পর্যন্ত দেশের হাটে বাজারে, মাতৃ-শ্রাদ্ধের জিনিস বাকিতে সংগ্রহ করা হল। পরম বৈষ্ণব, প্রভূত দেবত্র সম্পত্তির অধিকারী রামানন্দ কিভাবে অত্যাচারে নিঃস্ব হয়ে জঙ্গলে পুত্রবধূ নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল এবং দীর্ঘদিন পুত্রহীন থাকার পর শেষ পর্যন্ত পুত্রবধূর চেষ্টায় মুমূর্ষু রামানন্দের সঙ্গে পুত্রের পুনর্মিলন ঘটল, অত্যাচারের কাহিনীর পাশে এই কাহিনীও সমান কৌতূহলোদ্দীপক। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংসের স্বদেশযাত্রার কালে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অশ্রুবিসর্জন, কর্নওয়ালিসের আমলে দেবীসিংহের অত্যাচারের তদন্ত বিচার ও পদচ্যুতি প্রভৃতি বিষয়ও উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। হেষ্টিংস-দেয় গঙ্গাগোবিন্দের দিনাজপুরের পরগনা বাজেয়াপ্ত হয়। লেখকের অভিমত 'অন্যের অনিষ্ট করিলে এ জগতে কেহ শান্তি লাভ করিতে পারে না'। খুড়তুতো ভাই সচ্চিদানন্দকে লেখা প্রেমানন্দের দীর্ঘ চিঠির পর গ্রন্থের সমাপ্তি।

উপন্যাসটিকে ইতিহাস আবৃত করে রেখেছে। ইতিহাসের তথ্যপঞ্জীকে অনুসরণ করে মূলত হেষ্টিংসের অর্থলোলুপতা, ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং রাজস্ব আদায়কারী দেবী সিংহের অত্যাচারের অমানুষিক রূপটি বাস্তব দৃষ্টির নিরিখে লেখক ফটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসের বাস্তবতা দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' জাতীয়। প্রসঙ্গত, দেবী সিংহের কারাগারের অভ্যন্তরের বর্ণনাংশ উদ্ধার করছি,—

'ক্রন্দন এবং আর্তনাদের কলরবে সমুদয় কারাগার পরিপূর্ণ। চতুর্দিক হইতেই 'মলেম' 'মলেম' 'বাবা রে' 'প্রাণ গেল রে' এই চিৎকারের শব্দ শুনা যাইতেছিল। কোন স্থানে সিপাহিগণ এক-একটি কয়েদীর হস্তাঙ্গুলি একত্রে কসিয়া বান্ধিয়া তন্মধ্যে মুদ্গর দ্বারা সেই লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিতেছে, কোথাও তিন চারিজন সম্ভ্রান্ত জমিদার সন্তানকে রজ্জু দ্বারা একত্রে বন্ধন করিয়া অবিশ্রান্ত তাঁহাদের পৃষ্ঠের উপর বিছুটির দ্বারা আঘাত করিতেছে। আঘাতে আঘাতে তাঁহাদের পৃষ্ঠের চর্ম একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই চর্মশূন্য পৃষ্ঠের উপর আবার কিছুকাল পরে কণ্টকপূর্ণ বেলের ডালের আঘাত পড়িতেছে।' (প্র-স, পৃঃ ৫৩)।

অপর একটি চিত্র,—'কারাগারের প্রহরীগণ কোন রমণীকে বিবস্ত্রাবস্থায় প্রহার করিতেছে, কোন রমণীর স্বামীর সম্মুখে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিয়া তাঁহার ধর্ম নষ্ট করিবার নিমিত্ত সিপাহীদিগের জেম্মা করিয়া দিতেছে' (ঐ পৃঃ ৫৫)।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও দেবী সিংহের অত্যাচার ইংলণ্ডে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এডমণ্ড বার্ক-এর জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেশব্যাপী যে আলোড়ন আনে তার ফলে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফক্স সরকারের পতন ঘটে।

গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংস-এর দেওয়ান থাকাকালে মাতৃশ্রাদ্ধে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এসব অর্থ যে ন্যায়সঙ্গতভাবে উপার্জিত হয়নি একথা বলা বাহুল্য। এই উপন্যাসে গঙ্গাগোবিন্দ নেপথ্যভূমিতে রয়ে গেছেন। তার অপকর্মের কোন প্রত্যক্ষ বিবরণ এতে পাওয়া যায় না। বরং অন্যায়কার্য-জনিত তার অনুতপ্ত মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ'-এ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মহৎ কর্মের পরিচয় আছে।

বর্ণনার ফাঁকে কয়েকটি চরিত্র মুক্তাবিন্দুর মত উজ্জ্বল হয়ে আছে। সত্যবতীর আচরণ অনেকটা অস্বাভাবিক হলেও তার কর্তব্যপরায়ণতা ও বুদ্ধি প্রশংসার যোগ্য। নানকুর ছদ্মবেশে শ্বশুরকে কারাগৃহ থেকে মুক্তিদান ও কলকাতায় রামকৃষ্ণ নামে বালকের ছদ্মবেশে প্রেমানন্দকে মুক্ত করার পদ্ধতি রোমান্টিক। তারকনাথ বিশ্বাসের 'চন্দ্রপ্রভা' (১৮৮৬) উপন্যাসে ও সুগন্ধা ও চন্দ্রপ্রভাকে পুরুষের বেশ ধারণ করে কার্যসিদ্ধি করতে দেখা যায়। জমাদার রাম সিং ও হাবিলদার লক্ষণ সিং মানবিক গুণসম্পন্ন। হরেরামের সঙ্গে দেবী চৌধুরাণীর হরবল্লভের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। রাণী ভবানীর প্রসঙ্গ ক্ষীণ হলেও চরিত্রটির প্রতি লেখক শ্রদ্ধাশীল। কলকাতার মেয়র-কোর্টের বিচারকদের সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য 'যাহারা রাত্রে অস্ত্র লইয়া চুরি-ডাকাতি করিতেন, দিনে আবার তাহারাই বিচারকের গাউন পরিধান পূর্বক মেয়র-কোর্টের বিচারাসনে বসিয়া এই সকল অত্যাচারের বিচার করিতেন।' (প্র—স পৃঃ ১২৪) তৎকালীন ভণ্ড ইংরাজ বিচারকদের সম্পর্কে লেখকের কটূক্তি বিচারধারার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক।

লেখকের দেশাত্মবোধের পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসে। প্রেমানন্দের পত্রে যে দেশপ্রেমিকের বক্তব্য পাই, মনে হয় সেই বক্তব্য লেখকের নিজের।

গঠন-সংহতির অভাবে উপন্যাসটির কাহিনী দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তবে কাহিনী-বর্ণনায় লেখকের সদাজাগ্রত সহানুভূতি বর্তমান। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইতিহাসের একটি অভিশপ্ত অধ্যায়ের প্রতিচ্ছবি।

'অযোধ্যার বেগম'[৬] অযোধ্যার নবাব পরিবারের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ণধার হেস্টিংসের বিরোধ অবলম্বনে কোম্পানির অত্যাচারের পটভূমিতে লিখিত উপন্যাস। ইতিহাসকে ভিত্তিভূমিরূপে গ্রহণ করে লেখক তিনটি কাহিনী গ্রথিত করেছেন এই গ্রন্থে। এই কাহিনী তিনটি হল (১) অযোধ্যার বেগম বহুবেগমের কাহিনী (২) কাশীর রাজা চৈৎ সিংহ ও বিমাতা গোলাপকুমারীর কাহিনী (৩) বাণেশ্বর ভট্টাচার্য ও অমর সিংহের কাহিনী। এই কাহিনীত্রয় বিচ্ছিন্ন তিনটি কাহিনীরূপে স্বয়ংপ্রভ। এগুলির মধ্যে গভীর ঐক্যসূত্র রচিত না হওয়ায় উপন্যাসটি সংহতিহীন হয়ে পড়েছে। ইংরাজদের অত্যাচারের বিষয় প্রকাশই লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রথম খণ্ড 'উল্লংঘন'-এ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, কাশিরাজ চৈৎ সিং ও আসফউদ্দৌলা ন্যায়-নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে এদের **'প্রায়শ্চিত্ত'** প্রদর্শিত হয়েছে।

॥ প্রথম কাহিনী ॥ বাণেশ্বর ভট্টাচার্য, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন স্ত্রী-কন্যা ও পুত্রবধূর কাছ থেকে। ঘটনাচক্রে স্ত্রী-কন্যা ও পুত্রবধূ কাশীতে অবস্থানকালে ক্ষুধার জালায় মৃতবৎ অবস্থায় আশ্রয় পেল কাশীর রানী গোলাপকুমারীর কাছে। পুত্র অমর সিং নামে সিপাহীরূপে অযোধ্যায় আসে এবং ছত্রসিংহের সাহচর্যে রোহিলার নবাব হাফেজ রহমৎ খাঁর কন্যাকে হরণ করে যখন সুজাউদ্দৌলা হারেমে আনে, তখন প্রথমে বাধা দেবার ও পরে উদ্ধার করবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বারাণসী যুদ্ধে যোগ দেয়। সেখানে মন্দিরে মাতা, ভগিনী ও স্ত্রীর সঙ্গে তার মিলন হয়।

॥ দ্বিতীয় কাহিনী ॥ কাশীর রাজা বলবন্ত সিং সচ্চরিত্র ছিলেন না। সেজন্য স্ত্রী গোলাপকুমারীই দায়ী। রাজা গান শোনার অভিলাষ জানালে, গোলাপ পরিচারিকার সাহায্যে বারো বছরের যে বালিকাকে আনলেন, পরে জানা গেল সে মহারাষ্ট্রের শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কন্যা। বালিকার সন্ধান পাওয়া গেল না।

৬. অযোধ্যার বেগম ১ম খণ্ড, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ পৃঃ ১৫৭ ; ২য় খণ্ড, ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৬, পৃঃ ৩৫৮।

এই বালিকা পূর্ণিমা, রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত পরিবেশন করত। পূর্ণিমা যুবতী হলে, পূর্ণিমার রূপদর্শনে রাজা গোলাপের কাছে পূর্ণিমাকে বিবাহের অনুমতি চান। গোলাপের অনুমতি অনুসারে উভয়ের বিবাহ হলে, পূর্ণিমার গর্ভে চৈৎ সিং ও সুজন সিং-এর জন্ম হয়। বলবন্তের মৃত্যুর পর গোলাপ রাজ্যের অধিকারিণী হন। গোলাপকুমারী নাবালক চৈৎ সিংহকে রাজ্য দিয়ে কাশীতে আসেন।

॥ তৃতীয় কাহিনী ॥ ইংরাজদের প্ররোচনায় অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলা আক্রমণ করে অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইল। রোহিলারা যুদ্ধে নামল। সুজা, রোহিলার নবাব হাফেজ-এর কন্যাকে বন্দী করে হারেমে নিয়ে এলে, অমরসিংহ তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। সুজা, পাপ-লালসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে হাফেজ-দুহিতাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে গেলে, হাফেজ-দুহিতা কর্তৃক ছুরিকাহত হয়। হাফেজ-দুহিতা বুকে ছুরি দিয়ে ধর্মরক্ষা করে। বিষ-ছুরিকাহত নবাব সুজাউদ্দৌলা মৃত্যুর দিন গুনতে লাগল। প্রথম খণ্ডের এখানেই সমাপ্তি।

আসফউদ্দৌলা সিংহাসন পাবার অনতিকাল পরে লক্ষ্ণৌতে রাজধানী স্থাপন করলেন। ইংরাজদের শোষণে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। এদিকে চৈৎ সিং ইংরাজদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং পরাভূত হয়ে পালিয়ে গেলেন। হেস্টিংস হুকুম দিলেন বিজয়ঘরের দুর্গে যেসব মণিমুক্তা আছে তা সৈন্যদের। ফলে, চৈৎ সিংহের মা ও স্ত্রীদের উপর অত্যাচার শুরু হল। চৈৎ সিংহের ধনাগার লুণ্ঠন করে হেস্টিংস-এর অভাব মিটল না। স্থির করলেন, অযোধ্যার বউবেগম ও মতীবেগমের ধনাগার লুণ্ঠন করবেন। বেগমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, চৈৎ সিংহকে তাঁরা সাহায্য করতেন।

হেস্টিংস তাঁর বন্ধু সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পির সাহায্যে বেগমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করলেন। মিডলটনের চাপে বেগমরা ধনাগার শূন্য করে প্রায় দুকোটি টাকা দিলেন। কোম্পানির প্রাপ্য টাকার মধ্যে ষাট লক্ষ টাকা উসুল পড়ল। আসফের দেনা শোধ হল না। ফায়জাবাদে, শ্রীনিবাস, বাণেশ্বর ও অমরসিংহের মিলন হল। ইংরাজদের চাপে বেগমরা মণিমুক্তা দিয়ে দেবার পর, বউবেগম চরম সংকটে পড়লেন। বেগম শেষে জায়গির ফিরে পেলেন। আসফের মৃত্যুর পর উজীর আলী, পরে সাদাতালী

সিংহাসন পেল। এই কাহিনীর সঙ্গে মীরণের মা বঙ্গের নবাবমহিষী জগদম্বা বেগমের করুণ কাহিনী যুক্ত।

'এই উপন্যাসের নায়িকা অযোধ্যার উজীর সুজাউদ্দৌলার প্রধানা স্ত্রী বহুবেগম অথবা বাবু বেগম।' লেখকের স্বাধীনতা-প্রীতির উদাহরণ পাই এই উপন্যাসে। রোহিলাবীর হাফেজের শৌর্য ও পরাক্রমের মধ্যে চণ্ডীচরণের স্বদেশ-প্রীতি অভিব্যক্ত। ইংরাজদের অত্যাচার অবিচার ও মর্মস্পর্শী নিপীড়নের কৃষ্ণযবনিকা উত্তোলিত করে চণ্ডীচরণ সে যুগের রাষ্ট্র ও সমাজের বাস্তব রূপটি তুলে ধরেছেন। প্রখর ইতিহাসচেতনা গ্রন্থটিকে আবৃত করে রেখেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনায় চণ্ডীচরণ কতকাংশে রমেশ দত্তের সগোত্রীয়।

ইংরাজদের শঠতা ও প্রতারণার চমকপ্রদ ঐতিহাসিক দলিল এই উপন্যাস। গোরকপুর ও বেরুচের ইজারদার হ্যানের অত্যাচারের একটি চিত্র উদ্ধার করছি,—'নরপিশাচ রাক্ষসপ্রকৃতি কর্নেল হ্যানে রাজস্ব আদায় উপলক্ষে শত শত জমিদার এবং প্রজাকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড সূর্যোত্তাপে রাখিয়া দিয়াছে। কর্নেল হ্যানের কয়েদঘরে অনাহারে সহস্র সহস্র লোক মরিয়া যাইতেছে, প্রহারে চীৎকার করিতেছে। বাকী যে দেড়শত কয়েদী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে আঠারজনের শিরশ্ছেদন করিয়া কর্নেল হ্যানে এবং তাহার সহচরগণ তাহাদিগের দেহশূন্য মস্তক কয়েকটা এই অস্ত্রধারিণী রমণীদিগেব দিকে নিক্ষেপ করিল।' পপহ্যাম সাহেব চৈৎ সিংহের মা, স্ত্রী, সঙ্গিনী দাসীদের দুর্গ থেকে বার করে দিতে হুকুম দিলে, 'অর্থলোভে শতশত ইংরাজ চেৎ সিংহের মাতা, স্ত্রীর সঙ্গিনী দাসীদিগের গাত্রাভরণ হরণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আসিয়া আক্রমণ করিল। চেৎ সিংহের মাতা এবং স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। কেহ তাঁহাদের হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কেহ পরিধেয় বস্ত্রখানি টানিয়া লইয়া গেল। কেহ কণ্ঠের হার খুলিবার নিমিত্ত কঠিন হস্তে এই পরম সম্ভ্রান্তা রমণীদ্বয়ের গলদেশ চাপিয়া ধরিল।' উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য। বার্ক পালামেণ্টে হ্যানের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করেছিলেন।

হেস্টিংস-এর চরিত্রে কলঙ্কলেপনের জন্য লেখক উপন্যাসটি রচনা করেননি। রোহিলাদের সঙ্গে ইংরাজদের কোন শত্রুতা ছিল না। বরং রোহিলারা ছিল শান্তিপ্রিয় জাতি। কেবলমাত্র আর্থিক প্রয়োজনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

কর্ণধার হেস্টিংস অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রোহিলাদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করেন। এজন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ষাট লক্ষ টাকা পেল নবাবের কাছ থেকে ; আর হেস্টিংস নিজে পেলেন তিন লক্ষ টাকা।

চৈৎ সিংহের সঙ্গে হেস্টিংস-এর সম্পর্কও স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত। এক্ষেত্রেও অর্থের প্রয়োজনীয়তাই চৈৎ সিংহের উপর অত্যাচারের একমাত্র কারণ। ইতিহাস বলে, 'The company was in want of money. The Rajah was supposed to possess it. And since he would not give what was demanded willingly, the resolution was formed to take it by force'.

লেখক এবিষয়ে বলেছেন—'উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজগণ মধ্যে মহারাজ বলবন্ত সিংহ এবং অযোধ্যার উজীর আর তৎকালের নিস্তেজ দিল্লীর সম্রাট এই তিন জনই সর্বাগ্রে ইংরাজের কুহকে পড়িয়া প্রতারিত হইলেন। চরমে ইহাদের তিনজনের রাজ্যই বিনষ্ট হইল'। সুজাউদ্দৌলা ও শাহ্ আলমের সঙ্গে সন্ধি করে. মীরকাশিমের ইংরাজবিরুদ্ধতাও ঐতিহাসিক ঘটনা।

আরউইন অযোধ্যার ইতিহাসে[৭] লিখেছেন যে, সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর কারণ দুটি। (১) কেউ বলেন ফরক্কাবাদের নবাব-কন্যার প্রদত্ত আঘাত। (২) কেউ বলেন ইংরাজদের অবৈধ আচরণ ও অর্থশোষণ চেষ্টা।

বউবেগম ও জগদম্বা বগমের চরিত্রে মাতৃস্নেহরসপূর্ণ। সুজার পচনশীল দেহের শুশ্রূষা করেছেন উভয়েই। বউবেগম আদর্শনারী। বক্সারের যুদ্ধে স্বামীকে তিনি সহায়তা করতে গিয়েছিলেন। লেখক বলেছেন সীতার আত্মা ভর করেছিল বউবেগমকে।

সমসাময়িক উপন্যাসের প্রেমের প্রসঙ্গকে লেখক ধিক্কৃত করেছেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রসঙ্গ অনাবশ্যকভাবে এই উপন্যাসে ছায়াপাত করেছে। লেখক কেশব সেনের (Am I an inspired prophet) 'আমি কি পরগম্বর' বক্তৃতাটি পড়তে বলেছেন পাঠককে।

প্রথম খণ্ডে লক্ষ্ণৌকে লেখক অযোধ্যার রাজধানী বলেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন, ফায়জাবাদ। গ্রন্থটির 'টীকা'য় ঐতিহাসিক তথ্য স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩০১) প্রকাশক গুরুদাস

৭. GARDEN OF INDIA

চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি থেকে জানা যায়, গ্রন্থটি হিন্দী উর্দু ও গুজরাটী ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল।

লেখকের পরবর্তী উপন্যাস 'ঝান্সীর রানী'[৮] সিপাহী-বিদ্রোহের অধিনেত্রী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ-এর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সিপাহী-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এইকালে আরও কয়েকটি উপন্যাস রচিত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যান্য নায়কদের মধ্যে নানা সাহেব, আজিমউল্লা, তাঁতিয়া তোপি প্রভৃতি ব্যক্তির কর্মধারার উল্লেখ আছে এই উপন্যাসে। ইংরাজ লেখকেরা ঝান্সীর রানী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ-এর চরিত্র বিকৃত করে ইতিহাসে অনর্থক কলঙ্কের দায়ে দায়ী করেছেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক-এর মতে, ঝান্সীর হত্যাকাণ্ড রানীর আদেশমত হয়। কিন্তু ঝান্সীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রানীর সংস্রব ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। 'লক্ষ্মীবাঈ-এর চরিত্রের এই বৃথা কলঙ্ক-নিরাকরণার্থ ঝান্সী-বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনপূর্বক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি উপন্যাসাকারে লিখিত হইলেও ঐতিহাসিক বিবরণ অবিকৃত রহিয়াছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, সন তারিখসহ ঐতিহাসিক তথ্য উপন্যাসের পাদটীকায় না দিয়ে লেখক সেগুলিকে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের সঙ্গে রানী ঘটনাচক্রে যুক্ত হয়েছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীদের আক্রমণে ঝান্সীতে কোম্পানির প্রভাব ক্ষয় হয়। রাজ্যশাসনের ভার রানীর উপর এসে পড়ে। ইংরাজ সৈন্য কর্তৃক দুর্গ আক্রান্ত হলে, দুর্গের আসন্ন পতনকালে রানী ঝান্সী ত্যাগ করেন। ইংরাজেরা প্রায় পাঁচ হাজার লোক হত্যা করে। এরপর রানী সিপাহী-যুদ্ধের অন্যান্য নায়ক তাঁতিয়া তোপি, নানা সাহেব প্রভৃতির সঙ্গে যুগ্মভাবে গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করেন। গোয়ালিয়রের রাও সাহেবের নির্বুদ্ধিতার জন্য যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রানী বীরের সজ্জায় সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে জানান যে, তাঁর মৃতদেহ যেন ফিরিঙ্গীর হাতে না পড়ে। তেইশ বছর বয়সে রানীর মৃত্যু হয়। এই কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ত্র্যম্বক-যোগিরাজ-গঙ্গাবাঈ-এর কাহিনী। এই কাহিনী, মূল কাহিনীর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা

৮. RANI OF JHANSI, A HISTORICAL ROMANCE.
ঝান্সীর রানী (ঐতিহাসিক উপন্যাস), ১৮৮৮, পৃঃ ৩৮০। দ্বি স ১৩০১ অগ্রহায়ণ।

করতে পারেনি। হিন্দুনারীর বাল্যবিবাহের পরিণাম চিত্রিত হয়েছে গঙ্গাবাঈ-এর চরিত্রে। যোগিরাজ ও গঙ্গাবাঈ-এর প্রণয়াসক্তির সম্ভাব্যতা স্বাভাবিকতা লাভ করেনি।

লক্ষ্মীবাঈ-এর চারিত্রিক বলিষ্ঠতা প্রকাশ পায় তার আচার-আচরণে ও উক্তিতে। ইংরাজদেব সম্পর্কে লক্ষ্মীবাঈ-এর ধারণা, 'ইহাদিগের ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্ত এবং স্বার্থপর জাতি ভূমণ্ডলে আর কোথাও নাই। আমি যখন রাজ্যভার গ্রহণ কবিলাম তখন ইহারা নিশ্চয়ই মনে করিবে যে আমার আদেশানুসাবেই সিপাহীগণ এই নরহত্যা কবিয়াছেন।·· ·যদি রাজত্বই করিতে হয়, যদি রাজ্যভারই গ্রহণ কবিতে হয় তবে ইংরাজদিগের সঙ্গে একেবাবে সংস্রবশূন্য হইতে না পারিলে এ রাজ্যগ্রহণ বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নহে।' তৎসত্ত্বেও রানীর ইংবাজ-প্রতিরোধের আরও বলিষ্ঠ চিত্র এই উপন্যাসে আশা কবা অসঙ্গত ছিল না। লেখক ইংরাজ আক্রমণ ও অত্যাচারের চিত্ররচনায়ও কিছুটা শৈথিল্য দেখিয়েছেন।

. অহেতুকভাবে এই উপন্যাসে লেখক ব্রাহ্মধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। হিন্দুসমাজের কৌলীন্য-প্রথা ও বিধবা-সমস্যাকে লেখক তী৭ভাবে আক্রমণ কবেছেন। বাব বছরেব বালিকা হেমন্ত অন্তঃসত্ত্বা হবার পর স্বামীর মৃত্যু হয়। প্রসববেদনাকাতর হেমন্ত জল চাইলে, দাসী একঝিনুক জল দেয়। ফলে একাদশীব দিন বি৺ ৺ধ ধর্ম নষ্ট হবার ভয়ে হেমন্তর শ্বশুর দাসীকে খড়মের আঘাতে প্রহাবে জর্জবিত কবে। হেমন্ত গলা শুকিয়ে মারা যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র কবে যোগিবাজ কর্তৃক হিন্দুসমাজ নিন্দিত হয়েছে,—'হিন্দু-সমাজের লোকেব মন অত্যন্ত কলুষিত—তাঁহাদিগেব দৃষ্টি অপবিত্র, তাহাদিগেব হৃদয় দ্বেষ-হিংসায় পবিপূর্ণ।' হিন্দুদের বিধবা-বিবাহ নিবারণের চেষ্টার বিরুদ্ধে যোগিরাজের উক্তি,—'বিধবাগণ' কেহ কাশী কেহ শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী হইয়া পুত্রবতী হইতেছেন, কেহ কেহবা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বনপূর্বক সামাজিক বন্ধন হইতে আপনাকে নির্মুক্ত করিতেছেন।' লক্ষ্ণৌতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পক্ষে যোগিরাজ অবিনাশকে যুক্তি দিয়েছেন। অবিনাশ সিপাহী-বিদ্রোহে যোগদানকারী এক বাঙালী যুবক। লেখক যেন বিচারকের আসনে বসে জাতির অধঃপতনের জন্য হিন্দুধর্মের কুসংস্কারকে দায়ী করে হিন্দুসমাজের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছেন। (দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়) লেখকের এই মনোভাব

এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্যহীন। কৌতুক-সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখক স্থূল রুচির পরিচয় দিয়েছেন (চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়)। উপন্যাসটির গঠন-পরিকল্পনা শৈথিল্যের দায়ে দুষ্ট। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নানা সাহেব ও আজিমউদ্দৌলা চরিত্র এই উপন্যাসে অনেকখানি নিষ্প্রভ।[৯]

ঝান্সীর রানী চণ্ডীচরণের অন্যান্য উপন্যাসগুলির তুলনায় নিকৃষ্টতর রচনা।

চণ্ডীচরণের সর্বশেষ উপন্যাস 'এই কি রামের অযোধ্যা'য়[১০] উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অযোধ্যার সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসটির সম্পূর্ণ নাম 'এই কি রামের অযোধ্যা অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অযোধ্যার অবস্থা।' এই উপন্যাসটির পূর্বসূত্র পাই অযোধ্যার বেগম উপন্যাসে। ইংরাজরা কিভাবে অযোধ্যার নবাবকে ক্রীড়নকরূপে গ্রহণ করে আপন স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিযুক্ত রেখেছিল, তার পরিচয় বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে।

অযোধ্যার উজীর সাদাত আলীর মৃত্যুর কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অর্ধরাজ্য দান করে ঋণমুক্ত হওয়া। গাজিউদ্দিন হায়দর নবাব হলে লর্ড ময়রা তাঁর কাছ থেকে দু'কোটি টাকা আদায় করলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে গাজিউদ্দিন হায়দরের মৃত্যু হলে, তাঁর উচ্ছৃংখল পুত্র নসির নবাবি পেয়ে লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্টের স্ত্রীকে দুকোটি টাকা দেন। নসিরের পাঁচটি পারিষদ। ইংরেজ এবং ফিরিঙ্গি শিক্ষক, পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ, জর্মন চিত্রকর এবং গায়ক, শরীররক্ষক কাপ্তান এবং পঞ্চম, ইংরাজ নাপিত। 'এই নাপিতই বাদশাহের খাসদরবারে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।' এই নাপিতের নবাব-প্রদত্ত নাম সরফরাজ খাঁ। বাদশাহের সেনাপতি দর্শন সিংহের দৃষ্টি স্থাবর সম্পত্তির উপর, নাপিতের অস্থাবর। ইংরেজ-সৈন্য দিয়ে নবাব বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন করলেন, কেউ বা দস্যু ও ঠগী দলভুক্ত হলেন। সীতাপুরের জমিদার গঙ্গাপ্রসাদ

৯. (১) গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, (চিত্ত বিনোদিনী, ১৮৭৪) (২) কালীপ্রসন্ন দত্ত (বিজয় ১২৯১) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (অমর সিংহ, ১৮৯৮) প্রভৃতি বঙ্কিম-সমকালীন লেখকগণ কর্তৃক সিপাহী-বিদ্রোহ সমর্থিত হয়নি।

১০. এই কি রামের অযোধ্যা অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অযোধ্যার অবস্থা, ১৮৯৫, পৃঃ ২৬৪।

নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে দুই জামাতাকে হারালেন। কনিষ্ঠা কন্যা মানকুমারীকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গেল। ভ্রাতা কাশীনাথ ও স্বামী অযোধ্যানাথ মানকুমারীর অন্বেষণপর হল। কানপুরে জয়পাল সিংহের পরিত্যক্ত বাড়িতে বৃদ্ধা বুন্দিয়ার কথা শুনে অযোধ্যানাথের ধারণা হল যে, মানকুমারীকে দর্শনসিংহ এই বাড়িতেই রেখেছিল এবং ভগিনী কৈলাশেশ্বরী বুন্দিয়া কথিত সীতালক্ষ্মী। কৈলাশেশ্বরীকে বাদশাহ অন্দরমহলে নিয়ে যাবার কালে মানকুমারীর পরামর্শমত সে জানাল যে, সে দর্শন সিংহের উপপত্নী। সরফরাজ খাঁ দর্শন সিংহের বিরুদ্ধে বাদশাহকে উত্তেজিত করল।

বণিকতা করতে গিয়ে দর্শন সিংহ বাদশাহ কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল। দর্শনের পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার শুরু হল। কাশীনাথের পরামর্শে রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে দর্শনের এক স্ত্রী প্রতিকার প্রার্থনা করলে, তার প্রাণদণ্ড রহিত হল। পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে দর্শন নির্বাসিত হল। তারপর লক্ষ্ণৌতে মৃতপ্রায় কৈলাশেশ্বরী ও মানকুমারীর সঙ্গে অযোধ্যানাথ ও কাশীনাথের মিলন। মানকুমারী মৃত্যুর পূর্বে দাদাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে, তার মৃত্যুর পর কৈলাশেশ্বরীকে সে বিয়ে করবে।

১৮৩৭, ৭ই জুলাই বাঁদী আফজালউন্নেছার হাত থেকে সরবত খেয়ে বাদশাহ নসির প্রাণত্যাগ করলেন। পাদশা বেগম মানজানকে সিংহাসনে বসালে ইংরাজরা গোলা বর্ষণ করে সিংহাসন অধিকার করল। কাশীনাথ কাশীবাসী হল। পাবাহারী বাবা (অযোধ্যানাথ) সিপাহী বিদ্রোহের সময় সন্ন্যাসীর বেশে ইংরেজদের বিদ্রোহসংক্রান্ত খবর দিতেন। তার সাহায্য ছাড়া ইংরাজরা সিপাহী-বিদ্রোহ নিবারণ করতে সমর্থ হতো না।

মূল কাহিনীর সঙ্গে কাশীনাথ অযোধ্যানাথ-মানকুমারী-কৈলাশেশ্বরীর কাহিনীর গ্রন্থন শৈল্পিকরীতিসম্মত। এই উপকাহিনী নবাব নসিরুদ্দিনের কাহিনীকে পরিস্ফুট করতে সহায়তা করেছে। গ্রন্থের শেষে Appendix-এ মোট ১১টি 'নোট' এ ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী রক্ষিত হয়েছে। এই গ্রন্থেও অত্যাচার নিপীড়নের কাহিনী স্থান পেয়েছে। ঠগী-অত্যাচার প্রসঙ্গও এই উপন্যাসে অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। অন্য উপন্যাসগুলির মত এই উপন্যাসটিও ইতিহাস অনুসৃত তথ্যনিষ্ঠ রচনা। গল্পের খাতিরে ইতিহাসের বিকৃতি কিংবা লঘুকরণ ঘটেনি।

'দাসী'[১১] পত্রিকায় উপন্যাসটির সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অযোধ্যার মুসলমান শাসনকর্তাগণ কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারীগণ ও অন্যান্য ভারতপ্রবাসী ইংরাজগণ কিরূপ অর্থগৃধ্নু ছিল, এই বহিখানি পড়িলে তাহা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যায়।' ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনায় চণ্ডীচরণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরাজকর্মচারীদের অত্যাচার প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সে অত্যাচারজনিত ক্ষোভ ও বেদনা জাতির অন্তরাকাশকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ইংরাজদের শোষণের বিরুদ্ধে নাহ বিদ্রোহও দেখা দিয়েছে। জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ ও পুঞ্জীভূত অন্তর্জ্বালা ঘনীভূত অন্ধকারের বুকে বিদ্যুতালোকের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চণ্ডীচরণের উপন্যাসগুলিতে। নিপীড়িত মানুষের প্রতি অপার সহানুভূতি ও জাতির চরম বিপর্যয়জনিত ক্ষোভ চণ্ডীচরণের মানসপটে স্বদেশপ্রেমের একটি জ্বলন্ত চিত্র এঁকে দিয়েছে।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (?—?)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র উপন্যাস রচনায় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনেও কিঞ্চিৎ অভিনবত্ব এনেছেন তিনি। শিল্পরীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত না হতে পারলেও মানসিকতার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপন্যাসের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, কাহিনীর অভিনবত্ব ও চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়াস।

পূর্ণচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'মধুমতী'[১২] উপন্যাস নামে চিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র রচনা। আকারে ক্ষুদ্র হলেও গ্রন্থটিতে উপন্যাসের লক্ষণ বর্তমান। মধুমতীতে একটি পূর্বস্মৃতিভ্রষ্ট যুবতীর সমস্যা সহানুভূতি ও দক্ষতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত।

কাহিনীর নায়ক করালীচরণ পঁচিশ বছরের একটি ব্রাহ্ম যুবক। পেশায় ডাক্তার। একদিন শেষরাত্রে মধুমতী নদীতীরে এক মৃতপ্রায় যুবতী (২২) কে দেখে তার জ্ঞানসঞ্চার করে, সেই সুন্দরী নারীকে নিয়ে সৈয়দপুর যাত্রা করল। জ্ঞানপ্রাপ্ত মেয়েটি যেন পাগলের মত আচরণ করতে লাগল। অতীতের

১১. দাসী, ৪র্থ ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—জুন ১৮৯৫, পৃঃ ৩৫৭।

১২. মধুমতী, ১২৮০, বঙ্গদর্শন (জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)-এ প্রকাশিত।

কোন কথাই সে বলতে পারে না। করালীচরণ দেখল মেয়েটির হাতে কোন অলঙ্কার নেই। করালী মেয়েটির নাম দিল মধুমতী। মধুমতী করালীর কর্মস্থলে তার কাছেই থাকে। তার আচরণে শিশুসুলভ চাপল্য দেখা যায়। মধুমতী করালীকে বিবাহ করতে রাজী হলে, করালী তাকে বিয়ে করে স্বদেশে যাত্রা করল। নদীপথে যাত্রাকালে ঝড়জলের রাতে করালী দেখল, 'এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে।'

করালী ও মধুমতীর মধ্যে প্রণয় গাঢ় হল। করালীকে ছেড়ে মধুমতী এক মুহূর্ত থাকতে পারে না করালী কার্যোপলক্ষে কলকাতায় গেলে মধুমতী 'নির্বোধ অশান্তের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।' গ্রীষ্মের রাতে ননদিনীর সঙ্গে বাইরে বারান্দায় একদিন শুলে, একটা গানের সুর ভেসে এল তার কানে, 'আদর তরঙ্গ বহে রূপের সাগরে'। মধুমতীর মন চঞ্চল হল। মনে পড়ল গাছের ছায়া ঘেরা পুকুরসহ বাড়ি। আর দাড়িম্বগাছের তলায় 'আদরিণী ও আর একজন '। মধুমতীর দেহমনের অবস্থান্তর ঘটল। অসুস্থ হয়ে পড়ল সে। শয্যাশায়িনী মধুমতী রাত্রি এক প্রহরের সময়ে স্তিমিত আলোকের শিখায় দেখল তার পূর্বস্বামীকে। সে স্বামীকে জানাল, আদরিণী জলে ডুবে মরেছে। সে এখন তার রক্ষাকর্তার স্ত্রী। করালী বাড়ি ফিরলে, মধুমতী আগের মত হাসিমুখে তার কাছে ছুটে গেল না, 'কেবলমাত্র ঈষৎ চঞ্চল' হল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে করালী জানলায় 'একজন শ্মশ্রুবিশিষ্ট এক বৃহৎ মনুষ্য-মুণ্ড দেখিতে পাইলেন। মধুমতী কাঁদতে কাঁদতে করালীকে বলল, 'যে জীবন তুমি রক্ষা করিয়াছিলে তাহা আবার নষ্ট কর।' মধুমতী জানায় সে সধবা। লোকটি তার পূর্বস্বামী।

গঙ্গাতীরে মধুমতীর সঙ্গে তার পূর্বস্বামী গোপালের মিলন হল। গোপাল তাকে তার সঙ্গে বাড়ি যেতে বলল। দেশ ত্যাগ ক'রে সে কলঙ্ক ঘোচাবে জানাল। আদরিণী কাঁদতে কাঁদতে জানাল, সে পরের। সে পাপিষ্ঠা। এক-গলা জলে দাঁড়িয়ে আদরিণী গোপালের আলিঙ্গন ভিক্ষা করল। গোপাল জানাল, আদরিণী না ফিরলে সেও তার পথ অনুসরণ করবে। চিবুক পরিমিত জলে গোপাল 'চিরপ্রেমভাগিনী আদরিণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল।' 'তাহার পর উভয়কে পৃথিবীতে আর কেহ, কখনও দেখিল না'।

মধুমতী ওরফে আদরিণীই উপন্যাসটির মূল চরিত্র। নৌকা দুর্ঘটনায় তার স্মৃতি লোপ পাবার পর তার আচরণ ও পূর্বস্বামীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের পূর্বে একটি গানের সূত্রে স্মৃতির জাগরণ এবং মানসিক দ্বন্দ্ব মনস্তত্ত্বসম্মত। লেখক উপন্যাসটিতে মানব-মনের এক জটিল সমস্যার বিষয় কাহিনীর বিষয়ভুক্ত ক'রে শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষার ভিত্তি রচনা করেছেন। কাহিনীতে ঈষৎ রোমাণ্টিকতার স্পর্শ থাকলেও গঠনপ্রণালীতে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। মাত্র তিনটি পরিচ্ছেদে গঠিত এই কাহিনীটি লেখক বিশেষ সচেতনতার সঙ্গে গ্রন্থন করেছেন। মধুমতীর একটি বিশেষ অবস্থার কালে দু'জন স্বামীকে নিয়ে তার সমস্যা এবং তজ্জনিত গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব লেখক সহানুভূতির আলোকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন। করালীচরণ ও গোপাল উভয়েই মধুমতী ওরফে আদরিণীর প্রেমে গভীরভাবে আকৃষ্ট। মধুমতী বা আদরিণীও তাই। এই জটিল অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ আত্মহত্যাকেই তাই সে বেছে নিয়েছে। মধুমতীকে নিয়ে গৃহে ফেরার কালে নদীতীরে করালীর দীর্ঘাকার পুরুষদর্শন, মধুমতীর জীবনে ঘনায়মান সমস্যার ইঙ্গিত। এই ক্ষুদ্র কাহিনীর সমাপ্তিবাক্য উপন্যাসের রীতি-সম্মত। কাহিনীর শেষাংশ কপালকুণ্ডলার শেষাংশের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। স্মৃতিভ্রংশ নিয়ে আলোচ্যকালে আরও একজন লেখককে উপন্যাস রচনা করতে দেখি।[১৩]

পূর্ণচন্দ্রের 'শৈশব-সহচরী'[১৪] একটি পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে দুটি নারীর প্রণয়-কাহিনী। এই উপন্যাসের নায়িকা, একটি বিধবা যুবতী। বিধবা-বিবাহ এই উপন্যাসে সমর্থিত হয়েছে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে একটি বিধবার এই জাতীয় তৎপরতা ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের চিত্র আলোচ্যকালে একটি ছাড়া[১৫] অন্য কোন উপন্যাসে পাই না। শৈশব-সহচরী যে সময়ে বঙ্গদর্শনে (১২৮২–৮৪) প্রকাশিত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ও সেই সময়ে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[১৬] কৃষ্ণকান্তের উইলের নাম উল্লেখ করার

১৩. ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পারুল, ১৮৯৩।

১৪. শৈশব-সহচরী, ১৮৭৮, পৃঃ ১৬৬ : 'বঙ্গদর্শন'-এ (১২৮২—৮৪) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

১৫. দামোদর মুখোপাধ্যায়, দুই ভগিনী, ১৮৮১।

১৬. ১২৮২ সালের শেষ তিন মাস এবং ১২৮৪ সালের বৈশাখ—মাঘ।

কারণ এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সামাজিক উপন্যাসটি মূলত, বিধবা-প্রণয়কে কেন্দ্র করে লেখা।[১৭] পূর্ণচন্দ্র একই সময়ে লেখা অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল থেকে যে এই জাতীয় রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, এমন কথা মনে করার ভিত্তি নেই। পূর্ণচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বিধবা-প্রণয় ও বিবাহের অধিকার প্রতিষ্ঠাকেই শুধু প্রাধান্য দেননি, তার স্বাভাবিকতাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'শৈশব-সহচরী'র কুমুদিনী যেন রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র (১৯০৩) বিনোদিনীর পূর্বাভাস। প্রণয়ের পরিণতির ক্ষেত্রে পূর্ণচন্দ্র অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আরও একধাপ অগ্রসর হয়েছেন।

উপন্যাসের নায়ক রজনীকান্ত বিবাহচিন্তায় যখন বিভোর, তখন গঙ্গায় তার নৌকাডুবি হল। অজ্ঞান অবস্থায় যার সেবা শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় সে সুস্থ হয়ে উঠল, সে বিধবা কুমুদিনী। প্রথম দর্শনেই কুমুদিনীর প্রতি সে প্রণয়াসক্ত হল। পরে জানল, সে তার বাল্য সহচরী।

কুমুদিনীর বোন স্বর্ণপ্রভার সঙ্গে রজনীকান্তের বিয়ে হল। বিবাহের রাত্রে বিগতভর্তৃকা কুমুদিনীকে পুনরায় দেখে, সেই রাত্রে রজনী গৃহত্যাগ করল। গঙ্গার ঘাটে সে কুমুদিনীকে দেখল, 'রাজহংসীর ন্যায় জলক্রীড়া করতে।' রজনীর জিজ্ঞাসার উত্তরে কুমু বললে, সে ডুবে মরতে এসেছে', তারপরে বললে, তার প্রতি ভগিনীপতির স্নেহের পরিমাণ পরীক্ষা করছিল সে।

স্বর্ণপুরে রজনীর বাড়িতে ডাকাত পড়ল। এ খবর কুমুদিনী পূর্বেই তাকে দিয়েছিল। রজনী আহত হল, স্বর্ণপ্রভার প্রাণ গেল এবং কুমুদিনীকে এক যুবক রক্ষা করল। এই ডাকাতদের নেতা রজনীকান্তের খুড়তুত ভাই রতিকান্ত। বিনোদিনীর নিরুদ্দিষ্ট পিতা, দীর্ঘদিন পরে গৃহে ফিরে এসে স্থির করলেন, কন্যা বিনোদিনীর পুনর্বিবাহ দেবেন। রজনীকান্ত কুমুর সঙ্গে তার উদ্ধারকারী যুবক শরতের নিভৃত প্রেমালাপ শুনে স্তম্ভিত হল। রজনীকে কুমু জানাল, চিরদিন রজনী তার কাছে তার ভগিনীপতি হয়েই থাকবে। এক মুমূর্ষুপ্রায় মহিলার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী থেকে কুমু জানতে পারল যে রজনী জমিদার রমাকান্তের পুত্র নয়,—শ্যালিকাপুত্র। রমাকান্তের পুত্র শরৎ।

১৭. কৃষ্ণকান্তের উইল-চুরি পরিচ্ছেদ রচনাকালে ঘটনাচক্রে পূর্ণচন্দ্রের অনুরোধে বঙ্কিম তাঁকে অংশটি লিখতে দিয়েছিলেন। পরে পরিচ্ছেদটির প্রথমাংশ বঙ্কিম নতুন করে লেখেন। অবশিষ্ট অংশের 'এক আধ স্থানে মাটি লাগাইয়াছেন।' (পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃঃ ৭৭-৭৮)

রজনী সব সম্পত্তি শরৎকুমারকে দান করল। রজনীর সর্বস্বহীনতার বেদনা কুমুর অন্তরে রজনীর প্রতি প্রণয়ের নবচেতনা দান করল। শরৎ কুমুকে বিবাহের প্রস্তাব করলে, কুমুদিনী জানাল, 'বিধবার আর বিয়ে হয় ?'

রজনীর অসুখের খবর শুনে কুমুদিনী, খুড়তুত বোন বিনোদিনীকে সঙ্গে নিয়ে রজনীর বাড়ি যায় এবং তাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে থাকে। গঙ্গা-তীরে তাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে রজনীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যানের কথা। ফেলে-আসা জীবনের স্মৃতির টুকরোগুলি কুমুর মনের দর্পণে ভেসে ওঠে। শরৎ থেকে রজনীতে এসে কুমুর প্রেম আশ্রয় লাভ করে। কুমু শরৎকে তার ভাই হিসাবে গ্রহণ করে। শরতের শিরে যেন বজ্রাঘাত হয়।

এর পরে দৃশ্য উত্তোলিত হয় আগ্রায়। আগ্রার পথে কুমু রজনীকে দেখে বিস্মিত হল। সে ত তারই জন্য গৃহত্যাগী! রজনী তাদের বাড়ী এসেছে শুনে কুমুদিনী অন্তরাল থেকে দু'চোখ ভরে তাকে দেখতে লাগল। ঠাট্টা করে রজনীকান্ত পঞ্চদশী বিনোদিনীকে বলে যে, সে আবার বিয়ে করবে এবং স্বুবর্ণপুরের শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বিনোদিনীকে। বিনোদিনী লজ্জিত ও অপ্রতিভ হলেও রজনীর এই উক্তি তার মনে বিশ্বাসের ও আকাঙ্ক্ষার ছাপ ফেলল। এবারে একসঙ্গে দুটি নারীমন একটি পুরুষের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠল।

কুমুর পিতা কুমুর বিবাহের জন্য পাত্র স্থির করেছেন জেনে কুমুদিনী চঞ্চল হল। কারণ রজনীকান্তই তার ধ্যানজ্ঞান, চিন্তা। হরিনাথবাবু সমাজের ভদ্রলোকদের মিষ্টিমুখে ও অর্থ দিয়ে বশ করলেন। কুমুর সঙ্গে ছদ্মবেশী রজনীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন রাত্রে বিনোদিনীকে পাওয়া গেল না। রজনী বিবাহান্তে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। রতিকান্ত শরতের সম্পত্তির লোভে কুমুদিনীভ্রমে বিনোদিনীকে ধরে এনেছিল, শরতের সঙ্গে বিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। বিনোদিনীর অন্বেষণে এসে রজনীকান্ত শরৎ ও রতিকান্ত কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে, বিনোদিনীর পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে উঠল।

কুমুদিনীকে নিয়ে রজনীকান্ত কর্মস্থলে যাবার পূর্বকালে, বিনোদিনীর কান্না দেখে রজনীকান্ত বিচলিত হল। রজনীকে বিনোদিনী অনুরোধ জানাল তার মৃত্যুর আগে একবার দেখা দিতে। ওরা চলে যাবার পর থেকে বিনোদিনী

শয্যা গ্রহণ করল। বজনী সংবাদ পেয়ে এল। বজনীর কোলে বিনোদিনী মরল এবং মববাব আগে দিদিব জন্য সে তাঁব মত সুখেব মৃত্যু কামনা করল।

বিধবা-প্রণয় ও বিবাহ এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। বিধবার প্রণয়-বিশ্লেষণে লেখক আলোচ্যকালে এই উপন্যাসে নবতব দৃষ্টান্ত স্থাপন কবেছেন, যাব তুলনা নেই। এই প্রসঙ্গে 'বোহিণী'ব কথা মনে হতে পাবে। কিন্তু বোহিণীর প্রেমেব সর্বগ্রাসী লালসার্তি, সমাজধিক্কৃত আচবণ এবং লেখকের সমবেদনাহীনতা তাব চবিত্রকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধিব ক্ষেত্রে স্থাপন কবেছে। প্রসঙ্গত. বঙ্কিমচন্দ্রেব বিষবৃক্ষেব (১৮৭৩) কুন্দনন্দিনীব কথা মনে পড়তে পাবে। কিন্তু কুন্দব মানসিকতাব সঙ্গে কুমুদিনীব তুলনা চলে না। কুন্দব প্রেম ছিল নিবচ্চাব। তাব সমস্যাও ছিল ভিন্ন। কুন্দব বিবাহিত জীবনেব পবিণতি বিষগ্রহণে আত্মহত্যা। কুমুদিনীব দাম্পত্যজীবন সার্থকতার গৌববে দীপ্ত। এই উপন্যাসেব কুমুদিনীব প্রণয়কে লেখক নিবপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ কবে বিধবাব প্রণয়েব স্বাভাবিকতাকে সহানুভূতিব সঙ্গে চিত্রিত কবেছেন। বঙ্কিমসমকালীন ঔপন্যাসিকদেব মধ্যে পূর্ণচন্দ্র উপন্যাসে সূক্ষ্মতর বাস্তবতা প্রবর্তনেব প্রথম ভিত্তি বচনা কবেছিলেন বলা চলে। গঠন-পবিকল্পনায় বঙ্কিমের আদর্শই তৎকালে সাধাবণভাবে গৃহীত হয়েছিল। পূর্ণচন্দ্র সেই বীতিই অনুবর্তন কবেছেন তাঁব উপন্যাসে। তাব ফলে গঠন-পরিকল্পনায় বা শিল্প বীতিতে বোমান্টিকতাব ছোয়াচকে পূর্ণচন্দ্র এড়াতে পাবেননি। তৎসত্ত্বেও তাব উপন্যাসে সূক্ষ্ম বাস্তববাদেব প্রবর্তনপ্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রেব 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশেব পাচবছব পবে এই গ্রন্থেব প্রকাশ। কিন্তু বিধবাব প্রণয়-চিত্রণেব ক্ষেত্রে পূর্ণচন্দ্র এই উপন্যাসে এক নব-পথেব অগ্রপথিক।

বিধবা-বিবাহ তৎকালীন সমাজে পূর্ণস্বীকৃতি লাভ না কবায় সামাজিকদের নানাভাবে প্রলোভিত ক'বে স্বীকৃতি ও সমর্থন আদাযেব বাস্তবসম্মত চিত্রটিও লেখক এই প্রসঙ্গে তুলে ধবেছেন। বিবাহ-সভাব আড়ম্বরহীন বর্ণবিরল চিত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'বিধবাব বিবাহ, বড় সমাবোহ নাই। ⋯ বাজনা-বাদ্য, বোশনা, রোসনাই, ববযাত্রী, কন্যা যাত্রীব হুড়াহুড়ি নাই, লুচি-মণ্ডার ছড়াছড়ি নাই, উদ্যোগের বড় তাড়াতাড়ি নাই। বিশেষ বিধবাব বিবাহ হিন্দুয়ানি ছাড়া কাণ্ড,

যে বরযাত্রী বা কন্যাযাত্রী আসিবে তাহারই জাতি যাইবে, লোকজনের বড় শব্দ নাই।'

উপন্যাসটির পটভূমি সুবর্ণপুর গ্রাম থেকে সুদূর আগ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। উপন্যাসটির ঘটনা-সংস্থাপনে লেখক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। বিনোদিনীর সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত শরতের বিবাহমানসে কুমুদিনীভ্রমে বিনোদিনীকে লুণ্ঠন, এবং বিনোদিনীর উদ্ধারকল্পে রজনীকান্তের যাত্রা ও নিগ্রহভোগান্তে অসুস্থ অবস্থায় কুটীরবাস, বিনোদিনী ও শরৎকে একই বৃন্তে ক্ষণবাসের যে সুযোগ দান করেছে তা রজনীর উপর বিনোদিনীর প্রণয়ের গাঢতা ও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাকে প্রকাশ করে। রজনীকান্তের প্রতি বিনোদিনী ও কুমুদিনীর প্রেমের জাগরণ ও প্রতিযোগিতার ধাপগুলি মনস্তাত্ত্বিক। প্রথমে রজনীর প্রণয়কে প্রত্যাখ্যান ও পরে রজনীর সত্যপরিচয় জ্ঞাত হবার পর নিঃস্ব রজনীর প্রতি কুমুদিনীর সহানুভূতি ও অনুকম্পার সূত্রে প্রেমের জাগরণ, তাকে শরতের প্রেমকে অস্বীকার করার প্রেরণা দিয়েছে। তারপর রজনীর অসুস্থতার সংবাদে তার গৃহে বিনোদিনীর যাত্রা, তাকে না পাওয়ার বেদনা, অতীত ঘটনার পটে রজনীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যানের স্মৃতিজনিত দুঃখ, শরৎকে সহোদর ভাই জ্ঞান ক'রে রজনীর প্রতি তার প্রেমের আত্মসমর্থন লাভ, আগ্রায় অন্তরাল থেকে রজনীকে চোখ ভরে দেখে এবং অদর্শন-বেদনা জনিত নিভৃত কান্নার ধাপ পার হয়ে কুমুদিনীর প্রেম শেষে যমুনার তীরে, রজনীর নীরব স্বীকৃতির মধ্যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করেছে,— 'সেই জনহীন শব্দহীন যমুনার উপকূলে অন্ধকারে দুইজনে দুইজনের হস্তধারণ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন'। কুমুদ 'আর সে লজ্জা নাই সে ব্রীড়াকম্পিত দৃষ্টি নাই।' রজনীর প্রতি বিনোদিনীর প্রণয় উন্মেষ ও আকর্ষণের পশ্চাতেও লেখক বিশ্লেষণ-ধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন। কৌতুকের ছলে রজনী কর্তৃক বিনোদিনীকে বিবাহেচ্ছা জ্ঞাপনের পর থেকে বিনোদিনীর অন্তরে রজনীর প্রতি প্রেমাকর্ষণের কয়েকটি চিত্রাঙ্কনে কুশলী হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। 'জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কক্ষের বাতায়নের পথে রজনীকান্তের 'অমল শ্বেত অট্টালিকার দিকে' মুখ ফিরিয়ে বিনোদিনীর বসে থাকা, রজনীকান্তের প্রতি তার প্রেমতৃষিত অন্তরটি উদ্ঘাটিত করে। যমুনাতীরে রজনীর সামনে বিনোদিনীর পড়ে যাওয়া এবং রজনী কর্তৃক তাকে তুলে ধরার কথা শুনে, কুমুদিনীর প্রতি বিনোদিনীর উক্তি ('দিদি,

রজনীর সাক্ষাতে পড়িতে লজ্জা করিল না') মধ্য দিয়ে কুমুর প্রতি বিনোদিনীর ঈর্ষাজনিত মনোভাবের যে পরিচয় পাই, তা প্রেমের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক। রজনী চোখের আড়াল হবার পর বিনোদিনীর অসুস্থতা ও পরে রজনীর সান্নিধ্যে মৃত্যু, এই ত্রিভুজ প্রণয় সমস্যার সহজ ও মামুলী সমাধান। প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী রজনীকান্তের উপর শরতের ক্রোধ ও আক্রমণাত্মক আচরণ বাস্তবসম্মত।

রজনীর সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহের দৃশ্যে পাঠকচিত্তে কৌতূহল সৃষ্টির পরিকল্পনা অবাস্তব। এই জাতীয় পরিকল্পনার চিত্র পাই স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' (১৩০০) উপন্যাসে। তারও পূর্বে, অজ্ঞাত লেখকের 'মালা-বিনিময়' (১২৯৩) উপন্যাসের প্রবোধ ও প্রতিভার বিবাহ দৃশ্যে।

উপন্যাসটির শিল্পরীতিতে বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষণীয়। গভীর বন, বনমধ্যে ভৈরবীর মন্দির, ছাগরক্তাপ্লুত মণিবেদীন প্রভৃতি দৃশ্যে বঙ্কিমসুলভ রোমান্টিকতার ছাপ আছে। পাঠককে আহ্বান বঙ্কিম রীতি অনুসৃতির অপর উদাহরণ। সামগ্রিক বিচারে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনা পূর্ণচন্দ্রকে বঙ্কিম-সমকালে ঔপন্যাসিক হিসাবে বিশিষ্টতা দান করেছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭ ১৯১৯)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে ঔপন্যাসিকরূপে শিবনাথ শাস্ত্রীর আবির্ভাব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিবনাথ প্রগতিবাদী লেখক ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম-সমাজসেবাই ছিল তার জীবনের মূল ব্রত। কেশব সেনের ব্রাহ্ম-সমাজের সভারূপে শিবনাথ সমাজসংস্কারে আত্মনিয়োগ করলেও কুচবিহার হিন্দুবিবাহের পর প্রগতিবাদী দল কেশব সেনের সংসর্গ ত্যাগ করে যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করলেন, শিবনাথ তাতে যোগ দেন। ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তিনি ইংলণ্ড যান এবং ইংলণ্ড থাকাকালে মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন চালান। ইংরাজ চরিত্রের দোষ, গুণ ও ইংলণ্ডের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে ছ'মাস পরে শিবনাথ দেশে ফেরেন। এরপর কিছুকাল দক্ষিণ

ভারতে ধর্মপ্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের উন্নতি-চিন্তাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র চিন্তা। প্রগতিবাদী শিবনাথ বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহের পক্ষে এবং কৌলীন্য-প্রথার বিপক্ষে নিজেকে নিযুক্ত রেখে-ছিলেন। সুরাপানের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য 'মদনা গরল' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন। সোমপ্রকাশ, সমদর্শী, সমালোচক, তত্ত্ব কৌমুদী, ব্রাহ্ম-পাবলিক ওপিনিয়ন, সখা, মুকুল প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক, পরিচালক ও লেখক রূপে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর সমগ্র কর্মজীবন ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে যুক্ত এবং ধর্মপ্রচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। ব্রাহ্ম-ধর্ম-প্রচারক শিবনাথের উপন্যাসে প্রচারধর্মিতা তাই অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রথম গ্রন্থ একটি খণ্ডকাব্য 'নির্বাসিতের আত্ম বিলাপ' (১৮৬৮)। আলোচ্য পর্বে তাঁর তিনটি উপন্যাস 'মেজবউ', 'যুগান্তর' ও 'নয়নতারা'র[১৮] কেন্দ্রীয় চরিত্র নারী। শিবনাথ জানতেন নারীর শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সামাজিক এবং পারিবারিক কল্যাণের অন্যতম কারণ। তাঁর উপন্যাসত্রয়ে এই উপলব্ধিকেই তিনি প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

শিবনাথের প্রথম উপন্যাস 'মেজবউ'[১৯] উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা। গ্রন্থটি 'হিন্দু-কন্যাদিগের পাঠোপযোগী' ক'রে রচিত। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এসোসিয়েসনের সভ্যগণের অনুরোধে একটি পারিবারিক উপন্যাসরচনার দায়িত্ব তিনি পালন করলেন বাঁকিপুরের কাছে প্রকাশচন্দ্রের[২০] বাড়িতে অবস্থানকালে[২১]। লেখক গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকাংশে বলেছেন 'সুকুমারমতি কুলকন্যাদিগকে মানব-প্রকৃতির নীচ ও অপকৃষ্ট বিভাগের সহিত পরিচিত করা অকর্তব্যবোধে পাপের চিত্র সন্নিবেশিত করিতে পারা যায় নাই। গুরুজনের শুশ্রূষা, পতিসেবা, দাসদাসীদিগের প্রতি বাৎসল্য, অতিথি-অভ্যাগতদের পরিচর্যা, প্রতিবেশীদিগের প্রতি সৌজন্য, এইগুলিই নারীগণের শিক্ষণীয় প্রধান সদ্‌গুণ। এইগুলিকে

১৮. চতুর্থ ও সর্বশেষ উপন্যাস, বিধবার ছেলে, ১৯১৬ পৃঃ ২৯৭।

১৯. মেজবউ, ১৮৭৯, পৃঃ ৯৫ ; দ্বি স. ১৮৮০ ; একাদশ সং ১৯১২।

২০. ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা।

২১. এই ৮।১০ দিনের মধ্যে মেজবউ নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম। আত্মচরিত, সিগনেট সং—পৃঃ ১৬৭।

প্রদর্শন করিবার দুই-একটি মাত্র চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে'। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'ইহাকে উপন্যাস না বলিয়া অল্পবয়স্কা কুলকন্যাদিগের পাঠ্য গল্পের পুস্তক বলিলে ভাল হয়। ইহাতে গল্পচ্ছলে গার্হস্থ্য-জীবনের দুই-একটি ভাল ছবি চিত্রিত করিবার এবং আমাদের চারিদিকে, গৃহের পশ্চাতে দুইশত হস্তের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহার দুই-চারিটি প্রদর্শন করিয়া দুই-একটি নীতি শিক্ষা দিবার ও দুই-এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। উপন্যাসে এখনকার পাঠকেরা যাহা চান তাহার কিছুই ইহাতে নাই, সুতরাং সে অনুসারে ইহার বিচার কর্তব্য নয়। ইতি '

নদীয়া জেলার নিশ্চিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা পণ্ডিত ব্যবসায়ী মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের চার পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র হরিশচন্দ্র জমিদারের কাছারিতে কাজ করেন, দ্বিতীয় প্রবোধচন্দ্র কলকাতায় বি. এ. পড়ে, তৃতীয় পরেশচন্দ্র দু'বার এনট্রান্স অনুত্তীর্ণ, কনিষ্ঠ প্রকাশ কলকাতার একটি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্যামা (১৭।১৮) কুলীনবধূ, বাপের বাড়িতেই থাকেন। হরিশচন্দ্রের দুই মেয়ে ক্ষেমি ও পুঁটি। ছেলে গোপালচন্দ্র। পরেশের একটি মেয়ে। প্রবোধের স্ত্রী প্রমদা সর্বগুণযুক্তা হয়েও শাশুড়ীর চক্ষুঃশূল। বড়বৌ হরসুন্দরীর সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর। শ্বশুর মেজবৌকে অত্যন্ত স্নেহ করলেও গর্বস্নেহধন্যা মেজবৌ প্রমদার আচরণকে বড়মানসী ঢঙ বলে মনে করেন।

আষাঢ় মাসে কর্তামশায় পীড়িত হয়ে পড়লে প্রবোধ বাবার চিকিৎসার জন্যে বহুবাজারে বাসা ভাড়া ক'রে ডাক্তার দেখানর ব্যবস্থা করে। শ্বশুরের সেবায় প্রমদা সর্বক্ষণ নিজেকে নিযুক্ত রাখে। ডাক্তার, কর্তার মৃত্যু আসন্ন জানালে তাঁকে বাড়ি আনা হয় এবং মেজবৌ খরচের জন্য স্বেচ্ছায় গহনা বিক্রি করে। কর্তা মারা যান। কর্তার মৃত্যুর পর সংসারে ভাঙ্গন ধরতে শুরু করে।

প্রমদা সন্তানসম্ভবা হয়ে পিত্রালয়ে চলে গেল। প্রবোধ বর্ধমান জেলার একটি স্কুলে হেডমাস্টারের কাজ নিল। কন্যা হবার খবর শুনে প্রবোধ দেখে এল। পরের বছর শীতকালে আইন পাস করে প্রবোধ ওকালতিতে প্রচুর অর্থ আয় করতে লাগল। ভবানীপুরে বাসা করে প্রমদা ও কন্যা

লীলাকে নিয়ে এল। সে ভাই প্রকাশকে মেডিকেল পড়ার খরচ দেয়। তাছাড়া দাদা হরিশচন্দ্রকেও অর্থসাহায্য করে। বেরিলিতে পরেশের কয়েদের খবর পেয়ে প্রকাশকে নিয়ে প্রবোধ বেরিলি গেলে সেখানে তার টাকা চুরি গেল।

প্রমদা শাশুড়ীর অসুখের খবর পেয়ে প্রকাশের বন্ধু হরিতারণের শরণাপন্ন হয়। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে হরিশচন্দ্র মাকে নিয়ে এলে, সঙ্গে আসে শ্যামা, বামা, সেজবৌ, ছোট বৌ। কলকাতায় এসে সকলে নগরদর্শনে ব্যস্ত থাকলেও প্রমদার বিশ্রাম নেই। শাশুড়ীর সেবায় সে যত্নবতী। বেরিলিতে ভায়ের সঙ্গে দেখা করে প্রবোধ আপিলের ব্যবস্থা করল। লক্ষ্ণৌ-এ প্রমদার চিঠিতে মায়ের অসুখের কথা জেনে, ভৃত্য খোদাই ও প্রকাশকে রেখে এবং দু'জন উকিল নিযুক্ত করে প্রবোধ কলকাতায় ফিরল। মায়ের মৃত্যুর পূর্বকালে প্রকাশ পরেশকে নিয়ে শয্যাপার্শ্বে এলে পরেশ মায়ের কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করল। গৃহিণী মারা গেলেন। অনতিকালের মধ্যে লীলা পুকুরে ডুবে মারা গেল। অন্যদিকে বিধবা বামার সঙ্গে হরিতারণের প্রণয় বেড়ে চলল। প্রমদার একটি পুত্র হয়ে আটদিন পরে মারা গেলে, প্রমদা গুরুতর অসুস্থা হয়ে পড়ল।

প্রবোধচন্দ্র ডাক্তারের নির্দেশমত সপরিবারে ইটোয়াতে এল। প্রমদা সুস্থ হয়ে উঠলে প্রবোধ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। অর্থের অভাবে কর্জ শুরু হল। ভৃত্য খোদাই-এর সাহায্যে প্রমদা সব গহনা বিক্রি করল। বামা একটি স্কুলে কাজ পাবার অনতিকাল পরে যক্ষ্মায় পড়ল। হরিতারণ ও প্রকাশ-চন্দ্র এসে সকলকে কলকাতায় হরিতারণের বাসায় নিয়ে গেল। বামা মারা গেল। 'ইহার পর আর বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না। প্রমদা হাতের চুড়ি কয়গাছি খুলিয়া থান পরিধান করিয়া ভিখারিণীবেশে পিত্রালয়ে যাইতেছেন, সে দৃশ্য দেখাইবার ইচ্ছা হইতেছে না। অতএব এইখানেই সমাপ্ত'।

'কুলকন্যাদিগের পাঠোপযোগী' এই গ্রন্থটিতে লেখক তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থের বিষয়ে বিস্তৃতি নেই। শাখা-কাহিনীও (হরিতারণ-বামা) দুর্বল। পারিবারিক জীবনের অত্যন্ত বাস্তবঘেঁষা দিনগুলি উপন্যাসটিতে প্রতিফলিত হতে দেখি। লেখকের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার বিস্তৃত পরিচয় উপন্যাসটিতে পাওয়া যায়। কর্ত্রী ও হরসুন্দরীর ঝগড়া (পৃঃ ১৮) মহিলাদের

খাওয়ার দৃশ্য[২২], প্রবোধের বাড়ির বধূ ও কন্যাদের কলকাতা-ভ্রমণের দৃশ্য[২৩] প্রভৃতি তার উদাহরণ।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম শিবনাথ শাস্ত্রীর এই গার্হস্থ্য-উপন্যাসটিতে সমাজ-সংস্কারের তর্কবহুল কয়েকটি দিক উত্থাপিত হয়েছে। কৌলীন্য প্রথার প্রতি ব্যঙ্গ, বিধবা প্রণয় ও বিবাহকে সমর্থন ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সহানুভূতিশীল মত জ্ঞাপন করেছেন লেখক।

কৌলীন্য প্রথার প্রতি পরোক্ষ ব্যঙ্গ ও স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা যুবতী নারীর অব্যক্ত ক্ষোভ লেখকের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ফুটে উঠেছে, 'শ্যামা জ্যেষ্ঠা বধূ, বয়ঃক্রম ১৭ কি ১৮ বৎসর, কুলীনের ঘরে পড়িয়াছিল সুতরাং তাঁহার আর শ্বশুরঘর করিতে যাইতে হয় না' (পৃঃ ২, ১ম ও ২য় সং)। বিধবা প্রণয় ও বিবাহ-সম্ভাবনার প্রসঙ্গ এই উপন্যাসটিতে পাই। হরিতারণ ও বামার প্রণয় ও বিবাহেচ্ছা তার প্রমাণ। গৃহিণীর মৃত্যুর পর বামা ও হরিতারণের মধ্যে অনুরাগ সঞ্চারের ব্যাপারটি সহজেই প্রমদার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে,—'হরিতারণ যখন বাড়ীতে আসেন প্রমদা উভয়ের ভাবগতির লক্ষ্য করিয়া থাকেন। হরিতারণের যে বামার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে সে বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ নাই। বামার ভাব সেরূপ জানিতে পারা যাইতেছে না। প্রমদা বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বামা লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া থাকে সুতরাং হঠাৎ জানিবার উপায় নাই'। উভয়ের এই সম্পর্ক সমর্থিত হয়েছে প্রবোধ, প্রমদা ও প্রকাশ কর্তৃক। বামা হরিতারণের 'অশেষ গুণের পক্ষপাতিনী' হওয়ার জন্য 'প্রবোধ, প্রমদা ও প্রকাশচন্দ্র সকলেই সুখী হইয়াছেন এবং তাঁহাকে উক্ত সৎপাত্রগত করিবার সংকল্প আবার তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছে।' কিন্তু

২২ বামা স্কুল ভাঙে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন যুবতী বামহস্তে বৃহৎ নতখানি ঈষৎ সরাইয়া পরাণ্ডে অন্নপিণ্ড কবলিত করিতেছেন, কেহবা কোন পুরুষ দেবাৎ পরিবেশনস্থলে আসিবামাত্র অবগুণ্ঠনাবৃত ও কেন্নাইয়ের ন্যায় গুটাইয়া যাইতেছেন, কেহবা পীযষপূরিত স্তন সন্তানের মুখে দিতেছেন—মাতা ও পুত্রের এক সঙ্গে আহার চলিতেছে। (পৃঃ ১৫)

২৩ হরিতারণ উপর হইতে বলিতেছেন, 'ওইটে যাদুঘর,' একজন আভাসমাত্র শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'যাদু কাকে বলছে রে ভাই?' অমনি অপর একজন বলিয়া উঠিতেছেন, 'দেখ দেখ, আমাদের পুঁটির মত একটা মেয়ে, দেখ ও কাদের মেয়ে ভাই?' ইতিমধ্যে এক একবার এক একজন সাহেবকে দেখিয়া কেহ শিহরিয়া উঠিতেছেন 'ও ভাই ওই বুঝি গোরা রে ভাই'। অমনি সেদিকের দ্বার বন্ধ করা হইতেছে। (পৃঃ ৫৮—৫৯)

বামা ও হবিতারণেব প্রণয় বিবাহে পবিণতি লাভ করেনি। বামার অকালমৃত্যু তাব কাবণ। বিধবা-বিবাহ এই উপন্যাসে নির্দ্বিধায সমর্থিত হলেও তা কার্যকব হতে পাবেনি। হবিতারণ ও বামাব প্রণয, সংস্কাবমুক্ত হৃদযেব আন্তবিকতাব বসে উজ্জ্বল ও অকৃত্রিম। বামাব বোগজীর্ণ শবীব দর্শনে কাতব হবিতারণেব ক্রন্দন ও তাব মৃত্যুব পব শোকে উন্মত্তপ্রায হয়ে ওঠার দৃশ্য তাব উদাহবণ

স্ত্রীশিক্ষাব প্রযোজনীযতাব দিকটিও এই স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থটিতে স্বীকৃতি পেযেছে। 'প্রমদাব দ্বিতীয দোষ তিনি পডাশুনা কবিতে বড ভালবাসেন।' এই দোষ যে গুণেবই নামান্তব তা বলাই বাহুল্য।

প্রমদা গ্রন্থেব কেন্দ্রীয চবিত্র। একান্নবর্তী পবিবাবে শিক্ষিতা রুচিসম্পন্না কর্তব্যপবাযণা কুলবধূ সে। ভূমিকায কথিত সদ্‌গুণগুলিব পূর্ণপ্রতিফলন ঘটেছে প্রমদাব চবিত্রে। রূপেগুণে 'প্রমদা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।' অসুস্থ শ্বশুবকে শুশ্রূষা, শ্বশুবকে বাডি পাঠাইবাব জন্য নিজেব গহনা বিক্রি ক'বে অর্থসংগ্রহ, দাসদাসীব প্রতি সৎ-আচবণ, স্বামীব অনুপস্থিতিতে অসুস্থা শাশুডীকে এনে চিকিৎসাব ব্যবস্থা কবা প্রভৃতি বিষয প্রমদাব চবিত্রের সদ্‌গুণাবলীর পবিচয দান কবে। মুঙ্গেবে অসুস্থ স্বামীব অবস্থানকালে সমস্ত গহনা বিক্রি কবে নিঃস্ব রিক্ত প্রমদাব, স্বামী ও সংসাবের বাযভাব বহনেব চেষ্টা তাব চবিত্রেব মহত্ত্বনির্দেশক। সবশেষে সব-কিছু হাবিযে কেবলমাত্র অশ্রু সম্বল কবে বিধবা প্রমদাব পিত্রালযে যাবাব সংবাদ পাঠকচিত্তকে সহজেই ব্যথিত ও সহানুভূতিশীল কবে তোলে। পুরুষদেব মধ্যে প্রধান চবিত্র প্রমদাব স্বামী প্রবোধচন্দ্র। আদর্শ চবিত্ররূপে গণ্য হবার মত এই চবিত্রটিতে নানাবিধ সদগুণেব বিকাশ লক্ষণীয। বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পবিজন ভৃত্য প্রভৃতিব প্রতি যথোপযুক্ত কর্তব্যবিধান, দবিদ্রেব প্রতি অনুকম্পা ও দান, বিধবা-বিবাহেব প্রতি সমর্থন, তাব ঔদায ও মহত্ত্বেব কথাই প্রকাশ কবে। প্রবোধচন্দ্রেব চবিত্রেব অপব গুণ তাব আত্মবিশ্বাস। তাবই বলে সে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেবেছিল। হবিতাবণ কর্তব্যনিষ্ঠ ও আদর্শবাদী প্রেমিক। বামাব চবিত্রেও সদ্‌গুণেব বিকাশ লক্ষ্য কবা যায। মুঙ্গেবে প্রবোধচন্দ্রেব চরম আর্থিক অসচ্ছলতাব দিনে ৩৪ টাকা বেতনেব কাজ নিয়ে সংসারে আর্থিক স্বাচ্ছল্য আনার চেষ্টা, তাব কর্তব্যচেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হবিতারণের প্রতি তার প্রণয় গাঢ অথচ উচ্ছ্বাসহীন হওযায় অনায়াসেই

তার প্রেমতৃষিত অন্তরটি সকলের কাছে ধরা পড়েছে। এই গ্রন্থের অপর একটি চরিত্র, প্রবোধের ভৃত্য খোদাই, উল্লেখযোগ্য। প্রভু ও তার পরিবারের প্রতি চরম কর্তব্যের স্বাক্ষর রেখেছে সে। 'খোদাই' চরিত্রটি শিবনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত[২৪]।

ব্যক্তিগত জীবনে খোদাই লেখকের ভৃত্য ছিল। মুঙ্গেরে অবস্থানকালে অসুস্থ প্রবোধের চরম আর্থিক অসচ্ছলতার দিনে, ৩।৪ মাস মাহিনা বাকি থাকা সত্ত্বেও খোদাই অর্থসাহায্য করে মনিব-পরিবারের প্রতি চরম আনুগত্য ও কর্তব্যবোধের যে পরিচয় রেখেছে, শিবনাথের আত্মচরিতে খোদাই-এরও তদনুরূপ পরিচয় মেলে।[২৫]

গ্রন্থটিতে শিল্পরীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঈষৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে ঘটনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করানর রীতি উল্লেখযোগ্য। মেজবউকে উপন্যাস না বলে গার্হস্থ্য চিত্র বলাই সমীচীন। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'মেজবউ'-এর পরিশিষ্ট 'শান্তিমঠ অথবা মেজবউ-এর উপসংহার' (১৮৮৭) রচনা করেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'যুগান্তর'[২৬] বঙ্গদেশের ব্রাহ্ম-আন্দোলনের পটভূমিতে লিখিত একটি সামাজিক উপন্যাস। সর্বসমেত ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি সমাপ্ত। গ্রন্থটির ঘটনাকাল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৯

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই বৈশাখ নদীয়া জেলার নসিপুর গ্রামের বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা ভুবনেশ্বরীর বিবাহের আয়োজনের চিত্র দিয়ে গ্রন্থ শুরু। তর্কভূষণের একমাত্র জীবিতা ভগ্নী সদ্যবিধবা বিজয়া, ছেলে ইন্দুভূষণ (১০।১১) ও মেয়ে বিন্ধ্যবাসিনী (৬।৭) সহ এসে পৌঁছুলে আনন্দস্রোত ক্ষণকালের জন্য স্তিমিত হয়ে পড়ে। তর্কভূষণের পাঁচ পুত্র ও পাঁচ পুত্রবধূ। ভুবনেশ্বরীর বিবাহের ১০।১২ দিন পরে তর্কভূষণ বিজয়ার মনোবাসনা জানতে

২৪. খোদাইয়ের স্মৃতি আমার মনে পবিত্র প্রেমের উৎসস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে আমার 'মেজবৌ' নামক উপন্যাসে অমর করিবার চেষ্টা করিয়াছি—আত্মচরিত : শিবনাথ শাস্ত্রী, সিগনেট সং, পৃঃ ১৩৯।

২৫. তদেব, পৃঃ ১৩৯—৪০।

২৬. যুগান্তর, ১৮৯৫, বাং ১৩০১, পৃঃ ২৯৬।

চাইলে তিনি জানান যে, স্বামীর মৃত্যুশয্যার আদেশ তাঁর কাছে 'অলঙ্ঘনীয়' হয়ে আছে। দেবরের কাছে থাকা তাঁর কর্তব্য। বিজয়া স্বামীর কাছে লেখাপড়া শিখেছে। বাড়ির বধূদের সে মহাভারত পড়িয়ে শোনায়। স্বামীর ইচ্ছানুসারে সে বিন্দুর পড়াশুনার কথা তর্কভূষণকে জানায়। কলকাতার বেথুন স্কুলেব ছাত্রী সে। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তর্কভূষণ শেষ পর্যন্ত বিজয়ার কথায়, নসিপুরের স্কুলে বিন্দুকে পডাতে রাজী হন।

বিজয়া কলকাতায় গিয়ে ফিবে এলেন। দেবররা বিজয়া ও তার সন্তানদের ভরণপোষণেব ভার নিতে বাজী হল না। প্রতিবেশী যুবক গোবিন্দ (১৮।১৯) বিন্ধ্যকে পডায়। বিজয়ার স্বামী নন্দকিশোব ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তিনি বিজয়াকে বামমোহনের 'বিচারেব চূর্ণক', 'পৌত্তলিক প্রবোধ' এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাও পডিয়েছিলেন। ফলে, বিজয়া 'মনে মনে দেশপ্রচলিত পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি আস্থাবিহীন হইলেন, ক্রমে ধর্মভাব যেন তাঁহার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল'। বিজয়া 'আনিতম্বলম্বিত ঘননীল কেশবাশি' কেটে ছোট ক'বে ফেললেন।

তর্কভূষণের অনুমতি অনুসাবে গোবিন্দকে বিজয়া কলকাতায় শিবচন্দ্রের কাছে পাঠালেন। সে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হল। ভুবনেশ্বরী শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিতা ও মিথ্যা চুবিব দায়ে অভিযুক্তা হয়। কুলীন সংসারে তার দুর্গতির অন্ত থাকে না। হরচন্দ্র অসৎসঙ্গে পডে ও শেষে অনুশোচনা ও অন্তর্দাহের সম্মুখীন হয়। বিজয়ার প্রতি শ্রদ্ধাভাবাপন্ন হরচন্দ্র ইংরাজী শিখে কর্মগ্রহণেব অভিপ্রায় জানায়। বিজয়া তাকে অনুপ্রাণিত কবে বলেন, বামমোহন বাইশ বছর বয়সের সময় ইংরাজী পাঠাভ্যাস করে এমন শিখেছিলেন যে, তাঁর লেখা দেখে বড় বড ইংরেজীওয়ালাদের তাক লেগে যায়।' তর্কভূষণ স্থির করলেন, গ্রীষ্মের ছুটির পরে জ্যেষ্ঠাবধূ তার পুত্রকন্যারা, বিজয়া ইন্দু বিন্দু হরচন্দ্র ভবেশ কলকাতায় থাকবে।

বিজয়া সদলে কলকাতায় শিবচন্দ্রের বাড়ি এলে সকলেই সুখী হল। এবছব মতিলাল, শীলস্ ফ্রী কলেজ স্থাপন করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কিয়দংশ অতিক্রান্ত হল। দেশে তুমুল আন্দোলন আনলেন বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রচার করে। নসিপুরে তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে মীমাংসাকালে তিনি

দেশাচারকেই প্রাধান্য দিলেন। পঞ্চু বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পাণ্ডা হয়ে উঠল। শিবচন্দ্র ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাস থেকে পঞ্চু ও গোবিন্দকে বাড়ি আসতে নিষেধ করলেন। বিজয়া দেবরের বাড়ি গিয়ে নবরত্ন-সভার সভ্যদের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

নবীনচন্দ্র বসুর চেষ্টায় নবরত্ন সভা স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগরের মহৎ কর্মে সহায়তা করা এবং সুরাপান-বিরোধিতা করে হিতৈষী পত্রিকায় ইংরাজী ও বাংলা প্রবন্ধ লেখা হবে স্থির হয়। নবীনচন্দ্র বন্ধু ব্রজরাজের বাড়ি থাকাকালে ব্রজরাজের বালবিধবা বোন কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গে তার পরিচয় ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হল। ব্রজরাজের বিধবা মাসী মাতঙ্গিনী নবীনকে প্রেমপত্রে বিদ্যাসাগরের মতে তাকে বিবাহের প্রস্তাব জানাল। কিন্তু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নবীন গৃহত্যাগ করল। মাতুল শ্যামচাঁদ মিত্রের গৃহে কৃষ্ণকামিনী পূজা করতে রাজী না হওয়ায় মাতুল কর্তৃক নিগৃহীতা হল। এই ঘটনা নবীনকে পীড়া দিল। সে ভাবাবেশে মনে মনে কৃষ্ণকামিনীকে নিয়ে দেশান্তরী হবার স্বপ্ন দেখল। নবীনের জ্যাঠামশায় বৃদ্ধ হলধর নবীনের পিতার গচ্ছিত অংশ বাঁশ হাজার টাকা এবং বাড়ির দাম অনুযায়ী প্রাপ্য আট হাজার টাকা নবীন ও সুরেশকে ভাগ ক'রে দিলেন। নবীন পূজোর পরে ৭৫৲ টাকা বেতনে ফরিদপুর জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ পেয়ে চলে গেল।

'১৮৫৬ সালের ২১৮ অগ্রহায়ণ' শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরের মতানুসারে বিধবাবিবাহ করলেন। বৃদ্ধেরা বলতে লাগল, এ হল কি। এ যে দেখি যুগান্তর উপস্থিত হল। গোবিন্দের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহ না হয়ে বিজয়ার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হলে দু'মাস পরে বিন্ধ্যবাসিনী বিধবা হল।

নবরত্নের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বিজয় ও হরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। বিজয়ার মনের অনেক পরিবর্তন ঘটে। চাকুরি পেয়ে হরচন্দ্র বাসা করলে বিজয়া পঞ্চু ও গোবিন্দ সেখানে স্থান পেল।

ফরিদপুরে নবীনচন্দ্র সমাজ-সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করল। নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করল ব্রজরাজের কাছে। কৃষ্ণকামিনীর মাতুল মিত্রজমশায় কৌশলে কৃষ্ণকামিনী ও তার মাকে পশ্চিমে তীর্থে পাঠালেন। কৃষ্ণকামিনীর চিঠি থেকে নবীন জানল যে, সে কাশীতে

বন্দীজীবন যাপন করছে। কাশীতে নবীনের সঙ্গে কৃষ্ণকামিনীর বিয়ে হল। নবরত্নের সভ্যেরা সাদরে বরবধূকে বরণ করে নিল।

একদিন নারকেলডাঙ্গার খালের ধারে সধবার বেশে মাতঙ্গিনীর মৃতদেহ পাওয়া গেল। রাঙ্গামার মৃত্যুর পর নবীন চাকুরি ছেড়ে কলকাতায় এসে রাঙ্গামার বাড়ির ভিতরমহলে সপরিবারে বাস করতে লাগল এবং বাহির-মহলে বিজয়ার পরিচালনায় 'কৃপাময়ী বিধবাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তপস্যান্তে আবির্ভূত হলেন। কেশব সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তানরা উপবীত ত্যাগ করলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য যুবকরা নিগ্রহ ভোগ করতে লাগল। 'এই সকল বিবরণ শুনিয়া একদিন নবীনচন্দ্র পঞ্চুকে বলিলেন—পঞ্চু, এইবার বুঝি সত্যসত্যই যুগান্তর ঘটিল। তোমার ব্রাহ্মসমাজে ও বঙ্গদেশে বুঝি এইবার নবযুগ আসিল।'

গ্রন্থটির সামগ্রিক পটভূমিতে আছে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের আদর্শবাদ এবং প্রাথমিক পর্বের উত্তেজনা ও ইতিহাস। নসিপুর ও কলকাতার দুটি ভিন্নজাতীয় পরিবেশের ও ভিন্নরসের কাহিনীকে এই উপন্যাসে একটি সামাজিক সূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। নসিপুরের তর্কালঙ্কারের পরিবারকে কেন্দ্র করে সুখদুঃখ-বিজড়িত যে পারিবারিক কাহিনীটিকে লেখক অসীম নিষ্ঠা দিয়ে চিত্রিত করেছেন, তা পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেন শহরের কোলাহল ও চাঞ্চল্যের মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। নসিপুর থেকে কলকাতায় কাহিনী স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প যেন সমাজ-ইতিহাস ও নীতিপ্রচারের আবর্তে পথভ্রষ্ট হয়েছে। একটি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের বিধবা কন্যার নেতৃত্বে ও প্রভাবে কি ভাবে কয়েকজন যুবক ব্রাহ্মধর্মাদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একেশ্বরবাদী হয়ে প্রগতিমূলক কর্মধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত ক'রল, সেই কথাই মূলত লেখক এই উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। নসিপুরের গ্রাম্য পরিবেশে তর্কালঙ্কারের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে বিজয়ার কর্ম ও চিন্তাধারা পূর্ণমুক্তির পথ খুঁজে পায়নি। কলকাতায় এসে সেই পথ মুক্ত হল। সেই সঙ্গে নসিপুরের তর্কভূষণের পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে যে গার্হস্থ্য গল্পটি দানা বেঁধে উঠেছিল বিজয়া ও হরচন্দ্রের কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি শিথিল হয়ে ক্রমশ উত্তেজনা ও কোলাহলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

এই গ্রন্থেও শিবনাথ কয়েকটি তৎকালীন সামাজিক প্রসঙ্গ উত্থাপন

করেছেন—(১) ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ-আদর্শ (২) স্ত্রীশিক্ষা (৩) বিধবা-সমস্যা (৪) কৌলীন্য-প্রথা। শেষ তিনটি বিষয় এই উপন্যাসে প্রথমটির আধারে আশ্রয় পেয়েছে।

এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিজয়া, একটি বিধবা যুবতী। মোটামুটি তাকে কেন্দ্র করেই অপরাপর চরিত্রের ভিড় ও ঘটনার বিস্তৃতি। এই উপন্যাসে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ-আদর্শের বিষয়টি স্থানে স্থানে অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রকাশ পাওয়ায় প্রচার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বিজয়ার স্বামী নন্দকিশোর স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তার চিন্তাধারাকে ব্রাহ্মসমাজ-আদর্শানুযায়ী গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। যার অব্যবহিত ফল, বিজয়ার পৌত্তলিক ক্রিয়ার প্রতি আস্থাহীনতা ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আস্থাবোধের জাগরণ। ব্রাহ্ম-যুবকদল কর্তৃক নবরত্ন-সভা, পুতুলপূজা ও বাল্যবিবাহের বিরোধিতা প্রভৃতি বিষয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যুবসমাজের আস্থাবাদেরই প্রকাশ পায়। নসিপুরের নিষ্কর্মা যুবকদের কার্যকলাপের ভিত্তিতে লেখক যে সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন তা পৌত্তলিক পূজাপদ্ধতির প্রতি চরম আঘাতস্বরূপ। 'অমুক-ঘোষকে জব্দ করবার জন্যে প্রতিমার গণেশমূর্তি তুলে তার কাঁধে কাছা পরিয়ে অমুক ঘোষের হাতে গণেশ-জননীর অপঘাত মৃত্যু হয়েছে বলে ভিক্ষা করে 'প্রায় চারি-পাঁচ শত টাকা তুলিয়া তাহারা মহা ধুমধাম সহকারে গণেশ-জননীর শ্রাদ্ধ করিয়াছিল (পৃ ৮৪)। ঘটনা-সংস্থাপনের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় রচনাকৌশল বুদ্ধিপ্রসূত হলেও হিন্দুধর্মের পৌত্তলিক বিশ্বাসের প্রতি উদ্ধত আঘাত। এ যেন পরম উচ্ছ্বাসে' অবারিত আতিশয্য। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি'র মধ্যে হিংসার বিরুদ্ধে মত প্রতিষ্ঠাকল্পে অনুরূপ আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়।

গিরিশচন্দ্র, হরচন্দ্র ও বিজয়ার সঙ্গে কালী সম্পর্কে তর্কের বিষয় প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। কালী কালের প্রতীক ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ (পৃঃ ২৫৫) এই ধারণা গিরিশের। হরচন্দ্রের যুক্তি, কালীমূর্তি যারা কল্পনা করেছিল তাদের সঙ্গে এই ভাবনার সংস্রব নেই। রূপকের মাধ্যমে ভক্তির উদয় হয় না। তাই পূজা দেশের অনিষ্ট সাধন করেছে। যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মত প্রতিষ্ঠার এজাতীয় প্রচেষ্টা ব্রাহ্মসমাজ আদর্শ-প্রচারের কুশলী ধাপ। নবীনচন্দ্রের প্রচেষ্টায় নবরত্ন সভাস্থাপন এবং

প্রগতিবাদী আন্দোলনের পক্ষে (বিদ্যাসাগরের মহৎকর্মে সাহায্য ও সুরাপানের বিরোধিতা) 'হিতৈষী' পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ও আদর্শ প্রচারের অপর দিক। নবরত্ন-সভার সঙ্গে মেয়েদের সংযোগ (বিজয়া, কৃষ্ণকামিনী প্রভৃতি) ও সভার প্রভাব, মেয়েদের চিন্তা ও জীবনচর্যার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। নবরত্নের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে বিজয়ার মানসিক পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। ফলে বিজয়া (১) পূজাকে অবিধেয় বলে ভাবতে আরম্ভ করেছেন, (২) পরহিতকর কার্যে আপনাকে অর্পণ করার বাসনা জাগ্রত হয়েছে, (৩) প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন যা কতব্য ও ঈশ্বরের আদেশ বলে অনুভব করবেন তা থেকে নিজেকে বিচ্যুত করবেন না (পৃঃ ২৫৩)। নিষ্ঠাবান হিন্দুর ঘরের বিধবার পক্ষে প্রথম বিষয়টির অনুভূতিজনিত মানসিক পরিবর্তন উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। বাল্যবিধবা কৃষ্ণকামিনীর চরিত্রে ও এই জাতীয় ব্রাহ্ম-আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। মামার কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও সে অনেক ভেবে স্থির করেছিল গঙ্গাস্নান করবে না, পূজো করবে না। হিন্দু বিধবার এই জাতীয় মনোভাব যে ব্রাহ্ম-প্রভাবপুষ্ট একথা বলা বাহুল্য। লেখক বিবাহ পদ্ধতি সংস্কারের যে চিত্র দিয়েছেন তা পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম-আদর্শ-সূচক[২৭] (নবীন ও কৃষ্ণকামিনীর বিবাহ)।

সুস্থ সমাজগঠনের জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। লেখক প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক সামাজিক আদর্শের পার্থক্যের বিষয়টি কৌশলে উপস্থাপিত করেছেন। এবং প্রাচীন সংস্কারপুষ্ট পরিবারের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত একটি বিরোধী ভাবাদর্শের মধ্যে নারীশিক্ষার একটি সহজ স্বীকৃতি আদায় করেছেন। তর্কভূষণের মতে দশ বছর হতে না হতেই মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে, কাজেই বাংলা পড়িয়ে লাভ কি? অথচ এই তর্কভূষণ শেষ পযন্ত বিজয়ার কথায় তার মেয়ে

২৭. অবশেষে স্থির হইল পঞ্চু একটু ঈশ্বরের স্তুতি করিবেন, বরকন্যা একটি প্রার্থনা পাঠ করিবেন ও একটা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া সাক্ষীদের সমক্ষে স্বাক্ষর করিবেন, তৎপরে নবীনচন্দ্র একটা উইল লিখিয়া কৃষ্ণকামিনীকে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির স্বত্বভাগিনী করিবেন। তদনুরূপ প্রণালীতেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। যে প্রতিজ্ঞাপত্রে নবীনচন্দ্র ও কৃষ্ণকামিনী স্বাক্ষর করিলেন তাহাতে ব্রজরাজ, পঞ্চু, মিশনারী সাহেব ও পুলিসসাহেবেরও স্বাক্ষর রহিল। (পৃঃ ২৭৮)। আলোচ্যকালে অনুরূপ ঘটনা পাই :—

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নয়নতারা' (১৮৯৯) ও সীতানাথ নন্দীর 'বঙ্গগৃহ' (১৮৮৪) উপন্যাসে।

বিন্ধ্যবাসিনীর পড়ার অনুকূলে মত দিয়েছিলেন। শিবনাথ জানতেন, সামাজিক প্রগতির কালে নারীর শিক্ষা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন করে। বিজয়া ও কৃষ্ণকামিনী তার উদাহরণ।

কৌলীন্য-প্রথা ও বিধবা-প্রণয়প্রসঙ্গ প্রায় একই সূত্রে জড়িত। একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। এই কৌলীন্য-প্রথার বলিরূপে লেখক তর্কভূষণের কন্যা ভুবনেশ্বরী ও ভাগিনেয়ী বিন্ধ্যবাসিনীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। তর্কভূষণ উদার অথচ শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও প্রথাসিদ্ধ সংস্কারবাদে বিশ্বাসী। তর্কভূষণের কন্যা ভুবনেশ্বরীর বিবাহের সংবাদের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটির অবতারণা। অথচ, এই ভুবনেশ্বরী নিঃশব্দে ঘটনাপট থেকে নির্বাসিত হয়েছে শ্বশুরগৃহে। কৌলীন্য প্রথার অনুরোধে তর্কভূষণ অশিক্ষিত জ্ঞানেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভুবনের বিবাহ দিয়ে যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করলেন, তার ফলভোগ করল ভুবনেশ্বরী, শ্বশুরগৃহে স্বামী কর্তৃক নির্যাতিতা হয়ে। কৌলীন্য-প্রথার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত আশাহত ভুবনেশ্বরীর চরিত্র, কৌলীন্য-প্রথার তিক্ততম দিকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বিন্ধ্যবাসিনীর ভাগ্য ঐ একই প্রথার প্রভাবে বিড়ম্বিত। বিবাহের দুমাস পরে স্বামী চারুচন্দ্রের মৃত্যু, বিন্ধ্যবাসিনীর জীবনে অকালবৈধব্য আনল। জাতের প্রশ্ন তুলে তর্কভূষণ উপযুক্ত পাত্র গোবিন্দের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ না করে নৈহাটীর একটি সৎকুলজাত, বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী, অসৎচরিত্রসম্পন্ন ছেলের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহ দেন। কুসংস্কার, কৌলীন্য প্রথাকে আঁকড়ে ধরে সমাজে যে সংকটের সৃষ্টি করে, তারই চিত্র লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। বিধবা-প্রণয় ও বিবাহের বিষয়টি অনেকটা এই প্রথারই পরোক্ষ ফল। এই উপন্যাসে শিবনাথ বিধবাবিবাহকে সমর্থন করলেও (কৃষ্ণকামিনী) বিধবার সংযম ও সতীত্ববোধকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন (বিজয়া, বিন্ধ্যবাসিনী)। আবার এরই পাশে লালসাজাত বিধবার প্রণয়ের তিনি ভয়ংকর চিত্র এঁকেছেন (মাতঙ্গিনী)।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে তর্কভূষণের বিধবা বোন বিজয়া। বিজয়ার শিক্ষা, সংস্কার, স্বামীর সান্নিধ্য এবং পরবর্তীকালে নবরত্ন-সভার সংস্পর্শ, তার জীবনকে সংযম ও কর্তব্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ব্যক্তিত্ব দীপ্ত করে তুলেছে। বিধবা বিজয়ার জীবনাদর্শে স্বামিপ্রেম ও সতীত্ববোধ মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছে। বিজয়ার কন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর বৈধব্য, অকালবৈধব্য হলেও

ব্যক্তিপ্রেমবিমুখ। গোবিন্দ তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না জানালেও ব্রতচারিণী বিধবা বিন্ধ্যবাসিনী গোবিন্দকে বিয়ে না করে 'কৃপাময়ী বিধবাশ্রমে' শিক্ষিকা হয়ে থাকে। সংযমনিষ্ঠা, সতীত্ববোধ এবং সেবাব্রত, বিধবার চরিত্রের এই সমন্বিত আদর্শ, বিধবা সম্পর্কে শিবনাথের চিন্তার একদিক। অপর দিকে, তিনি বিধবা-বিবাহের গোঁড়া সমর্থক। বিধবা-বিবাহের সঙ্গে বিধবা-প্রণয়প্রসঙ্গও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়িত। কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গে নবীনের প্রণয় এবং অভিনব পদ্ধতিতে বিবাহের মধ্য দিয়ে শিবনাথ বিধবা-প্রণয়সঞ্জাত বিবাহের কল্যাণপ্রদ দিকটি সমর্থন করেছেন। তিনি উভয় চরিত্রের স্বরূপ পরিস্ফুট করে উভয়ের মিলনের ব্যক্তিগত ও সমাজগত কল্যাণের দিকটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। উভয়ের প্রণয় এবং বহু বিপত্তির ধাপ অতিক্রম করে পরিণয়ে সেই প্রণয়ের পরিণামকে, তিনি আনন্দ-মধুর করে তুলেছেন। এরই পাশাপাশি মাতঙ্গিনীর সকাম প্রণয়তৃষ্ণার বেদনাকর অথচ ভয়াবহ পরিণাম তিনি চিত্রিত করেছেন। প্রেমপত্রের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের মতে নবীনকে বিবাহের প্রস্তাবের ফলে মাতঙ্গিনীর আকাঙ্ক্ষাতপ্ত প্রেমতৃষিত মনটি বড় নির্লজ্জ ও নগ্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নবীনের প্রেমবিমুখ হয়ে উমাশঙ্করের সংস্রবে মাতঙ্গিনী অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার পথ খুঁজে পেল। উভয়ের অবৈধ সম্পর্ক মাতঙ্গিনীর মৃত্যুর কারণ হল। মাতঙ্গিনীর সকাম প্রেম, লালসার আগুনে প্রজ্বলিত। তাই কৃষ্ণকামিনীর প্রেমের পরিণতি বিবাহে, মাতঙ্গিনীর হত্যায়।[২৮] বিধবার সামাজিক জীবন সম্পর্কে শিবনাথের তিনটি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হয়েছে এই উপন্যাসে।

(১) বিধবার সংযম, সতীত্ববোধ এবং বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য।

(২) আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ প্রণয়ের পরিণতি রূপে বিধবা বিবাহ।

(৩) লালসাজাত প্রণয়ের ভয়ংকর পরিণাম।

অজস্র চরিত্র উপন্যাসটিকে ঘটনাসূত্রে জড়িয়ে বৈচিত্র্য দান করেছে। নসিপুরের পটভূমিতে রচিত কাহিনীর সঙ্গে তর্কভূষণের সম্পর্ক নিবিড়। পরোপকারী, দাতা, অতিথিবৎসল, সহানুভূতিশীল এবং একটি বিস্তৃত মনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন সংস্কার ও জীবনাদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত

২৮ কৈলাস চক্রবর্তীর বিধবা কন্যা নিস্তারিণীর (১৯।২০) অবৈধ গর্ভের বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (৯ম পরিচ্ছেদ)।

তিনি নন। ইংরাজী শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার যেমন বিরোধী, তেমনি কৌলীন্য-প্রথার নিষ্ঠাবান সমর্থক। নিজবর্ণ ও ধর্ম সম্পর্কে তিনি গর্বিত। 'কবে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণেব মাথায পা তুলবে' সেই চিন্তায তিনি চিন্তিত। নসিপুরের গ্রাম্য পবিবেশে একটি বলিষ্ঠ কর্তব্যপবাযণ অথচ দেশাচাববাদী, প্রাচীন সংস্কাব-ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেব চবিত্ররূপে তর্কভূষণ একটি উজ্জ্বল সৃষ্টি।

বিজয়া উপন্যাসটিব দুই পটভূমিব্ সূত্রে জড়িত। শুধু তাই নয়, তাব স্থান পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাও তাকে অনুসরণ কবে চলেছে। শিক্ষিতা, যুক্তিপবাযণা, কর্তব্যপবাযণা ও সতীত্ববোধসম্পন্না নাবীরূপেই কেবল নয়, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী ক্ষমতায বিজয়া চুম্বকেব মত অজস্র চবিত্র ও ঘটনাপুঞ্জকে আকৃষ্ট কবে বেখেছে। বিজযাব সংস্পর্শে এসে হবচন্দ্রেব পবিবর্তন, পঞ্চুর আত্মসমর্পণ, নিঃসন্দেহে তাব চবিত্রেব বলিষ্ঠতা সূচিত কবে। বিজয়ার মনে তিনটি বিশ্বাস জাগ্রত। (১) পরমবস্তু বা পবমপুরুষই সাব, জগৎ তাঁর আববণ মাত্র, (২) বিশুদ্ধ প্রীতি ও ভক্তিব দ্বাবাই ঈশ্ববকে লাভ করা যায, (৩) পবমপুরুষকে লাভ কবাব উপায ভগবৎকৃপাব উপব নির্ভব কবা। এই বিশ্বাসত্রয ধাবণ কবে বিজয়া সমাজহিতার্থে আত্মনিযোগ কবেছে। তবে, বিজয়াব চবিত্রে প্রচাবধর্মী মনেব ছাপ স্পষ্ট। আদর্শের অতিবঞ্জন অনেক ক্ষেত্রে চবিত্রটির বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ করেছে। বিজয়ার পার্ষদবর্গ পঞ্চু, গিবিশচন্দ্র, হবচন্দ্র প্রভৃতি চবিত্রগুলি অনেকটা নির্জীব পুতুলেব মত। রামছবি, জহবলাল, চিনু ঘোষ প্রভৃতি খল ও দুষ্ট চবিত্রেব মানুষগুলি, গ্রাম্য পবিবেশে যথাযথ ভাবে চিত্রিত। নবীনচন্দ্র ও কৃষ্ণকামিনীব চরিত্রেব মূলেও আদর্শ বর্তমান। নবীনচন্দ্র যেন ব্রাহ্ম-আদর্শেব মূর্ত বিগ্রহ। নববত্ন সভা স্থাপন, বিভিন্ন সমাজ-সেবামূলক কাজ, ফলে ম্যাজিস্ট্রেটেব প্রশংসা অর্জন, এমন কি হেডমাস্টাবের স্থলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া উচিত বলে ঘোষণা প্রভৃতি বিষয় নবীনেব আদর্শবাদিতাব স্বীকৃতি ও গুণাবলীব পরিচাযক। নবীনচন্দ্রের প্রেমনিষ্ঠা, ও সংযমবোধ ও তাব চরিত্রকে আদর্শের গৌববভূষিত করেছে। সর্বোপরি ব্রাহ্ম-সমাজে ও বঙ্গদেশে নবযুগ আনাব ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্রের দান, স্বীকৃতি পেয়েছে এই উপন্যাসে। কৃষ্ণকামিনীব প্রণযভীরু মন, সংযম ও নিষ্ঠা তাব চবিত্রকে মাধুর্য দান করেছে। মাযেব জবানীতে নবীনচন্দ্রকে চিঠি লেখার কালে কৃষ্ণকামিনীর হাত 'স্বিন্ন' হযে আসা ও কণ্ঠতালু শুকিয়ে যাওয়ার

মধ্যে (পৃ ১৮৩) তার প্রণয়কম্পিত মনটি অনাবৃত হয়ে পড়ে। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণকামিনীর কথোপকথনের মধ্যে তার অভিমান ও ক্রন্দন তার প্রণয়-কাতর মনের গভীরতম স্তরটি উদ্ঘাটিত করে (পৃ ১৮৪)। কৃষ্ণকামিনীর চরিত্রে ব্রাহ্ম-প্রভাব ও তজ্জাতীয় আচরণ স্বাভাবিকতা লাভ করেনি। কৃষ্ণ-কামিনী নবরত্ন-সভার প্রত্যক্ষ সভ্যা ছিল না। সভার প্রতি আস্থা মাত্র ছিল। সেই আস্থাবলে গঙ্গাস্নান ও পূজা না করা জাতীয় মনোভাব অতিরিক্ত এবং অন্ধবিশ্বাসজাত। কৃষ্ণকামিনীর বিপরীতে মাতঙ্গিনী-চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক কৃষ্ণকামিনীর চারিত্রিক দৃঢ়তা সংযম ও ধৈর্যের অশেষ পরিচয় তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসটির গল্পাংশ এত শিথিল ও বিশৃঙ্খল যে, কোন একটি নির্দিষ্ট গল্পের ধারা অনুক্রম করে উপন্যাসটি পরিণতি লাভ করেনি। চরিত্র ও ঘটনার অজস্র সমাবেশে সংহতিহীন বৈচিত্র্য লাভ করলেও উপন্যাসটিকে সামাজিক ঘটনাপুঞ্জের চিত্রাবলী বলাই অধিক সঙ্গত। নবীনচন্দ্র ও কৃষ্ণকামিনীর প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে গল্পের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, উপন্যাসটির ঘটনাপুঞ্জের স্রোতধারায় এই কাহিনী কখনো ডুবেছে কখনো উঠেছে। একটি নিরবচ্ছিন্ন সূত্র ধরে কাহিনীটি পরিণামমুখী হতে পারেনি। নবীনচন্দ্র ও কৃষ্ণকামিনীর কাহিনীর সূত্রপাতই চতুর্দশ পরিচ্ছেদ থেকে[২৯]। উপন্যাসটি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্ম-সমাজ আন্দোলনের একটি স্ফীত দলিল বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্যে' 'যুগান্তর'-এর দীর্ঘ সমালোচনা আছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর পরবর্তী উপন্যাস 'নয়নতারা'[৩০] একটি পারিবারিক উপন্যাস। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক প্রগতির সমর্থন ও নিয়ন্ত্রণ, কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা ও সংস্কারমুক্তির আলেখ্য পাই এই উপন্যাসে। ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রসঙ্গ ও শিবনাথ এই উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। অপর উপন্যাস-গুলির মত এইটিতেও নারীর স্বাধীনতা, শিক্ষা, প্রণয়বোধ ও নারীত্বকে শিবনাথ অন্যতম উপজীব্য বিষয়রূপে গণ্য করেছেন। এই উপন্যাসে সতীত্বের আধারেই লেখক নারীত্বকে স্থাপন করেছেন। সতীত্বকে অস্বীকার করে, নারীত্ব ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথ ধরে বেপথু হয়নি। নারীর বিকশিত ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত জীবনে আকাঙ্ক্ষাসিদ্ধির অন্তরায়ের সম্মুখীন হলেও তা অপ্রাপ্তির

২৯. ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি সমাপ্ত।

৩০. নয়নতারা (১৮৯৯) প ২৬২।

বেদনায় অধর্ম বা অসত্যকে গ্রহণ করে আত্মস্খলনের পথ ধরেনি বরং ধর্মপথেই জীবনের সান্ত্বনা ও সার্থকতাকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। এই উপন্যাসের নায়িকা, প্রেমবিড়ম্বিত নয়নতারা, শেষে পার্থিব বন্ধন ও আকর্ষণ ছিন্ন করে, মুঙ্গেরে সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে পরমার্থকে পেতে চেয়েছে। সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের অনেকেই প্রেমবিড়ম্বিত নরনারীর জীবন-পরিণতি সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের মধ্যেই নির্দেশ করেছেন।[৩১]

নয়নতারায় একটি প্রগতিশীল পরিবারের জীবনযাত্রার চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন। এই পরিবারের সূত্র ধরে ঘটনা ও চরিত্রের ভিড় এবং তারই ফলে উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি। ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি একদিকে যেমন ইংরাজ অনুকারী উৎকট ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি ভারতবর্ষীয় সমাজধারাকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করে ভারতীয় আদর্শের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করতে চেয়েছিল। নয়নতারায় এই উভয়বিধ ধারার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। বাঁকুড়ার ডাক্তার ন্যাণ্ডে ও রায়মশায়ের ছেলে সুরেশ ও যোগেশ এই জাতীয় ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রতিনিধি। ডাঃ ন্যাণ্ডের কথায় ও আচরণে অভারতীয় ভাবের পরিচয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তার বাংলা ব্যাকরণ ভুলে যাওয়ার কথা সগর্বে ঘোষণা (ইউ সি আই এ্যাম নিয়ারলি ফরগেটিং মাই বেঙ্গলি গ্রামার), নয়নতারাকে 'মহাশয়' বলে ডাকা প্রভৃতি বিষয় বিজাতীয়তার প্রতি এই জাতীয় সমাজের সামাজিকদের অশেষ শ্রদ্ধার সাক্ষ্যবাহী। সুরেশ ও যোগেশের বন্ধুবর্গসহ মদ্যপান, ইংরাজ-প্রভাবিত প্রগতির বিকৃত রূপটি সহজেই উদ্ঘাটিত করে। ডাঃ ন্যাণ্ডে, স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে'র রমানাথে ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী'র ব্যারিস্টার চ্যাটার্জীর গোত্রীয়। অপরপক্ষে রায়মশায় স্বয়ং এবং কন্যা নয়নতারার মধ্যে এই প্রগতির একটি সহজ অথচ সংযত স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যায়, যা ভারতীয় সমাজ-আদর্শের সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্যমূলক। শিবনাথ বিশ্বাস করতেন, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতা, নারীসমাজকে নবতর সত্যে বিশ্বাসী

৩১. কালীময় ঘটক: ছিন্নমস্তা (১৮৭৮), গিরিশচন্দ্র ঘোষ: চন্দ্রা (১৮৮৭), কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়: যোগিনীজীবন (১৮৮৭), শরৎচন্দ্র সরকার: প্রেমের সন্ন্যাসী (১৮৮৮), ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়: অমৃত পুলিন (১৮৮৮) সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য: ফুল (১৮৯১), প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ.: নবীনা (জননী ১৮৯১)।

করে, সমাজের একটি মহৎ সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত করতে পারে। সেই বিশ্বাসের রূপদান করেছেন তিনি এই উপন্যাসে। আত্মচিন্তা, ঈশ্বরবিশ্বাস ও সদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, প্রগতির লক্ষ্যহীন রথচক্রকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাকে যে কল্যাণকর করা চলে এমন একটি আশ্বাসের পথ লেখক দেখাতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসে আনীত ব্রাহ্ম-ধর্ম ও সমাজ-প্রসঙ্গ একান্তভাবেই প্রচারমূলক। কালীপদ রায়ের গৃহে ব্রহ্ম-সভা স্থাপন ও হিন্দু-বিবাহ-সংস্কারের (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ) বিষয় উদ্দেশ্যমূলক। এই পদ্ধতি ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতবাহী[৩২]।

প্রণয়ী-নির্বাচনে নারীর অধিকারবোধকে শিবনাথ এই উপন্যাসে স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতাজনিত নারীর বিকশিত-ব্যক্তিত্বই এজন্য দায়ী। এই উপন্যাসে নয়নতারা ও সৌদামিনীর মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রণয়ী-নির্বাচনের ভার তারা নিজেদের হাতেই তুলে নিয়েছিল। একজনের প্রণয়-বিবাহে পরিণতি লাভ করেছিল (সৌদামিনী) এবং অপর-জনের করেনি (নয়নতারা)। তার কারণ, নিষ্ঠাহীনতা নয়,—উভয়ের চরিত্রের নীতিগত ধারণার পার্থক্য।

একটি অবরোধ-প্রথাহীন প্রগতিবাদী এমন একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত, সেখানে তৎকালে ২২।২৩ বছরের মেয়ের অবিবাহিতা থাকা (নয়নতারা) এবং যুবকযুবতীদের স্বাধীনভাবে মেলামেশার অধিকার সমর্থিত; এই পরিবারে বাপের সঙ্গে ছেলে নিঃসঙ্কোচে তার বোনের প্রণয়-প্রসঙ্গ উত্থাপন করে (প্রথম পরিচ্ছেদ) এবং পনের বছরের প্রায় যুবতী মেয়ে টুনি, গৃহশিক্ষক হরেন্দ্রকে অসংকোচে চুম্বনের অধিকার পায়। হরেন্দ্রের ঘাড়ে পড়ে টুনির 'গল্প গেলা'র চিত্রও এই সঙ্গে স্মরণীয়। (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ)। পনের বছরের মেয়ের এই জাতীয় আচরণকে লেখক বয়সোচিত সারল্য জ্ঞান করেই হয়ত বা সমর্থন জানিয়েছেন।

বাল্য-বিবাহের একটি ভয়ংকর পরিণতির চিত্র, লেখক এই উপন্যাসে একটি সংকীর্ণ পরিসরে অঙ্কন করেছেন। কৌলীন্য-প্রথার চাপে বাল্য-বিবাহ কেবল অকালবৈধব্য আনে না, কিশোরী স্ত্রীর অকালমৃত্যু পারিবারিক জীবনে গুরুতর সংকটেরও সৃষ্টি করে। অবিনাশের কিশোরী প্রসূতি স্ত্রীর সূতিকা-

৩২. 'যুগান্তর'-এ এই ধরনের বিবাহ-পদ্ধতির চিত্র লেখক পূর্বেই দিয়েছেন।

রোগে অকালমৃত্যুর মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরে (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ) লেখক এই সামাজিক ক্ষতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

উপন্যাসটির গঠন-পরিকল্পনায় শিবনাথ কুশলী মনের পরিচয় দিয়েছেন। হরেন্দ্র ও নয়নতারার প্রণয়-প্রসঙ্গ এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসূত্রে জড়িত। উপন্যাসটির গঠন-সংহতির এটি অন্যতম কারণ। নয়নতারার সঙ্গে হরেন্দ্রের প্রণয়ের বিষয়টি বিশেষ কৌশলের সঙ্গে ধাপে ধাপে তুলে ধরে, লেখক তাদের প্রণয়ের পরিণতির সর্বশেষ স্তরটি নির্মাণ করেছেন। চুঁচুড়া স্টেশনে নয়নতারার প্রতি অশ্লীল আচরণের জন্য হরেন্দ্র কর্তৃক যুবকদ্বয়ের প্রহৃত হবার ঘটনা, হরেন্দ্রের প্রতি নয়নতারার আস্থা ও আকর্ষণের প্রাথমিক কারণ ('এইরূপ পুরুষের আশ্রয়েই থাকতে হয়'-- নয়নতারার আত্মচিন্তা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। নয়নতারার জন্মদিনে শিবপুর কোম্পানির বাগানে হরেন্দ্রের মনোবাসনা (নয়নতারাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া সেই মুখখানি নিজ বক্ষস্থলে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করেন 'বল আমাকে ভালবাস কিনা') ও নয়নতারার ইঙ্গিত-পূর্ণ উক্তি ('এমনি আমার প্রত্যেক জন্মদিনে আমার সঙ্গে থাকবেন ত'), উভয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষিত হৃদয়টি যেন একেবারে অনাবৃত করে দেয়। (সপ্তম পরিচ্ছেদ) এমনিভাবে ইঙ্গিত ও আবেদনের মধ্য দিয়ে এই দুটি নরনারীর হৃদয় একটি শুচিস্নিগ্ধ প্রণয়ভূমিতে এসে উপনীত হয়। নায়ক-নায়িকার প্রণয়-সংঘটন ও বিকাশের ক্ষেত্রে একটি পরিচ্ছন্ন, রুচিসম্মত এবং মনস্তাত্ত্বিক শিল্পী-রীতি-অনুসৃতির পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

চরিত্রসৃষ্টিতে শিবনাথ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে সমবেদনার মিশ্রণ শিবনাথের চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতার প্রাথমিক কারণ। নয়নতারা উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। একটি উদার প্রগতিশীল পরিবারের শিক্ষিতা কন্যা নয়নতারা, সর্বধর্মের সত্যকে স্বীকার করে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত রচনাবলীর সঙ্কলন-গ্রন্থ পাঠ ও জীবনের সর্ববিধ সুখের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, তার শয্যাগ্রহণ পূর্বের নিত্যকর্ম। নয়নতারার ধর্ম, প্রেমধর্ম , -'ঈশ্বরই প্রেমস্বরূপ, তিনি প্রেমে বাস করেন'। মুঙ্গেরে বাসকালে নয়নতারা ঈশ্বরের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছে। নিষ্ঠা, নয়নতারা-চরিত্রের উল্লেখযোগ্য গুণ। হরেন্দ্রের প্রতি তার প্রণয়ে কৃত্রিমতার চিহ্নমাত্র নেই। দাদার ব্যঙ্গ ও বাধা এবং অন্যান্য ব্যক্তির বিবাহেচ্ছা (ডাঃ ন্যাণ্ডে, ব্যারিস্টার

ব্যানার্জী) নয়নতারাকে সত্যভ্রষ্ট করেনি। তার ব্যক্তিগত প্রেম, পরিণামে ব্যর্থতার বেদনা বহন করে আনলে, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রেমে সর্বসমর্পণতার মধ্য দিয়ে পরম সান্ত্বনার সন্ধান পেয়েছে। ত্যাগের গৌরবমুকুট ধারণ করে, তার প্রেম একটি মহৎ আদর্শ স্থাপন করেছে। নয়নতারা সর্বগুণান্বিতা। সে পরদুঃখকাতরা, সেবিকা ও দানশীলা। সংসারে নয়নতারাই কর্ত্রী। পিতৃবন্ধু মণিলাল তাকে 'জুয়েল' বলে অভিহিত করে। বাক্যে ও আচরণে সে সংযত চরিত্রের। থিয়েটার দেখতে গিয়ে ব্যানার্জী সাহেবকে ধরা না দিয়ে দাদার পাশে বসা এবং ব্যানার্জীর ঈঙ্গিত, গূঢোক্তি, প্রণয়োচ্ছ্বাস কিছুরই মধ্যে প্রবেশ না করা, তার সংযমনিষ্ঠ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। উদ্ভিদ-বিদ্যা, সংস্কৃত, ইংরাজীকাব্য, বৈষ্ণবকাব্য প্রভৃতি পাঠে আগ্রহ এবং 'পিতা-পুত্রীতে চন্দ্রালোকে বোটের ছাতে বসিয়া পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে অনেক আলাপ' প্রভৃতি বিষয় তার জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃহার গুরুত্ব প্রকাশ করে। নয়নতারার ভ্রাতৃপ্রীতিও উল্লেখযোগ্য। পিতার মৃত্যুর পর তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গৃহে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। বন্ধুবর্গ সহ ভাইদের মাতলামি বন্ধ হয়, ভাই যোগেশ নয়নতারার হস্তক্ষেপে মদ্যপান ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করে। হরেন্দ্রের প্রতি সুরেশের অশিষ্ট উক্তিজনিত অপমানের প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্যন্ত নয়নতারার বাড়ি না ফেরার প্রতিজ্ঞা, তার আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্ববোধের গভীর পরিচয়বাহী। গৃহত্যাগের পূর্বে ভাই যোগেশের কাগজে লিখে পাঠান অনুরোধ, ('সিস্টার। ডোণ্ট লিভ আস, উই শ্যাল গ্রো ওয়ার্স') নয়নতারার প্রতি আত্যন্তিক বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে। ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতিজাত প্রগতিকে স্বী-করণ করে এবং দেশীয় ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে, শিবনাথ নারী-চরিত্র-সৃষ্টিতে যে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, নয়নতারা তার উদাহরণ। এই উপন্যাসের নায়ক একটি দরিদ্র পরিবারের উচ্চশিক্ষিত যুবক হরেন্দ্র। বহুগুণবিশিষ্ট এই চরিত্রটিকে নয়নতারার সমমর্যাদা লাভের অধিকারী করে লেখক সৃষ্টি করেছেন। তার অপার সহানুভূতি, কর্তব্যচেতনা ও ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত, তার চরিত্রকে গৌরবভূষিত করেছে। নয়নতারার সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে একসময়ে ভুল-বোঝাবুঝির অবকাশ থাকলেও, নয়নতারার প্রতি তার ভালবাসায় কোথাও দ্বিধা কিংবা আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করা যায় না। নয়নতারার ধর্মজীবনের পথ মুক্ত করে দিয়ে প্রণয়িনীর প্রতি সে কর্তব্যচেতনার পরিচয় রেখেছে।

হরেন্দ্র নির্ভীক, সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ। গঙ্গাবক্ষ থেকে নিমজ্জমান যুবতীকে উদ্ধার, পাহারাওয়ালার ঘুষ নেওয়ার প্রতিবাদে কারাবরণ, নয়নতারার প্রতি আপত্তিকর আচরণহেতু অশিষ্ট যুবকদ্বয়কে শিক্ষাদান প্রভৃতি তার পূর্বোক্ত গুণাবলীর পরিচয়। ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য হরেন্দ্র একজন সমাজ-সংস্কারক। কিন্তু সর্বোপরি হরেন্দ্র প্রেমিক। তার প্রেম ত্যাগের গৌরবে উজ্জ্বল। নয়নতারার অনুপস্থিতি হরেন্দ্রের মনে শূন্যতার সৃষ্টি করে। তাই নয়নতারাহীন চুঁচুড়া তার কাছে বিষবৎ মনে হওয়ায় বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ নিয়ে সে কলকাতায় চলে যায়। লেখক হরেন্দ্রের চরিত্রে বাস্তবতা ও আদর্শবাদের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

রায়মশায় অর্থাৎ কালীপদ রায়ের চরিত্রটি উদারতা, মহত্ত্ব ও স্নেহে-প্রেমে আকর্ষণীয়। চুঁচড়ায় তার বাড়িকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের ঘটনাজালের বিস্তৃতি। রায়মশায় সংস্কারক কিন্তু পরমতসহিষ্ণু। স্বনির্ণীত পদ্ধতিতে কন্যার বিবাহ দিয়ে, বিবাহ-সংস্কারের গুরুত্বকে তিনি প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুর পূর্বকালে উপলে পরহিতের জন্য অর্থবরাদ্দ করে রায়মশায় চরম ঔদার্যের উদাহরণ রেখেছেন। আদর্শ পিতা ও সামাজিক রূপে শিবনাথ, রায়মশায়ের চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন। ছোটবড় বহু চরিত্রের অবতারণা করেছেন লেখক এই উপন্যাসে। মণিলাল, ব্যারিস্টার ব্যানার্জী, তারাপদ রায়, বিদ্যারত্ন, সুরেশ, যোগেশ, রায়গৃহিণী, ডাক্তার ন্যাণ্ডে, সৌদামিনী, গোবিন্দ প্রভৃতি চরিত্র উপন্যাসটির মধ্যে একদিকে যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে তেমনি উপন্যাসটিকে পরিণামমুখী করে তুলতে সহায়তা করেছে।

গোবিন্দ ও সৌদামিনী চরিত্রদ্ব অপর এক প্রেমিক যুগলরূপে নয়নতারা ও হরেন্দ্রের বিপরীতে চিত্রিত হয়েছে। দুশ্চরিত্র গোবিন্দ, যে চিরদিন বাজারের মেয়ের সঙ্গে মিশেছে সে নয়নতারা ও তাদের পরিবারের প্রভাবেই চরিত্র ফিরে পেয়েছে।

সৌদামিনী স্বার্থপর। অসুস্থ বাবাকে ফেলে নয়নতারা বিবাহ করতে আপত্তি করলেও সৌদামিনীর লজ্জাহীনতা বিবাহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাধার সৃষ্টি করে নি। পিতার অভিপ্রায়কে মেনে নেওয়ার মধ্যে সৌদামিনীর পিতৃভক্তির কোন পরিচয় অপেক্ষা, তার স্বার্থপরতা ও নির্লজ্জতার রূপটি প্রকট হয়ে ওঠে।

শিবনাথ শাস্ত্রীব 'নয়নতারা'য় তাঁব প্রচারধর্মী মন অনেকটা সংযত ও সচেতন। এই উপন্যাসে সর্বধর্মের সত্যতা স্বীকৃত হলেও তা যেন পবোক্ষভাবে ব্রাহ্ম-সমাজের ঔদার্য ও সহনশীলতার দৃষ্টান্তবিশেষ। পারিবারিক উপন্যাস হিসাবে নযনতারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বচনা। নযনতারায প্রচাবধর্মিতা শীর্ণতা লাভ করে শিল্পেব মর্যাদা লাভ কবেছে। আর যুগান্তব-এ প্রচাবধর্মিতা উপন্যাস-টিকে শিল্পেব সংকীর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যুগান্তর অপেক্ষা নযনতাবা উন্নততব শিল্প বচনা।

শিবনাথেব উপন্যাসে সামাজিক চিত্র কোথাও কোথাও উপন্যাসেব কাহিনীকে গ্রাস কবেছে। এব কাবণ, সামাজিক ইতিহাসেব প্রতি শিবনাথেব গভীব আগ্রহ। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, তাঁব সামাজিক উপন্যাসগুলিকে তাঁর 'সামাজিক ইতিহাসেব খসডা' বলে মনে কবেন এবং 'সেই কাবণেই বোধ কবি সামাজিক ইতিহাসখানা লিখিবাব পবে তিনি আব সামাজিক উপন্যাস লিখিবাব প্রয়োজন বোধ কবেন নাই'।[৩৩] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'বামতনু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শিবনাথ শাস্ত্রী-বচিত শ্রেষ্ঠ সামাজিক ইতিহাস।

৩৩. শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক, প্রথম খণ্ড।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯১৯)

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক। একথা সত্য যে ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য। উদ্দেশ্যমূলকতার সঙ্গে ব্যঙ্গ সাহিত্যের আয়ুর সম্পর্কও জড়িত। যুগ-প্রয়োজনেই ব্যঙ্গ-সাহিত্যের উদ্ভব। তাই যুগাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই সাহিত্যের আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসে। ব্যঙ্গ রচনার প্রেরণার মূলে থাকে সমাজ ও সংসারের মঙ্গলসাধন। এই মঙ্গলসাধনের পথ হিতোপদেশের মধ্য দিয়েও প্রদর্শন সম্ভব, কিন্তু শিল্পের মধ্য দিয়ে এই প্রচেষ্টা আরও প্রত্যক্ষ ফলদায়ক। মানব-কল্যাণই ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ-সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা। ত্রৈলোক্যনাথের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনও তাঁকে পরবর্তীকালে ব্যঙ্গ-শিল্পীর পদ-গ্রহণের পথ নির্দেশ করেছিল। সময়ের গুণ ও ব্যক্তির বিশেষ গুণের সমন্বয়ে যে ব্যঙ্গ-শিল্পের উদ্ভব, ত্রৈলোক্যনাথ সৃষ্ট ব্যঙ্গ-শিল্পের ক্ষেত্রেও সেই সূত্র বর্তমান।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম জীবনের শোচনায় অভিজ্ঞতা, দুঃখ-দারিদ্র্য এবং সীমাহীন ক্লেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তাঁর অপার মনুষ্যত্ববোধ এবং তীব্র আত্মসম্মান-চেতনা। জীবনে কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হলেও তিনি আত্মসম্মানবোধকে জলাঞ্জলি দেননি। সম্ভবত পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠা পাবার এটাই তার অন্যতম কারণ। তার কর্মজীবন দেশসেবারই নামান্তর। মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য তাঁর প্রয়াস মানবসেবার উজ্জ্বল পরিচয়। দেশীয় শিল্পের প্রসারকল্পে সমাজের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বিলাতের শিল্প-প্রদর্শনী (১৮৮৬) উপলক্ষে বিলাতযাত্রা, ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের জন্য গাজরচাষের মধ্য দিয়ে তাদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা প্রভৃতির মূলে আছে তাঁর দেশসেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও গভীর মানবিক বোধ। দুর্ভিক্ষের তিক্ততর অভিজ্ঞতা তাঁর প্রথম জীবনে ঘটেছিল। উখড়া (রাণীগঞ্জ) স্কুলে শিক্ষকতাকালে তৎকালীন দুর্ভিক্ষের তীব্রতা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। স্থানীয় শিশুদের জীবনরক্ষাকল্পে সেইকালে তাঁকে অর্ধাহার ও অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছে। ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত করেছেন শীতল জল পান করে। তাই

ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিজ্ঞা—'যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে, এইরূপ কার্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করিব। সেইদিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবশ্যক শিখিতে লাগিলাম। —কিন্তু কি করিব, সকলেই আপনার নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। যাহাতে দেশের দুঃখমোচন হয়, এইরূপ চিন্তা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন, বড়জোর না হয় ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে একদিন কি দুইদিন আহার দিয়া থাকেন। কিন্তু গরীবদুঃখী লোকেরা চিরকালের জন্য যাহাতে একমুঠা অন্ন পায়, এরূপ কার্যে ক'জনের দৃষ্টি আছে?' ত্রৈলোক্যনাথের এই প্রতিজ্ঞা থেকে তাঁর চরিত্রের তিনটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, মানুষের দারিদ্র্য ও দুঃখমোচনে ত্রৈলোক্যনাথের আগ্রহ ও চেষ্টা, দ্বিতীয়ত, দুঃখী মানুষের জন্য স্বভাব সহানুভূতি, তৃতীয়ত, মানুষের স্বার্থপরতার জন্য বেদনাবোধ। কর্মজীবনে সরকারী কর্মচারী ত্রৈলোক্যনাথকে দেশসেবা ও মানব-কল্যাণের যে ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গেছে, কর্মজীবনোত্তরকালে সাহিত্য-সাধনার কালেও তাকে সেই ভূমিকাই গ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতাজনিত প্রতিজ্ঞা তাঁর কর্মধারাকে চিরদিন নিয়ন্ত্রিত করেছে। একথা তাঁর কর্মজীবন ও অবসরজীবন তথা সাহিত্যিক জীবন, উভয় জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ত্রৈলোক্যনাথের কর্মজীবনও বৈচিত্র্যপূর্ণ। যৌবনে কটক জেলায় পুলিস-দারোগার চাকরি। তার পূর্বে বীরভূমের দুটি স্কুলে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে সাজাদপুর স্কুলে শিক্ষকতা। উখড়া স্কুলে শিক্ষকতার পরে সরকারী চাকুরি,—কৃষি, বাণিজ্য ও স্ট্যাটিসটিকস বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদ-গ্রহণ। অবসরগ্রহণের শেষ ক'বছর কলকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটারের পদ। ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য জীবনের শুরু তার কর্মজীবনের শেষপাদ থেকে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম জীবনের প্রতিজ্ঞার সূত্রে আমরা তাঁর মানসিক প্রবণতার যে পরিচয় পাই, তার সৃষ্ট শিল্পের মধ্যে অনুরূপ মানসিকতাই প্রতিফলিত হতে দেখি। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে দেশের সাময়িক আনুকূল্য তাকে ব্যঙ্গ-সাহিত্যিকের দুর্লভ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ব্যঙ্গ-রসিকের দৃষ্টি নিয়েই তাঁর আবির্ভাব। মানবপ্রেমিক ত্রৈলোক্যনাথ স্বার্থপর নৃশংস মানুষকে একেবারে স্বার্থশূন্য হতে বলেন নি।

কারণ তিনি জানতেন মানুষ দেবতা হয় না; তা হলেও তিনি এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, মানুষ যদি আর একটু স্বার্থত্যাগী ও সহৃদয় হয় তবে পৃথিবী হয়ত আর একটু ভদ্রভাবে বাসের উপযোগী হতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথের ক্রোধ মানুষের ভণ্ডামির উপর। 'ভলটেয়ারের ক্ষেত্রে যেমন ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধির মূঢ়তা, ত্রৈলোক্যনাথের ক্ষেত্রে তেমনি হৃদয়হীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ। এ দুটির কবল হইতে মানুষ আর একটু মুক্ত হোক, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটুখানি সজাগ করিয়া তোলাই তাঁহার শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল'।[১] ত্রৈলোক্যনাথের শিল্প সম্পর্কে উক্তিটি নিঃসন্দেহে সত্য।

ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গের বাহন তাঁর ভাষা। অনাড়ম্বর চলিত ভাষা সহজেই ব্যঙ্গের তীব্রতাকে প্রকাশ করেছে। উদ্দেশ্যপ্রকাশে লেখকের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা তাঁকে প্রভূত সহায়তা করেছে। কিন্তু পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা অধিক থাকলেও ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনাশক্তির দীনতা তাঁর শিল্পকে সার্থকতার চরম মূল্য দিতে পারে নি। ত্রৈলোক্যনাথ-সৃষ্ট হাস্যরসের সঙ্গে করুণ রসের ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষণীয়। 'হাস্যরসের প্রধান উপাদান করুণা। এক হিসাবে করুণ রসের সহিতই ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ। কুশলী রসস্রষ্টার কৃতিত্ব এইখানেই, কাঁদাইবার বস্তু দিয়া তিনি হাসান। সে হাসি কান্নার অপেক্ষা করুণ'।[২] ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যরসের বিচারের এই উক্তি অবশ্য স্মর্তব্য।

ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় গল্পরস স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত। গল্প বলার কথকতাজাতীয় ভঙ্গী তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভূতপ্রেতের ভূমিকা রয়েছে। এর মূলে তাঁর শিল্পরচনার উদ্দেশ্য বর্তমান। পূর্বেই বলেছি, ব্যঙ্গশিল্পের প্রচারমূলকতার কারণ মানব-কল্যাণ। মানব-চরিত্রের অসঙ্গতি প্রদর্শনের জন্যই তাঁর রচনায় ভূতপ্রেতের আবির্ভাব। ভূতের গল্প বলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তুলনায়, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তথা মহত্ত্বের দিক নির্দেশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর কঙ্কাবতী, পাপের পরিণাম, ভূত ও মানুষ (বীরবালা, লুল্লু) প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রয়াস লক্ষ্য করি।

আলোচ্য কালসীমার মধ্যে প্রকাশিত ত্রৈলোক্যনাথের একমাত্র গ্রন্থ

১. শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক, প্রথম খণ্ড (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়)।

২. শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী'র ভূমিকা, পৃঃ ১।

'কঙ্কাবতী'[৩] তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় রচনা। কঙ্কাবতী উপকথার উপন্যাস। একটি প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসটির কাহিনীটিকে একটি আষাঢ়ে কাহিনী বলে বাহ্যত মনে হলেও এটি একটি ব্যঙ্গ-রচনা। মনুষ্য-চরিত্রের ও সমাজের অসঙ্গতি প্রদর্শনই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য। গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের কাহিনী, বাস্তব-নির্ভর হলেও দ্বিতীয়াংশের রোগশয্যার স্বপ্ন, কঙ্কাবতীর স্বপ্নের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অদ্ভুত কাল্পনিক কাহিনী।

অর্থপিশাচ তনু রায় শেষ পর্যন্ত অর্থলোভে বৃদ্ধ জনার্দন চৌধুরীর সঙ্গে কন্যা কঙ্কাবতীর বিবাহ স্থির করলে, খেতুর সঙ্গে তার বিয়ের আশা তিরোহিত হল। কঙ্কাবতী অসুখে পড়ল। তারপর দীর্ঘ বাইশ দিন ধরে জ্বরবিকারে স্বপ্ন দেখে চলল সে। সে যেন গায়ের জ্বালায় নদীর ঘাটে জল মাখতে গেল। তারপর নৌকায় চড়ে নদীর মাঝখানে গেলে নৌকাটি ডুবে গেল।

মাছেরা তাকে তাদের রানী করল। তারপর কঙ্কাবতী কিছুদিন গোয়ালিনী মাসীর বাড়ী রইল। সেখান থেকে শ্মশানঘাটে শোকাতুর খেতুর সঙ্গে দেখা। তারপব তার সঙ্গে বাড়ি ফেরা।

একবছর পর একটি বাঘ বাড়িতে এলে. কঙ্কাবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হল। তারপর বাঘের সঙ্গে কঙ্কাবতীর বনগমন। ক্রমে ঘ্যাঁঘো ভূত, নাকেশ্বরী ভূতিনী, ব্যাঙ, মশা দর্শন ও খেতুর পরমায়ু চুরি। খেতুর পরমায়ু উদ্ধারে আকাশযাত্রা এবং শেষে খেতুর চিতায় সহমরণে আত্মসমর্পণ। তারপর দীর্ঘদিন পরে শান্তিদায়িনী নিদ্রা-অন্তে কঙ্কাবতীর পুনরায় চেতনালাভ।

প্রৌত্রের মৃত্যুজনিত শোকে জনার্দন চৌধুরী বিবাহের আশা বর্জন করলেন। কঙ্কাবতী ভালোভাবে আরোগ্যলাভ করলে, শুভ দিনে শুভ লগ্নে খেতু ও কঙ্কাবতীব শুভবিবাহ সম্পন্ন হল। খেতুর অনেক টাকা ও সন্তান হল। তনু রায় তাদের সঙ্গে খেলা করে আনন্দ পেতেন।

মানুষের চরিত্রের অসঙ্গতি, ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির প্রতি লেখকের ক্রোধ ও বিদ্বেষ কৌতুকের আবরণে মর্মবিদারী বাণরূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এই উপন্যাসে। ষাঁড়েশ্বর, তনু রায়, গদাধর, জনার্দন চৌধুরী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক মানুষের বিচিত্র মনোবৃত্তির কলঙ্কিত চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন।

৩. কঙ্কাবতী, ১২৯৯ সাল, ইং ১৮৯২, পৃঃ ৩০১।

গ্রন্থে লেখক কয়েকটি সামাজিক প্রসঙ্গ অবতারণা করে, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে প্রবীণা বিধবার ভীতি ও কন্যা-ব্যবসায়ীর আনন্দ, এই দ্বিবিধ চিত্র পাই উপন্যাসটিতে।

খেতুর মা উত্তর করিলেন (তনু রায়ের স্ত্রীকে) 'চুপ কর বোন!... বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়া সাহেবরা যদি বলেন যে, দেশে আর বিধবা থাকিতে পাবে না, সকলকেই বিবাহ করিতে হইবে, ছি ছি! ওমা! কি ঘৃণার কথা! এই বৃদ্ধ বয়সে তাহা হইলে যাব কোথা? কাজেই তখন গলায় দড়ি দিয়া জলে ডুবিয়া মরিতে হইবে।' (পৃ° ৩৫)

বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হলে তনু রায়ের ব্যবসা ভালো চলে, তাই নিজের স্বার্থানুযায়ী সে নীতি নির্ধারণ করে। ব্যবসায়ের সুবিধার্থে সে বিধবা-বিবাহের সমর্থক।

বরফ খাওয়ার ফলে জাত যাওয়ার সংস্কারের প্রতি লেখকের তীব্র কটাক্ষ: খেতু আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'একটু বরফ খাবে গদাধর?' আমি বলিলাম—'না দাদাঠাকুর! আমি বরফ খাইব না, বরফ খাইলে আমার অধর্ম হইবে, আমার জাতি যাইবে'।

জনার্দন চৌধুরী উত্তর করিলেন,—'বরফ সাহেবেরা প্রস্তুত করেন, সাহেবের জল। শিরোমণি মহাশয় বিধান দিয়াছেন যে, বরফ খাইলে সাহেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সাহেবত্বপ্রাপ্ত লোকের সহিত সংস্রব রাখিলে সেও সাহেব হইয়া যায়। তাই এ খেতার সহিত সংস্রব রাখিয়া সকলেই আমরা সাহেব হইতে বসিয়াছি।' জাতিরক্ষার্থে সাহেব না হবার এই কারণের পশ্চাতে, সত্যকার কোন সৎ-উদ্দেশ্য যে নেই একথা বলা বাহুল্য। ধর্ম ও জাতিরক্ষার এই অহেতুক গোঁড়ামির পশ্চাতে ভণ্ডামির কারণ নিহিত। খেতার বিরুদ্ধেই এঁদের চক্রান্ত, জাতিরক্ষার জন্যে গোঁড়ামি বাহ্য ঘটনা মাত্র। আসলে, গোঁড়ামির নামে ভণ্ডামি।

'গোয়ালিনী—কঙ্কাবতীকে বলিল সকলেই বলিতেছে, 'তুমি বরফ খাইয়াছ, তোমার জাতি গিয়াছে, তোমার মাকে ঘাটে লইয়া যাইলে আমাদের জাতি যাইবে'।

বরফ খাওয়ার অপরাধে জাতিভ্রষ্ট হবার অভাবিত ঘটনার প্রতি ত্রৈলোক্য-নাথের বিদ্রূপ কটাক্ষ! কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ত্রৈলোক্যনাথের সংগ্রামের অপর পরিচয়।

অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য পাত্রে কন্যাদানের বিষয় তৎকালীন সমাজের একটি কলঙ্কিত রীতি। অর্থপিশাচ পিতার এতজ্জাতীয় আচরণ, সমাজে বিরল ছিল না। এই সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থের বিনিময়ে হিংস্র পশুর মত পাত্রেও কন্যাসমর্পণে দ্বিধা বোধ না করে বরং আত্মতৃপ্তি বোধ করত। বাঘের সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহের ঘটনা এর উদাহরণ। এই বিবাহের পর তনু রায়ের স্বস্তিবাচন—'এতদিন পরে এইবার আমি মনের মত জামাই পাইলাম'। বাঘের সঙ্গে কন্যার বিবাহজনিত এই অসঙ্গতির মধ্যে নিহিত কৌতুকের গভীরে নিষ্ঠুরতার দিকটি আভাসিত হয়েছে।

সমাজে প্রচলিত গৌরীদান প্রথা ও সেই কারণে পিতার হৃদয়হীনতা ত্রৈলোক্যনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। এই প্রথাকে ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গের ছুরিকাঘাতে আহত করেছেন। করুণ রসের সঙ্গে হাস্যরসের ঘনিষ্ঠ সংযোগে ত্রৈলোক্যনাথ শিল্পকে কতখানি অন্তরস্পর্শী করেছেন তার উদাহরণ—

(কঙ্কাবতী মশাকে বলল,)—'বাল্যকালে মনুষ্য-বালিকারা পিতার সম্পত্তি থাকে। দান বিক্রয়ের অধিকার পিতার থাকে। অন্ধ-আতুর, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তিনি দান-বিক্রয় করিতে পারেন। জ্ঞান না হইতে হইতে পিতামাতা আপন আপন বালিকাদিগকে দান-বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হন।' (পৃঃ ২১৪)

সাহেবিয়ানা তৎকালীন সমাজের আর একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। পরপদানত ভারতবাসী ইংরাজী জানার মোহ ত্যাগ করা দূরের কথা বরং অন্ধ হয়ে ইংরাজী জানায় আত্মসমর্পণ করে গর্ব বোধ করত। কোম্পানির নাম থেকে শুরু করে নিজের নামে পর্যন্ত ইংরাজীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণে ও বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হত। কোম্পানির নাম ইংরাজীতে রাখার প্রচলনের কারণ, 'তাহা হইলে পসার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে। বরং ইংরেজ, পিংরেজ দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে, তবু দেশী দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে না।' (পৃঃ ১৮৩) জাতীয় জাগরণের কালে, মানুষের এই জাতীয় বিজাতীয়সুলভ মনোভাব ও আচরণ, মানব-চরিত্রের এই হাস্যকর অসঙ্গতি, ত্রৈলোক্যনাথের বিদ্রূপ-কটাক্ষে জর্জরিত হয়েছে।

'ব্যাঙ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন কেবল বলিবে, ব্যাঙ, ব্যাঙ! কেন

আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে মুখে ব্যথা হয় না নাকি। আমার নাম মিস্টার গোমীশ'।'

শোষিত ভারতবাসীর প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের অপার সহানুভূতি এবং পরাধীনতাহেতু গভীর ক্ষোভ যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি ভারতবাসীর অসহায়তা ও নির্বীর্যতার প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের চাপা ব্যঙ্গও বর্ষিত হয়েছে এই উপন্যাসে। দীর্ঘশুণ্ড মশার বক্তৃতায় জানা যায় যে, ভারতবাসীর রক্তপান করে পৃথিবীর যাবতীয় মশা এতদিন স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছিল। শোষিত ভারতবাসীর অসহায়তার প্রতি মৃদু ভর্ৎসনা ধ্বনিত হয়েছে এই প্রসঙ্গে।

মশা বলিলেন,—'এখন শুনিলে। ভারতের মানুষ কিসের জন্য হইয়াছে তা বুঝিলে।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞা হাঁ। মশারা আহার করিবেন বলিয়া তাই মানুষের সৃজন হইয়াছে।

ভারতীয় জনগণের শক্তিহীনতা, আত্মসম্মানবোধের অভাব, বশ্যতা-ভাব, আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি বিষয় ত্রৈলোক্যনাথকে কতখানি বিচলিত করেছিল তার প্রমাণ পাই এইভাবে। ত্রৈলোক্যনাথ যেন পরোক্ষ ভাবে ভারতবাসীর আত্মদর্শন ঘটাতে চেয়েছেন। শোষণমুক্ত তথা স্বাধীন হবার অন্যতম পন্থা, বহির্বিশ্ব সম্পর্কে ভারতবাসীর জ্ঞান-বৃদ্ধি। ত্রৈলোক্যনাথ পরোক্ষ ভাবে এই পন্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। দীর্ঘশুণ্ড মশার বক্তৃতায় বলা হয়েছে যে, 'দেশভ্রমণ করে ভারতবাসীদিগের যদি চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যগণ আর আমাদের বশতাপন্ন হইয়া থাকিবে না'। (পৃঃ ২৩০) ভারতবাসীর নিশ্চেষ্টতা ও বশ্যতামূলক মনোভাবকে তাই ত্রৈলোক্যনাথ মর্মভেদী ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন।

কলিকালে ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত এই বিধি আছে—

সদা কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শঙ্কা পিহিতেক্ষণা।
ঘোরান্ধতমসে কূপে সন্তু ভারতবাসিনঃ॥
পিবন্তু রুধিরঞ্চেষাং যাবন্তো মশকা ভুবি।
অদ্য প্রভৃতি বৈ লোকে বিধিরেষ প্রবর্ত্তিত॥

'ইহার স্থূল অর্থ এই যে, কলিকালে ভারতবাসীগণ চক্ষে ঠুলি দিয়া হাত

জোড় করিয়া, অন্ধকূপের ভিতর বসিয়া থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় মশা আসিয়া তাহাদিগের রক্ত শোষণ করিবে।'

ত্রৈলোক্যেনাথ চিরদিন কুসংস্কারের বিরোধিতাই করে এসেছেন। সামাজিক কুসংস্কারের হাস্যকর অসঙ্গতিকে আবিষ্কার করে, তিনি কুসংস্কারের অসারত্বের প্রতি অঙ্গুলি হেলন করেছেন। সহমরণ-প্রথাকে কেন্দ্র করে এককালে আমোদ করা হত। সতীর দেহের আভরণ নিয়েও টানাটানি পড়ত। সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে লেখক ব্যঙ্গবাণ হেনে এই উৎসবে অংশগ্রহণ-কারী ব্যক্তিগণকে ভূত-প্রেতের সামিল করেছেন। খেতুর মৃত্যুর পর (কঙ্কাবতীর স্বপ্নঘটিত), কঙ্কাবতী সহমরণে যাবে জানালে, নাকেশ্বরী মাসীকে বলল, পৃথিবীর ভূতিনী-প্রেতিনীদের সহমরণ দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে। 'বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, সকল ভূতিনী-প্রেতিনীই সহমরণ দেখিয়া পরম পরিতোষ উপভোগ করিবে।' তা ছাড়া, সতীর হাতের চুড়ি, চিতা-প্রদক্ষিণকালে ছড়ানো খই এবং ভূত-পেতনী ছেড়ে যাওয়া মাথার সিঁদুর বিছানার ছারপোকা-নাশক! এবং শিশু পুত্রবধূর পক্ষে ঐ সিঁদুর ধারণ, পতিপরায়ণা হবার সম্ভাবনাপূর্ণ! একটি মর্মান্তিক সামাজিক প্রথাকে কেন্দ্র করে, এই ধরনের কৌতুকসৃষ্টির অভিপ্রায়ে, সমাজদর্শনের মধ্য দিয়ে লেখকের সমাজশোধনের প্রয়াসই লক্ষিত হয়।

মানুষের চরিত্রের চরম অসংগতি প্রদর্শনের জন্য ত্রৈলোক্যনাথ যে উপন্যাসে ভূত-প্রেতের অবতারণা করেছেন, সে-কথা পূর্বেই বলেছি। ভূত ও মানুষকে একই সূত্রে জড়িয়ে ত্রৈলোক্যনাথ মানুষের কর্মধারা ও জীবনযাত্রার সঙ্গতিই পরিস্ফুট করেছেন। মানুষের মত ভূতের মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা কল্পনার হাস্যকর দিকটি এই রচনায় পরিস্ফুট।

'আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যদি আমাদিগের মত ভূতদিগের রোগ হয় তাহা হইলে ভূতেরাও তো মরিয়া যায়। আচ্ছা! মানুষ মরিয়া তো ভূত হয়, ভূত মরিয়া কি হয়!'

স্কল উত্তর করিলেন,—'কেন ভূত মরিয়া মারবেল হয়। সেই যে ছোট ছোট গোল গোল ভাঁটার মত মারবেল, যাহা লইয়া ছেলেরা সব খেলা করে'।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যরসের নামকরণ করেছেন, উদ্ভটরস। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'লক্ষ্যবস্তুর পরিধি যত সঙ্কীর্ণ তাঁহার

হাসির নির্মলতা তত অল্প, সে হাসিতে ঝালের পরিমাণ কিছু বেশী। আক্রমণের পাত্র যতই সীমা ছাড়াইয়া যায় হাসির তাপও তত কমে। কঙ্কাবতী, ডমরু-চরিত, মুক্তামালা প্রভৃতির মধ্যে এই উভয় রসের দৃষ্টান্ত অজস্র রহিয়াছে। কিন্তু এই উত্তাপের একান্ত অভাব যে হাস্যরসে যাহার নাম দিয়াছি উদ্ভটরস তাহাই ত্রৈলোক্যনাথের বিশেষত্ব'[৪]। 'কঙ্কাবতী'র নাকেশ্বরী, ঘ্যাঁঘোঁ, খর্বুর, হাঙ্গী ঠাকুরপো, আকাশের দুর্দান্ত সিপাহী প্রভৃতির বর্ণনা উত্তাপহীন কৌতুকরস-সঞ্চারী। এগুলি উদ্ভটরসের নিদর্শন।

ষাঁড়েশ্বরের চরিত্রে নব্যবঙ্গের সামাজিকদের ভেকধার্মিকতার পরিচয় পরিস্ফুট। ষাঁড়েশ্বরের বাড়িতে নীচে হরি-সংকীর্তন এবং উপরে বন্ধু-সমাবেশে মাংসের স্যুপ, হাঁস, মুরগী, ব্রাণ্ডী প্রভৃতি উপভোগের চিত্র। বিয়েপাগলা বুড়ো রূপে জনার্দন চৌধুরীর চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। পুত্রকন্যার বাধাদান সত্ত্বেও বৃদ্ধবয়সে দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ, দু'হাজার নগদ ও নববধূকে গা ভরা গহনা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিবাহের প্রস্তাব হাস্যকর। অর্থপিশাচ কন্যাব্যবসায়ী রূপে তনু রায় হৃদয়হীন পিতার প্রতিভূ।

'অনুসন্ধান[৫]'-এ কঙ্কাবতীর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'ইংরাজীতে যেমন 'রবিনসন ক্রুশো', 'ডনকুইকজোট' প্রভৃতির কাহিনী বালকবালিকার কৌতুহল-উদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ, মুখোপাধ্যায় মহাশয় কঙ্কাবতীকে কতকটা সেই ছাঁচে গড়িয়াছেন'। উক্ত সমালোচক গ্রন্থটিকে 'আরও একটু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্য' হলে 'উপাদেয়' হত বলে মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোন প্রমাণ পরিচয় সমালোচক উদ্ধার করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য়[৬] কঙ্কাবতীর সমালোচনা করে বলেছেন, —'লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন, এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।' গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কিন্তু লেখক যে তাহার উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশকে রোগশয্যার স্বপ্ন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে, স্বপ্নের ন্যায়

৪. শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী'র ভূমিকা,' পৃঃ ৩।৶০।

৫. অনুসন্ধান, ৬ই পৌষ, ১৩০১ সাল, পৃঃ ৮৫৫।

৬. সাধনা, দ্বিতীয়বর্ষ প্রথমভাগ, ফাল্গুন ১২৯৯।

সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্রে চলিয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ 'কঙ্কাবতী'র সঙ্গে 'কঙ্কাবতী'র মত 'অসম্ভব অবাস্তব কৌতুকজনক' 'অ্যালিস ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' নামক গ্রন্থের বালিকার স্বপ্নকে 'যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক,' বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথের 'লেখা আমাদের দেশের বালকবালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে' বলে মত জ্ঞাপন করেছেন।[৭]

উনিশ শতকে ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ নতুন পথের দিশারী। ব্যঙ্গ সাহিত্যের উদ্দেশ্য, মানবকল্যাণ। ত্রৈলোক্যনাথ সেই পথেই তাঁর সাহিত্য ধারাকে পরিচালিত করেছেন। মানবিক ঘটনার সঙ্গে ভৌতিক ঘটনার যথেচ্ছ মিলনের মধ্য দিয়ে তিনি যে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন তা মানব-চরিত্রের অসঙ্গতি ও সামাজিক কুসংস্কারকে অনায়াসেই স্পর্শ করেছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তীব্র ব্যঙ্গ মনোভাব, চরিত্র ও সমাজ শোধনের কারণ হয়েছে। রূপকথার কল্পকাহিনীকে বাস্তব কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে ত্রৈলোক্যনাথ রচনাকে অপূর্বতা দান করেছেন। আধুনিক কালে হাস্য ও ব্যঙ্গ রচনায় পরশুরাম (রাজশেখর বসু) যে ধারাকে পুষ্ট করে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছেন, সেই ধারারই উদ্বোধন ঘটেছে ত্রৈলোক্যনাথের রচনায়।

৭ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য রচনা : ভূত ও মানুষ (গল্পসচিত্র) ১৮৯৬, ফোকলা দিগম্বর (সামাজিক উপন্যাস) ১৯০১, মুক্তামালা (উপন্যাস) ১৯০২, ময়না কোথায় (উপন্যাস ১৯০৪, মজার গল্প, ১৯০৬, পাপের পরিণাম, ১৯০৮, ডমরুচরিত্র, ১৯২৩।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮–১৯০৯)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাস শিল্পীরূপে রমেশচন্দ্রের আবির্ভাব ও অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। রামবাগানের দত্তপরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম। এই পরিবারের অনেকেই সাহিত্যচর্চায় অনুরাগী ছিলেন। ইতিহাসচর্চায়ও এই পরিবার অগ্রণী ছিল। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য শশিচন্দ্রের সাহচর্যলাভে তার জীবন গড়ে ওঠে। শশিচন্দ্রের চরিত্র ও কর্মধারা রমেশচন্দ্রকে প্রভাবিত করে। শশিচন্দ্র প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ অধিকারসম্পন্ন হয়েছিলেন। শশিচন্দ্রের প্রেরণায় রমেশচন্দ্র ইতিহাসচর্চায় অনুরাগী হন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতযাত্রার পরে পিতৃব্য শশিচন্দ্রের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটে। তিনবছর পরে রমেশচন্দ্র নিজের ভ্রান্তি উপলব্ধি করে পিতৃব্যকে যে পত্র লেখেন তা সত্যই তার বিরাট মনের পরিচয় বহন করে এবং শশিচন্দ্রের প্রতি তার আনুগত্যের স্বীকৃতি দান করে।[১] 'তাঁহারই নিকট হইতে রমেশচন্দ্র দুইটি বিষয় লাভ করেন, প্রথম স্বাবলম্বন, দ্বিতীয় সাহিত্য-সম্বন্ধীয় সর্বোচ্চ শিক্ষা'।[২]

বিদ্যাচর্চার প্রতি রমেশচন্দ্রের আগ্রহ তার ছাত্রজীবনে গভীরভাবে প্রকাশ পায়। বিলাতে আই. সি. এস. পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। সরকারী কর্ম উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তাকে কর্মরত থাকতে হয়। কর্মজীবনে রমেশচন্দ্র অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন। তার পদোন্নতি তৎকালীন ইংরাজমহলে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। কমিশনারের পদপ্রাপ্তির পর 'ইংলিশম্যান'-এর ক্ষোভ তাঁর অন্যতম উদাহরণ। ময়মনসিংহে

১. আশা করি আপনার নিকট হইতে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহসূচক প্রত্যুত্তরই প্রাপ্ত হইব। যদিই বা আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি পুনর্মিলনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলেও জানিবেন আপনার প্রতি আমার অনুরাগ শ্রদ্ধা ও ভক্তি চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় : রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন-চরিত পৃঃ ১৭।

২. জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার : বংশপরিচয় (ত্রয়োদশ খণ্ড)

থাকাকালে রমেশচন্দ্র Civilization of Ancient India নামে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। স্বদেশের অতীত গৌরবকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থরচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অতীত ভারতের ঐতিহ্য, সাধনা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পণ্ডিতদের সাহায্যে ঋগ্‌বেদের অনুবাদ, বিলাতে থাকাকালে রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদকর্মে হস্তক্ষেপ প্রভৃতি বিষয় তার উদাহরণ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরির মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই তিনি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর কারণ বাণীর আরাধনা এবং স্বায়ত্তশাসনলাভে দেশবাসীর প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার আকাঙ্ক্ষা।[৩]

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারত ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তার বক্তৃতার বিষয়গুলি ছিল Study of Indian History, Civilisation and Religion of the Ancient Hindus, History, Civilisation, Religion and Literature of the Ancient Hindus (2nd), The Epic and Poetry in Ancient India, The Epic and the Epic age of India.

ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস সঙ্কলনের উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি প্রায় ২০ খণ্ড 'ব্লু বুক' পাঠ করেছিলেন। পলাশির যুদ্ধের সময় থেকে, বিংশ শতকের পূর্বকাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালের অর্থনৈতিক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তার রচিত দুই খণ্ডে প্রকাশিত Economic History of British India নামক গ্রন্থে। ঐতিহাসিক চর্চার আত্যন্তিক নিদর্শন এই গ্রন্থগুলি। এই ইতিহাস প্রীতিই তার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রেরণার উৎসভূমি।

বরোদার রাজস্ব সচিব থাকাকালে রমেশচন্দ্র বরোদায় প্রায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। দেশশাসনের দায়িত্ব জনগণের উপর ন্যস্ত করার যৌক্তিকতা রমেশচন্দ্র গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি বলেন, অত্যধিক রাজস্বই এদেশের কৃষককুলের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কারণ। রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এই অভিভাষণ। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে থাকাকালে তিনি

৩ তদেব, পৃঃ ১৩২

ভারতের প্রকৃত শাসন-সংস্কারের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি মহামতি গোখলের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি রূপে তিনি বৃত হন। রমেশচন্দ্রের সাহিত্যসাধনায় এটি সর্বোত্তম স্বীকৃতি।

স্কট ছিল রমেশচন্দ্রের প্রিয় গ্রন্থকার। স্কটের উপন্যাস থেকে সাহিত্য ও ইতিহাস উভয় রস তিনি আস্বাদন করতেন। স্কট সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের বক্তব্য,

– Sir Walter Scott was my favourite author forty years ago I spent days and nights over his novels, I almost lived in those historic scenes and in those mediæval times which the great enchanter had conjured up .... I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or if my taste for history made me an admirer of Scott, but no subject, not even poetry had such a hold upon me as history.[8]

এমন একজন বিদগ্ধ রসিক রমেশচন্দ্রের সঙ্গে নাটকীয় ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার। তাঁর উপন্যাস রচনার প্রেরণার কারণটি পরবর্তী কালে তিনি বিবৃত করেছেন[৫]। 'বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভবানীপুরে একটি ছাপাখানা হইতে এই কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, এবং বঙ্কিমবাবু সর্বদা যাইতেন, সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বড় [illegible]। বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?' আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম—আমি যে বাঙ্গালা লেখা কিছু জানি না। ইংরাজী [illegible] পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনা পদ্ধতি জানি না।' গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, 'রচনা পদ্ধতি আবার কি— তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে।

৪. Wednesday Review, 1905

৫. নব্যভারত, বৈশাখ ১৩০০।

তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে'। এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল।'

পিতৃব্য শশিচন্দ্রের প্রতিভার প্রভাব স্কটের উপন্যাসের তন্ময়তা এবং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক বাংলায় রচনায় উৎসাহ এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যক্ষফল রমেশচন্দ্রের ঔপন্যাসিক রূপে আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী রচনাবলী ও বাংলা রচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর উপদেশ শিষ্য রমেশচন্দ্রকে অনতিকালের মধ্যেই ঔপন্যাসিকের একটি বিশিষ্ট স্থান দান করল। রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'র প্রকাশকাল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের দুবছর পর। এ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৮৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) ইন্দিরা (১৮৭৩) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) প্রকাশিত হয়েছে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসরচনার কাল ১৮৭৪ — ১৮৯৪ পর্যন্ত। রমেশচন্দ্র রচনারীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে মূলতঃ অনুসরণ করেছেন। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মনে করেন দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী রচিত না হলে বঙ্গবিজেতা রচিত হতে পারত না।[৬] বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রেরণা-সূত্রে রমেশচন্দ্রের আবির্ভাব।

রমেশচন্দ্রের রচনায় ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার সামঞ্জস্যবিধানে পরিমিতি-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনীর জনপ্রিয়তা সমধিক হওয়া সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, দুর্গেশনন্দিনী বিশুদ্ধ রোমান্স। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোমান্স-এর রস অনুচ্ছুসিত, সংযত ও ঘনীভূত। রোমান্স-সর্বস্বতায় ভরপুর নয়। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা নিঃসন্দেহে আপত্তির ঊর্ধ্বে। অতিরিক্ত ইতিহাস-নিষ্ঠা ও ইতিহাসের মর্মজ্ঞান তাকে কল্পনানির্ভর রোমান্সের পথ থেকে বাস্তবনির্ভর ইতিহাসের পথে পরিচালিত করেছে।

রমেশচন্দ্রের রচনায় প্রকৃতি চেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর পাই। তিনি প্রকৃতি-বর্ণনায় যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তেমনি প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় সম্পর্কের দিকটিও তাঁর রচনায় উদ্‌ঘাটিত। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, চেতনা এবং বর্ণনানৈপুণ্য রমেশচন্দ্রের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটি সহৃদয় সহানু-

৬. শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত রমেশ-রচনাসম্ভার, রমেশচন্দ্র দত্ত ।৵০

ভূতিশীল মন সমগ্র রচনাব মধ্যে সঞ্চাবিত। প্রকৃতি ও মানবমন-বর্ণনার মধ্যেই বমেশচন্দ্র নিজেকে নিবদ্ধ বাখেন নি। যুদ্ধ-বর্ণনা ও চাবণের গীতে অতীত গৌববগাথা বর্ণনায় তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসেব প্রেক্ষাপটকে আবও বেশী জীবন্ত কবে তুলেছেন। বমেশচন্দ্রেব ঐতিহাসিক উপন্যাসেব এটি বিশিষ্ট পবিচয়।

বমেশচন্দ্র চাবখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস ও দু'খানি সামাজিক উপন্যাস বচনা কবেছেন। চাবখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসকে মোটামুটি দু'শ্রেণীতে ভাগ কবা চলে। প্রথম শ্রেণী, 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কন'। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অপব দুটি উপন্যাস 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা'। এই শ্রেণী-বিভাগ গুণাগুণনিভব নব। এই দুই শ্রেণীব মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটিতে কল্পনাব আধিক্য ও দ্বিতীয়টিতে ইতিহাসনিষ্ঠা বতমান। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কবলেও উপন্যাসগুলিব একটিব সঙ্গে অপবেব যোগসূত্র ছিন্ন নয়। 'বঙ্গবিজেতা' দুই শ্রেণীব ঐতিহাসিক উপন্যাসেব মধ্যস্থিত সেতু। আবাব 'মাধবীকঙ্কন' এ পববর্তী শ্রেণীব উপন্যাসেব বীজসূত্র বতমান। এই চাবখানি উপন্যাস একত্রিত কবে বমেশচন্দ্র 'শতবর্ষ' (১৮৭৯) নামে গ্রন্থ প্রকাশ কবেন। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসেব ঘটনাকাল ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ। 'জীবন-প্রভাত' এব ঘটনা সমাপ্তি শিবাজীব মৃত্যুব পব (১৬৮০)। এই হিসাবে শতবর্ষ। এই একশ বছবেব ভাবতবর্ষেব উত্থান পতন, সন্ধি-বিগ্রহেব ইতিহাসই লেখক চাবটি উপন্যাসে বিবৃত কবতে প্রয়াসী হয়েছেন।

'বঙ্গবিজেতা'[৭] বমেশচন্দ্রেব প্রথম উপন্যাস। কাহিনীব ঐতিহাসিক-ভিত্তি নিতান্ত দুর্বল নয়। বাংলাদেশে পাঠান শাসনেব সমাপ্তি ও মোগল শাসনেব অভ্যুদয়কালেব সন্ধিক্ষণ, এই উপন্যাসেব ঐতিহাসিক পটভূমি। উপন্যাসটিব কাহিনীকাল ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ। মোগল প্রতিনিধি বাজা টোডবমল্ল তখন বঙ্গেব সেনাপতি ও শাসনকর্তা। গ্রন্থটিব কাহিনীকাল সম্বন্ধে লেখকেব বক্তব্য—'কি প্রকাবে এই নিশঙ্ক বীবপুরুষ তৃতীয়বাব বঙ্গদেশ জয় ও দুই বৎসবকাল বঙ্গ বিহাব ও উডিষ্যা দেশ শাসন কবেন তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে। এই আখ্যায়িকায় ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দেব কথা লিখিত হইবে।

৭. বঙ্গবিজেতা ১৮৭৪, পৃ. ৩১৪, 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এ (১২৮১ সালের বৈশাখ—অগ্রহায়ণ প্রথম প্রকাশিত।

সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, জমিদার ও প্রজা, পাঠান ও মোগল-দিগের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, সংক্ষেপে বিবৃত হইল' (প্রথম পরিচ্ছেদ)। গ্রন্থটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হতে পারলেও রমেশচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা ইতিহাসের রসসৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। পাঠান শাসন অবসিত হবার কালে এবং মোগল শক্তি বঙ্গদেশে বিস্তৃত হবার সময়ে বঙ্গদেশে ছোটবড অনেক জমিদার ছিলেন। এই জমিদারবর্গের কেউ কেউ মোগল ও পাঠানের পক্ষপুটে নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রায় রত ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থের সমর সিংহ তৎকালীন জমিদার কাশীনাথ রায়। কিংবদন্তী আছে যে, পাঠান দাযুদ খাঁর সঙ্গে মোগলের সংঘর্ষের কালে তিনি মোগলপক্ষে যোগ দিয়ে শৌর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। মোগলসম্রাট আকবর তাঁকে সমরসিংহ উপাধি দান করেন। তিনি চতুর্বেষ্টিত দুর্গে বাস করতেন। কুশদ্বীপ পরগনা তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। মন্ত্রী সতীশচন্দ্রের ষডযন্ত্রে সমর সিংহের প্রাণদণ্ড হয়। তখন হোসেন কুলি খাঁ বঙ্গের শাসনকর্তা (১৫৭৭-৭৮)[৮]।

টোডরমলকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করে রাজা সমর সিংহ তাঁর প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। যে সতীশচন্দ্রকে প্রাণদণ্ডের হাত থেকে সমর সিংহ রক্ষা করেছিলেন, তারই চক্রান্তে রাজা সমর সিংহ বিদ্রোহী প্রতিপন্ন হলেন। টোডরমলের অনুপস্থিতিতে সমর সিংহের প্রাণদণ্ড হল। সমর সিংহের পত্নী মহাশ্বেতা স্বামীর নির্দেশমত প্রতিজ্ঞা করল, —'বৈরনির্যাতনে যত্নবতী হইব।' সমর সিংহের কন্যা সরলার সঙ্গে ধর্মের গৌরব ও পাপের দণ্ডের জন্য গৃহত্যাগী ইন্দ্রনাথের আলাপে, উভয়ের মধ্যে প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটল। বিদায়ের পূর্বে ইন্দ্রনাথ সরলাকে জানাল, বেঁচে থাকলে সে সপ্তম পূর্ণিমা তিথিতে সরলার কাছে আসবে।

বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর ভবিষ্যৎবাণীকে বিশ্বাস করে মহাশ্বেতা পঞ্চদশী কন্যা সরলাকে সঙ্গে নিয়ে মোহন্ত চন্দ্রশেখরের আশ্রমে আশ্রয় নিল।

সতীশচন্দ্রের সপ্তদশী কন্যা বিমলা, পিতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণা এবং পাপ-পুণ্যের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন। সতীশচন্দ্র কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। কর্মচারী কুচক্রী শকুনিই সতীশচন্দ্রের পাপকর্মের জন্য দায়ী। চতুর্বেষ্টিত দুর্গ থেকে ৫।৬ ক্রোশ দূরে মহেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে গিয়ে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে

৮. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড।

বিমলার পরিচয় হয়। বিমলা তার পিতাকে রক্ষা করতে বলে এবং শকুনিই সকল দোষে দোষী বলে জানায়।

টোডরমল মুঙ্গেরে ইন্দ্রনাথকে অশ্বারোহী পদে নিযুক্ত করেন। টোডরমলের দুই বিদ্রোহী সৈনিক তর্খান ও হুমায়ুন ইন্দ্রনাথকে বশীভূত করতে না পেরে আক্রমণ করলে, ইন্দ্রনাথ গঙ্গাগর্ভে পতিত হল। তাকে উদ্ধার করল এক নৌকারোহী যুবক। সে ছদ্মবেশী বিমলা।

চন্দ্রশেখরের পালিতা কন্যা কমলার সঙ্গে সরলার বন্ধুত্ব হল। চন্দ্রশেখরের আশ্রমে সমর সিংহের বন্ধু জমিদার নগেন্দ্রনাথ এসে, পূর্বপ্রতিজ্ঞামত পুত্রের সঙ্গে সরলার বিবাহের প্রস্তাব করলে, মহাশ্বেতা অসম্মত হলেন।

ঘটনাচক্রে শকুনির চক্রান্তে মহাশ্বেতা ও সরলার চতুর্বেষ্টিত দুর্গের কারাগারে স্থান হয়। সরলার সঙ্গে বিমলার আলাপ হল। মহাশ্বেতা সরলাকে পূর্ববৃত্তান্ত জানাল। বিমলা জানাল পামর শকুনির মৃত্যু অনিবার্য।

বিমলা দৃঢ়ভাবে শকুনির প্রেম প্রত্যাখ্যান করে পুরুষের ছদ্মবেশে মুঙ্গের যাত্রা করল। ইন্দ্রনাথ বীরত্বের সঙ্গে সৈন্য পরিচালনা করে টোডরমলকে রক্ষা করে নিজে শত্রুর হাতে পড়ল। কারাগার থেকে দাসীর ছদ্মবেশে বিমলা ইন্দ্রনাথকে রক্ষা করল। ইন্দ্রনাথ বললে, বিমলা ধৃত হলে মানুষীর কাছে যেন একদিন সময় প্রার্থনা করে। ইন্দ্রনাথ পাঠান দুর্গ আক্রমণ করে বিমলাকে উদ্ধার করে। বিমলা ফিরে যায় পিতৃগৃহে।

শকুনি-নিযুক্ত ভৃত্যের বিসাক্ত অস্ত্রের আঘাতে সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হল। নির্বাচিত পূর্ণিমা-তিথিতে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সরলার মিলন হল—চতুর্বেষ্টিত দুর্গে। টোডরমলের আদেশানুযায়ী বন্দী শকুনিকে ইচ্ছাপুরে নিয়ে যাওয়া হল। পিতার সঙ্গে ইন্দ্রনাথের পুনর্মিলন হল। মাঝি বেশী উপেন্দ্র, ইন্দ্রনাথ ওরফে সুরেন্দ্রনাথের দাদার সঙ্গে কমলার পুনর্মিলন ঘটল। জানা গেল কমলা আসলে চন্দ্রশেখরের গঙ্গাসাগরে বিসর্জিত কন্যা। পুত্র ও পুত্রবধূদের পেয়ে নগেন্দ্রনাথের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল।

বিচারকালে শকুনির জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করল বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী। শকুনি জারজ। বিশ্বেশ্বরীর মায়ের প্রতি এক ব্রাহ্মণ রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়, তার ফল শকুনির জন্ম। শকুনিকে হত্যা করে এক সৈনিক।

টোডরমল ইচ্ছাপুর ত্যাগ করলেন। উপেন্দ্র ও কমলা আশ্রমে বাস করতে

লাগল। সুরেন্দ্রনাথ সরলাকে বিবাহ করে দুটি বিস্তীর্ণ জমিদারির মালিক হল। মহাশ্বেতা বিনা রোগে মারা গেলেন। সরলার বিবাহের দিন বিমলার মৃত্যু হল।

'বঙ্গবিজেতা'র কাহিনী সংগতি লাভ করে নি। ঘটনা, চরিত্র ও বর্ণনার প্রাচুর্য গতিকে মন্থর করে তুলেছে। ঘটনা-সংযোজনের ক্ষেত্রে আকস্মিকতা অনেক সময় গ্রন্থের বাস্তব রসকে ক্ষুণ্ণ করেছে। মহাশ্বেতাকে কেন্দ্র করে অনাবশ্যক ভাবে গল্পের বিস্তৃতি, উপেন্দ্র কমলার চমকপ্রদ কাহিনীর সংযুক্তি ইত্যাদি গ্রন্থের মূল বিষয়কে বিঘ্নিত করেছে। তা ছাড়া চন্দ্রশেখরের আশ্রম-বর্ণনা, দীর্ঘ প্রকৃতিবর্ণনা, ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য ইত্যাদি বিষয় গ্রন্থটির শিল্পরসকে ব্যাহত করেছে। চণ্ডীকাব্য রচনার জন্য মুকুন্দরাম রাজা টোডরমল কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন বলে জানা যায় না। টোডরমলের সম্মুখে কৃত্তিবাস কর্তৃক রামায়ণপাঠের বিষয়টিও নিছক কল্পিত[৯]। চন্দ্রশেখরের আশ্রমগৃহে শীতকালীন রাত্রির যে চিত্র পাই তা পাশ্চাত্য আবহাওয়া প্রসূত[১০]। দেশকালের আবহাওয়া ও প্রথার আনুগত্যবিরোধী কল্পনা। উপন্যাসের প্রবক্তা কল্পনাশক্তি বাস্তবরসকে ক্ষুণ্ণ করে কাহিনীকে প্রায় ক্ষেত্রে প্রাণহীন করে তুলেছে।

চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে আমরা কখনো কখনো মহাপুরুষজাতীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করি। এই জাতীয় চরিত্র বঙ্কিমের উপন্যাসে ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়ে পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বঙ্গবিজেতার চন্দ্রশেখর সেই জাতীয় নয়। এই চরিত্রটি লেখকের হিন্দুত্ববোধের স্বাক্ষররূপে বিরাজমান। উপন্যাসের গতিতে এই চরিত্রটির ভূমিকা মূল্যহীন। ইন্দ্রনাথ, দুর্গেশনন্দিনীর জগৎসিংহের অনুকরণজাত। জগৎসিংহের মত পাঁচশত সৈন্য নিয়ে শত্রু প্রতিহত করা এবং শত্রু কারাগারে আবদ্ধ বিমলার ইন্দ্রনাথের প্রতি অস্পষ্ট প্রেমাসক্তির অভিব্যক্তি, বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষম অনুকরণ। দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা ও আয়েষা চরিত্রের আদর্শ, সরলা ও বিমলায় প্রতিফলিত।

৯. পরবর্তী সংস্করণে এই অংশ বর্জিত।

১০. গৃহে গৃহে শীত নিবারণার্থ অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বন্ধুবান্ধবে উপবেশন করিয়া মিষ্টালাপ করিতেছে (ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ)।

উপন্যাসটিতে অধিকাংশ চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। বিমলা লেখকের সহানুভূতিধন্যা। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে বঙ্গদেশের সমাজে বিমলার মত চরিত্র অকল্পনীয়। বাস্তব জীবনপটে এই জাতীয় চরিত্রের আবির্ভাব ও আচরণ তৎকালে অভাবনীয়। এর স্থান কল্পনার অলকাপুরীতে। ইন্দ্রনাথের প্রতি তার প্রথম দর্শনজাত প্রণয়, গঙ্গাগর্ভ ও কারাগার থেকে ইন্দ্রনাথকে উদ্ধার প্রভৃতি বিষয় তার প্রেমের চরম নিদর্শন। আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রনাথ ও সরলার জীবনকে আনন্দময় করে তোলা প্রভৃতি বিষয় আদর্শজাত। লেখকের এই চরিত্রটির প্রতি অজস্র সহানুভূতি সত্ত্বেও বিমলা পরিপূর্ণ মানবী-রূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। মহাশ্বেতার চরিত্র পূর্ণ বিকশিত হয়নি। স্বামীর হত্যাকারীর প্রতি ক্রোধ ও প্রতিশোধ লিপ্সার বাস্তব চেষ্টা তার চরিত্রে অনুপস্থিত। মহাশ্বেতার কর্মধারার সঙ্গে তার প্রতিজ্ঞাপালনের অভাব চরিত্রটির সামঞ্জস্যহীনতার পরিচায়ক। কাহিনীর নায়ক ইন্দ্রনাথ ধর্মের গৌরব ও পাপের দণ্ডের জন্য গৃহত্যাগী হয়ে ব্রতপালনে শেষ পর্যন্ত তৎপর থেকেছে। অসমসাহসী ইন্দ্রনাথ টোডরমলের প্রিয়ভাজন হয়ে যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা তার চরিত্রের উপযোগী হলেও তার শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতার অধ্যায়গুলি অচিত্রিত। লেখক ইন্দ্রনাথ, সরলা ও বিমলাকে নিয়ে একটি ত্রিভুজ প্রণয় সংঘটনের সম্ভাবনাকে কার্যকরী করতে পারেন নি। সমরসিংহ ও সতীশচন্দ্রের ঐতিহাসিক পরিচয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। টোডরমল এই উপন্যাসের প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু বঙ্গবিজেতা টোডরমলের ভূমিকা এই উপন্যাসে ক্ষুদ্র। লেখক ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে টোডরমলের ঐতিহাসিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। টোডরমলের চরিত্রে জাগ্রত হিন্দুত্ববোধ ন্যায় বিচারকালে তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। হিন্দুধর্মজাত সংস্কার 'ব্রাহ্মণ অবধ্য' টোডরমলকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিল, তার মূলে আছে ধর্মসংস্কারের সঙ্গে ন্যায়বিচারের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে টোডরমল ধর্মের পক্ষ গ্রহণ করেন। তার কিংকর্তব্যবিমূঢ়াবস্থা, তাঁর চরিত্রের ন্যায়-নীতিবোধে কলঙ্ক আরোপ করেছে। এই আচরণ তাঁর চরিত্রের অসঙ্গতির স্বাক্ষরবাহী। শকুনিকে এই উপন্যাসে খল রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এই চরিত্র আচার-আচরণের ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাভাবিকতা লাভ করেছে। নামটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। অষ্টম পরিচ্ছেদে, শকুনির স্বগত-

চিন্তার মধ্যে সতীশচন্দ্রকে হত্যা-অন্তে বিমলাকে বিবাহ করে বিস্তীর্ণ জমিদারি-ভোগের যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, তাকে পররর্তীকালে কর্মে রূপায়িত হতে দেখি বিমলার প্রতি প্রণয়নিবেদনে এবং সতীশচন্দ্রকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এই চরিত্রটির কার্যকলাপ, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিচারসভায় আত্মরক্ষার সর্বশেষ চেষ্টা ও শকুনির চরিত্রোপযোগী ভূমিকা। সরলা ও অমলার সখিত্বের সম্পর্ক বাস্তবতার বর্ণে উজ্জ্বল। বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত।

এই উপন্যাসের রচনারীতিতে বঙ্কিমের প্রভাব স্পষ্ট। পরিচ্ছেদের নামকরণ, পাঠককে আহ্বান, ভাগ্যগণনায় আস্থা, স্বপ্ন-প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়, তার উদাহরণ।

বঙ্গবিজেতায় ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এটি ব্যর্থ রচনা নয়। বঙ্গদেশের এক সংকটময় কালের চিত্র, লেখক নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তৎকালে 'হিন্দু ও মুসলমান, জমিদার ও প্রজা, পাঠান ও মোগলদিগের মধ্যে' নিহিত সম্পর্ক লেখক কৃতিত্বের সঙ্গে বিবৃত করেছেন।

'ভারতী' পত্রিকায়, গ্রন্থটির সমালোচনা বাহুল্যজ্ঞান করা হয়েছে -'ইহার সমালোচনা বাহুল্যমাত্র। কারণ উপন্যাসপ্রিয় পাঠক মাত্রেই ইহার চমৎকারিত্ব ও পারিপাট্যের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত আছেন'[১১]।

'মাধবীকঙ্কন'[১২]-এর ঘটনাকাল ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে কাহিনীর গ্রন্থন সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্রাট সাজিহানের রাজত্বের শেষধাপে পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধকে অবলম্বন করে, কাহিনী রচিত হয়েছে। ভারতের ইতিহাসের এই রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের কালে ভাগ্য বিড়ম্বিত এক বাঙ্গালী যুবকের জীবন-পরিণতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসে ইতিহাস রস বঙ্গবিজেতা অপেক্ষা উজ্জ্বল। পরবর্তী দুটি উপন্যাসের আবির্ভাবের বীজও উপন্যাসটির মধ্যে নিহিত।

বীরনগরের জমিদার বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে তার বাল্যবন্ধু দেওয়ান নরকুমার, বীরেন্দ্রের পুত্র নরেন্দ্রের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করে। নরকুমার একে একে বীরেন্দ্রের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে এবং শ্রীশকে দত্তক-পুত্র রূপে গ্রহণ

১১ ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫ পৃঃ ১৪৩।

১২. মাধবীকঙ্কন, ১৮৭৭, ১২৮৪ সাল, পৃঃ ২০৭।

করে। উদ্দেশ্য, কন্যা হেমলতার সঙ্গে তার বিবাহদান। নরেন্দ্র শ্রীশ ও হেমলতার মধ্যে বাল্যকালে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নবকুমার কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে নরেন্দ্র গৃহত্যাগ করার পূর্বকালে, বাল্যকালে রোপিত মাধবী-লতাটি ছিন্ন করে একটি কঙ্কন করে হেমের হাতে পরিয়ে দেয়।

নরেন্দ্র সুজার দ্বারস্থ হয়ে জমিদারি পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়। সুজার নির্দেশ অনুযায়ী সে মোগল জায়গিরদার এক্রাম খাঁর অধীনে যুদ্ধকার্য শিক্ষা করতে থাকে।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে সাজিহানের মৃত্যু সম্পর্কে মিথ্যা খবর রটলে বঙ্গদেশ থেকে সুজা, দক্ষিণ থেকে আরংজীব, গুজরাট থেকে মোরাদ, রণসজ্জায় সিংহাসনের আশায় বেরিয়ে এলেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর যুদ্ধে সুজা রণে ভঙ্গ দিলে, দারার পুত্র সুলাইমান ও যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে জয়ী হলেন। অর্ধমৃত নরেন্দ্রকে আশ্রয় দিল এক রাজপুত সৈন্য, গজপতি সিংহ। নরেন্দ্র যশোবন্তের শিবিরে স্থান পেল। নরেন্দ্রের অসুস্থতাকালে জেলেখা নাম্নী এক নারী তার সেবা করত। দিল্লীতে নরেন্দ্রের সঙ্গে গজপতির সাক্ষাৎ হয়। দিল্লীর এক ভাতার দেওয়ানী বালক নরেন্দ্রকে অনুরোধ করে, তাকে কাছে রাখতে।

গজপতি যুদ্ধে যাবার আগে নরেন্দ্রকে জানাল, যুদ্ধে তার মৃত্যু হলে দেশে তার দুটি শিশু-সন্তানকে মহারাজ যেন কৃপা করেন।

আরংজীব স্থির করে পিতামহ তৈমুরের মুকুট ললাটে শোভিত করবে। আরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধে যশোবন্ত পরাস্ত হলেন। গজপতির মৃত্যু হল।

শৈলেশ্বর নামে এক রাজপুরুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নরেন্দ্র পরাভূত হল। শৈলেশ্বর গোস্বামীবেশে নরেন্দ্রকে আদেশ করল, স্বপ্নেদৃষ্ট নারীকে বিবাহ করতে। নরেন্দ্র মুসলমানী জেলেখাকে বিবাহ করতে অসম্মত হলে তাকে বেঁধে রাখল শৈলেশ্বর।

শ্যামনগরের যুদ্ধে জয়লাভ করে আরংজীব ভারতবর্ষের সিংহাসন লাভ করলেন। যশোবন্ত সিংহ আগ্রা এলেন আরংজীবের মিত্র বেশে। নরোজার দিন জেলেখার সহায়তায় নারীর ছদ্মবেশে নরেন্দ্র বেগমমহলে এক রাজপুত নারীকে দেখে হেমলতা বলে মনে করল।

এদিকে তীর্থভ্রমণের পথে শ্রীশ একজন রাজার উপরোধে নরোজার দিন হেমলতাকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রণয়বঞ্চিতা জেলেখা আত্মঘাতিনী হল। মথুরার মন্দিরে হেমের সঙ্গে নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হলে হেমলতা শুষ্ক ও খণ্ডিত মাধবীকঙ্কন ফিরিয়ে দিয়ে নরেন্দ্রকে ভাই বলে গ্রহণ করল। যশোবন্ত ক্ষোভে রাজস্থানে ফিরলেন। সুজা আরাকানে পলায়ন করল। পলায়িত দারাকে সিন্ধুদেশ থেকে এনে আরংজীব হত্যা করল। মোরাদও নিহত হল। ভ্রাতৃরক্তে স্নাত আরংজীব সিংহাসনে বসল।

বিবাহের দশবছর পর হেমলতা বীরনগর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে এক সন্ন্যাসীকে দেখতে গেল। সন্ন্যাসী হেমকে আশীর্বাদ করে চোখের জল মুছে অন্তর্হিত হলেন।

এই উপন্যাসের নায়ক নরেন্দ্র ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সূত্রেই এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি। নরেন্দ্র হেমলতার প্রেমোপাখ্যানের বিষয়টি রাজনৈতিক জালের আবর্তে গৌণ হয়ে পড়েছে। নরেন্দ্রের গৃহত্যাগের উদ্দেশ্য দুটি। এক, পিতার জমিদারি উদ্ধার এবং তারপর হেমলতাকে বিবাহ। নবকুমারের তিরস্কার অভিমানী ও ক্রোধী নরেন্দ্রকে পথে ঠেলে দিয়েছে। জমিদারি উদ্ধারমানসে তাকে বঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্তা সুজার দ্বারস্থ হতে দেখি। তারপর রাজনৈতিক ঝটিকায় নরেন্দ্র ভেসে বেড়িয়েছে প্রায় সমগ্র ভারত ভূখণ্ড। হেমলতার স্মৃতি মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের মনে উঁকি দিলেও ঘটনাবর্তের মধ্যে হেমলতা ও নরেন্দ্রের সম্পর্কের প্রসঙ্গ ক্ষীণতর হয়ে পড়েছে। মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে, সাজিহানের পুত্রদের মধ্যে কলহ, সিংহাসনকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে রাজপুত শক্তির ভূমিকা। স্বাধীন রাজপুতদের প্রতি লেখকের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ছিল। সেই মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন বঙ্গবিজেতায় টোডরমলের চরিত্রে। তার আরও পরিচয় পাই এই গ্রন্থের যশোবন্ত সিংহের বীরত্বে, তার পত্নীর তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্বে ও গজপতি সিংহের মানবিকতার মধ্যে। পরবর্তী গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যেও রাজপুতদের সম্পর্কে লেখকের সশ্রদ্ধ ও সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাই। এই দৃষ্টিতেও গ্রন্থগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব। ‘স্বাধীন রাজপুত জাতি’র প্রতি লেখকের সহানুভূতির গভীর পরিচয় পাই যশোবন্ত সিংহের চরিত্র-চিত্রণে। সম্রাটের প্রতি আনুগত্যবোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যপালন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যশোবন্ত

সিংহের চরিত্রের একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়। তার পাশে আরংজীবের শঠতা, হৃদয়হীনতা ও কর্তব্যচ্যুতির বিষয় যশোবন্তের চরিত্রের সদ্‌গুণাবলীকে প্রোজ্জ্বল করে তোলে। ভারতসম্রাট আরংজীব যে চরিত্রবলে যশোবন্তের তুলনায় হেয়, নগণ্য, একথা লেখক নিশ্চিত করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে লেখক যথাসম্ভব অবিকৃত রেখেছেন। অন্যান্য চরিত্র-চিত্রণে কল্পনাশক্তির প্রয়োগে ও ইতিহাসের বাস্তব রসসঞ্চারে, শক্তির পরিচয় রেখেছেন। এই উপন্যাসের রাজপুত-কাহিনী ইতিহাসের বাস্তবতাকে হুবহু অনুসরণ করে চিত্রিত। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে, চারণের গীতে রাজস্থানের অতীত গৌরবকাহিনী বর্ণিত। যশোবন্তের রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন-কাহিনী যোধপুরে রানীর কর্ণগোচর হলে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ওঠেন। ইতিহাস বলে, যোধপুরের রানী ৮।৯ দিন অবধি উন্মত্তপ্রায় ছিলেন। উদয়পুর থেকে তাঁর মা এসে তাঁকে সান্ত্বনা দেন। এই কারণে অচিরে সৈন্য সংগ্রহ করে যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে যাবেন স্থির হয়। গজপতি সিংহের স্বার্থত্যাগ, মানবিকবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠা যে কোন মোগল-সৈন্য অপেক্ষা উচ্চতর। তার ক্ষণকালীন ভূমিকা পাঠকমনে স্থায়ী রেখাপাত করে। রাজপুত জাতির সামগ্রিক পরিচয়সাধনে লেখক ঐ সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির কথাও উত্থাপন করেছেন। রাজপুত জাতির প্রতি, সর্বোপরি হিন্দুসমাজের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যবোধই এর অন্যতম কারণ। জাতির অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করে, লেখক জাতীয়-জীবনকে যেন অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন।

ইতিহাসের বাস্তব অনুসরণ যেমন গ্রন্থটির ঐতিহাসিক পটভূমি রচনা করেছে, তেমনি লেখক তার ফাঁকে তৎকালীন সমাজ-জীবনের চিত্রও উদ্ধার করেছেন। সুজার রাজদরবারে আমলাতান্ত্রিক জালে সত্য কি ভাবে মিথ্যায় পরিণত হত তার পরিচয় পাই এর্ফান খাঁর সহায়তায় নরেন্দ্রের জমিদারি ফিরে পাবার দাবি জানানর মধ্যে। সুজা উৎকোচগ্রাহী কানুনগোর যুক্তি মেনে নেওয়ার ফলে আপন সম্পত্তিলাভে বঞ্চিত হল নরেন্দ্র। একের সম্পত্তির অধিকারী হল অপরে। আরংজীবের সিংহাসনপ্রাপ্তির পশ্চাতে তার মাতৃহত্যার ঘটনা ইতিহাস-অনুমোদিত। গ্রন্থের মধ্যে ইতিহাস-রস সিঞ্চনে লেখক এক কৌশল গ্রহণ করেছেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, গজপতির সঙ্গে নরেন্দ্রের আকস্মিকভাবে দেখা হবার পর, দিল্লীভ্রমণের পথে গজপতি কর্তৃক

দিল্লীর অতীত ইতিহাস বর্ণনা এবং নরোজার দিন নারীর ছদ্মবেশে নরেন্দ্র কর্তৃক বেগমমহল, নারীবাজার, শিশমহল ইত্যাদি দর্শন প্রভৃতি বিষয়, গ্রন্থটিকে অনায়াসেই ঐতিহাসিক বর্ণ ও ব্যাপ্তি দান করেছে। এইসব বিষয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যটি প্রতিষ্ঠিত।

নরেন্দ্র জেলেখার প্রণয়-প্রসঙ্গ অস্পষ্টতার আবরণমণ্ডিত। জেলেখা রোমান্স রাজ্যের অধিবাসিনী। তাতারবেশী বালকরূপে নরেন্দ্রের নিত্য সঙ্গলাভ ও তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় গোস্বামীকে তিন সহস্র হীরকবলয়ে তুষ্ট করে ভিন্নতর কৌশল অবলম্বন, ছুরিকাহস্তে তার আবির্ভাব, তাতার যুবতীর আকাঙ্ক্ষাপূরণের প্রচেষ্টার পরিচায়করূপ গণ্য করা গেলেও, তার সেবা, প্রেম ও ব্যর্থ প্রণয়জনিত আত্মহত্যা, তার চরিত্রকে স্বাভাবিকতা দান করে নি। বরং অবাস্তব আদর্শবাদের পথে প্রেরণ করেছে। নরেন্দ্র ও জেলেখার কুহেলিকাময় প্রণয় প্রসঙ্গ রোমান্টিক সৌন্দর্যমণ্ডিত। নরেন্দ্র, হেমলতা ও জেলেখাকে নিয়ে ত্রিভুজ প্রণয়সূত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে লেখক নির্মূল করে দিয়েছেন। নরেন্দ্র, হেমলতা, জেলেখার প্রণয়কাহিনী দুটি স্বতন্ত্ররেখায় সমাপ্ত।

এই উপন্যাসটির মধ্যে লেখক পরবর্তী দুটি উপন্যাসের বীজ বপন করেছেন। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে নরেন্দ্রনাথের মাড়োয়ারযাত্রার কালে চারণের মুখে প্রতাপের জয়গাথা রাজপুত জীবনসন্ধ্যার বীজ নিহিত। আবার যশোবন্ত সিংহ ও গজপতি সিংহের অবতারণার মধ্যে 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'এর আবির্ভাব-সম্ভাবনা নিহিত। মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতে যশোবন্ত সিংহের সাক্ষাৎ পাই এবং গজপতির পুত্র রঘুনাথকে শিবজীর অনুচররূপে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখি। গজপতির কন্যা লক্ষ্মীরও সন্ধান পাই এবং পরিশেষে গজপতির পুত্র রঘুনাথের পরিচয় প্রাপ্ত হয়ে যশোবন্ত সিংহকে দেখি পৈতৃক ভূমি সহ বহু জায়গির রঘুনাথকে দান করতে।

মাধবীকঙ্কন-এ লেখক ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার সামঞ্জস্যবিধানে কৃতকার্য হয়েছেন। ইতিহাসের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনপটে নরেন্দ্র ও হেমলতার প্রণয়-কাহিনী গৌণ হয়ে পড়লেও স্বাভাবিক, আবেগসমৃদ্ধ এবং সমাজনীতি-নির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। নরেন্দ্র ও হেমলতার সম্পর্কের মাঝখানে শ্রীশের আবির্ভাব এই তিনটি নরনারীর প্রণয়জীবনে জটিলতা আনে নি। শ্রীশের প্রতি

যে মনোভাব হেমলতা পোষণ কবত তা শ্রদ্ধা ও সম্মানের আলোকে স্নিগ্ধ। তাই শ্রীশ অনাযাসেই ভেবেছে, 'বালিকাব হৃদযে যেটুকু প্রণয বা স্নেহ আছে তাহা শ্রীশকেই অবলম্বন কবিযাছে'। শ্রীশেব প্রতি হেমলতাব আচরণেব মধ্যে কোন স্বতন্ত্র মনোভাবেব সন্ধান আপাতদৃষ্টিতে পাওযা যায না। কিন্তু উগ্র তেজস্বী নবেন্দ্রনাথেব প্রতি হেমলতাব মনেব গভীবে সংগোপনে বক্ষিত প্রেমচেতনাব পবিচয বাহ্যিক ভাবে পবিস্ফুট না হলেও, সংযম ও অপ্রকাশেব আডালে হেমলতাব মনে গভীব শূন্যতা ও নৈবাশ্যেব সৃষ্টি ববেছে। দাম্পত্য-জীবনেব প্রতি গভীব আনুগত্য প্রকাশ পেলেও হেমলতাব দাম্পত্য জীবনেব চিত্র বর্ণহীন ও উচ্ছ্বাসহীন বেখায বিষণ্ণ। নবেন্দ্র ও হেমেব বিদায ও পুনর্মিলনেব দৃশ্য এবং সবশেষে মাধবীকঙ্কনটিকে যমনাব জলে বিসর্জনেব মধ্য দিযে উভযেব সম্পর্কেব ক্ষেত্রে স্থাযী বিচ্ছেদবেখা টেনে দেওযাব ইঙ্গিতেব মধ্যে প্রণযীযুগলেব অন্তর্বেদনাব অব্যক্ত সুব সহজেই অন্তব স্পর্শ কবে। ডক্টব শ্রীকুমাব বন্দোপাধ্যায 'নবেন্দ্র হেমলতাব অন্তর্গূঢ, প্রতিরুদ্ধ-প্রণযেব' 'করুণ চিত্রটি' উপন্যাস সাহিত্যে বিবল বলে উল্লেখ কবেছেন।[১৩]

চবিত্র সৃষ্টি ও রচনা রীতিতে বঙ্কিমেব প্রভাব এই গ্রন্থটিব ক্ষেত্রেও লক্ষণীয। অলৌকিকতাব অবতাবণা, যোগবল প্রযোগ, সন্ন্যাসীব আবির্ভাব, ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মবণ কবিযে দেয। উপন্যাসেব শুবক অংশটা চন্দ্রশেখব এব মত। নবেন্দ্র হেমলতাব প্রেমেব সঙ্গে চন্দ্রশেখব এব প্রতাপ শৈবলিনী প্রেমেব প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য। প্রণযবঞ্চিত নাযকেব সন্ন্যাসীতে রূপান্তবেব উদাহবণ পাই বঙ্কিমচন্দ্রেব কৃষ্ণকান্তেব উইলে। সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দেব কযেকটি উপন্যাসে নাযকেব এই জাতীয পবিণাম লক্ষ্য কবা যায[১৪]।

দাম্পত্য বন্ধন সম্পর্কে হিন্দুধর্মেব শিক্ষা 'মাধবীকঙ্কন'এ পবিস্ফুট। শ্রীপ্রমথ-নাথ বিশী, 'মাধবীকঙ্কনেব শিক্ষাব মূলে বিষবৃক্ষেব ইঙ্গিত থাকাই সম্ভব' বলে

১৩. শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধাবা, প স° পৃঃ ৫১।

১৪ (১) শবৎচন্দ্র দাস : হিবণ (১৮৮৪)

(২) কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায : যোগিনী-জীবন (১৮৮৭)
(স্বামী সন্ন্যাসী হলে স্ত্রীও সন্ন্যাসী হয়)

(৩) নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : শিখরবাসিনী (১৮৯০)

(৪) কমলকুমার (১৮৯৯)

মনে করেন[১৫]। মাধবীকঙ্কনের সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রেরণা, বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক আদর্শের উৎসভূমি থেকে আহৃত।

মাধবীকঙ্কন-এ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের সামঞ্জস্য-বিধানে শিল্পসার্থকতায় দীপ্যমান। 'ভারতী'তে উপন্যাসটির সমালোচনা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'ইহাতে উপন্যাসের ভাগ অতি সংকীর্ণ এবং যতটুকু আছে তাহাও অতি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ইহার উপন্যাসের ভাগ সামান্য হওয়াতে কোন ক্ষতি হয় নাই যেহেতু ইহার ঐতিহাসিক উপাদানটুকু সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে'[১৬]।

'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত'[১৭]-এ শিবজীর স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠনের বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করেছে। লেখক ইতিহাসকে অনুসরণ করে কাহিনীর গ্রন্থন করেছেন। শিবজীর সঙ্গে আরংজীবের শত্রুতা ও যশোবন্ত ও জয়সিংহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দিকটি উপন্যাসে উদ্ঘাটিত হয়েছে। রাজপুতদের প্রতি শিবজীর শ্রদ্ধা, রাজপুতের স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতাচেতনা, হিন্দুত্ববোধ প্রভৃতি ছিল শিবজীর স্বাধীন হিন্দুরাজ্যগঠন আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা। বাল্যকালে দাদাজী কানাইদেবের পদপ্রান্তে রামায়ণ মহাভারতের বীরত্ব কাহিনী শুনে হিন্দুধর্মে তাঁর আস্থা দৃঢ়ীভূত হয়। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ধর্মানুরক্ত ও মুসলমানবিদ্বেষী হন। শিবজীর বীরত্ব রামায়ণ মহাভারতের বীরদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই যুগের বীরত্বের আদর্শ যেন শিবজীর চরিত্রে প্রতিফলিত।

আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে যাদবরাও ও ভনস্লে এই দুটি পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ ছিল। যাদবরাওয়ের বংশ থেকে শিবজীর মাতা ও ভনস্লের বংশ থেকে পিতার জন্ম হয়।

দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বে ভবানীর আদেশ জানাবার জন্য শিবজী তরুণ হাবিলদার রঘুনাথকে পাঠালেন মন্দিরের পুরোহিতের কাছে। পুরোহিত জনার্দনের কন্যা সরযূকে দেখে রঘুনাথের হৃদয় বিচলিত হয়। এর

১৫. প্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক, (প্রথম খণ্ড) পৃঃ ৩৬।

১৬. ভারতী, আষাঢ়, ১২৮৫।

১৭. মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, ১৮৭৮, পৃঃ ৩০০। ১২৮৫ সালের 'বান্ধব'-এ (১ম—১০ম সংখ্যা) প্রকাশিত।

উভয়েব মধ্যে হৃদয় বিনিমিত হয়। দেবীব আদেশ হল,—'ম্লেচ্ছদিগের সঙ্গে যুদ্ধে জয় স্বধর্মীদিগেব সঙ্গে পবাজয়'।

১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ দাক্ষিণাত্যেব শাসনকর্তা হয়ে এলেন। শিবজীকে দমন কবাব ভাব পড়ল তাঁব উপব। যশোবন্ত সিংহ তাঁব সঙ্গে যোগ দিলেন (১৬৬৩ খ্রীঃ)। সন্ধিব প্রস্তাব নিয়ে শিবজীব দূত মহাদেওজী এলেন। যশোবন্ত সিংহেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে মহাদেওজী তাঁব মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। শিবজীব পক্ষগ্রহণে যশোবন্ত সম্মত হলেন। দূতরূপী মহাদেওজীই শিবজী।

আখ্যায়িকাব শুরু ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই সময় বিজয়পুবেব সঙ্গে শিবজীব সন্ধি হয়। তৎপূর্বে তিনি আবুল ফাজেলকে আলিঙ্গনকালে হত্যা কবেন। শিবজী শায়েস্তাব আবাস আক্রমণ কবলেন। শায়েস্তা খাঁ পালাতে গিয়ে একটি আঙ্গুল হাবালেন। চাঁদখাব পুত্র মহাসিংহেব খড়্গ থেকে শিবজীকে বক্ষা কবল বঘুনাথ। আওবঙ্গজীব পুত্র মোয়াজীম ও যশোবন্তকে পাঠালেন শিবজীব বিরুদ্ধে। শিবজী বায়গড়ে এসে বাজ উপাধি নিলেন।

বিবহিণী সবযু বোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বোগমুক্তিব পব আকস্মিকভাবে বঘুনাথেব সঙ্গে তাব সাক্ষাৎ হয়। সবযু বঘুনাথেব জয় প্রার্থনা কবে।

শিবজীব বিরুদ্ধে জয়সিংহ প্রেবিত হলে, শিবজী তাঁব শিবিবে এসে হিন্দুবাজ্য স্থাপনেব কল্পনা জানান। শিবজীব অভিপ্রায়কে জয়সিংহ অভিনন্দিত কবেন কিন্তু সত্যাবদ্ধ জয়সিংহ দিল্লীব অধীনতা অস্বীকাব কবতে পাবেন না। সম্রাটেব সঙ্গে সন্ধি হয়। সম্রাটেব পক্ষ গ্রহণ কবে শিবজী বিজয়পুবেব বিরুদ্ধাচবণ কবতে লাগলেন এবং কদমণ্ডল অধিকাব কবলেন। বঘুনাথ অসমসাহসিকতাব পবিচয় দিলেন কিন্তু ভুল বোঝাবুঝিব জন্য বঘুনাথকে নিবস্ত্র কবে দল থেকে বহিষ্কৃত কবা হয়। চন্দ্রবাও বঘুনাথকে দোষী প্রতিপন্ন কবালেন।

গজপতি সিংহেব পালিত চন্দ্রবাও মাড়ওয়াবেব পথে দস্যুতা কবে গজপতিব পুত্র ও কন্যাকে মহারাষ্ট্রে নিয়ে আসে। লক্ষ্মীকে সে বিবাহ কবে। বঘুনাথ দস্যুশিবিব থেকে পলায়ন কবে। শিবজী কর্তৃক বিতাড়িত বঘুনাথ ঘটনাচক্রে ভগিনী লক্ষ্মীব সাক্ষাৎ পায়। লক্ষ্মী তাকে কলঙ্কমুক্ত হতে বলে। গোস্বামী-

বেশে রঘুনাথ সরযূর কাছে এলে সে বলে, রঘুনাথ বাহুবলে ও কার্যগুণে অপযশ দূর করবেন অথবা প্রাণ দেবেন।

শিবজী মুরেশ্বর, স্বর্ণদেব ও অন্নজীকে মহারাষ্ট্রের শাসনভার দিয়ে পাঁচশ অশ্বারোহী, একহাজার পদাতিক নিয়ে আরংজীবের সাক্ষাৎমানসে দিল্লী যাত্রা করলেন। পৃথু রায়ের দুর্গ থেকে আধুনিক দিল্লী পর্যন্ত আসতে শিবজীর মনে হল, যেন সেই পথেই ভারতের ইতিহাস অঙ্কিত আছে।

আরংজীবের কাছে শিবজী যথাযোগ্য সমাদর পেলেন না, শিবজী স্বগৃহে বন্দী হলেন। তন্নজী হাকিমের ছদ্মবেশে জানাল শিবজীর অনুচরবৃন্দ দিল্লী ত্যাগ করেছে। শিবজী রোগমুক্তি উপলক্ষে দিল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে বৃহৎ বৃহৎ আধারে ফল মিষ্টি পাঠানর কালে, দুটি আধারে তিনি ও পুত্র শম্ভুজী পলায়ন করলেন। মথুরাযাত্রার পথে তাকে শত্রুসেনার হাত থেকে রক্ষা করল অশ্বরক্ষক জানকীর বেশে রঘুনাথ। শিবজী রঘুনাথের কাছে অপরাধ স্বীকার করে তাকে আলিঙ্গন দিলেন।

গৃহত্যাগিনী সরযূর সঙ্গে নাটকীয় ভাবে মিলন হল রঘুনাথের। জয়সিংহের মৃত্যুর পূর্বকালে, শিবজী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি মোগলসাম্রাজ্যের পতনের নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা বললেন। শেষে বললেন, 'কপটচারী আপনাকেই শাস্তি দান করে, সত্যমেব জয়তে'। শিবজী দুর্গে ফিরে এসে সৈন্যদের উৎসাহিত করলেন, 'পূর্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখিতে পাইতেছ ও প্রভাতের রক্তিমাচ্ছটা। কিন্তু ও আমাদিগের পক্ষে সামান্য প্রভাত নহে, মহারাষ্ট্রগণ! হিন্দুগণ! অদ্য আমাদের জীবনপ্রভাত'।

সমস্ত সেনানী ও সৈন্যরা গর্জে উঠল—'অদ্য আমাদের জীবনপ্রভাত'।

বিচারে চন্দ্ররাওকে কঠিন শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে চাইল রঘুনাথ। কিন্তু চন্দ্ররাও রঘুনাথের বুকে পদাঘাত করে আত্মহত্যা করল।

সরযূর সঙ্গে বিবাহ হল রঘুনাথের। যশোবন্ত সিংহ, গজপতির পুত্র রঘুনাথকে পৈতৃক ভূমি ও অনেক জায়গির দিলেন। লক্ষ্মী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হল।

ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ উপন্যাসটিতে রাজপুত শক্তির পরাভবের পর শিবজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র-শক্তির হিন্দুরাজ্য গঠন-প্রচেষ্টা বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসটির ঘটনাকাল ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শিবজীর মৃত্যুকাল অর্থাৎ ১৬৮০

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। শিল্পের ঊর্ধ্বে ইতিহাস যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। দেশকাল, পরিবেশ, চরিত্র, সর্ববিষয়ে লেখকের ঐতিহাসিক-চেতনায় উপন্যাসটি মণ্ডিত। অবশ্য ঐতিহাসিক কাহিনীর পাশে রঘুনাথ-সরযুর প্রেমোপাখ্যানটি কল্পিত। ঘটনা ও পরিবেশের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য-হীন। এখানে রমেশচন্দ্রের কল্পনাশক্তি, ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধির পাশে একেবারে ম্লান। রমেশচন্দ্র ডফএর 'হিস্টরি অফ মারহাট্টাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিবৃত শিবজীর কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। রমেশচন্দ্রের তীব্র হিন্দুজাতীয়তাবোধ থেকেই উপন্যাসটির জন্ম। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে, ব্রাহ্মণের পুরাণপাঠের পুণ্যকথার সূত্র ধরে রমেশচন্দ্র হিন্দুভারতের গৌরবময় দিনগুলি রোমন্থন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'গৌরবের দিনে এই অনন্ত-গীতে আমাদিগে পূর্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, এবং অযোধ্যা, মিথিলা, হস্তিনা, মগধ, উজ্জয়িনী, দিল্লী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে প্লাবিত করিয়াছিল। দুর্দিনে এই গীত গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ, হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনবায় পুবাকালের গৌরবসাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন'। পরে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন, 'একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব। কেবল এই উদ্দেশ্যে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে—নচেৎ পুস্তক দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না'। এই গভীর হিন্দুত্ববোধ থেকেই ভারতের দুই বীর জাতির দুই বীর সন্তান অবলম্বনে মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত ও রাজপুত-জীবনসন্ধ্যার জন্ম।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭)-এ শিবজীর কাহিনীতে শিবজী-রোশিনারা উপাখ্যানও মূলত বিবৃত হয়েছিল। তবে যশোবন্ত ও শিবজীর কথোপকথনের মধ্যে শিবজীর স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ এবং যশোবন্তকে উত্তেজিত করার প্রসঙ্গ জীবনপ্রভাত-এ আরও প্রসারিত। জীবনপ্রভাতের কিছুকাল পূর্বে রচিত কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর 'রোশিনারা'র (১২৭৬, ইতিবৃত্তমূলক উপাখ্যান) কাহিনী শিবজীকে কেন্দ্র করে রচিত। রোশিনারা ও শিবজীর প্রেমকাহিনী ভূদেবের গ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থে আরও

বিস্তৃত। শিবজীর চরিত্র এই গ্রন্থে ভূদেবের অপেক্ষা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। গ্রন্থটিকে মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতের পূর্বভূমিকা বলা চলে। রাজপুত ও মারাঠা জাতির গৌরবকাহিনী, উপন্যাসটিতে উজ্জ্বল রূপ লাভ করেছে। হৃত-সর্বস্ব রাজপুতশক্তি যেন নতুন প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে মারাঠা শিবজীর মধ্যে। শিবজী যেন রাজপুতশক্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেছেন। যশোবন্ত সিংহকে স্বমতে আনা ও জয়সিংহের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপোষণের মূলে, রাজপুতজাতির প্রতি শিবজীর গভীর আস্থাই প্রকাশ পায়। গজপতির পুত্র রঘুনাথ এই উপন্যাসের উপনায়ক। রঘুনাথের শৌর্য, বীরত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা রাজপুতশক্তির নবার্জিত গৌরবই বহন করে। আরংজীবের অধীনস্থ জয়সিংহ সত্যপালনে সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষায় এবং মোগলরাজ্যের আসন্ন বিলুপ্তির পর মহারাষ্ট্রের গৌরব তথা হিন্দুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। কিন্তু ক্ষত্রিয় জয়সিংহ সত্যধর্ম লঙ্ঘন করে দিল্লীর বিরোধিতা করতে পারেন না। রাজপুতের ক্ষত্রধর্মনিষ্ঠার এ এক জ্বলন্ত উদাহরণ। হিন্দু জয়সিংহের সঙ্গে শত্রুতাচরণ, শিবজীর ধর্মবিরোধী। তাই জয়সিংহের বশ্যতা স্বীকার করে তাকে চরম সম্মান দান করলেন গুরুর গুরু রূপে বরণ করে। হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর বিরোধ, হিন্দুজাতির ঐক্যশক্তির অন্তরায় বলেই শিবজী মনে করতেন।

রঘুনাথ ও সরযূর প্রণয়কাহিনী এই গ্রন্থের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। ভবানীর মন্দিরযাত্রার কালে সরযূকে দর্শন ও চিত্তচাঞ্চল্য এবং পুরোহিতগৃহে সরযূ কর্তৃক সেবা ও পরিচর্যা, রঘুনাথের সরযূর প্রতি প্রেমাকর্ষণ তীব্রতর করে তুলেছে। সরযূর হৃদয়েও অবরুদ্ধ প্রণয়চেতনার ঢেউ উঠে উচ্ছ্বসিতভাবে আছড়ে পড়েছে রঘুনাথের হৃদয় উপকূলে। রাজপুত নারী রূপে সরযূর আচরণ অনেকটা স্বভাবিক। রঘুনাথ ও সরযূর প্রণয় প্রথমদর্শনজাত। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে প্রথম দর্শনজাত প্রণয়ের উদাহরণই বেশী।[১৮] এই প্রণয় কাহিনীটিতে কাহিনীর নায়ক-নায়িকার মিলন-মুহূর্তগুলি আকস্মিকতাপূর্ণ।

লেখক উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিক ব্যাপ্তিদানে সচেতন থেকেছেন। দিল্লীর

১৮ বঙ্গবিজেতা : ইন্দ্রনাথ—সরলা
মাধবীকঙ্কন : জেলেখা—নরেন্দ্র
জীবনপ্রভাত : রঘুনাথ—সরযূ
জীবনসন্ধ্যা : তেজসিংহ—পুষ্প

পথ পরিক্রমাকালে মন্ত্রী রঘুনাথ পন্থ কর্তৃক শিবজীকে দিল্লীর ঐতিহাসিক পরিচয়দান কেবলমাত্র শিবজীর হৃদয়ে অতীত হিন্দু গৌরবের কথা ভাবিয়ে ক্ষুব্ধ করেনি, গ্রন্থটির ঐতিহাসিক পট প্রসারিত করে উদ্দেশ্যসাধনে পাঠকের সহানুভূতি প্রকাশের অবকাশ করে দিয়েছে। এই অতীত হিন্দুগৌরব নব-প্রেরণায় শিবজীকে উদ্দীপিত করে তোলে।

সীতাপতি গোস্বামী ও অশ্বরক্ষক জানকী রূপে রঘুনাথের ভূমিকা অস্বাভাবিকতাপূর্ণ। তার ছদ্মবেশ ও আকস্মিক আবির্ভাব বাস্তবরস ক্ষুণ্ণ করেছে। অভিমানিনী সরযূ গৃহত্যাগ করার পর যখন গোকর্ণ নামে কৃষকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করল, তখন সে জানতে পারেনি যে, নিরুদ্দিষ্ট রঘুনাথের সঙ্গে তার পুনর্মিলন ঘটতে পারে। সেই পরিবারের সন্তান ভীমজী রঘুনাথের অধীনস্থ শিবিরের সেনা। [illegible] ভীমজীর সম্বাদসূত্রে রঘুনাথের খবর পাওয়া গেল যে সে কৌশলে শিবজীকে উদ্ধার করেছে এবং সকলে ফিরে আসছে। সেই সঙ্গে রঘুনাথের সঙ্গে সরযূর পুনর্মিলনের আভাসবাহী। ঘটনা যোজনার কৌশল লেখকের [illegible]।

রূপকল্পনায় রমেশচন্দ্রের আদর্শের উল্লেখ যোগ্য। যুদ্ধের নিখুঁত চিত্র-অঙ্কনে এবং যুদ্ধকালীন বর্ণনায় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে ঈশানী মন্দিরে ভ্রাতা ভগিনী (রঘুনাথ লক্ষ্মীর) মিলন দৃশ্যটি আন্তরিকতার আলোকে উজ্জ্বল।

শিবজী এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর চরিত্র। তবে শায়েস্তা খাঁকে পরাভূত করার পরে, শিবজীর পুণানগরী ভ্রমণ ও যুদ্ধসজ্জার ঘটনা ইতিহাস অনুসৃত নয়। শিবজীর চরিত্রকে ব্যাপ্তি দেবার বেলা কৌশল লেখক এভাবে গ্রহণ করেছেন। শিবজীর জাগ্রত হিন্দুচেতনা দিল্লীর পথে হিন্দুরাজা পৃথুরায়ের দুর্গদর্শনে হিন্দুর অধঃপতন জনিত ক্ষোভ, জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহের কাছে হিন্দুরাজ্যগঠনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ এবং রাজপুত [illegible] হিন্দুর সঙ্গে যুদ্ধে শোণিতপাতের অনিচ্ছা প্রভৃতি বিষয় তার চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার রুদ্রমণ্ডল দুর্গ অধিকৃত হবার পর, চন্দ্ররাওয়ের কথায় তার প্রাণরক্ষাকারী রঘুনাথকে কঠিন শাস্তিদান এবং ভুল বোঝার পর দিল্লীতে রঘুনাথের প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা ও আলিঙ্গন দান প্রভৃতি ঘটনা কঠোরে-কোমলে গড়া শিবজী চরিত্রের

যথার্থ নিদর্শন। শিবজীর সাহসিকতা, যুদ্ধকৌশল, অদম্য মনোবল, শত্রুর প্রতি ভদ্রতাচরণ, আত্মসম্ভ্রমবোধ, চাতুর্য, আপন পর নির্বিশেষে অন্যায়কারীকে শাস্তিদান এবং সর্বোপরি হিন্দুর অতীত গৌরব সম্পর্কে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, তার চরিত্রকে একটি উন্নত ও বলিষ্ঠ মানবের মর্যাদা দান করে, তার কীর্তিকে স্থায়িত্ব দিয়েছে। শিবজীর সাধনা দেশের ধর্মসাধনারই নামান্তর এবং সেই সাধনার ভিত্তিভূমিতে শিবজীর কীর্তি অবিনশ্বর। শিবজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য,—'বস্তুত, তাঁহার সাধনা সমস্ত দেশেরই ধর্মসাধনার একটি বিশেষ প্রকাশ। এই ধর্মসাধনার আহ্বানেই খণ্ড খণ্ড মারাঠা আপনার বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র সম্মিলিত করিয়া মঙ্গল উদ্দেশ্যের নিকট নিবেদন করিতে পারিয়াছিল, লুণ্ঠনের ভাগ লইয়া ক্ষমতার ভাগ লইয়া, পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে নাই'[১৯]। এই উক্তি এই উপন্যাসের শিবজী চরিত্রের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। শিবজীর চরিত্র অঙ্কনে লেখকের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস সার্থকতার বর্ণে দীপ্যমান।

আরংজীবের চরিত্র ইতিহাস অনুসৃত। আরংজীবের পর্বসূত্র আমরা মাধবীকঙ্কন এ পেয়েছি। মানুষের প্রতি তীব্র অবিশ্বাসবোধ আরংজীবের তথা মোগলসাম্রাজ্যের পতনের কারণ। এই অবিশ্বাস থেকে বন্ধুর শত্রুতে রূপান্তর সম্ভব। বিজয়পুর জয় করার জন্য জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ, পিতার জন্য সামান্য সৈন্য প্রার্থনা করলে আরংজীব নামঞ্জুর করলেন এবং জয়সিংহকে পদচ্যুত করে যশোবন্ত সিংহকে পাঠালেন। সত্যনিষ্ঠ সেনাধ্যক্ষদের প্রতি চরম অবিশ্বাস পোষণ, আরংজীবের ভবিষ্যৎ পতনের ধাপ রচনা করেছে। শিবজীর মত আরংজীবও ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু ব্যক্তি ও জীবনের প্রতি আচরণের ভিন্নতা, উভয়ের চরিত্রকে যেন একই গোলকের বিপরীত মেরুতে স্থাপন করেছে। ধূর্ত ও কুটিল আরংজীবের তুলনায় শিবজী অনায়াসেই পাঠকের সহানুভূতিলাভে সক্ষম হয়েছে। আরংজীবের সঙ্গে দুর্গাদাসের নেতৃত্বে রাজপুতদের সংঘর্ষ এবং তার দুর্বলনীতির জন্য মোগলসাম্রাজ্যের পতনের বিষয় নিয়ে সমকালে রচিত আর একটি উপন্যাস পাই।[২০]

জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহের চরিত্রের আপাতবিরুদ্ধতা রাজপুত-চরিত্রের

১৯ রবীন্দ্রনাথ, ইতিহাস (শিবাজী ও মারাঠা জাতি)।

২০. ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কোহিনুর (১৮৯৩)

বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। আরংজীব কর্তৃক অপমানিত ও পদচ্যুত হয়েও জয়সিংহ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ত্যাগ করেননি। সম্রাটের প্রতি চরম কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন।

চরিত্রের সত্যনিষ্ঠা ঔদার্য ও বিশ্বস্ততা জয়সিংহের চরিত্রের প্রধান উপাদান। জয়সিংহের চরিত্রচিত্রণে লেখক টডকে অনুসরণ করেছেন। যশোবন্ত সিংহের চরিত্রে দোদুল্যমানতা, সত্য ও কর্তব্যনির্ধারণে অস্থিরচিত্ততা এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জয়সিংহের চরিত্রের বিপরীত।

চন্দ্ররাও ও লক্ষ্মীবাঈ সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর চিতায় লক্ষ্মীর সহমৃতা হবার পশ্চাতে রাজপুত নারীর স্বামীর প্রতি ভালোবাসার গভীরতা ও একাত্মতাব সম্পর্কেব দিকটি পরিস্ফুট।

গ্রন্থটিতে বঙ্কিমের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। রচনারীতিতে এবং মেজাজে বঙ্কিম-অনুসৃতি স্পষ্ট। দ্বিতীয়টির পশ্চাতে, উভয় শিল্পীর মানসিকতার অভিন্নতাই হয়ত কাবণ। পাঠককে আহ্বান, চরিত্রেব আচরণ ও ঘটনার ক্ষেত্রে লেখকের মন্তব্য, রোমান্সসুলভ চমকদান প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমের মৃণালিনীতে (১৮৬৯) ঐতিহাসিক প্রেরণার সঙ্গে পরাধীনতার গ্লানিও বর্তমান। মৃণালিনীতে সূচিত স্বদেশপ্রেম জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যায় প্রতিফলিত এবং উপন্যাসদ্বয়ে এই প্রেরণা কুলপ্লাবিত। অবশ্য এর অন্যতম কাবণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও বমেশচন্দ্র উভয়ের মানসে ইতিহাসের প্রেরণার সঙ্গে স্বাধীনতার প্রেরণার অবস্থিতি।

'বাজপুত-জীবনসন্ধ্যা'য়[২১] বাজস্থানের অতীত গৌরবের ঐতিহাসিক পটে মোগলের সঙ্গে স্বাধীনতারক্ষাব্রতী প্রতাপসিংহের যুদ্ধের প্রসঙ্গই মূলত উত্থাপিত হয়েছে। এবিষয়ে লেখক প্রতাপসিংহের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি-অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। বাজপুত জাতির প্রতি রমেশচন্দ্রের শ্রদ্ধার পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর পূর্ববর্তী তিনখানি উপন্যাসে। কিন্তু বাজপুতদের প্রাধান্য দিয়ে পূর্ববর্তী উপন্যাসত্রয় রচিত হয়নি। রাজপুতজাতি ও শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত উপন্যাস রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা। রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি রাজপুত-বীরত্বকে অবলম্বন করে প্রবল ধারায় স্ফূর্ত হয়েছে এই উপন্যাসে।

রাজপুতদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও আত্মকলহের বিষয় এই উপন্যাসে প্রথম আভাসিত হয়েছে। চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরদের মধ্যে বংশপরম্পরাগত বৈরিতার

২১. রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা, ১৮৭৯, পৃঃ ২১৩।

প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাকাল শুরু হয়েছে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। মেওয়াবের পর্বতদুর্গ সূর্যমহলের দুর্গেশ্বর চন্দাওয়ৎ দুর্জয় সিংহ, আহেরিয়ার মৃগয়াকালে, বন্যবরাহ কর্তৃক আক্রান্ত হলে যে বীর যুবক তাকে রক্ষা করল, সে দুর্জয় সিংহের কুলশত্রু রাঠোর তিলক সিংহের পুত্র তেজ সিংহ।

চন্দাওয়ৎ কুলেশ্বর সালুম্ব্রাধিপতি সৈন্যসামন্ত নিয়ে কমলমীরে মহারানা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রতাপ সিংহ কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে সকলে তুর্কীদের হাত থেকে চিতোর উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল। সলিম ও মানসিংহ মেওয়াবের বহির্ভাগ অধিকার করলেন। হলদিঘাটার যুদ্ধে রাজপুত শক্তি মোগলদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হেনে পরাভব স্বীকার করল। আহত প্রতাপ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। যুদ্ধান্তে প্রতাপ ও ভ্রাতা শক্তের মিলন হল।

চারণীর উপদেশ অনুযায়ী তেজ সিংহ সাময়িকভাবে দুর্জয় সিংহের বিরুদ্ধে প্রতিশোধগ্রহণে বিরত হয়ে, হলদিঘাটার যুদ্ধে যোগদান করল। রাঠোর যোদ্ধা দেবী সিংহ তেজ সিংহকে উত্তেজিত করল সূর্যমহল জয় করতে। কিন্তু তেজ সিংহের অনুরোধে এবং 'ওযেরী' নিষিদ্ধ থাকায় তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে চিতোর উদ্ধার করাই স্থির হল। চারণের কাছে দুর্জয় সিংহ জানলেন যে, শিশোদীয়রা আসবার আগে ভীলরা এই প্রদেশে বাস করত। তেজ সিংহ যে ভীলবেশে আছেন দুর্জয় সিংহ তা জানতেন।

চারণ, পুষ্পের প্রতি তেজ সিংহের ভালোবাসার স্বীকৃতি স্বরূপ তেজ সিংহ প্রদত্ত আংটি তাকে দিল। চারণ ছদ্মবেশী তেজ সিংহ।

বছরের পর বছর যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মোগল মেওয়ার জয় করতে পারল না। প্রতাপের বীরত্বকথা দিল্লী পৌঁছাল। সূর্যমহলে প্রতাপের পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করল। সূর্যমহল মোগলের অধিকারে আসার পূর্বে রাজপরিবার ভীমগড় দুর্গে প্রেরিত হল। ভীমগড় মোগল কর্তৃক আক্রান্ত হবার কালে নারীরা চিতায় প্রাণ দিয়ে সতীত্ব রক্ষা করল। প্রতাপ সিংহ ভীল নির্বাসিত চপ্পন প্রদেশে বাস করার কালে কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। প্রতাপ চিতোর আজমীর ও মণ্ডলগড় ছাড়া সব উদ্ধার করলেন। সূর্যমহল অধিকারকালে তেজ সিংহ ও দুর্জয় সিংহ পরস্পরে ভাইয়ের মত লড়াই করল।

কিছুকাল পরে তেজ সিংহ প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সূর্যমহল অধিকার

করল। আঠার বছর পর সূর্যমহল রাঠোরদের অধিকৃত হল। গোকুল দাস পুত্রহন্তা দুর্জয় সিংহকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করল এবং দুর্জয়ের খড়্গাঘাতে নিজে নিহত হল।

১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপের মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র অমর সিংহ পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী যুদ্ধ করে ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে মোগলের অধীনতা স্বীকার করল। কিছুকাল পরে অমর সিংহ অধীনতা অস্বীকার করে, পুত্র করণকে রাজপদে অভিষিক্ত করল। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক মেওয়ার আক্রমণের পঞ্চাশ বছর পরে, জাহাঙ্গীরের শাসনকালে মেওয়ারের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হল।

রাজপুতদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও বৈরিতার সম্পর্কের পাশাপাশি, মহারানা প্রতাপ সিংহের দুর্জয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের চিত্র লেখক দিয়েছেন। রাজপুতদের মধ্যে পারিবারিক কলহ ও বৈরিতা যে সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তার কারণ দেশরক্ষাকল্পে প্রতাপ সিংহের প্রতি চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরদের আনুগত্য-বোধ। রাজপুতজাতির প্রতি রমেশচন্দ্রের অবিমিশ্র শ্রদ্ধাবোধের যে পরিচয় পূর্ববর্তী তিনটি উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, আমরা আলোচনাক্রমে তার স্বরূপ উল্লেখ করেছি। এই উপন্যাসে লেখকের রাজপুতপ্রীতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাজপুতজাতির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় ও রাজনৈতিক কর্মধারার মধ্যে। রাজপুতজাতির গৌরবপূর্ণ ইতিহাসই লেখকের প্রেরণার উৎস। লেখক বলেছেন, 'রাজপুত ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর,—কপট-চারিতার পরিচয় নাই, সত্যভঙ্গের পরিচয় নাই, পরমশত্রুর সহিতও অন্যায় সমরের বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় নাই। সম্রাটের বাক্য লঙ্ঘন হইয়াছে, সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের সত্যলঙ্ঘন হয় নাই!' রাজপুতজাতির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রমেশচন্দ্রের রচনায় প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। পারিবারিক বিরোধের ফল যে জাতিকে দুর্বল করে তোলে, ঐক্য শক্তির মূলে সংশয়ের সৃষ্টি করে, তার উদাহরণ পাই চন্দাওয়ৎ রাঠোরদের বৈরিতার সম্পর্কের মধ্যে।

প্রতাপের স্বাধীনতা-প্রীতি, দেশরক্ষার সঙ্কল্প, কৃচ্ছ্রসাধনা ও স্বার্থত্যাগ সামন্তগণের প্রভুভক্তি ও 'স্বামীধর্মে'র প্রতি নিষ্ঠা, রাজপুতনারীর সতীত্বরক্ষার্থ অগ্নিতে আত্মাহুতি প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে রাজপুতজাতির বীরত্বব্যঞ্জক রূপটি অনায়াসে মূর্ত হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ঝটিকাক্ষুব্ধ আবর্তের গভীরে, চন্দাওয়ৎ-

রাঠোর সংঘর্ষের বিষয়টি গ্রন্থের সামগ্রিক পরিবেশকে যেন অগ্নিবলয়মণ্ডিত করে রেখেছে। প্রতাপেব পরিচয় ফুটে উঠেছে যুদ্ধক্ষেত্রে তার অবিচলিত প্রতিজ্ঞায় এবং তার আত্মত্যাগের মধ্য দিযে। কিন্তু দুর্জয় সিংহ এবং তেজ সিংহেব বিরোধের বিষযটি উপন্যাসে দীর্ঘস্থান জুড়ে ছড়িযে আছে। এই বিষযটিকে প্রাধান্য দেবাব কারণ হযত গৃহযুদ্ধেব মর্মান্তিক পবিণতি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন কবা। বমেশচন্দ্রের স্বদেশচিন্তায বিষযটি হযত বা গভীরভাবে নাড়া দিযেছে। দুর্জয সিংহ অপেক্ষা তেজ সিংহের প্রতি লেখকের সহানুভূতি গভীরতব। তিলক সিংহেব বিধবা স্ত্রীকে হত্যা, পুত্র তেজ সিংহকে নদীতে নিক্ষেপ প্রভৃতি দুর্জয সিংহেব পাশবিক আচবণকে লেখক সমর্থন কবতে পারেন নি। তাই 'আহেবিযা' মৃগযাকালে বন্যববাহেব হাত থেকে তেজ সিংহ কর্তৃক রক্ষা পাওযাব ঘটনায দুর্জয সিংহেব অধিকতব বীবত্ব ও কৌশল স্বীকৃত হযেছে। জন্মার্জিত ক্রোধ ও বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও দেশেব সংকটকালে সামযিকভাবে গৃহবিবাদের কথা বিস্মৃত হযে বানাব পক্ষে যোগদান এবং প্রতাপ সিংহ উভযকে তুল্যবীব জ্ঞান কবে কাকে 'দুনা' দেবেন স্থিব কবতে না পাবাব কালে, তেজ সিংহ দুর্জয সিংহকে দুনা পাবাব যোগ্য বলে জানানব মধ্যে কর্মেব ফল প্রাপ্তিব প্রতি তাব নির্লোভ ও নিস্পৃহ মনেব পবিচয পাওযা যায। স্যযমহল দখলের কালে তেজ সিংহকে বাঠোব যোদ্ধা দেবী সিংহেব উৎসাহদান পাহাড়জী ভূমিযা কর্তৃক প্রতিশোধগ্রহণে উৎসাহ, চন্দ্রপুব প্রভৃতি 'বসী' গ্রামগুলিব অধিবাসীদেব সমর্থন, তেজ সিংহের পিতৃদুর্গ অধিকাবে ব পশ্চাতে যৌক্তিকতার উদাহবণ। এমন কি প্রতাপ সিংহেব উক্তি, 'ভবসা কবি, আচবে তুমি পৈতৃক দুর্গ অধিকাব কবিবে', তেজ সিংহেব সিদ্ধান্তেব সমর্থন কবে। অপরপক্ষে দুর্জয সিংহেব সাহসিকতা, বীবত্ব ও দেশেব সংকটকালে প্রতাপ সিংহেব কর্মে সহাযতাব বিষয যেমন তাব চবিত্রেব একদিক, অপব দিকে রাঠোরদের প্রতি অমানুষিক আচবণ চন্দ্রপুর প্রভৃতি 'বসী' গ্রামগুলিব জনসাধারণেব প্রতি অত্যাচাব, পুষ্পকুমাবীকে বলপূর্বক বিবাহেব চেষ্টা, 'দোলা' প্রথাব সুযোগগ্রহণ প্রভৃতি তার চবিত্রেব মসিলিপ্ত অপবদিক। তেজ সিংহ অপর সকলেব সঙ্গে লেখকেবও সহানুভূতি লাভ করেছে। প্রতাপেব প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে চন্দাওবৎ-বাঠোব সম্পর্কের দ্বাবা অনেকাংশে আচ্ছন্ন। এবং এই কারণে প্রতাপের প্রতি সহানুভূতিব অনেকখানি তেজ সিংহ কর্তৃক অধিকৃত।

তেজ সিংহ ও পুষ্পের প্রণয়প্রসঙ্গ এই উপন্যাসের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে সামঞ্জস্যহীন। চারণবেশী তেজ সিংহ কর্তৃক তেজ সিংহের প্রণয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ পুষ্পকুমারীকে পরিচয়জ্ঞাপক অঙ্গুরিদান এবং পুষ্পকুমারী কর্তৃক অঙ্গুরি-হারানর ঘটনা এবং পরিশেষে রত্নপ্রাপ্তি ও পুনর্মিলন, গতানুগতিক শিল্পরীতির চর্বিতচর্বণ। ইতিহাস-রস গ্রন্থটির গল্পের গতিকে মন্থর করে তুলেছে। চারণের গান উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক ব্যাপ্তিদান করেছে। তা ছাড়া চারণ-চারণী, উপন্যাসের ঘটনার যোগসূত্ররচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বর্ণনানৈপুণ্যে যুদ্ধগুলির চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির চিত্রবর্ণনায় লেখক কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রতাপ সিংহ ও ভ্রাতা শক্ত সিংহের মিলনের দৃশ্যটি সৃজনী-শক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ইতিহাসের এই ঘটনাটি লেখকের অপরিমেয় সহানুভূতিলাভে অনবদ্য শিল্পসুষমা লাভ করেছে।

এই উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র ও ঘটনা ঐতিহাসিক। এক দুর্বল মুহূর্তে আকবরের কাছে প্রতাপসিংহের সন্ধিপ্রার্থনা এবং তৎপরে আকবরের রাজপুত সভাসদ পৃথ্বীরাজ কবি কর্তৃক প্রতাপ সিংহকে উৎসাহদান এবং রাজপুতকুল পবিত্র রাখার আবেদন, প্রতাপের বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ভামশাহের সঞ্চিত অর্থদান এবং যুদ্ধে উৎসাহদানের ফলে চিতোর, আজমীর, মণ্ডলগড় ছাড়া বাকি অংশ উদ্ধারকাহিনী ইতিহাস অনুমোদিত। প্রতাপের চরিত্র একান্তভাবে ইতিহাস-অনুসৃত। প্রতাপের শৌর্য, বীর্য ও বীরত্বের মধ্যে লেখক স্বাধীন জাতীয়-নেতার নির্ভীকতার রূপটি চিত্রিত করেছেন, 'একবার নহে, সেইদিন ক্রমান্বয়ে তিনবার প্রতাপ সিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন যে বাহু একাকী ভারতবর্ষের বলবীর্যের সহিত যুঝিতে সাহস করিয়াছিল, অদ্য ভারতবর্ষের একীকৃত সৈন্যদল সে বাহুর বিক্রমের পরিচয় পাইল'।

মান সিংহ ও সলিম এই উপন্যাসে সংকীর্ণ স্থান গ্রহণ করলেও অবিকৃত। ভোজসভায় মান সিংহের উপস্থিতির জন্য প্রতাপ কর্তৃক ভোজসভা বর্জনের পশ্চাতে, ধর্ম ও জাতিদ্রোহী মানসিংহের প্রতি রাজপুতজাতির ঘৃণার ভাবটি সুপরিস্ফুট।[২২] প্রতাপের স্ত্রীর সামান্য ভূমিকা রাজপুত নারীর চরিত্রের

২২. সমকালে রচিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কমলাদেবী (১৮৮৫) উপন্যাসে মান সিংহকে হিন্দুজাতির কলঙ্ক না বলে লেখক বলেছেন, 'দেবতা ভাবিয়া ভক্তি করিতে সাধ হয়।'

বোশন্যজ্ঞাপক। চারণী, তেজ সিংহের যুদ্ধাকাঙ্ক্ষাকে গৃহযুদ্ধের পথে ঠেলে না দিয়ে হলদিঘাটাব পথে প্রেরণ কবে, বাজপুত নারীর জাতীয়-চেতনার পবিচয় দিয়েছে। তেজ সিংহ ভীলদের আশ্রিত থাকায় রাজপুতদেব সঙ্গে ভীলদেব সম্পর্কনির্ণয়েব চেষ্টাও লক্ষিত হয। বাজপুত-ভীল সম্পর্ক নিযে লিখিত স্বর্ণকুমারীব 'মিবাববাজ' (১৮৮৭), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০) উপন্যাসদ্বয় প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রেব 'বাজ সিংহে'ব সঙ্গে জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যার তুলনা-কালে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীব মন্তব্য উল্লেখযোগ্য,—'বাজ সিংহ সার্থকতব উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যেব বৃহত্তম পটভূমি-সংযুক্ত মহত্তম উপন্যাস। 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা' সার্থকতব ঐতিহাসিক উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যেব সার্থকতম ঐতিহাসিক উপন্যাস'[২৩]।

'সংসাব' ও 'সমাজ' বমেশচন্দ্রেব দুটি সামাজিক উপন্যাস। জীবনসন্ধ্যা প্রকাশেব সাতবছব পবে বমেশচন্দ্রেব সংসাব প্রকাশিত হয। সংসাব[২৪] এব প্রকাশকাল (১৮৮৬) বঙ্কিমচন্দ্রেব সবশেষ উপন্যাস 'সীতাবাম' প্রকাশেব একবছব পূর্বে। এই উপন্যাস দুটি পবস্পব সম্পর্কযুক্ত। গ্রন্থদ্বযেব অধিকাংশ পাত্রপাত্রী ও ঘটনাস্থান অভিন্ন। কেবল কালেব পার্থক্য। দুবছবেব (১৮৮৫ ১৮৮৭) অবকাশকালেব প্রথম বছবে, ভাবতে থেকে বমেশচন্দ্র সংসাব বচনা কবেন। এই বছবেব শেষেই তিনি সপবিবাবে বিলাত যাত্রা কবেন।

রমেশচন্দ্র 'সংসাব' ও 'সমাজ' বচনাব কাবণ সম্পর্কে লিখেছেন– "On principle inter-caste marriage is a duty with us, because it unites the divided and enfeebled nation, and we should establish this principle (as well as widow-marriage etc.) safely and securely in our little society ; so that the greater Hindu Society of which we are only a portion and the advanced guard, may take heart and follow. I cannot tell you how deeply I have felt this for years past ; of my last

২৩. প্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক (১ম খণ্ড) বমেশচন্দ্র দত্ত পৃঃ ৪১।

২৪. সংসাব, ১৮৮৬, পৃঃ (দুই খণ্ডে) ২১২। দ্বিতীয় বর্ষেব প্রচাব (১২৯২)-এ ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত। ইংবাজী অনুবাদ—The Lake of Palms.

two novels, Sansar goes in for widow-marriage and Samaj goes in for inter-caste marriage."[২৫]

সংসার উপন্যাসটি বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত। সমাজ-এ অসবর্ণ-বিবাহের সমর্থন পাই। এই দুটি ব্যাপারই তৎকালীন সমাজে অসম্ভবপ্রায় ছিল। বিধবাবিবাহের আইনগত স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও সমাজে গৃহীত হয় নি। বঙ্কিমের উপন্যাসে বিধবা প্রণয় ও বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেও তার পরিণতি তৎকালীন সামাজিক অনুমোদনের ঊর্ধ্বে ছিল না। এ বিষয়ে বঙ্কিমের চিন্তাধারা আইনকে সমর্থন করে গড়ে ওঠে নি। তিনি মনে করতেন শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটি ক্রমশ আইনের ধারা অনুসরণ করবে। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' প্রবন্ধে বলেছেন 'বিধবাবিবাহ ভালও নহে মন্দও নহে, সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনও পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না।' বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্টীকৃত করে। অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের চিন্তা সেই যুগে নতুন। সমাজহিতৈষী রমেশচন্দ্র এ চিন্তার পথপ্রদর্শক। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র উভয়েরই হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মানসিকতার পার্থক্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র প্রচলিত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের সামাজিক জীবনকে সংস্কারমুক্ত করতে চেয়েছেন। হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাবান রমেশচন্দ্র তৎকালীন সমাজজীবনের স্রোতকে নির্বাধ করার দায়িত্ব পালন করেছেন শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি হিন্দুর অতীত গৌরবকে আবিষ্কার করে, জাতির আত্মদর্শন ঘটাতে চেয়েছিলেন ঐতিহাসিক রচনার মধ্য দিয়ে। আর, সামাজিক সংকীর্ণতার পাশ ছিন্ন করে বর্তমান সমাজের নিস্তরঙ্গ জীবনে চলমানতার স্রোত আনতে চেয়েছিলেন, সামাজিক উপন্যাস রচনা করে।

সংসার এর মূল বক্তব্য বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রতিপন্ন করা এবং উদ্দেশ্য, বিধবাবিবাহের সার্থকতা প্রদর্শন করা। কৌলীন্য প্রথা মানুষের সামাজিক জীবনে যে কত ভয়ংকর ক্ষতিসাধন করতে পারে তারও চিত্র পাশাপাশি দেখান হয়েছে। কুল বা বংশগৌরবই মানুষের মহত্ত্বের মাপকাঠি কিংবা

২৫. শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'বাংলার লেখক' (১ম খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৪।

পারিবারিক সুখের উৎস নয়। বরং পাত্রপাত্রীর যোগ্যতাই বিবাহিত জীবনের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ। বংশকৌলীন্য মানুষের বিবাহিত জীবনে যে কতখানি হতাশা, ব্যর্থতা ও শোকজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, তার মর্মস্পর্শী চিত্র এই গ্রন্থে পাই। বিলাসবহুল জীবনে বংশ ও অর্থগৌরব-বিভূষিত স্বামীর ভেকধার্মিকতা ও পরনারী-আসক্তি শেষ পর্যন্ত তাকে চরম বিপর্যয়ের মুখে প্রেরণ করে এবং সংসারে পতিব্রতা স্ত্রীর অকালমৃত্যুজনিত শোকার্ত জীবনে চরম জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করে। স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল জীবন স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ হয়। কৌলীন্যের জোরে কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে বালিকা কন্যার বিবাহ, কন্যার অকালবৈধব্য আনে। সমাজ-সমর্থিত এই জাতীয় ঘটনা রমেশচন্দ্রকে পীড়িত করেছে। মানুষের সংসাব-জীবনের এই অসঙ্গতি, হৃদয়-হীনতা ও বিপর্যয়ের চিত্র লেখক মূর্ত করে তুলেছেন সংসার উপন্যাসে। অপরদিকে স্বামিপ্রণয়স্পর্শহীনা সরলা বালবিধবার পুনর্বিবাহে সমাজের রক্তচক্ষু প্রদর্শন, বিধবাবিবাহের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও বিবাহজনিত প্রতিক্রিয়ার চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে, সংসাব উপন্যাসে।

বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে গ্রন্থের অন্যান্য উপকাহিনীর সৃষ্টি ও চরিত্রের ভিড়।

তালপুকুরে বিন্দুর বিধবা মা, স্বামীর বন্ধুর পুত্র হেমচন্দ্রের সঙ্গে বিন্দুব বিবাহ দিলেন। অপর কন্যা সুধাবও বিবাহ দিলেন পাঁচবছর বয়সে। কিন্তু সুধা সাতবছর বয়সে বিধবা হল। বিন্দুব জ্যাঠামশায তাবিণী মল্লিক তাব বাবাব সম্পত্তি হস্তগত করলে হেমচন্দ্র সেগুলি উদ্ধারে যত্নবান হয়। দীর্ঘদিন পবে কলকাতা থেকে শবৎ আসে হেমচন্দ্রেব কাছে। শবতেব দিদি কালীতারা বিন্দুর বাল্যসহচবী। চল্লিশ বছর বয়সেব ববের সঙ্গে কালীব বিয়ে হয়।

জ্যাঠাইমা কন্যা উমার সুখসম্পদ ও প্রাচুর্যের কথা জানায় বিন্দুকে। কিন্তু উমার কথায় তার বিবাহিত জীবনের বেদনার সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। হেমচন্দ্র ভাগ্যান্বেষণে সপরিবারে কলকাতায় আসে। সুধার সঙ্গে শরতের পরিচয় পূর্বেই ছিল। হেমচন্দ্র ভবানীপুরে শরতের বাসার কাছে বাসা ভাড়া করে। সুধার অসুস্থতাকালে শরৎ তাকে আপ্রাণ সেবা-শুশ্রূষা করে। পল্লীর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশে হেমচন্দ্র বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। হেমচন্দ্র উমার স্বামী ধনঞ্জয়বাবুর নারীসঙ্গ ও আমোদমত্ততার পরিচয় পায়।

উমার জীর্ণ রূপ দেখে দুঃখ পায় বিন্দু। বিজয়ার দিন রাত্রে শরৎ এসে বিন্দুকে জানায়, সে সুধাকে বিয়ে করতে চায়। খবরটা জনৈক ঝি-এর মাধ্যমে পাড়ায় রটে গেলে কোন্দল শুরু হয়। সমাজপতিরা হেমচন্দ্রকে এসে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মত জানিয়ে যায়। চতুর্দশী সুধার মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ ওঠে।

হেমচন্দ্রকে শরৎ জানায় লোকনিন্দার ভয় সে করে না। হেম ও বিন্দু বিবাহে সম্মতি দেয়। কিন্তু শরতের মা বাদ সাধেন। তিনি পুত্রকে কুলে কলঙ্ক না দিতে বলেন। বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এদিকে কালীতারার স্বামী কলকাতায় মারা যায়। অভিমানিনী উমাও দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মৃত্যুবরণ করে। কালীর স্বামীর মৃত্যুতে কলকাতায় এসে শরতের অবস্থা দেখে তার মা বিচলিতা হন এবং গুরুদেবের ইচ্ছানুসারে সুধার সঙ্গে শরতের বিবাহ দিয়ে সুখ লাভ করেন।

উপন্যাসটির দুটি অংশ। একটি অংশ তালপুকুরকে কেন্দ্র করে রচিত। অপর অংশের ঘটনা তালপুকুরের কাহিনীর সূত্র ধরে কলকাতায় সংঘটিত। লেখক পল্লীর নিভৃত জীবনযাত্রার গভীরে সুখদুঃখের লীলায়িত ছন্দকে স্পন্দমান করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু তার পল্লীজীবনের অনভিজ্ঞতা যথাযথ চিত্রাঙ্কনে সহায়তা করে নি। লেখকের বর্ণনানৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য হলেও বর্ণনার সঙ্গে বিশ্লেষণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। লেখকের পর্যবেক্ষণক্ষমতা লক্ষণীয়। বিন্দু ও সুধার প্রথম কলকাতা-দর্শনের অভিজ্ঞতা অনেকটা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' এর সমজাতীয় ঘটনার মত। দেবীপ্রসন্নবাবুর স্ত্রীর দেহে তৈলমর্দনের চিত্রও লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অপর উদাহরণ।

লেখক উপন্যাসটিতে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের প্রসঙ্গে কৌলীন্য-প্রথার মারাত্মক কুফলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কৌলীন্য-প্রথার দুটি পরিণতির চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। অর্থকৌলীন্যের বলি উমা। বংশকৌলীন্যের বলি কালীতারা প্রথমজনের অকালমৃত্যু, দ্বিতীয়জনের অকালবৈধব্য। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা লেখক যে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, এই জাতীয় ঘটনা-যোজনা তার প্রমাণ। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য-প্রথা বালবিধবা-সমস্যা উনিশ শতকের সামাজিকদের চিন্তিত করে তুলেছিল। এই সমস্যাগুলি পুনর্বিচার

করার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত কৌলীন্য-প্রথাকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'এ কুল ত কুল নয় সার মাত্র আঁটি'। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়েছিল, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। সমকালীন অনেক উপন্যাসই কৌলীন্য-প্রথা ও বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে।

উপন্যাসটিতে শরৎ ও সুধার প্রণয়-পরিণতি স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত। উভয় চরিত্রের মানসিকরূপ বিশ্লেষণে লেখক বিশেষ তৎপর না হলেও একেবারে এড়িয়ে যান নি। সমকালীন ঔপন্যাসিকেরা মানসিক-বিশ্লেষণ অপেক্ষা ঘটনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও পাত্র-পাত্রীর মানসিক-বিশ্লেষণের বিষয়টি উপেক্ষিতপ্রায়। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে সুধার আত্মচিন্তার মধ্য দিয়ে তার মনের আশা ও নৈরাশ্যের চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত। শরতের মায়ের পুত্রের বিবাহে মতপরিবর্তনের পশ্চাতে দুটি ঘটনা অনেকাংশে দায়ী। প্রথমটি, কন্যা কালীতারার অকালবৈধব্য, দ্বিতীয়টি উমার অকাল-মৃত্যু। পল্লীবাসিনী মাতার হৃদয়ে এই দুই ঘটনা স্থায়ী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তার অব্যবহিত ফল, গুরুদেবের পরামর্শগ্রহণ এবং সন্তানের কল্যাণ-কামনায় বিধবাবিবাহে সম্মতিদান। উপন্যাসের উদ্দেশ্যসাধনে এই দুটি ঘটনার সংযোজন লেখকের কুশলী মনের পরিচয়। সনাতন কৈবর্ত ও তার স্ত্রীর সঙ্গে হেমচন্দ্র ও বিন্দুর সম্পর্কের মধ্যে সরল দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পায়। এই জাতীয় আচরণ কাহিনীকে ভাবগত ঐক্য দান করেছে।

হেমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও বিন্দু এই তিনটি চরিত্রই প্রধানত উপন্যাসটিকে ঘিরে আছে। হেমচন্দ্র ও বিন্দুর দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য এই উপন্যাসের দাম্পত্য-চিত্রের সার্থকতম রূপ। হেমচন্দ্র ও বিন্দুর সূত্রে শরতের আবির্ভাব, সুধার সঙ্গে পরিচয় এবং ক্রমে পরিচয়ের প্রণয়ে রূপান্তর। হেমচন্দ্র ও বিন্দুর সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠা, শরতের শ্রদ্ধাবোধ, কর্তব্যচেতনা ও লোকভয়হীনতা, চরিত্র-গুলিকে আদর্শমণ্ডিত করে তুলেছে। হেমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র উভয়েই মানুষের হৃদয়ধর্মের ঊর্ধ্বে আচরিত অশাস্ত্রীয় ধর্মকে স্বীকৃতি দেয় নি। বালবিধবা সুধা ও শরতের মত নিষ্কলুষ দুটি চরিত্রের অন্তরঙ্গতা ও পরিণতিরূপ মিলনকে হেমচন্দ্র অন্যায়রূপে গণ্য করে নি। বরং বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ-প্রথার কথা স্মরণ করে মানসিক শক্তির সন্ধান করেছে। সুধার দিদি বিন্দু

শরৎ ও সুধার বিবাহ-প্রস্তাবকে মনে মনে সমর্থন জানালেও বাহ্যত লোক-নিন্দার কথা ভেবে, প্রথমে প্রকাশ্যে মত জ্ঞাপন করতে পারে নি। তাই সুধার হাত থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ কেড়ে নিয়েছিল এবং কুন্দর কি অবস্থা হয়েছিল সুধা এ কথা জানতে চাইলে, এককথায় বিন্দু বলেছিল, বিষ খেয়ে মরেছে। কিন্তু এই বিন্দু শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রতিকূল সমালোচনাকে উপেক্ষা করে শরতের প্রস্তাবকে সমর্থন জানালো। শরতের মায়ের চরিত্রটিও উল্লেখ-যোগ্য। আজন্মসঞ্চিত সংস্কারকে তিনি মেনে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে শরতের বিবাহকেই তিনি সমর্থন করেছেন। চরিত্রটিতে স্নেহকাতরতা এবং সন্তানের প্রতি কর্তব্যসচেতনতার পরিচয় পাই। তথাপি বিশ্লেষণের অভাবে চরিত্রটি সম্পূর্ণতা লাভ করে নি। ঘটনার পরিণতি-প্রদর্শনে সন্ন্যাসী ঠাকুরদাদার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিষয়ী তারিণী মল্লিকের চরিত্রটি স্বাভাবিকতার বর্ণে উজ্জ্বল।

রচনারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। একাদশ পরিচ্ছেদে 'কলিকাতা বড়বাজার' এর বর্ণনা অনেকটা 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'বড়বাজার' এর অনুরূপ। পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে নাটকীয় সংলাপরীতি বঙ্কিমচন্দ্রীয়। পাঠককে আহ্বান করে চরিত্র, ঘটনা ও বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ-রীতি বঙ্কিমচন্দ্র-অনুসৃত। শরৎ কর্তৃক সুধার বিবাহ প্রস্তাবের বিষয় ঝি-এর সাহায্যে রটিত হওয়ার ঘটনাটি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ গোবিন্দলাল-রোহিনী নিয়ে কলঙ্কপ্রচারের কাহিনীর অনুরূপ। ঘটনাস্রোতে চরিত্রের ভাসমানতার দিকটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লক্ষিত হয়। চরিত্র যেন ঘটনার অনুগামী দাস। চরিত্রের বাহ্যিক পরিচয় আচার আচরণ-রুচি সবকিছুই প্রায় ঘটনাকেন্দ্রিক রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীও যেন ঘটনার স্রোতে ভাসমান। এদিক বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের শিল্পভাবনার মূলে উদ্দেশ্যই প্রাধান্য পেয়েছে। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঘটনাজাল বিস্তার করে, উভয় লেখকই চরিত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। চরিত্রের অন্তর্নিহিত মানসিক ভাব-সংঘাত ও দ্বন্দ্বজটিলতা ঘটনার স্রোতে যেন চাপা পড়ে গেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের সাহিত্যিক মেজাজ সমগোত্রীয়।

'সংসার' উপন্যাসটি রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত।

'সমাজ'[২৬] 'সংসার'-এর আট বছর পরে রচিত। সংসার-এর আট বছর পরের ঘটনার অনুবৃত্তি। প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই পরিচিত। পরিবেশও তাই।

শ্যামা ও সুধার হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপের মধ্য দিয়ে গ্রন্থ শুরু। এই আলাপের প্রাথমিক সূত্র সুধার শিশুপুত্র। শরৎ 'স্টটুটারি সিভিল সার্ভিস'-এ প্রবেশ করেছে। সুধার বিয়ে নিয়ে এখনও গ্রাম্য কোন্দলের অবসান হয়নি। এদিকে বিন্দুর জ্যেঠামশায় তারিণী মল্লিক 'বংশরক্ষা ও অসুস্থা স্ত্রীর পরিচর্যার জন্য পুনর্বিবাহে অভিলাষী। নবম বয়স্কা গোপবালার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাল তারিণী মল্লিক তার মায়ের কাছে। মা অমত করল। গোপী, বিন্দুর মেয়ে সুশীলার বন্ধু। বিন্দুর কোলে বসে আদর খায়। বয়সানুপাতে একটু পাকা। তার ইচ্ছা বড়লোকের গৃহিণী হওয়া। শেষে গোপীর ভাই গোকুল-চন্দ্রকে চারহাজার টাকা দিয়ে তারিণী তার সম্মতি আদায় করল। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক তারিণীর সঙ্গে নবমবর্ষীয়া গোপীর বিয়ে হল।

গোপীর চোদ্দ বছর বয়সকালে নাজিরমশায় পেনসন নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। গোপীর ইচ্ছানুসারে যথাসর্বস্ব তার নামে তিনি উইল করে দিলেন। উমার মা মারা গেল।

সনাতনবাটীর জমিদার কামিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি একদিন রাম-প্রসাদ নামে এক জটাধারী ব্রাহ্মণ এসে উঠলেন। জমিদারবাড়ির বিষয়-বঞ্চিতা বিধবা যোগমায়া রমাপ্রসাদ সরস্বতী ঠাকুরের সেবা করত। সরস্বতী ঠাকুর শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন। শরৎ ও হেম তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানে মুগ্ধ হল। সরস্বতী ঠাকুরের আত্মকথা থেকে জানা যায় যে কাশীতে থাকাকালে তিনি কাশীবাসী ক্ষত্রিয় কৃপাল সিংহের কন্যাকে বিয়ে করেন। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় একথাও তিনি জানালেন।

তারিণীবাবু মারা যাবার কালে সরস্বতী ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সাক্ষী রেখে মৃত্যুর পূর্বে তারিণী যাবতীয় সম্পত্তি সুধা ও বিন্দুকে উইল করে দেন। কামিনীকান্ত বিধবা গোপবালার পক্ষ গ্রহণ করেন। কলকাতায় গিয়ে সুমতিবাবুকে ঘটনাটি বলে সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে তারিণীকে হত্যার অভিযোগ আনবেন জানান।

২৬. সমাজ, ১৮৯৪, পৃঃ ২০২। ১৩০০ (ফাল্গুন—চৈত্র) ও ১৩০১ (বৈশাখ—আষাঢ়) সালের 'সাহিত্যে' দশম অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত।

জমাদারের সাহায্যে তদন্তের পর দারোগা কামিনীকান্তের অনুকূলে রিপোর্ট দিল। ইনস্‌পেকটরের আপত্তি নাকচ করল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। বর্ধমানের আদালতে বিচার হল। হেমচন্দ্রের চেষ্টায় সরস্বতীর পক্ষে হাইকোর্টের উকিল চন্দ্রনাথবাবু এলেন। তাঁর জেরায় ফরিয়াদী পক্ষের সব সাক্ষীর মত উল্টে গেল এবং আসামীর পক্ষে তারিণীবাবুর গুরুদেব, সনাতনবাটীর একজন পুরানো দাসী, ধনপুরের ধনঞ্জয়বাবু এবং ময়মনসিংহের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট শরৎচন্দ্র ঘোষের সাক্ষ্যে রামপ্রসাদ সরস্বতী মুক্তি পেলেন। মুক্ত রমাপ্রসাদ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ত্রিশ বছর পূর্বে সংঘটিত রমণীকান্তের খুন সম্পর্কে বিচার প্রার্থনা করলেন এবং কামিনীকান্তের কাছে নিজেকে ভ্রাতা রমণীকান্ত বলে জানালেন।

যোগমায়া, রমণীকান্তের স্ত্রী বলে জানা গেল। কামিনীকান্ত ক্রোধে ভ্রাতার অংশ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় গিয়ে 'জাতি সংরক্ষণ সমাজ' স্থাপন করলেন। শাস্ত্রজ্ঞ [illegible]ক্ষণদেব নিষেধকে অগ্রাহ্য করে সরস্বতী পুত্র দেবীপ্রসাদের সঙ্গে হেমচন্দ্রের কন্যা সুশীলার বিবাহ দিলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ-বিবাহে বর্ধমানে হুলুস্থূল পড়ে গেল।

সমাজ সংসারের মত শিল্পসার্থকতা লাভ করেনি। যদিও সংসার-এর সূত্রেই সমাজ-এর আবির্ভাব [illegible] কাহিনীর উদ্দেশ্য শিল্পরীতির ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত। তাই সমাজ অনেকটা প্রচারধর্মী রচনার পর্যায়ভুক্ত। অসবর্ণ বিবাহ উপন্যাসটির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। [illegible] বিবাহ সংঘটিত করার পশ্চাতে স্তরপরম্পরাগত কোন ধাপ রচিত হয়নি। যার ফলে উপন্যাসের পরিণতি স্বাভাবিকতা লাভ করেনি। রমাপ্রসাদ সরস্বতীর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে শাস্ত্রীয় সমর্থনের সংযোগে, এই উপন্যাসে সংঘটিত অসবর্ণ বিবাহের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে। এই ভূমি যেমন দৃঢ় নয়, তেমনি এ শিল্পরীতিসম্মত। উপন্যাসটিতে অসবর্ণ বিবাহের ঘটনাটি [illegible] সংযোজিত। কোন পরিকল্পিত পথ বেয়ে ঘটনাটি না ঘটে প্র[illegible] উদ্দেশ্যের পথ ধরে যেন হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে। এই কারণে উপন্যাসটি শিল্পসৌন্দর্য লাভ করতে পারেনি।

তারিণী মল্লিকের পুনর্বিবাহকে কেন্দ্র করে হাস্য ও ব্যঙ্গের অবতারণা করেছেন লেখক। বিশেষ, বিবাহের পূর্বে নবমবর্ষীয়া হবু বধূ গোপীকে কোলে আদর করার ঘটনাটি যথেষ্ট হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। আবার বিবাহের পূর্বে

তারিণীর আচরণ সম্পর্কে বর্ণনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত,—'তারিণী-বাবুর মুখে আর হাসি ধরিত না, লুকাইয়া দর্পণে ঘনঘন আপনার মুখখানি দেখিতেন, চুলে ঘন ঘন কলপ দিতেন, কাহার সাধ্য একগাছি পাকা চুল বাহির করে। নাপিতের মাহিযানা দ্বিগুণ করিয়া প্রত্যহ ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করিতেন, দাঁড়ি-গোঁফ এখনও উঠে নাই বলিলেও চলে।'

উপন্যাসটির দুটি অংশ। একটির ঘটনাস্থল তালপুকুর, অপরটির তালপুকুরের সন্নিকটস্থ সনাতনবাটির জমিদারগৃহ। মূলঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সনাতনবাটী থেকে। রমাপ্রসাদ সরস্বতীই এই ঘটনার নিয়ন্তা। রমাপ্রসাদ কর্তৃক জাতি-নির্বিশেষে শাস্ত্র শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্য উপন্যাসের প্রচারমূলকতার দিকটি পরিস্ফুট করে। এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদের একটি উক্তিও প্রণিধানযোগ্য,—'রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা ফলপ্রসবিনী হইবে। তাঁহাদের চেষ্টায় অবনত হিন্দুজাতি উন্নত হবে, জাতিনির্বিশেষে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবে (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)।

তারিণীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সরস্বতীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও মামলা গ্রন্থের তিনটি পরিচ্ছেদ জুড়ে বিস্তৃত। এই ঘটনা বিশ্লেষণে লেখকের বাস্তববাদী মনের পরিচয় পাই। চতুর্থ পরিচ্ছেদে, তারিণীবাবুর সঙ্গে গোকুলচন্দ্রের বিবাহবিষয়ক কথাবার্তার চিত্রটি দুটি বিষয়ী ব্যক্তির বিনয়মার্জিত আচরণের আবরণে বুদ্ধির ছুরিখেলা বিশেষ। চিত্রটি নিঃসন্দেহে বাস্তবরসসম্পৃক্ত। বর্ধমানে মোক্তারের গৃহে ঘোমটার আড়ালে বিন্দু ও সুধার আবির্ভাব কৌতূহলোদ্দীপক হলেও অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত। রমাপ্রসাদের বাক্স, বিবাহের পর রমণীকান্ত প্রদত্ত দড়াহার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে রমাপ্রসাদ ও রমণী-কান্তের মধ্যে অভিন্নতা সম্পর্কে যোগমায়ার নিশ্চয়তার বিষয়টি একটি মামুলি শিল্পকৌশল। দেবীপ্রসাদ ও সুশীলার বিবাহের পশ্চাতে অসবর্ণ-বিবাহের সমস্যাকে লেখক এড়িয়ে গেছেন এবং সমাজজীবনে জটিলাবর্ত সৃষ্টির পূর্বেই বিষয়টির উপর স্থায়ী ছেদ টেনে দিয়েছেন।

রমাপ্রসাদ সরস্বতী এই উপন্যাসে একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে। তার আকস্মিক আবির্ভাব, কাশী থাকাকালে তার জীবনকথা বর্ণনা, অপার শাস্ত্র-জ্ঞান সাধুজনোচিত। এই উপন্যাসে লেখক রমাপ্রসাদকে উদ্দেশ্যপ্রচারের উৎসরূপে গ্রহণ করেছেন। রমাপ্রসাদ যেন মূর্তিমান শাস্ত্রগ্রন্থ। এই চরিত্রটি

সনাতনবাটীব জমিদারপবিবাবে বহস্যজাল বিস্তাব করে জমিদার কামিনী-কান্তেব ভীতিব কাবণ হযেছে এবং পাঠকচিত্তে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। সনাতনবাটীব জমিদাবপবিবাবেব কাহিনীব এক আবৃতরহস্যকে উদঘাটিত কবে উপন্যাসে এই চবিত্রটি নতুন বসেব সঞ্চাব কবেছে। বিন্দু ও সুধাব ভূমিকা এই উপন্যাসে স্বল্প। উমাব স্বামী ধনঞ্জয়েব কৃতকর্ম তাব মনে আত্ম-গ্লানিব সৃষ্টি কবে তাকে পাপমুক্ত কবতে চেয়েছে। ভেকধার্মিকতার স্বরূপটি সুন্দবভাবে উদ্ঘাটিত হযেছে কামিনীকান্তেব চবিত্রে। মুসলমানী উপপত্নী খাজেস্তাবিবিব নাচগানেব সঙ্গে মদ্যপানসহ আমোদমত্ত কামিনীকান্ত আবাব দেশাচাবেব বক্ষক। উপন্যাসেব শেষাংশে এই কামিনীবাবুকে ‘বৃহৎ জাতি-সংবক্ষণ সমাজ’ স্থাপন কবতে দেখা যায। লেখক এই ভাবে এই উপন্যাসে ভেকধার্মিক সামাজিকদেব মুখোশ অনাবৃত কবে দিয়েছেন। ক্ষণকালেব জন্য হলেও কামিনীকান্তেব স্ত্রীব অসহায়তাব বেদনা অন্তব স্পর্শ কবে।

সংসাব ও সমাজ ভিন্ন নামে বচিত হলেও প্রথমটিব কাহিনীব পববর্তী অংশ দ্বিতীয়টিতে অনেকাংশে বিবৃত হয়েছে। যদিও সমাজ-এ নতুন ঘটনাব সংযোজন ঘটেছে।

বমেশচন্দ্রেব সামাজিক উপন্যাস দুটি উদ্দেশ্যমূলক বচনাব পর্যাযে পড়ে। আবেগেব অভাবে চবিত্র ও ঘটনাপুঞ্জকে লেখক এক সূত্রে সংগ্রথিত কবতে পাবেন নি। তাই উপন্যাসদুটি শৈল্পিক ভূষণ লাভ কবতে পাবে নি। ডক্টব শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় বমেশচন্দ্রেব সামাজিক উপন্যাসেব প্রধান অপূর্ণতাব কাবণেব মূলে যে প্রবল আবেগেব অভাবেব কথা বলেছেন তা সর্বাংশে সত্য।[২৭] এই প্রসঙ্গে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সংসাব ও সমাজ বচনাব মধ্য দিযে বমেশচন্দ্র কেবল প্রগতিবাদী মনেবই পবিচয বাখেন নি, বাংলা সামাজিক উপন্যাসেব বিষযবস্তুব ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ প্রত্যযেব বীজ বপন কবেছেন।

২৭. ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধাবা, প-সং পৃ ৬৩।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯১১)

হাস্য ও ব্যঙ্গশিল্পী রূপে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটি বিশ্রুত নাম। ব্যঙ্গ-উপন্যাসরচনায় তাঁর অবদান থাকলেও আসলে ইন্দ্রনাথের মানসিকতা ঠিক উপন্যাসরচনার অনুকূল ছিল না। মজলিসী রসিকতা, হাস্য-রসাত্মক প্রবন্ধ ও টিপ্পনী রচনার দিকেই তাঁর প্রবণতা ছিল বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে হাস্য-ব্যঙ্গ রচনায় ইন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে জনবন্দিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ইন্দ্রনাথের উপর দুর্লক্ষ্য নয়। হাস্যরসসৃষ্টিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুবর্তন করেছেন। তার পঞ্চানন্দ ছদ্মনাম গ্রহণের পশ্চাতে বঙ্কিমের কমলাকান্ত বর্তমান। সমকালীন সমাজের অসঙ্গতি, ব্রাহ্ম-প্রভাবিত সমাজের দুর্গতি ও অধঃপতন, ব্যক্তি-জীবনের হাস্যকর বিপত্তি প্রভৃতি বিষয় পঞ্চানন্দের হাস্যরস-সৃষ্টির উপাদান। ইন্দ্রনাথ মূলত সমালোচকের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, কোন পথ নির্দেশ করেননি। কমলাকান্তের মত বিষয়-নির্বাচনে তিনি রুচিকেই একমাত্র মাপকাঠি করেন নি। স্থূলসূক্ষ্ম সর্বশ্রেণীর বিষয় তাঁর রচনার উপাদান রূপে গৃহীত হয়েছে। ইন্দ্রনাথের রচনায় ব্রাহ্ম-সমাজের সমালোচনা সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তিনি ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধে নিষ্ঠাবান সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের আক্রমণ মূলত ব্রাহ্ম-সমাজ সমর্থিত নারীর শিক্ষা-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ এবং শিক্ষিত ও স্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষের ধর্মাদর্শের নামে শ্রদ্ধাহীনতা ও ভণ্ডামির প্রতি। বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মদের প্রতি যে ঈষৎ বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন, তাকে তিনি শিল্পের ক্ষেত্রে আদৌ প্রাধান্য দেননি। ইন্দ্রনাথ শিল্পকে উপলক্ষ করে উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দান করেছেন। যোগেন্দ্রনাথও অনেকাংশে ইন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। তাই ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-উপন্যাস একান্তভাবেই উদ্দেশ্যমূলক রচনা। একটি সূত্র ধরে শুরু হলেও বহুবিধ উদ্দেশ্য মূলসূত্রকে কখনও বা অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম-ধর্মের মধ্যে ধর্ম ও জাতিসমন্বয়, স্ত্রী-শিক্ষা-স্বাধীনতার প্রচেষ্টা, বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত

তারকনাথের কথামত কল্পতরু 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এ প্রকাশের জন্য রাজশাহীতে শ্রীকৃষ্ণ দাসের কাছে পাঠান হয়। কিন্তু উপাদেয় গ্রন্থ হলেও গ্রন্থের নিন্দাসূচক বলে জ্ঞানাঙ্কুর-এ প্রকাশিত হয়নি। তারপর নিজব্যয়ে কলকাতায় বইটি ছাপিয়ে লেখক গ্রন্থকার হলেন।

ইন্দ্রনাথের কল্পতরু একটি ব্রাহ্মযুবকের চরিত্র ও আচরণকে কেন্দ্র করে রচিত। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই অজস্র ঘটনা ও চরিত্রের ভিড়। লেখক প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্ম ধর্মকে স্থানবিশেষে আক্রমণ করেছেন এই উপন্যাসে।

ব্রাহ্মযুবক নরেন্দ্রনাথ নারীর অবরোধ-প্রথার বিরোধী। তার বন্ধু দালাল রামদাস। নরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষার্থী। পাশের বাড়িতে থাকেন অটোল রাপান্তবাগীশ। রাপান্তবাগীশের সাড়ে সতের বছরের এক মেয়ে ঝুলবর্ণা বড়িনাকী বিধবা ভ্রাতৃবধূ, আর ছত্রিশ বছরের বেঁটে চুলকটা বামা ঝি ছাদে এলে, নরেন্দ্র খড়খড়ির মধ্য দিয়ে উপদেশ দেয়—'আপন পর ভেদ রাখা মহাপাপ, তুমি আমার আমি তোমার'। রাপান্তবাগীশ নরেন্দ্রকে মারতে গিয়ে ভ্রমক্রমে স্ত্রীকে আঘাত করলেন। একদিন রাত্রে আহারান্তে নরেন্দ্র, বিধবার কষ্টসূচক অবৈধ সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে উপায়গ্রহণের ইচ্ছায় দশ টাকা পুঁজি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রেয়সীর ইচ্ছা থাক বা না থাক তাকে দুর্দশামুক্ত করার উদ্দেশ্যে রাপান্তবাগীশের বাড়ির দরজার দিকে অগ্রসর হয় এবং জীর্ণ কাঠ ভেঙ্গে পড়লে একপায় জুতো নিয়ে দৌড়ে পালায়।

নরেন্দ্র, দাদা মধুসূদন ও পিসামার কাছে মানুষ। দীর্ঘদিন খবর না পেয়ে পিসীর কথায় মধুসূদন প্রতিবেশী গরেশচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নরেন্দ্রের খোঁজে কলকাতা যাত্রা করল। গরেশ যথাসাধ্য সুবিধা আদায় করল। মধুর ছড়ি ও টাকাকড়ি গরেশ কাছে রাখে। স্টেশনে টিকিট কাটার বাধা কাটিয়ে গরেশচন্দ্র মধুকে নিয়ে কলকাতায় এল। বরমানে একটি বাড়িতে থাকাকালে সংবাদপত্রে নরেন্দ্র দেখল গোলদীঘির কাছে প্রাপ্ত একপাটি জুতোর মালিককে ধরে দিতে পারলে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তারপরই রাণীগঞ্জ-যাত্রা। রাণীগঞ্জে এক মুদির সাহায্যে নিকটবর্তী স্থানের এক সম্পন্ন অধিবাসী কালীনাথ ধরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, কুড়ি টাকা বেতন ও নিখরচায় খাওয়া ও থাকার বিনিময়ে, ধরমশায়ের ছেলেকে সে পড়াতে লাগল। নরেন্দ্রনাথ

৩. কল্পতরু ১২৮১, (১৮৭৪) পৃঃ ১৯১।

বাজহাটের স্কুলের ভার নিলে 'যথাকালে পাঠশালাটি ভাঙ্গিযা গেল, "পরম-পূজনীয় "শিরোনামা এবং "সেবক শ্রী"—পাঠ উঠিযা গেল।

রামকিশোর চট্টোপাধ্যাযের ৪৮তম পত্নী বিমলা। নরেন্দ্র স্কুলের ছাত্রদের বেতনের টাকায় রাণীগঞ্জ থেকে কিছু ওষুধ এনে ডাক্তার সেজে বসল। স্কুলের ছাত্র অতুলের মাযের অনুরোধে নরেন্দ্র তার দিদি বিমলার অসুখের চিকিৎসা করতে গেলে অতুলের মা প্রস্তাব করল নরেন্দ্রকে তাদের ভার নিতে। নরেন্দ্র আনন্দে বিগলিত হল। ধবমশায ৯ বৎসর বয়স্ক পুত্রের বিয়ে বেশ ধুমধাম করেই দিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে বামদাসের সঙ্গে নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ। নরেন্দ্র আহ্লাদে বিগলিত হল।

ইতিমধ্যে গবেশচন্দ্র ও মধুসূদন কলকাতায় পৌঁছুল। গদিয়ানবাবুর কাছ থেকে খবর পেয়ে তারা নরেন্দ্রের অন্বেষণে রাজহাট যাত্রা করল। বাজহাট এসে জানল 'ধর্মাক্রান্ত' নরেন 'পাড়াকান্ত' বিমলাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ। গবেশচন্দ্র ও মধুসূদন বাড়ি ফিরল। পিসী নরেনের দুঃখে মারা গেলেন। আখড়া গোপালপুর বনে শ্রীরূপদাস বাবাজির আশ্রমে নরেন বিমলাকে নিয়ে এল। বাবাজীর কাছে বিমলাকে রেখে নরেন কলকাতা গেল।

গবেশ তার বিধবা মাসীর বসন্তরোগে বিকৃতদেহা কন্যার সঙ্গে মধুর বিয়ের ব্যবস্থা করল। কোমরভাঙ্গা মধু 'অঙ্গবাটা' স্বরূপ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তবে বিয়ে করতে পারল। রামদাসের চেষ্টায় ফণী ব্রাদার্সের বাড়ির মুৎসুদ্দী বিকু বাবু (বৃকোদর মল্লিক) কে বলে-কয়ে একটা চাকরি পেল নরেন। রামদাসকে নিয়ে সে গোপালপুরের আখড়ায় এসে বাবাজীর কাছে জানল যে, পিত্রালয়ের লোক জানতে পেরে বিমলাকে নিয়ে গেছে। বিমলার নিরুদ্দিষ্ট পিতা দীর্ঘ ২৩২৪ বছর পরে অর্থের অন্বেষণে বাড়ি এসেছে। বিমলাদের বাড়ি গিয়ে নরেন বিমলার পিতা বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায় মশায়ের কাছে নাগরা জুতার মার খেয়ে বাড়ি ফিরল।

বাবাজীর মনোভাব জানতে পেরে বিমলা বড় বৈষ্ণবীর সহায়তায় বলরামপুরে বামের মাযের আশ্রয়ে এসে উঠল। সীতানাথবাবু বিমলা-হরণে লোক পাঠালেন।

এক দোকানে বদনগঞ্জের থানার সাব-ইন্সপেক্টর নবীন ঘোষের সঙ্গে নরেনের আলাপ হলে, তাকে নিয়ে রামদাস সহ সে গোপালপুরের আখড়ায়

এল। বিমলার সত্যকার খবর দিতে সকলে অস্বীকার করলে, এক রাখালের কাছে প্রাপ্ত সংবাদে পুকুরের মধ্য থেকে হাঁড়ি তুলে বিমলার গর্ভপাতের প্রমাণ পাওয়া গেল। জানা গেল ঐ কারণে পরে তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে সে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে, ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে কুলীন-কন্যা বিমলা জীবিত কলঙ্ককে দেহে স্থান দেয়। নির্বোধ নরেন্দ্রের সাহায্যে কলকাতায় যাবার ঠিক করে। বলরামপুরে থাকার কালে তার এই দশা ঘটে।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার অপরাধে বিচারে রামদাসের সাত বছরের জন্য দ্বীপান্তর হয়। নরেন্দ্রনাথ বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় ফিরে পঁচিশ টাকা বেতনের এক চাকরি পায়, পূজোর সময় বাড়ি গিয়ে সে পৃথক হয়।

'নরেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা বিদায় প্রার্থনা করি। নরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে অনেক দেখাইলেন। যাহা দেখিয়াছি আমরা তাহাকে কল্পতরু বলি, কারণ তাহাতে নাই, এমন প্রায় কিছুই নাই। নাই কেবল আমাদের ন্যায় লেখক'।

ব্রাহ্মযুবক নরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটিতে অজস্র ঘটনা ও চরিত্রের আনাগোনা। নরেন্দ্রনাথের জীবনের খণ্ডাংশ চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। ইন্দ্রনাথের ঝোঁক প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া। গল্প বলার তাঁর ইচ্ছে, সন্দেহ নেই। তবে সে গল্প গল্পের গল্প। শাখা-ঘটনাগুলিকে হাস্যরসের ধারায় স্নাত করে ইন্দ্রনাথ উপন্যাসটিতে সেগুলি সন্নিবেশিত করেছেন। গল্পের সূত্রে ব্যক্তি ও সমাজের অসঙ্গতি নিয়ে রসিকতা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই নরেন্দ্রের কাহিনীর প্রসঙ্গে সুযোগ পেলেই লেখক মূলকাহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, সমাজ-হিতৈষণার আবরণে সমাজের আভ্যন্তরীণ কদর্যতা ও ভণ্ডামিকে হাস্য ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন।

উপন্যাসটির কাহিনী-সংহতির প্রতি লেখকের দৃষ্টির অভাব লক্ষ্য করি। একটি কাহিনীর বৃত্তে বহু ঘটনার জাল বিস্তার করেই লেখক ক্ষান্ত থাকেন নি, সেগুলির উপর কটাক্ষপাত করে তিনি বিষয়ান্তরে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। লেখকের রসিকতার আতিশয্য পাঠককে উপন্যাসের মূল কাহিনীর কথা কখনও বা ভুলিয়ে দিয়েছে। তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ব্রাহ্মদের ভণ্ডামি ও নীতিহীনতা।

নরেন্দ্র নারীর অবরোধ-প্রথার বিরোধী ও বিধবার দরদী। তার এই নীতির

পশ্চাতে কোন মহৎ উদ্দেশ্য অপেক্ষা লালসা-চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষাই মুখ্য। তার এই ভেকধার্মিকতার মুখোস উন্মুক্ত করেছেন লেখক। তাঁর স্বার্থপরতা ও কর্তব্যহীনতাকে লেখক শ্লেষ ও ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন। নরেন্দ্রনাথের কাছে নারীমাত্রেই স্ত্রী বলে, সে তার বিদ্রোহী ধর্মবুদ্ধিকে নিরস্ত করে। শিক্ষক নরেনের ডাক্তারে রূপান্তর এবং সেই সূত্রে অসহায় বিধবা নারীর অভিভাবক রূপে ভক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ, নরেন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। এ হেন সমাজহিতৈষী তরুণ ব্রাহ্ম নরেন্দ্রকে নিয়ে লেখক রসিকতার স্রোতে তুফান তুলেছেন। স্বাতন্ত্র্যবোধের অধিকারে ও ধর্মের প্রতি আনুগত্যের আধিক্যবশে এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম যুবক তৎকালে গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যের কথা অনায়াসে বিস্মৃত হয়েছিল। নরেন্দ্র তাদেরই সগোত্র। নরেন্দ্র-অন্তপ্রাণ পিসীমা ও জ্যেষ্ঠ মধুসূদনদের প্রতিভার চরম কর্তব্যহীনতা ও শ্রদ্ধার অভাব, তার প্রমাণ। নরেন্দ্র-চরিত্রে আমরা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর চিনিবাস-এর পূর্বসূত্র খুঁজে পাই। পরেশ চরিত্রটি জীবন্ত। পরেশ, পরকে ঠকিয়ে, শোষণ করে, জীবিকা নির্বাহ করে। অপরের দুর্বলতা ও সারল্যের সুযোগ নিয়ে সে অর্থোপার্জন ও স্বাচ্ছন্দ্যভোগে পটু। পরেশ বাংলা উপন্যাসের একটি বিরল চরিত্র। নরেন্দ্রনাথের পার্ষদরূপে রামদাস উপযুক্ত। বৈষ্ণবদের ধর্মের নামে ভণ্ডামির উজ্জ্বল পরিচয় পাই রূপদাস বাবাজীর চরিত্রে। বৈষ্ণবদের এই জাতীয় ভণ্ডামির চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন চণ্ডীচরণ সেন তাঁর মহারাজা নন্দকুমার (১৮৮৫) উপন্যাসে। মধুসূদনের সততা ও সারল্য লেখকের সহানুভূতিপুষ্ট।

লেখক উপন্যাসটিতে কয়েকটি সামাজিক অসঙ্গতির চিত্র তুলে ধরে হাস্য ও ব্যঙ্গের অবতারণা করেছেন। ধরমশায়ের ন'বছরের প্লীহারোগগ্রস্ত পুত্রের ধুমধাম সহ বিবাহ ও অল্পকাল পরে মৃত্যু, বিবাহব্যবসায়ী কুলীন বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের পঁচিশ বছরের কুলীন বালিকাকে বিবাহ, ত্রিরাত্রবাসের পর নিরুদ্দেশ হওয়া, অষ্টমমাসে বিষ্ণুরামের নবপরিণীতার গর্ভে নবকুমারীর জন্ম, এই নবকুমারীর বয়ঃপ্রাপ্তির পর রামকিশোর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক নবকুমারীকে 'আটচল্লিশ নম্বরে বিবাহ' করা প্রভৃতি ঘটনা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য-প্রথাকে কেন্দ্র করে লেখকের চরম রসিকতার উদাহরণ। তাছাড়া রূপদাস বাবাজীর আশ্রমে ধর্মের নামে নারীভোগ ও ভ্রূণহত্যা, পুলিসের বিসদৃশ ও বিপরীত আচরণ সম্পর্কে হাস্যকর অসঙ্গতির বিষয়ও ইন্দ্রনাথের

লক্ষ্যবস্তু। পুলিসের আচরণ সম্পর্কে হাস্যকর চিত্র পাই ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'র দুর্দান্ত সিপাহীর চরিত্রে।

সমগ্র উপন্যাসটিতে লেখকের মন্তব্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অনাবিল হাস্যরসের ধারা উৎসারিত হতে দেখি। যথা :—

নরেনকে লাঠি দিয়ে মারতে গিয়ে ভুলক্রমে বাপান্তবাগীশের স্ত্রীকে আঘাত, 'বাপান্তবাগীশের রাগ হইলেই কাপড় 'খুলিয়া যাওয়া', গলির মুখে বাপান্ত-বাগীশ প্রদীপ নিয়ে দাঁড়ালে এক পায়ে জুতো নিয়ে নরেনের পলায়ন, সংবাদ-পত্রে দিঘির কাছে প্রাপ্ত একপাটি জুতার মালিককে ধরে দিতে পারলে ৫০ টাকা পুরস্কারদানের সংবাদে বর্ধমান থেকে রাণীগঞ্জে নরেন্দ্রের পলায়ন (কারণ জুতোর মালিক নরেন্দ্র স্বয়ং), বিবাহের পূর্বে মধুর কোমর ভাঙ্গা কিনা পরীক্ষার্থে উচ্চস্থান থেকে মধুর লম্ফদান এবং পতন এবং তজ্জন্য 'অঙ্গবাটা' স্বরূপ পঞ্চাশ টাকা দান, বিমলাদের বাড়ি থেকে গঙ্গোপাধ্যায় মশায়ের কাছে নাগরা-জুতোর মার খেয়ে নরেন্দ্রের পলায়ন, স্থূলকায় ধরমশায়কে লক্ষ্য করে কন্যা-যাত্রীদের উক্তি ('বরযাত্র জয়ঢাক সমেত তিনজন'), জজসাহেবের মুখে রায়দান কালে বিকৃত বাংলা উচ্চারণ ইত্যাদি কয়েকটি উদাহরণ।

ইন্দ্রনাথ কল্পতরু রচনা করে সাহিত্যিক-খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তৎকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কল্পতরু সমাদৃত হয়েছিল। বঙ্গদর্শন[৪] এ কল্পতরু সমালোচিত হয়। বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত দীর্ঘ সমালোচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধার করছি।

'বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গালার প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়, মনুষ্যচরিত্রের বহুদর্শিতায় লিপিচাতুর্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দুক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত।...তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্বস্থানেই মুক্তা-প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধুবাবুর মত তিনি উচ্চহাসি হাসেন না। হুতোমের মত 'বেলল্লাগিরি'তে প্রবৃত্ত হন না, কিন্তু তিলার্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর সর্বদা সহনীয়। কল্পতরু বঙ্গভাষায়

৪. বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮১

একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।' জ্ঞানাঙ্কুর[৫] পত্রিকায় কল্পতরুর সমালোচনা প্রসঙ্গে বইটি প্রশংসিত হয়েছে। সমালোচনায় আরও বলা হয়েছে যে, গ্রন্থকারের অসাধারণ রহস্য লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। এখানি আগাগোড়া রহস্য, হুতোম পেঁচা, আলালের ঘরের দুলাল প্রভৃতি পুস্তকের শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে।...লেখক মানব-হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন'। বান্ধব[৬] পত্রিকায়ও কল্পতরুর দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচকের মতে, 'কল্পতরু বাংলাভাষার একখানি অদৃষ্টপূর্ব আভরণ এবং ইহার রচয়িতা বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।...ইন্দ্রনাথ-বাবুকে আমরা সাধারণ লেখকদিগের মধ্যে গণনা করি না, প্রকৃতি তাঁহাকে অতি উচ্চশ্রেণীর শক্তি দিয়াছেন, এবং এই কল্পতরু তাহার প্রথম সৃষ্টি হইলেও ইহাতেই সেই শক্তির প্রচুর পরিচয় রহিয়াছে।...কল্পতরুর ভাষায় তরঙ্গ না থাকিলেও তীব্র বেগ আছে এবং কোন কোন স্থলে আবর্তের বৈচিত্র্য আছে।'

ইন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস 'ক্ষুদিরাম'[৭] অসম্পূর্ণ রচনা। 'বঙ্গবাসী'তে উপহার দেবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম লিখিত হয়। লেখক উপন্যাসটিকে 'গালগল্প' বলে চিহ্নিত করেছেন। উপন্যাসটির গল্পপ্রবাহে ধারাবাহিকতা রক্ষিত না হওয়ার কারণ অবান্তর প্রসঙ্গ ও মন্তব্যের সন্নিবেশ। গ্রন্থটিতে উপন্যাসের রীতি অনুসৃত হয়নি। এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন, 'আমার এ গ্রন্থ উপন্যাস নহে, গালগল্প। শর্মার সঙ্গে সম্মার্জনীর অর্থাৎ কমলিনীর বৈঠকী আলাপ। উপন্যাসের রীতি অবলম্বন করিলে চলিবে কেন?' (পৃ ৯১—৯২) গল্পের সূত্র হারিয়ে যাওয়ার পশ্চাতে লেখকের রসিকতাই প্রধান কারণ।

কৈবর্ত সন্তান শিক্ষিত ক্ষুদিরাম এই উপন্যাসের মূল চরিত্র। ক্ষুদিরামের জীবনের একটি অধ্যায়ের কাহিনী লেখক রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে চিত্রিত করেছেন। পিতৃহীন ক্ষুদিরামকে তার মা লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে। কিন্তু লেখাপড়া শিখে ক্ষুদিরাম মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়। ক্ষুদিরাম কলকাতায় হাড়কাটা গলির কাছে থাকে। বাসায় আছে ঝি আর রাণীগঞ্জনিবাসী সাত্ত্বিক রাঁধুনি বামুন। মা দেশে জাতব্যবসা অর্থাৎ মাছের ব্যবসা করে।

৫. জ্ঞানাঙ্কুর, ফাল্গুন, ১২৮১, পৃ. ১৮৯—১৯২।

৬. বান্ধব, ফাল্গুন ও চৈত্র ১২৮৩, পৃ. ৪৬১—৬২।

৭. ক্ষুদিরাম (গালগল্প), (ভগ্নাংশ) ১২৯৪, ১৮৮৮, পৃ. ১৪২।

ক্ষুদিরামের সেখানেই আপত্তি। মাকে মাছের ব্যবসা ছাড়তে বললে, মা রাজী হয় না। কারণ এই ব্যবসার দৌলতেই ক্ষুদিরামকে সে মানুষ করতে পেরেছে। বি. এ. পাস ক্ষুদিরামের বন্ধুদের মধ্যে প্রধান ভুসীভোজন ও নিবারণ। বাসায় ৩৫ বছরের আধুনিকা যুবতী ঝি-এর পরিচর্যায় তার দিন কাটে। বি এ পাস করে ক্ষুদিরাম একবার ধীবরপাড়ায় গিয়েছিল। মা মাছ বিক্রি করে বলে, তাকে প্রণাম করেনি।

ক্ষুদিরাম নিজের জাতির কথা বন্ধুদের জানতে দেয় না। সে ও তার বন্ধুরা ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আস্থাবান। নিবারণ একটি কায়স্থ মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ আনলে সে আপত্তি করে না। ক্ষুদিরাম মেয়েদের অবরোধ প্রণালীর বিরোধী। সে যুবতী বিধবাদের বিয়ের আগে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে কেমন সন্দেহ প্রকাশ করে। এদিকে ঝি আড়ি পেতে সব কথা শোনে। বাবুর প্রতি তার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। শেষপর্যন্ত ক্ষুদিরাম বিধবা পতিগত প্রাণা শ্রীমতী নিরঙ্গিনীকে বিবাহ করে। প্রাণদায়িনী সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশ পায় এবং নিবারণ বিস্মিত হয়ে ক্ষুদিরামকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে।

ক্ষুদিরাম এ কাহিনীর গঠন সংহতির অভাব উল্লেখযোগ্য। লেখকের বর্ণনা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় সমগ্র উপন্যাসটিতে বিস্তৃত। তীব্র পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা না থাকলে সার্থক ব্যঙ্গলেখক হওয়া যায় না। ইন্দ্রনাথের রচনায় এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অজস্র উদাহরণ পাই। তুচ্ছ বিষয় থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যন্ত ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি প্রসারিত। তাই তার রসিকতা সর্বস্তরে সঞ্চারিত। ইন্দ্রনাথ উপন্যাসের মধ্যে শ্লেষ প্রয়োগ করে ব্যঙ্গের এক নতুন রীতি প্রবর্তন করেছেন। ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের বিষয়মূলক ঘটনাগুলি ও চারিত্রিক আচরণকে সহানুভূতির সঙ্গে অনুমোদন করে, সেগুলির উপর প্রশংসার বারি নিক্ষেপ করে পরোক্ষভাবে আঘাতজর্জর করে তুলেছেন। ক্ষুদিরামের জননী পদ্মের পুত্রের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও স্নেহপ্রবণতাহেতু প্রত্যাশাকে দোষারোপ করা, বাসার ঝি ঠাকুর প্রভৃতির সম্পর্কে উক্তি বিপরীত অর্থকেই প্রকট করে তুলেছে। 'তাঁহার নিন্দা ও প্রশংসা সব সময়েই বিপরীত অর্থ বহন করিয়াছে।'[৮] যোগেন্দ্র চন্দ্র, ইন্দ্রনাথের এই রীতি কখনও কখনও অনুবর্তন করেছেন।

৮ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড (ভূমিকা)।

ক্ষুদিরামকে কেন্দ্র করেই গ্রন্থটিতে ঘটনার জাল বিস্তৃত। তথাকথিত নিম্নসম্প্রদায়ের সন্তান লেখাপড়া শিখে কিভাবে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, নিজের জাতিধর্ম গোপন করে, সমাজে সম্মানিত ও উচ্চাসন লাভের আকাঙ্ক্ষায় মায়ের প্রতি সম্মান দেখাতে কুণ্ঠিত হয়, ধর্মের নামে কাপট্য ও নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেয়—এবং বিধবাবিবাহ করে খ্যাতি লাভ করে, তারই চিত্র মূলত উপন্যাসটিতে অঙ্কিত হতে দেখি।[৯] ক্ষুদিরামের চরিত্রের অসংগতির সূত্র ধরে লেখক তৎকালীন ব্রাহ্ম ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী নব্য সমাজকে ব্যঙ্গ করেছেন। স্ত্রী ও পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা ও মিশ্রণ, একত্রিত হয়ে সভা সমিতিতে যোগদানের ঘটনা, লেখকের ব্যঙ্গের হাত থেকে রেহাই পায়নি।[১০]

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ইন্দ্রনাথের আক্রমণের এই ধারাটিকে 'মডেল ভগিনী' ও 'চিনিবাস চরিতামৃত' উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যে প্রাবল্য দান করেছেন। স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে ইন্দ্রনাথের রসিকতার মধ্যেও চিন্তাশীল সামাজিকের অভিমত ব্যক্ত হতে দেখি, 'স্বাধীনতাই হউক আর অন্য কিছুই হউক সকল বিষয়ে খুব পাকা লোক দরকার—সংসারেতে পাকা লোক মেলা ভার। বানরকে কলা দিলে খোসা সমেত খাইয়া ফেলে, ছেলেমানুষের হাতে তেলের ভাঁড় দাও, তেলেরও ছড়াছড়ি ভাঁড়েরও গড়াগড়ি' (পৃ ৯৩)। ইন্দ্রনাথের অভিযোগ অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক সমাজসংস্কারের ভারগ্রহণের বিরুদ্ধে। তার বিশ্বাস, এই কারণেই সামাজিক অসংগতির সৃষ্টি এবং তার অব্যবহিত ফল সামাজিক অধঃপতন।

গ্রন্থটিতে লেখক কমলিনী নাম্নী একজন প্রাচীন সংস্কারবিরোধী আধুনিকা মহিলাকে পাঠিকা রূপে কল্পনা করেছেন। কমলিনীর সুদীর্ঘ পরিচয় লেখক তুলে ধরেছেন।

'কমলিনী, অর্থাৎ এখনকার সুশিক্ষিতা বাঙ্গালিনী রমণী। এখন কেবলই কোমল, কাজ কাটে [illegible] তখন যদি এলাইত ও মাথার বেণীই এলাইত। এখন শরীর, মন, প্রাণ সবই এলাইয়া পড়িতেছে। এখন

৯ কৃষ্ণধন চক্রবর্তীর শরৎকামিনী (১৮৮৪) উপন্যাসে একটি বি এ. পাস ছুতার যুবককে একটি বংশপরিচয়হীন মেয়েকে বিয়ে করতে দেখা যায়।

১০ স্ত্রী স্বাধীনতায় আমার আপত্তি নাই, বরং প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু স্ত্রীটি যদি পরের হয়, তবেই, নচেৎ নয়। (পৃ ৯২)

শুধুই সখি ধর ধর। এখন রোদ উঠিবে ভোর হইবে শুনিলে কমলিনীর গাযে কাঁটা দেয়। কঠোব সংসাবেও কমলিনী আছেন সে কেবল উপন্যাসের স্তব-বিন্যাসে। সেইজন্যই ত উপন্যাস আগে একেবারেই ছিল না এখন রাশি রাশি' (পৃ ১০—১১)। উপন্যাসেব, স্তববিন্যাসের ক্ষেত্রে আমবা 'কমলিনীর' লীলাব প্রত্যক্ষ পবিচয় পাই, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬—১৮৮৯) উপন্যাসে।

লেখক কমলিনীব সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিযে উপন্যাসেব বিষযবস্তু পেশ করেছেন। পাঠিকাকে আহ্বান, ঘটনাব ক্ষেত্রে লেখকের মন্তব্য[১১] প্রভৃতি বীতি বঙ্কিম-অনুসৃত। ডঃ সুকুমার সেন বঙ্কিমচন্দ্রেব মুচিবাম গুডেব জীবন-চাবতে ইন্দ্রনাথের অনুসৃতি লক্ষ্য কবেছেন।[১২]

একটি বক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইন্দ্রনাথ সমাজদর্শন কবেছেন এবং ব্যক্তিচরিত্র-বিশ্লেষণে ব্রতী হযেছেন। তাব বচনা তাই আক্রমণাত্মক ও একদেশদর্শী। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্দ্রনাথ সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ কবেছিলেন। উনিশ শতকেব দ্বিতীযার্ধে ব্রাহ্মসমাজেব সামাজিক আদর্শ তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে পরিত্যক্ত ও উপহসিত হযেছিল এবং ব্রাহ্মদেব আচবণ বক্ষণশীল হিন্দুদের মনে সন্দেহেব সৃষ্টি করেছিল। সেই সন্দেহ ক্রমে বিদ্বেষে পবিণত হয়। ইন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদেব বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে লেখনীকে আযুধরূপে গ্রহণ কবে হিন্দুসমাজের নিষ্ঠাবান সৈনিকের দায়িত্ব যেমন পালন করেছেন, তেমনি হিন্দুসমাজের কুসংস্কাব ও কুপ্রথাজনিত নৈতিক অধঃপতনও তাব ব্যঙ্গেব হাত থেকে রেহাই পাযনি। ব্যঙ্গশিল্পীরূপে ইন্দ্রনাথেব বচনায উদ্দেশ্য প্রাধান্য পেলেও তা ব্যঙ্গশিল্পেব ধর্মকে লঙ্ঘন করেনি।

১১ মাকে প্রণাম কববে কিনা এ বিষয়ে ক্ষুদিরামের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হলে লেখকের মন্তব্য,—'ক্ষুদিরাম। এক ডেলা আফিম খাইতে পার নাই। তাহা হইলে তোমাবও যন্ত্রণা হইত না আমারও যন্ত্রণা হইত না'।

১২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, (উপন্যাস ও গল্প)।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—১৮৯৪)

সাংবাদিক সাহিত্যিক কবি রাজকৃষ্ণ রায়, ঔপন্যাসিক হিসাবেও একদা শ্রুতকীর্তি ছিলেন। সাংবাদিক রূপে তিনি প্রথমে 'সমাজদর্পণ' ও পরে 'বীণা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন (১৮৭৮)। গল্পকল্পতরু, নামে তাঁর গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ শুরু করেন ১২৮৬ সাল থেকে। রাজকৃষ্ণ 'দারিদ্র্য লইয়াই সংসারে বিচরণ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাল্যাবধি কবিত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবসরসরোজিনী প্রভৃতির কোন কোন কবিতা কাব্যজগতে উজ্জ্বল রত্ন।......রাজকৃষ্ণ সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের যে সুন্দর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রধান কীর্তিস্তম্ভ'।[১] গিরিসন্দর্শন (১৮৭০), আগমনী (১৮৭১), বঙ্গভূষণ (১৮৭৪), অবসরসরোজিনী (প্রথম ভাগ ১২৮৩, দ্বিতীয় ভাগ ১২৮৬) নিভৃতনিবাস (১৮৭৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রথম উপন্যাস 'হিরন্ময়ী'[২] ত্রয়োদশ শতকের পটভূমিতে রচিত একটি সামাজিক কাহিনী। দুই খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থে একটি পুরুষ ও দুটি নারীকে নিয়ে ত্রিভুজপ্রণয়-কাহিনী স্থান পেয়েছে। তুর্কী-আক্রমণের ফলে বাংলাদেশে নদীয়া অঞ্চলে মুসলমানদের অত্যাচার শুরু হয়। সেই বিপর্যয়ের কালে একটি পলায়নপর পরিবারের নৌকাডুবির পর থেকেই কাহিনীর গ্রন্থন।

ব্রাহ্মণ গোলকনাথ, স্ত্রী তারাসুন্দরী ও পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ সহ পলায়নকালে নৌকাডুবির ফলে সমগ্র পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নৌকাডুবির স্থান থেকে পাঁচক্রোশ দূরে মধুপুরে জগদীশপ্রসাদ নামে এক ধনী বাস করতেন। একদিন ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে এসে সব কথা নিবেদন করলে তিনি ধীরেন্দ্রনাথকে পুত্রস্নেহে কাছে টেনে নিলেন। জগদীশের দুই কন্যা কিরণময়ী (৫) ও হিরন্ময়ী (৪)। গৃহশিক্ষকের সহায়তায় তিনি মেয়েদের

১. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়: বঙ্গভাষার লেখক।

২. হিরণ্ময়ী (১ম খণ্ড) ১২৮৬, ইং ১৮৮০, পৃ. ১৯২।

ঐ (২য় খণ্ড) ১২৮৬ ইং, ১৮৮০, পৃ. ১৯৬—৩৪০।

পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের মা-বাবা ও ভাইয়ের সন্ধানে নদীয়া ও সপ্তগ্রামে লোক পাঠালেন জগদীশপ্রসাদ। কিন্তু তাঁদের পাওয়া গেল না।

দশবছর পরে এই কাহিনীর পট আবার উত্তোলিত হল। ধীরেন্দ্রনাথ চব্বিশ বছরের যুবা। কিরণময়ী পনের এবং হিরণ্ময়ী চোদ্দ বছরের নবযুবতী। তিনজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা গভীর। তবে হিরন্ময়ীকে ধীরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে বেশি। হিরন্ময়ীও আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে তার ভালোবাসা জানায় ধীরেন্দ্রনাথকে। পত্রযোগে কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে প্রণয় জানায়। এই তিনজনের মধ্যে একটি ত্রিভুজ-প্রণয়-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধীরেন্দ্রনাথ মানসিক সংকটের সম্মুখীন হয়। দুই বোনের এক পুরুষের প্রতি ভালোবাসা উভয়ের মধ্যে ঘটনাচক্রে ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

জগদীশপ্রসাদ দেওয়ান হরিহরের সহায়তায় কিরণময়ীর সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথের বিয়ের বন্দ করলেন। কিরণময়ী যেন আনন্দময়ী আর হিরন্ময়ী বিষাদ-প্রতিমা। দিদির সৌভাগ্যের কথা ভেবে হিরন্ময়ী নিজেকে অসহায় বোধ করে। কন্যার মত পরিবর্তনের জন্য ধীরেন্দ্রনাথের বন্ধু প্রিয়মাধবের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ধীরেন বন্ধুকে জানায় সে মধুপুর ছেড়ে চলে যাবে। হিরন্ময়ী অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিরণময়ীর কাছে হিরণের অসুখের কারণ ব্যক্ত হয়ে পড়লে, কিরণ তাকে জানায় যে সে ধীরেন্দ্রনাথকে বিয়ে করবে না কিরণ বাবার কাছে তিরস্কৃত হল। দিশাহারা বিরহরোগাতুরা হিরণ একটি পত্র লিখে সেই রাত্রে মধুপুর ত্যাগ করল। উদ্দেশ্য মৃত্যুবরণ। জগদীশপ্রসাদ পরদিন এখবর জেনে অনুতপ্ত হয়ে গৃহত্যাগিনী কন্যার অনুসন্ধানে সচেষ্ট হলেন। সকলে হিরণের সন্ধানে চলে যাবার পর, কিরণ নিরুদ্দিষ্টা হল। মাকে লেখা তার চিঠি থেকে জানা গেল যে, সে হিরণের সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছে। জগদীশ ও ধীরেন কেউই এখবর জানলেন না। শোকে ও উত্তেজনায় জাহ্নবীদেবী একদিন হৃদরোগে মারা গেলেন। একমাস পরে জগদীশ বাড়ি ফিরে এসে কিরণের গৃহত্যাগ ও স্ত্রীর মৃত্যুর কথা শুনে ভেঙ্গে পড়লেন। প্রথম খণ্ডের এখানেই ইতি।

দ্বিতীয় খণ্ড। হিরন্ময়ী সারারাত হেঁটে এক বনদেশ পার হয়ে, এক গ্রামের এক বৃদ্ধার গৃহে স্থান পেল। রাত্রে হিরন্ময়ী মুক্তার মালা ও সোনার বালা সেই

বৃদ্ধার কাছে রেখে দিল। অবশেষে বৃদ্ধার দেওয়া দুধ পান করে সে হৃতচেতন হলে, বৃদ্ধার দুই ডাকাত ছেলে তাকে শঙ্করীনদীতে ফেলে দিয়ে এল। একদল ডাকাত তাকে উদ্ধার করল নদী থেকে। দস্যুসর্দার বীরচাঁদ তাকে ধর্ম-মেয়ে বলে গ্রহণ করল। অজয় নদের তীরে শ্মশানে কাপালিক ভৈরবানন্দের কাছে দুজন দস্যু হিরন্ময়ীকে নিয়ে এল। হিরন্ময়ীকে দেখে কাপালিকের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হলে, সেকথা বীরচাঁদকে সে জানাল। বীরচাঁদ অভিমানে বিদায় নিল। বিবাহের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় ভৈরবানন্দ হিরণকে সুড়ঙ্গে প্রেরণ করল।

চন্দ্রবে ডাকাত ডাকাতি করতে গিয়ে ধরে আনল ধীরেন্দ্রনাথকে। ভৈরবের নতুন শিষ্য চণ্ডাল বালক মাখন হিরণ্ময়ী ও ধীরেন্দ্রনাথকে উদ্ধার করল কাপালিকের হাত থেকে।

ঘটনাচক্রে মৃত জাহ্নবী জীবিত হয়ে উঠলেন কবিরাজ শূলপাণি কণ্ঠাভরণের চিকিৎসায়। জগদীশের সঙ্গে তিনি মিলিত হলেন। হিরণ্ময়ীকে জগদীশ-প্রসাদ বীরেন্দ্রনাথের হাতে সম্প্রদান করলেন। মাখন পরিচয় দিয়ে কিরণময়ী হল। ঘটনাচক্রে বীরেন্দ্রনাথের পিতা গোলকনাথকে পাওয়া গেল। কাপালিক আত্মপ্রকাশ করল, ধীরেনের দাদা বীরেন্দ্রনাথ রূপে। বীরচাঁদ হল, নৌকাডুবির মথুর মাঝি। বীরেন্দ্রনাথের মাকেও পাওয়া গেল। নীলকণ্ঠপুরে সকলে মিলিত হবার পর জগদীশপ্রসাদ সদলবলে স্বগৃহ মধুপুরে প্রস্থান করলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের এখানেই শেষ।

লেখক উপন্যাসটিতে একটি সরল গল্প পরিবেশন করেছেন। ঘটনা সংস্থানের ক্ষেত্রে চমক দেবার প্রয়াসও লক্ষণীয়। নৌকাদুর্ঘটনায় পরিবার-বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জগদীশের মহানুভবতায় পুত্রস্নেহে তার গৃহে ধীরেন্দ্রনাথের বাস, হিরন্ময়ী ও কিরণময়ীর গৃহত্যাগ, ছদ্মবেশী চণ্ডাল বালকরূপী কিরণময়ী কর্তৃক হিরন্ময়ী ও বীরেন্দ্রনাথের উদ্ধার, মৃত জাহ্নবীর পুনর্জীবনলাভ, ধীরেন্দ্রের বাবা মা দাদার আবির্ভাব ইত্যাদি ঘটনা গল্পের গতিপথে নাটকীয় চমক সৃষ্টি করেছে। যে যুগের পটভূমিতে গল্প রচিত হয়েছে, প্রথম খণ্ডের সূচনায় তার বর্ণনা পেলেও পরবর্তী অংশে আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কাপালিক ভৈরবানন্দের পরিবেশ, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার আরণ্যপরিবেশ মনে করিয়ে দেয়। দেবীচৌধুরাণীর ভবানী

পাঠকের আড্ডাস্থলও প্রায় অনুরূপ। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার বন্ধে জাহ্নবীর মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাদম্বিনীর পরিণতির যেন পূর্বাভাস। 'দ্বিতীয় খণ্ড' ভাওয়াল-এর রাজকুমারকে উপহৃত। পরবর্তী কালে ভাওয়াল-এর এক রাজকুমারের মৃত্যু ও পুনর্জীবনলাভের ঘটনা প্রভূত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩)-এ এই জাতীয় ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই ভগ্নার একই ব্যক্তিকে স্বামী রূপে পাবার ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থে প্রণয়জাল বিস্তৃত হয়েছে। এই জাতীয় কাহিনীর পূর্বসূত্র পাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শৈশবসহচরী' (১৮৭৮) উপন্যাসে। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'দুই ভগ্নী' (১৮৮১) উপন্যাসের কাহিনীও এই জাতীয় ত্রিভুজ-প্রণয়ভিত্তিক। লেখক বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'যে পিতামাতা পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দেন, সে বিবাহ বালিকা বুঝে না, বুঝেন কেবল সেই পিতামাতা। আমরা সেরূপ পিতামাতার বুঝাকে পাপ বলিয়া বিশ্বাস করি' (পৃ ১২৮)। কোন পরিচ্ছেদের মধ্যে লেখকের বক্তব্য ও মন্তব্য স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের মত (অষ্টচত্বারিংশ, পৃ. ২৩৫)। লেখক স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী। কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীর বিদ্যাচর্চা তার প্রমাণ।

চরিত্রচিত্রণে লেখক বাস্তবতার পথ নিষ্ঠাপূর্ণভাবে অনুসরণ করেন নি। অধিকাংশ চরিত্রের আচরণে ও উপস্থাপনে আকস্মিকতার পরিচয় পাই। হিরন্ময়ীর প্রেম আকাঙ্ক্ষা-উদ্ভূত কামজ ও স্বার্থচেতনার সংকীর্ণতায় আবিল। সে ঈর্ষাতুরা। ধীরেন্দ্রনাথকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে,—'ধীরেন, তুমি বড়দিদিকে বিবাহ করিবে না বল' (পৃ. ৮৮)। কিরণের সঙ্গে ধীরেনের বিবাহের সংবাদে হিরণ্ময়ীর মানসিক সংকটের চিত্র লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার অসুস্থতা মানসিক সংকটেরই ফল। দ্বিতীয় খণ্ডে হিরণ্ময়ীর ভূমিকা অল্প। হিরণ্ময়ীর পাশে কিরণময়ীর চরিত্র ত্যাগ ও কর্তব্যপরায়ণতার বর্ণে উজ্জ্বল। হিরণের সঙ্গে ধীরেনের ভালোবাসার কথা জেনে সে স্বেচ্ছায় ধীরেনের উপর তার অধিকার ত্যাগ করে। হিরণ্ময়ী ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে নিরুদ্দিষ্টা হবার পর তার অন্বেষণে কিরণময়ীর গৃহত্যাগ কর্তব্য-প্রণোদিত। অবশ্য চণ্ডাল বালক মাখন রূপে তার আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি অস্বাভাবিক কল্পনাপ্রসূত। ধীরেনকে ভগিনীপতিরূপে, বন্ধুরূপে ভালোবাসবার

আশ্বাস জানিয়েও মানস-স্বামীরূপে গ্রহণ এবং মানদেই তাকে যাবজ্জীবন স্বামীরূপে সেবা করার বাসনা, তার চরিত্রকে সামঞ্জস্যহীন করে তুলেছে। ধীরেন্দ্রনাথ দুই নারীর প্রেমের আকর্ষণে কিছুটা সমস্যাপীড়িত। হিরণ্ময়ীকে প্রণয়িনীরূপে প্রাধান্য দিয়ে সে সঙ্কটমুক্ত হতে চেয়েছে। জগদীশপ্রসাদ হৃদয়বান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। কাপালিকরূপী বীরেন্দ্রনাথ, বীরচাঁদরূপী মথুরমাঝি, কাপাসডাঙ্গার বৃদ্ধ পাচকরূপী গোলকনাথ, ভিখারিনীরূপিণী তারা-সুন্দরী প্রভৃতির চরিত্র পরিকল্পনা ও সংযোজন অস্বাভাবিক ও কৌতূহলপ্রদ।

উপন্যাসটি রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। রচনারীতি ও চরিত্র পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। পরিচ্ছেদের নীচে শিরোনাম, ঘটনার ক্ষেত্রে পাঠককে আহ্বান, ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের কয়েকটি উদাহরণ। তা ছাড়া হিরণ্ময়ীর স্বপ্ন-প্রসঙ্গ অপর উদাহরণ। দস্যু বীরচাঁদ ও কাপালিকের চরিত্র-পরিকল্পনায় যথাক্রমে ভবানী পাঠক এবং কপালকুণ্ডলার কাপালিকের প্রভাব স্পষ্ট। নায়িকা (হিরণ্ময়ী) কর্তৃক আনমনে নায়কের (ধীরেন্দ্রনাথ) নাম লেখার বিষয়টিও 'দুর্গেশনন্দিনী'র তিলোত্তমার আচরণের মত। উপন্যাসটির ভাষা সরল এবং রচনার গতি স্বচ্ছন্দ। লেখকের 'কিরণময়ী'[৩] 'হিরণ্ময়ী উপন্যাসের পরিশিষ্ট।' এই গ্রন্থটিও রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। কিরণময়ীর চরিত্রের পরিণতি প্রদর্শিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিরণময়ীর বিবাহের কথা উঠলে কিরণময়ী ও বীরেন্দ্র উভয়েই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। বীরেন্দ্রনাথ ভুলতে পারেন না। কিরণময়ীর প্রতি তার অতীত আচরণের কথা। কিরণময়ীকে একটি পত্র লিখে বীরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করে। কিরণ জানল, বীরেন্দ্রনাথ আবার ফিরে যাবে তার অতীত জীবনে। ঘটনাক্রমে পত্রটি হিরণ্ময়ীর হাতে পড়ে। ভাইয়ের অন্বেষণে ধীরেন্দ্র-নাথ গৌড়ে এসে পাঠানের হাতে বন্দী হল। বীরেন্দ্র তাকে উদ্ধার করল। কিরণময়ী বীরেন্দ্রের মাকে আশ্বাস দিল যে, সে তার পুত্র ও পুত্রবধূ এনে দেবে। কিরণময়ী গৌড়ে এসে বীরেনকে অনুরোধ করল বাড়ি ফেরার জন্য। তারপর গৌড়ের জনৈক ব্যক্তি দেবনারায়ণের কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে বীরেনের বিবাহ স্থির করল। যথাকালে প্রিয়মাধবের পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিল

৩. কিরণময়ী, ১২৮৭।

ধীরেন্দ্রনাথ। এবং আরও পরে কিরণ পিতামাতার সঙ্গে কাশীবাসিনী হল। বীরেনের চিন্তায় উদাসিনী ও যোগিনী হল।

কিরণময়ী বৈশিষ্ট্যহীন রচনা। উপন্যাসটির মধ্যে সুলতান গায়সুদ্দিনের প্রসঙ্গ এনে লেখক উপন্যাসটির ঐতিহাসিক কালের আভাস দিয়েছেন। কিরণময়ীর ত্যাগ ও কর্তব্যচেতনার পরিচয় দিয়ে লেখক তার চরিত্রে আদর্শবাদের ছায়াপাত করেছেন। কাহিনীটি সরলরেখায় সমাপ্ত।

রাজকৃষ্ণ রায়ের পরবর্তী গ্রন্থ 'দুই শিকারী'[৪] খোস গল্প বিশেষ। গরীব ও বড়লোক ভাইয়ের কাহিনী। রচনাটি উপাখ্যানজাতীয়। গ্রন্থটি আগাগোড়া চলিত ভাষায় রচিত। এটাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। অন্যথায়, বৈশিষ্ট্যহীন রচনা।

'গল্প কল্পতরু'র 'চতুর্থকুসুম' 'অদ্ভুত ডাকাত'[৫] গৌড়ের পতনকালের পটভূমিতে রচিত এ্যাডভেঞ্চার-জাতীয় রচনা।

এই গ্রন্থটিও দুই ভাইয়ের বিচ্ছেদ ও মিলন-কাহিনী। জমিদার ধনেশ্বর সিংহরায়ের চক্রান্তে ভাই রত্নেশ্বর সিংহরায় গৃহত্যাগী হয়। নতুন নাম গ্রহণ করে ভীমভাম। এই ভীমভাম ডাকাতি শুরু করে। অত্যাচারী অধার্মিক ধনীর ধন লুণ্ঠন করে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে। ধনেশ্বর অত্যন্ত অত্যাচারী, লোভী ও অধার্মিক। তার মেয়ে সরলাকে জলে ডোবার হাত থেকে তার কর্মচারী যাদবেন্দ্র রক্ষা করলে, সে যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিয়ে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু কার্যকালে অন্যত্র বিয়ের ব্যবস্থা করে।

ভীমভাম সন্ন্যাসীর বেশে ঘোরে। ঘটনাচক্রে যাদবেন্দ্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এবং ধনেশ্বরের কন্যার সঙ্গে যাদবেন্দ্রের বিয়ে দেবার সংকল্প করে। শেষ পর্যন্ত দস্যু-অধিপতি ভীমভাম সরলার বিয়ের রাত্রে মন্দিরে মুক্ত তরবারির সামনে ধনেশ্বরকে পূর্ব-প্রতিজ্ঞাপালনে বাধ্য করে। সরলার সঙ্গে যাদবেন্দ্রের বিয়ে হয়। ধনেশ্বরের অপরকন্যা তরলার সঙ্গে নীলকান্ত রায়ের (সরলার সঙ্গে যার বিবাহ স্থির ছিল) বিয়ে হয়। ঘটনাক্রমে প্রকাশ পায় যে সরলা ধনেশ্বরের পালিতা কন্যা, বাঘের মুখ থেকে শিকারীরা তাকে পেয়ে ধনেশ্বরকে দেয়। সাক্ষ্যপ্রমাণে জানা যায় যে মেয়েটি রত্নেশ্বরের। অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীর বেশ খুলে সে তার আসল পরিচয় দান করে,—সে রত্নেশ্বর সিংহ রায়।

৪. দুই শিকারী, ১২৮৯, পৃঃ ৮৬।

৫. অদ্ভুত ডাকাত, ১২৯৫, পৃঃ ৮৮।

কৃষ্ণকান্তকে। উদ্দেশ্য বিনোদবিহারী নামে এক যুবকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ীর বিয়ে পাকা করা।

অমরের দেওয়া 'সীতার বনবাস' বইটি জ্যোতির্ময়ী সযত্নে পড়ত। বিয়ের দিন বর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে কৃষ্ণকান্ত ও তাঁর বাবা মধুসূদন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একজন এসে খবর দিল যে এগারশ টাকা চক্রধরবাবুকে পাঠিয়ে না দিলে তিনি বর পাঠাবেন না। কৃষ্ণকান্ত ছ'শটাকায় কিছুতেই চক্রধরবাবুকে সম্মত করাতে পারলেন না। বৃদ্ধ মধুসূদন চক্রধরের হাত ধরে জানালেন, পাঁচশ টাকার হ্যাণ্ডনোট পিতাপুত্রে লিখে দেবেন। চক্রধর নগদ না পেলে রাজী নয় জানাল। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে কৃষ্ণকান্ত প্রতিবেশী মুখুজ্যেমহাশয়ের দ্বারস্থ হয়ে তাঁর এক পুত্রের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ীর বিবাহের ব্যবস্থা কবলেন।

হুগলির দয়ালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বসন্তসুন্দরীর সঙ্গে নৈরাশ্যপীড়িত অমরকুমারের বিবাহ হল। বিয়ের পরে অমরকুমার উন্মাদ হয়ে উঠল এবং অকালে জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যু হল।

গ্রন্থটি লেখকের অন্যান্য উপন্যাসগুলির তুলনায় সুগ্রন্থিত ও পরিণত। পণপ্রথা জীবনে যে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে, পুত্রের পিতার লোভ, পূর্ব-নির্ধারিত বিবাহ ভেঙ্গে দিয়ে কন্যার পিতা ও পরিবারবর্গের জীবনে যে অশান্তির আগুন জ্বালে, তারই একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। ঘটনা-সংস্থাপনে লেখকের কৌশল, শিল্পকে বিঘ্নিত করেনি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিণত কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অমরকুমার ও হিরণ্ময়ীর বিবাহের কথা যখন স্থির, তখন অমরকুমার দত্ত 'সীতার বনবাস'-এ জ্যোতির্ময়ীর লেখা —'শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাম, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী সীতা' অংশটি পাঠক-মনকে উভয়ের মিলনের সম্ভাবনার আনন্দিত লগ্নটিকে উজ্জ্বল করে তোলে। কিন্তু বিবাহলগ্নে পাত্রের অর্থগৃধ্নু পিতার আচরণে বিবাহ-ভঙ্গের ঘটনাটি পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। মাল্যবদলকালে মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানের কয়েকটি পংক্তি[৭] জ্যোতির্ময়ীর মনে আসার

৭ শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিত নয়নে না হেরি অন্য জন॥
যখন মানসে তায় বরিয়াছি আমি।
জীবনমরণে সেই সত্যকাম স্বামী॥

মধ্য দিয়ে তার অন্তরলোকটি অনাবৃত হয়ে পড়েছে। চরিত্রের মানসিক অনুভূতি পরিস্ফুটনে এটি লেখকের একটি শিল্প-কৌশল। মাল্যবদলকালে জ্যোতির্ময়ীর হাত থেকে মালা পড়ে যাওয়ার পর তার অশ্রুসিক্ত চোখে অসহায়তার যে রূপটি মূর্ত হয়ে ওঠে, তা সহজেই পাঠকের সহানুভূতি লাভ করে। লেখক গল্পের মধ্যে কৌতূহল উদ্রেককর পরিবেশ সৃষ্টি করে গল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। পরিচ্ছেদের নামকরণ, চরিত্র সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য প্রভৃতি বিষয় বঙ্কিম-অনুসৃত।

জ্যোতির্ময়ীর চরিত্রে কিছুটা স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ, বিবাহের দিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত জ্যোতির্ময়ীর মানসিক ভাবান্তরের পরিচয় লেখক নিপুণভাবে এঁকেছেন (পঞ্চম অংশ। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। অমরকুমার ঘটনাচক্রের বলি। পিতৃসত্যপালনের মধ্য দিয়ে কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেও অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত মস্তিষ্কবিকৃতি তার চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। অল্পের জন্য হলেও অমরকুমারের মায়ের চরিত্রটি পুত্রের প্রতি সহানুভূতি ও স্নেহে উজ্জ্বল। চক্রধর অর্থগৃধ্নু পিতার উদাহরণ। সে জন্মার্জিত কুসংস্কারের মূর্তিমান প্রতিভূ। ইংরেজ ও 'বেহ্মজ্ঞানী' তার কাছে এক। শ্যামলালের শঠতা ও চক্রান্ত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯)-এর যামিনীনাথ-এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। 'কর্ণধার'[৮]-এর সাহিত্য-সংবাদ শিরোনামায় উপন্যাসটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, 'গ্রন্থের ভাষাটি বেশ প্রাঞ্জল এবং গল্পটিও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। চরিত্র-অঙ্কনের চেষ্টা অপেক্ষা গল্পচ্ছলে একটা ঘটনা বিবৃত করা বোধ হয় রায়মহাশয়ের উদ্দেশ্য এবং সেইজন্যই বুঝি কাব্যাংশে সৌন্দর্যসৃষ্টির উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং উপন্যাসের অঙ্গহানি হইয়াছে। তবে গল্পাংশে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ ক্ষমতা উপলব্ধি হয়। গ্রন্থের প্রথম অংশটা বর্ণনাধিক্যপ্রযুক্ত কিছু নীরস, কিন্তু শেষ অংশটুকু বড়ই করুণ-রসাত্মক ও মর্মস্পর্শী। আমরা পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে চক্ষের জল ফেলিয়াছি'।

রাজকৃষ্ণ রায়ের পরবর্তী উপন্যাস 'অনুপমা'[৯] নারীর স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে লিখিত উপন্যাস। কালিপদ তার বাগ্‌দত্তা জাহ্নবীকে

৮. কর্ণধার, দ্বিতীয় বৎসর, দ্বিতীয় খণ্ড ১২৯৫—৯৬, পৃ. ২২১।

৯. অনুপমা, ১৮৮৯, পৃ. ১৬৬।

বিয়ে না করে, কুলশীলহীনা অনুপমাকে বিয়ে করে। অনুপমার রক্ষাকর্তা প্রসন্ন তার প্রেমে পড়ে। অনুপমা কালিপদকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তাকে জেলে পাঠায়। প্রসন্ন অনুপমার সঙ্গে বাসকালে, তার প্রতি দুর্ব্যবহার করলে, অনুপমা তাকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তারপর কয়েকজন সন্ন্যাসী তাকে রক্ষা করে এবং তাকে শিক্ষিতা করে তুলে তাদের দলের অধিনেত্রী করে। তারপর কালিপদর সঙ্গে তার পুনর্মিলন হয়।

অশিক্ষিতা পরিচয়হীনা বেপথুনারীর লোভ ও হৃদয়হীনতা ও পরে সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে, শিক্ষালাভে পদমর্যাদার অধিকারিণী হয়ে, পূর্বস্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের সার্থকতার দিক প্রতিপন্ন করেছেন লেখক। গল্পটি চমকপ্রদ ও এবং আকর্ষণীয়।

লেখকের 'সম্পাদিত' 'শান্তিকুটীর'[১০] পুরাকালের পটভূমিতে লেখা কাল্পনিক উপাখ্যান বিশেষ। এই উপন্যাসের ঘটনাকাল সম্বন্ধে লেখক বলেছেন,—'যে সময়ের কথা এই আখ্যায়িকার বিষয়—সে সময় অনেককাল অতীত হইয়াছে। সে সময়ে আর্যের ভারতে আর্য রাজা ছিল, আর ঋষিগণ তপঃপরায়ণ হইয়া লোকালয়ের দূরে তপোবনে শ্রীহরির চরণ চিন্তা করিতেন—এখন সেদিন নাই' (পৃ ২)। বর্ণনার মধ্যে কালিক পটভূমির সামান্য পরিচয় সীমাবদ্ধ।

অমরপত্তনের রাজা, জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় সিংহকে, বীরবাজোর রাজকন্যাকে বিবাহ করার কথা জানান। কিন্তু পুত্র মন্ত্রী বুদ্ধিশেখরের কন্যা প্রিয়ম্বদাকে বিবাহ করার ইচ্ছা জানায়। রাজা ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করলে, পুত্র বিজয় সিংহ পিতৃরাজ্য ত্যাগ করে, শান্তিকুটীরে বসবাস শুরু করেন। বিজয় সিংহ প্রিয়ম্বদাকে বিয়ে করেন। রাজা ছোট ছেলে অজিত সিংহের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পুষ্করতীর্থে যাত্রা করলেন।

অমরপত্তন মগধরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হলে অজিত সিংহ স্ত্রী পুত্রসহ পালিয়ে গেলেন। যে মহর্ষির কাছে বুদ্ধিশেখরের একমাত্র পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন আট বছর হলো সে নিরুদ্দেশ। পুত্রকন্যার সন্ধানে বুদ্ধিশেখর ইতিমধ্যে বিশ্বপর্যটনে বেরিয়েছেন। এদিকে বিজয় সিংহ একদিন কার্যান্তরে গিয়ে আর ফিরলেন না, অবশেষে এক মহর্ষির চেষ্টায় পুনরায় সকলের সঙ্গে মিলন হল। সকলে শান্তিকুটীরে বাস করবার মনস্থ করলেন।

১০. শান্তিকুটীর ২৬ পৃ ১১৬।

রচনাটি রোমান্স বিশেষ। কাহিনীর পরিবেশ রচনায় লেখক আদৌ যত্নবান হননি। গল্পকে লেখক মূলত প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। রচনাটি বৈশিষ্ট্যহীন। রচনারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। অজিত সিংহের মৃত্যু, বৃষ্টির দরুন শ্মশানঘাটে শবত্যাগ ও পুনর্জীবনলাভের ঘটনা, এই লেখক রচিত 'হিরণ্ময়ী' (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৮৮০) উপন্যাসের জাহ্নবীর মৃত্যুর ও পুনর্জীবনলাভের অনুরূপ ঘটনা।

রাজকৃষ্ণ রায়ের অপর রচনা 'প্রতিফল' (১৮৯৩) 'প্রকৃত ঘটনামূলক উপন্যাস' বলে চিহ্নিত হলেও আসলে বড় গল্পবিশেষ।

সীমিত প্রতিভা নিয়ে রাজকৃষ্ণ রায় ঔপন্যাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে ছিলেন। উপন্যাস-রচনায় সমকালীন অন্যান্য লেখকের মত ইনিও কাহিনীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অতীত কালের পটভূমিতে রচিত কাহিনী গ্রন্থনে লেখক সেই কালের লক্ষণ ও ধর্মকে কাহিনীর মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবপুষ্ট মানসিকতা নিয়ে তিনি উপন্যাসরচনায় ব্রতী হলেও প্রতিভার দীনতা তাকে বিশিষ্টতা দান করতে পারে নি।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী (?—?)

বাংলার প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক, শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী উনিশ শতকের মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম। হেমাঙ্গিনীর নাম আজ আর লোকগোচরে নেই। মহিলা ঔপন্যাসিকদের বৈশিষ্ট্য হেমাঙ্গিনীর রচনায়ও লক্ষণীয়। নারী-মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা তার রচনায় বর্তমান। নারীর সতীত্ববোধ ও প্রেম সম্পর্কে ধারণা ও নিষ্ঠার বিষয় হেমাঙ্গিনীর উপন্যাসে উপস্থাপিত হতে দেখি।

আলোচ্যকালে হেমাঙ্গিনীর দুটি উপন্যাসের সন্ধান পাই। সেই দুটি উপন্যাসেই নারীচরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর প্রণয়-আনুগত্য, সতীত্ববোধ এবং এ সম্পর্কে সামাজিক বিধিকে লেখিকা মর্যাদা দিয়েছেন। লেখিকার প্রথম উপন্যাস 'মনোরমা'[১১] উপন্যাসের পূর্ণ-প্রতিশ্রুতি বহন করে না।

১১ মনোরম (আখ্যায়িকা), অর্থাৎ সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র স্ত্রীজাতির দ্বারা সংসারাশ্রম কিরূপ সুখের স্থান হয় তদ্বিষয়ক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ১২৮১, পৃ. ৯৫।

'উৎসর্গ-পত্র' থেকে জানা যায় যে, ১২৭২ সালে লেখিকা মনোরমা লিখতে শুরু করেন এবং ঐ সালেই শেষ করেন। কিন্তু 'মুদ্রাঙ্কনের নিতান্ত অযোগ্য জানিয়া এ পর্যন্ত কাহাকেও না দেখাইয়া' লেখিকা পাণ্ডুলিপি ফেলে রেখে-ছিলেন। 'ভূমিকা'য় প্রকাশক গ্রন্থটির সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি সাংসারিক কার্যের অবসরে এইখানি রচনা করিয়াছেন। অবসরকাল স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে নিজের চেষ্টায় যতটুকু সাধ্য পড়িতে শিখিয়াছেন এবং পাঠানুশীলনকালে অন্তঃকরণে যে সকল কোমল ভাবের আবির্ভাব হইত, সময়ে সময়ে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।' এই মনোরমা 'তাঁহার নবোদিত সুকুমার ও অপরিস্ফুট সদ্ভাব-বৃক্ষের প্রথম মঞ্জরী।'

রচনাকাল বিচারে (১২৭২) হেমাঙ্গিনী বাংলার প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক। এই প্রসঙ্গে নবীনকালী দেবীর ('কামিনীকলঙ্ক', ১৮৭০) দাবি উঠতে পারে (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে নারী, পৃ. ৮)। কিন্তু প্রকাশ-কাল নয়, রচনাকাল বিচারে বাংলার প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকরূপে হেমাঙ্গিনীর দাবি নিঃসন্দেহে প্রথম।

মনোরমা সরলরেখায় সমাপ্ত একটি আখ্যায়িকা। রচনাটি অনেকটা স্ত্রী-শিক্ষামূলক। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রন্থটি রচিত। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ও শ্রদ্ধার চিত্র লেখিকা নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সতীত্ববোধই নারীর এই প্রেরণার উৎস।

জয়পুর জেলার চন্দননগর গ্রামের চাষী গৃহস্থ হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে মনোরঞ্জন পরীক্ষা দিতে কলকাতায় যায়। বন্ধু মনোহর ও সে, গ্রামের প্রতিবেশী অবস্থাপন্ন দুর্গাচরণের বাসায় থাকে। পরীক্ষান্তে বাড়ি ফেরার অব্যবহিত পূর্বে আশ্রয়দাতা দুর্গাচরণ কলেরায় মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে মনোরঞ্জনকে তিনি অনুরোধ করেন তাঁর কন্যাকে দেখাশুনা করার জন্য।

দুর্গাচরণের স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর গৃহত্যাগ করে উদ্যানসংলগ্ন মন্দিরে বাস করতে থাকেন। মনোরঞ্জনের মায়ের প্রস্তাবে মনোরঞ্জনের সঙ্গে দুর্গাচরণের কন্যা মনোরমার বিয়ে হয়। তারপর একে একে মনোরমা ও মনোরঞ্জনের মা মারা যান।

মনোরমার উপর সংসার পড়ে। গৃহে মনোরঞ্জন মনোরমাকে শিক্ষিতা করে তোলে। মনোরঞ্জন সংসারের প্রতি কর্তব্যের প্রেরণায় গোরক্ষপুরে এক

জমিদারের অধীনে ২০০ টাকা বেতনে কাজে যোগ দেয়। শেষে পত্রযোগে মনোরমাকে তার বন্দীত্বের কথা জানায়। মনোরমা শিশুসন্তান দুটিকে মনোহরের স্ত্রীর কাছে রেখে ঝিকে নিয়ে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে গোরক্ষপুরে এসে শোনে যে, মনোরঞ্জন মুক্তি পেয়ে অযোধ্যায় গেছে। মনোরমা অযোধ্যায় আসে কিন্তু সেখানে শোনে যে, মনোরঞ্জন নৈমিষারণ্যে। শেষে, দীর্ঘদিন অন্বেষণের পর স্বামীর সন্ধান না পেয়ে, অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে মৃত্যুবরণ করার পূর্বের মুহূর্তে মনোরঞ্জন তাকে রক্ষা করে। কিন্তু মূর্ছিতা মনোরমার আর জ্ঞান ফেরে না।

গ্রন্থটির স্ত্রী-চরিত্রগুলি এক ছাঁচে গড়া। স্বামীর ও স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাসের সূত্রই প্রধান। মনোরঞ্জন ও মনোহরের কথোপকথনের মধ্যে নারীসমাজের দুর্দশার কথা স্থান পেয়েছে। স্ত্রী-সমাজের দুর্দশামোচনের জন্য স্বামীদের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথাই মনোহর উত্থাপন করে। স্বামীর যেমন কর্তব্য স্ত্রীকে শিক্ষাদান করা, স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীকে স্ত্রী-চরিত্র সম্পর্কে শিক্ষাদান করা। চরিত্রসৃষ্টিতে লেখিকার কোন নৈপুণ্য লক্ষিত হয় না। ঘটনা-সংযোজনের ক্ষেত্রে লেখিকা আদর্শ ও কল্পনার তাড়নায় শিল্পকৌশলকে পরিহার করেছেন।

কাহিনী-বর্ণনাকালে লেখিকা মাঝে মাঝে উপদেশ দান করেছেন। গ্রন্থটির আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, স্ত্রী ও পুরুষের বেদনাজনক মানসিক অবস্থাকে পদ্যে বিবৃত করা হয়েছে। দুর্গাচরণের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর বিলাপোক্তি (পৃ. ১২-১৬, ২১, ২৪,-২৫) পদ্যে লিখিত। মনোরমাকে লিখিত মনোরঞ্জনের বেদনাজনক মনোভাবপূর্ণ পত্রটিও পদ্যে লিখিত। ডঃ সুকুমার সেন গ্রন্থটিতে 'প্রাচীন পদ্ধতির আখ্যায়িকা হইতে আধুনিক পদ্ধতির উপন্যাসের উদ্ভবের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন' পেয়েছেন।[১২]

সংসারজীবনের ফাঁকে আলোচ্যকালে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া করে লেখিকার উপন্যাসরচনার এই প্রয়াস সাধুবাদ পাবার মত। লেখিকার এই প্রচেষ্টা রাসসুন্দরী দাসীর প্রচেষ্টাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৩]

১২. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, তৃ-স ১৩৫৬, পৃ ১১৩-১৪।

১৩. রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' (১২৭৫), ('আমার জীবন' আত্মজীবনী)।

হেমাঙ্গিনীর অপর উপন্যাস 'প্রণয়-প্রতিমা'[১৪] কল্পনামূলক উপন্যাসরূপে চিহ্নিত। এই উপন্যাসটিতেও লেখিকা নারীর প্রণয়ের সম্ভাবিত স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। পুরুষের প্রণয়িনী রূপেই নারী-জীবনের সার্থকতা। সেই ভালোবাসায় আন্তরিকতা ও সর্বসমর্পণতার স্বাক্ষর থাকে নারীর জীবনচর্যায়। লেখিকা নারীর এই ঐকান্তিক ভালোবাসার চিত্র অঙ্কন করেছেন এই উপন্যাসে।

দেবগ্রামের অধিবাসী অন্নদাপ্রসাদ ও তার স্ত্রী বিনোদিনীর মধ্যে গভীর ভালোবাসা। অন্নদাপ্রসাদ এম. এ. পাস। স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতা যাত্রার পথে, অপর নৌকার দুজন যাত্রিণীকে অন্নদাপ্রসাদ নিজের নৌকায় আশ্রয় দিল এবং কাশীপুরে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে কলকাতা গেল।

সহযাত্রিণীদের মধ্যে যুবতী হেমাঙ্গিনী অন্নদাপ্রসাদের প্রণয়াসক্তা হল। দেবগ্রামে অন্নদার খুলতাত কৃষ্ণকান্ত কয়েকজন গাঁজাখোর লোকের সাহায্যে বিনোদিনীকে হরণ করে নিয়ে গেল। কিছুকাল পরে এক অরণ্যভূমিতে সঙ্গীতরতা বিনোদিনীর সাক্ষাৎ পেল অন্নদাপ্রসাদ। তারপর বিনোদিনী স্বামীর ক্রোড়ে মাথা রেখে মারা গেল।

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে অন্নদার বিয়ে হল। উভয়ের সুখের সংসারে আবার শনির পদসঞ্চার ঘটল। কৃষ্ণকান্ত কয়েকজন দুষ্ট লোকের সহায়তায় পদ্মর মেয়েকে হত্যা করার অভিযোগে অন্নদাকে অভিযুক্ত করল। মিথ্যা সাক্ষ্যে অন্নদা দোষী প্রতিপন্ন হলে তার প্রাণদণ্ড হল। ফাঁসির কূপে লাফিয়ে পড়ে হেমাঙ্গিনী মৃত্যু বরণ করে হল,—'প্রণয়-প্রতিমা'।

এই উপন্যাস রচনায় লেখিকা আদর্শতাড়িত মনের পরিচয় রেখেছেন। হেমাঙ্গিনী ও অন্নদার সম্পর্কের মধ্যে বিনোদিনীর প্রসঙ্গ আদৌ উঠতে দেখা যায় না। অন্নদাপ্রসাদের বিবাহিত জীবনের এই গোপনীয়তা রক্ষার কারণ অজ্ঞাত। পদ্মর মেয়েকে কৃষ্ণকান্ত নিজে হত্যা করে অন্নদার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার বিষয়টির পশ্চাতে কারণ থাকলেও, বিচারে অন্নদার ফাঁসি হওয়ার ঘটনা অনেকটা কাকতালীয়।

উপন্যাসটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে সমগ্র কাহিনীতে নারীমনের নির্যাস

১৪. প্রণয়-প্রতিমা (কল্পনামূলক উপন্যাস) ১২৮৪, পৃ ৭০।

ছড়ানো। সামাজিক নীতির প্রতি লেখিকার আস্থাবোধও উপন্যাসটিতে অভিব্যক্ত। নিগৃহীতা বিনোদিনীর সমাজে স্থান নেই, তাই অরণ্যভূমিই হয় তার আবাসস্থল। কিন্তু নিগৃহীতা হলেও সে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলা। পরপুরুষের প্রতি তার আসক্তি থাকলে, অরণ্যের স্থলে পতিতসমাজেই তার সন্ধান পাওয়া যেত। বিনোদিনীর অরণ্যবাসের চিত্র লেখিকার রোমান্টিক কল্পনাজাত। সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ যে নারীর স্বাভাবিক ধর্ম, একথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিনোদিনীর চরিত্রে। হেমাঙ্গিনী ও বিনোদিনীর চরিত্রে আদর্শগত কোন পার্থক্য নেই। চরিত্র দুটি একই শ্রেণীর। সুরবালা ও মোহিনীর চরিত্র কর্তব্যনিষ্ঠ স্বামী ও স্ত্রীর অপর উদাহরণ। উপন্যাসটির মধ্যে সুযোগমত তত্ত্বালোচনা করে লেখিকা উপন্যাসের গতিকে মন্থর করে তুলেছেন।

বঙ্কিম-সমকালীন অন্যান্য মহিলা ঔপন্যাসিকদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য কাহিনীর মধ্যে গানের সন্নিবেশ। হেমাঙ্গিনীও তাঁর উপন্যাসে গান অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উপন্যাসটিতে বঙ্কিম-প্রভাব লক্ষ্য করি। পরিচ্ছেদের নামকরণ, পাঠককে আহ্বান ইত্যাদি রীতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দীনেশচরণ বসু (১৮৫১—১৮৯৮)

দীনেশচরণ বসু কবি ও ঔপন্যাসিক রূপে এককালে জনসমাজে সমাদৃত হয়েছিলেন। আজ বিস্মৃতপ্রায় লেখক। পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরে দীনেশচরণের বিদ্যালয়-জীবন কাটে। প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে এক সময়ে 'সখের পলাতক' হন। তারপর ধৃত দীনেশচরণ গৃহে প্রেরিত হবার পর কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ডাক্তার হবার আগেই অসুস্থতার জন্য তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হয়। 'বান্ধব' পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। তিনি 'চারু-বার্তা' ও 'ঢাকা প্রকাশে'র কিছুকাল সম্পাদকতাও করেছিলেন।[১৫] তাঁর প্রথম গ্রন্থ একটি কাব্য—'মানসবিকাশ' (১২৮০)।

দীনেশচরণের 'কুলকলঙ্কিনী'[১৬] একটি 'সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস'। উপন্যাসটিতে লেখক বিধবা-প্রণয়-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন কিন্তু বিধবাবিবাহের

১৫. প্রদীপ (৩য় সংখ্যা, ১৩০৫)-এ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত প্রবন্ধ।

১৬ কুলকলঙ্কিনী, ১৮৮৩, পৃ. ২৯০।

সমর্থন করেন নি। দেওয়ান মহেন্দ্র চৌধুরীর আশ্রিতা চতুর্দশী বিধবা বসন্ত। চৌধুরানী যেন রাজরাণী। আর ছেলে উপেন্দ্র-অন্ত প্রাণ বসন্তের। মহেন্দ্রের পালিত এক জমিদার পুত্র কিরণ, বসন্তের প্রণয়প্রার্থী। মহেন্দ্রের ভূতপূর্ব কর্মচারী লোকনাথ চক্রবর্তী তার বাড়ি থেকে দলিলপত্র চুরি করার জন্য লোক নিযুক্ত করে। রাত্রে মধুমতীতীরে লোকনাথের সঙ্গে এক পাগলিনীর দেখা হলে সে অতীত প্রসঙ্গ তুলে লোকনাথের কাছ থেকে দুপদ গহনা ও ৪০০০ টাকা নেয়।

কিরণ ও বিধু দুই ভাই। সম্পত্তি ভাগ হলে কিরণ প্রাপ্ত অর্থের অংশে দাতব্য চিকিৎসালয় করে। বিধু মহেন্দ্রকে জব্দ করার চেষ্টা করে, কিরণ উপকারের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা করে। মহেন্দ্র চৌধুরীর চাকুরি যায় এবং সিন্দুক থেকে ৬০ হাজার টাকার তমসুকও হারিয়ে যায়। পূর্বে আদালত অবমাননার দায়ে এবং কৃষ্ণ কবিরাজকে লুকিয়ে রাখার মিথ্যা অভিযোগে চৌধুরীর তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড হল। কিরণচন্দ্র চৌধুরীর বিপদেব দিনে পাশে এসে দাঁড়াল। চৌধুরানী কর্ত্রী হয়ে বসন্তকে চুবির দায়ে আক্রমণ করল। বসন্ত বিশ্বাস হারিয়ে 'লজ্জায় দুঃখে শোকে কাপড়ের পোঁটলা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোর সন্ধ্যার সময় বসন্ত চৌধুরীর বাড়ি হইতে বাহির হইলেন'। বসন্তকে আশ্রয় দিল কিরণ। বসন্ত কিছুদিন পরে মাসীর বাড়ি গেলে, একরাত্রে মদ্যপ লোকনাথ তার ঘরে ঢুকে তার উপব অত্যাচার করতে উদ্যত হলে সহসা দবজায় ধাক্কা পড়ল এবং লোকটি বসন্তকে বিপদমুক্ত করল। এদিকে চৌধুরানী ওরফে মোহিনী স্বামী ও সংসার ছেড়ে বিধুর সঙ্গে কলকাতায় পালাল। প্রথমে একটি কুপল্লী ও পরে একটি নতুন বাড়িতে তাকে নিয়ে এলো বিধু।

লোকনাথের ঘরে আগুন দিল পাগলিনী। সে পাগলিনীকে কুলত্যাগিনী ভিখারিনী ও পাগলিনী করেছে। তার কথায় জানা গেল লোকনাথের নাম কালীচরণ। লোকনাথ গহনা নিয়ে পালাতে গিয়ে আগুনচাপা পড়ল। মহেন্দ্র কারামুক্ত হয়ে ছেলের কাছে শুনল 'মা মরেছে'। কিরণ মহেন্দ্রকে জানাল, সে বসন্তকে বিয়ে করবে না। মহেন্দ্র বসন্তকে ডেকে শাসন করল। পুকুরে ডুবে মরতে যাবার সময়ে পাগলিনীর সঙ্গে তার দেখা। পরিচয়ের মধ্য দিয়ে জানাল তারা পরস্পর বোন। পাগলিনীর নাম শরৎ।

মহেন্দ্র পাগল হয়ে গেল। মোহিনী ঝি-বৃত্তি করতে লাগল। মহেন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে উইলে স্ত্রীকে ৩০ হাজার টাকা ও উপেন, বসন্ত ও কিরণকে ১০ হাজার টাকা করে দিল। মোহিনী শ্মশানে এসে মূর্ছা গেল। তারপর মৃত্যু। কিরণ বিয়ে করল। বসন্ত ও শরৎ ফিরে গেল পিত্রালয়ে, মধুমতীতীরে। দীর্ঘদিন পরে সপরিবারে কিরণের সঙ্গে বসন্তের দেখা হল। তারপর আবার বিচ্ছেদ।

মোহিনী কুলকলঙ্কিনী। স্বামীর কারাবাসের কালে সে যে স্বামী ও সন্তানকে ত্যাগ করেছিল আরও সুখের আশায়, সেই আশা অকালেই চূর্ণ হয়ে গেলে সে জানতে পেরেছিল স্বামীই তাঁর অবলম্বন। তাই স্বামীর মৃত্যুকালে মোহিনীর পূর্বসংসারে প্রত্যাবর্তন ও কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও মৃত্যু। লেখক নারীর সতীত্বকে এই উপন্যাসে বক্তব্যের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। কেবলমাত্র মোহিনীর প্রায়শ্চিত্তরূপ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এই অভিমত প্রকাশ পায়নি, বসন্তের সঙ্গে কিরণের বিবাহ না হওয়ার পশ্চাতেও লেখকের এই মন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মহেন্দ্র-চরিত্রে লেখক মহত্ত্ব আরোপ করেছেন কিন্তু বিধবা-বিবাহের প্রতি তার অনুদার চিন্তাধারা এবং বসন্তকে একারণে তিরস্কার করার বিষয় তার রক্ষণশীল মনের পরিচায়ক। কর্তব্যনিষ্ঠ স্বজনপালন হিতৈষী রূপে মহেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। মোহিনীর অধঃপতন আকস্মিক। চরিত্রটি এজন্য স্বাভাবিকতা লাভ করেনি। কিরণ আদর্শবাদী ও কর্তব্যসচেতন। কিন্তু দুর্বলচিত্ত। তাই বসন্তের সঙ্গে প্রণয়লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিবাহ করার মানসিক শক্তি তার নেই। স্নেহে প্রেমে কর্তব্যচেতনায় আত্মসম্মানবোধে এবং লেখকের সহানুভূতির স্পর্শে বসন্ত জীবন্ত চরিত্র। পাগলিনী ওরফে শরৎ চরিত্রটি রোমান্টিক। বালবিধবা টেলিগ্রাফ-মাসীর পরচর্চা ও সংবাদদান তার চরিত্রকে স্বাভাবিকতা দান করেছে।

লেখক ঘটনাসংস্থাপনে কৃতকার্য হন নি। আকস্মিকতাই এজন্য দায়ী। প্রকৃতিবর্ণনা, মোকদ্দমার জেরার দীর্ঘ ব... লেখকের মন্তব্য প্রভৃতি কাহিনীর গতিকেও মন্থর করে তুলেছে। রচনারীতি বঙ্কিম-অনুসৃত। পাঠককে আহ্বান, উপন্যাসের চরিত্রের উপর মন্তব্য প্রভৃতি বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। টেলিগ্রাফ-মাসীর রূপবর্ণনার পূর্বে আসমানিকে লেখকের স্মরণ এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত। দীনেশচরণের প্রথম উপন্যাস কুলকলঙ্কিনী সার্থক রচনার গৌরবলাভে বঞ্চিত।

'নিরাশ প্রণয়'[১৭]-এ কৌলীন্য-প্রথার অসারত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন লেখক। উপন্যাসটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন,—'বর্তমান কৌলীন্য-প্রথার অনুরোধে দিন দিন সমাজের যে সকল দুর্গতি ঘটিতেছে, পিতামাতা কৌলীন্য-প্রথার অনুরোধে প্রাণসম কন্যাকে সুপাত্রের করে সমর্পণ করিতে পারিতেছেন না কৌলীন্য-প্রথার রক্ষার কারণ সপত্নী সত্ত্বেও তাহার উপর আবার অনায়াসে কন্যাদান করিতেছেন, এই সকল বিষয় সাধারণকে জ্ঞাত করানই উদ্দেশ্য'। (বিজ্ঞাপন)

নিধুপুর গ্রামের একখণ্ডে জমিদার দীননাথ ঘোষ। অপর খণ্ডে দেবপ্রসাদ। দীর্ঘদিন পরে তাঁর একটি কন্যা হয়। নিধু ধীবর একটি বালিকাকে নিয়ে এলে দেবপ্রসাদ তাকে সন্তানস্নেহে গ্রহণ করে কন্যার মর্যাদা দেন। বৈষয়িক কাজে কলকাতা যাবার কালে নদীতীরে এক অচেতন বালকের জ্ঞানসঞ্চার করে তাকে বাড়ি আনেন। বালক নগেন্দ্রনাথের কাছে, তার পারিবারিক কাহিনী শুনে দেবপ্রসাদ ঝড়ে নিখোঁজ তার মা ও বোনের সন্ধানে লোক পাঠান। সেই গ্রামের উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের গভীর বন্ধুত্ব হয়।

কন্যা সুরজা ও পালিতা কন্যা নীরজার লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন দেবপ্রসাদ। নগেন্দ্র একদিন সুরজাকে জলে ডোবার হাত থেকে রক্ষা করল। সুরজা নগেন্দ্রনাথকে হৃদয়ের গভীরে খুঁজে পেল।

সুরজা নগেন্দ্রকে নিয়ে মনে মনে সুখস্বপ্ন রচনা করে। গভীর রাত্রে উদ্যানে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরজা মিলিত হয়ে, তার সঙ্গে নিজের বিবাহের প্রস্তাব করে। দেবপ্রসাদের কনিষ্ঠা ভগিনী স্বরৎসুন্দরী বৌদিদি অন্নপূর্ণার কাছে নগেন্দ্রের সঙ্গে সুরজার বিবাহের প্রস্তাব করে। এ সংবাদ দেবেন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হলে বংশজের সন্তান নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কৌলীন্যের অনুরোধে, কন্যার বিবাহ দেবেন না জানান। সুরজা নগেন্দ্রনাথকে জানাল মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা। অন্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহের পূর্বদিন সুরজা আত্মহত্যা করল। নগেন্দ্র সুরজার চিতায় ঝাঁপ দিল। শোকে অন্নপূর্ণা মারা গেলেন। উন্মত্তপ্রায় দেবপ্রসাদ কাশীবাসী হলেন। উপেন্দ্রের উদ্যোগে এক নবনির্মিত মন্দিরে নগেন্দ্র ও সুরজার প্রতিমূর্তি স্থাপিত হল। মন্দিরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হল—নিরাশ-প্রণয়।

১৭. নিরাশ প্রণয়, ১২৯৫, পৃ. ২৮৪।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫১—১৯৩১)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত ও পালিতে পণ্ডিত ছিলেন। প্রত্নতত্ত্বের বিশিষ্ট গবেষক প্রাচ্যবিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীনতম পুঁথি চর্যাপদের তিনি আবিষ্কর্তা। সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর 'বাল্মীকির জয়'-এর কিছু অংশ ১২৮৭ সালে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সান্নিধ্যে আসেন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ The Sanskrit Budhist Literature of Nepal গ্রন্থের ভূমিকায় হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজেন্দ্রলালের প্রেরণাই হরপ্রসাদের রচনার উৎস।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মাত্র দুখানি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কাঞ্চনমালা'[১৯]য় অশোকের পুত্র কুণালের উপর অশোকের স্ত্রী তিষ্যরক্ষিতার অধিকার স্থাপনের ইচ্ছা ও পরিণতির বিষয় স্থান পেয়েছে। এবং এই প্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। হরপ্রসাদের ভাষা অবিকৃত রেখে সংক্ষেপে কাহিনীটি উদ্ধার করছি।

পাখী ও ফুলের মিল সুন্দর বটে, কিন্তু যদি ঐরূপ সমবিকশিত সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভিত মানুষের মিল হয়...দুই হাজার বৎসর আগে পাটলীপুত্র নগরে একবার মিলিয়াছিল...একদিন সন্ধ্যার সময়, গঙ্গার তীরে অশোক রাজার প্রমোদকাননে, এইরূপ দুইটি হৃদয় মিলিতে দেখিয়াছিলাম।...

একটি রমণী অপরটি পুরুষ। অশোক রাজার প্রিয়পুত্র, প্রধান সেনাপতি, অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কলাভিজ্ঞ ধর্মানুরাগী কুণাল, রমণীকুলচূড়া, সুশিক্ষিতা, সুপণ্ডিতা প্রেমপূর্ণহৃদয়া কাঞ্চনমালার সঙ্গে আলাপ করিবে?

অভিনয় সত্বর আরম্ভ হইবে· কুণাল ও কাঞ্চনমালা মার ও মারপত্নী সাজিয়া বুদ্ধদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইবেন।...কুণাল বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। যে মারপত্নী সাজিয়া আসিয়াছে, এ কে? গলার স্বরে বুঝিলেন

১৯. কাঞ্চনমালা, ১২৯০ সালে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালে।

কাঞ্চনমালা নহে। দুষ্টা রমণী ক্রমাগত কুণালের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।……

…স্ত্রীলোকটা কী ভাবিতেছিল জানিনা। বোধ হয় ভাবিতেছিল যেদিন অশোক রাজার বাটীতে কুণাল আমার নজরে পড়িয়াছে, সেইদিন অবধি জানিয়াছি যে, রাজপরিবারে এই বৃদ্ধ স্বামীর সংসারে কুণাল বৈ আমার গতি নাই।…

কুণাল বলিল, 'মাতঃ'

এই সম্বোধনটি করিও না। তোমার মুখে ও সম্বোধন বিষবৎ লাগে। তুমি আমায় চরণে রাখ। ….কালই তোমার উত্তরাধিকার দেওয়াইতে পারি।

কুণাল। আমি ইন্দ্রত্বেও স্বীকৃত নহি।—

তি। জানিও তুমি স্ত্রী-হত্যা করিলে, জানিও তুমি মাতৃহত্যা করিলে।

কু। আমি নিদোষ।……

তখন তিষ্যরক্ষিতার মনের ভিতর বসিয়া সুমতি আর কুমতি দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিল।… তিষ্যরক্ষা …..অশোককে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন…অশোক রাজার নামে এক চিঠি লিখিল "ভগবান বুদ্ধ আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে বলিতেছেন।"…

তিষ্যরক্ষা একজন ক্ষৌরকারের কন্যা।……এই সময় বিন্দুসারপুত্র অশোক অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিলেন……রাজা পিঙ্গলবৎসের নিকট শিক্ষার্থ তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। অশোকের ইতিপূর্বে দুই-তিনবার বিবাহ হইয়াছিল।… পিঙ্গলবৎস ক্রোধে অন্ধ হইয়া অশোককে ডাকাইলেন, জোর করিয়া তিষ্য-রক্ষার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন এবং রাজাকে লিখিয়া বলিলেন…… আপনি আপনার পুত্র ও পুত্রবধূকে এখান হইতে লইয়া যান।'……রাধাগুপ্ত চাণক্যের মন্ত্রশিষ্য। ..নাপিতানীও দেখিল রাধাগুপ্তকে হাত করিলে রাজরানী হইবার জোগাড় হইতে পারে। …

অশোক রাজা হইলেন, তিষ্যরক্ষা রানী হইল।.. .. উভয়েরই ভাবিবার অবসর হইল……অশোকের এই ভাবনার ফল বৌদ্ধধর্মাশ্রয় ও জগতে 'অহিংসা পরমো ধর্ম' প্রচার। তিষ্যরক্ষার ভাবনার ফল হইল স্বামীতে তাহার মন উঠিল না।… ..তিষ্যরক্ষা…দেখিল ..কুণাল চলিয়া যাইবার উদ্যোগ

করিতেছেন। তিষ্যরক্ষা হাসিতে হাসিতে কহিল 'তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। যদি না হও তোমার ও কাঞ্চনমালার সর্বনাশ করিব।'……

……রাধাগুপ্ত রানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ আবার কি খেলা খেলিতেছ? বুঝিতেছ নাকি'?…'বুঝিলাম। আপাতত তবে কুণাল আর পরিষ্যরক্ষিতাকে ধরে আনতে হচ্ছে।'

……অশোক ও কুণালের প্রতাপে দাঙ্গাহাঙ্গামা শীঘ্রই শমিত হইল।… তিষ্যরক্ষা যেখানে বৃক্ষ ছিল সেইখানে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইল …উপগুপ্ত এই সভাস্থলে তিষ্যরক্ষাকে অর্হৎ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। · স্থির হইল তিষ্যরক্ষা পাটরানী হইবেন এবং পরিষ্যরক্ষিতা পৌণ্ড্রবর্ধনের দুর্গে অবরুদ্ধ হইবেন।

……একদিন তিষ্যরক্ষা অশোকের পূর্বেকার কেলিগৃহে নানাবিধ বিলাস-সামগ্রীতে পরিপূর্ণ করিল। এবং…প্রকাশ্য আজ্ঞাপত্র দ্বারা কুণালকে ডাকাইয়া পাঠাইল। গৃহমধ্যস্থলে খট্টোপরে অর্ধবিবসনা তিষ্যরক্ষা বিচিত্র অঙ্গরাগে বিভূষিত। তিষ্যরক্ষা আপন অনাবৃত হৃদয় কুণালের পদপ্রান্তে ফেলিয়া পদদ্বয় বেড়িয়া ধরিল। কুণাল তিষ্যরক্ষাকে …· ফেলিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন।· ·তক্ষশীলা হইতে দূত অশ্বারোহণে দ্রুত আসিল। তথায় বিদ্রোহ হইয়াছে। কুণালই এই বিদ্রোহ-শান্তি নিমিত্ত সর্বপ্রধান সেনাপতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।·· কাঞ্চনমালা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন…তিনি দেখিলেন, কুণালের অভ্রভেদী ধ্বজের উপর একটি শকুনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।…

·যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই কুণাল বিদ্রোহীদের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। ক্রমাগত ভাবনায় ও ক্রমাগত পরিশ্রমে অশোক রাজার বহুমূত্ররোগ উপস্থিত হইল। ··তিষ্যরক্ষা দিন নাই রাত্রি নাই রাজা অশোকের সেবা করিতে লাগিলেন। রাজা বর দিতে চাহিলেন। সে প্রার্থনা করিল যে, আমি একাকী একবৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্য শাসন করিব। অশোক সম্মত হইলেন।·· দুই জন চণ্ডাল রাজপত্র হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রথম চণ্ডাল কুণালের চক্ষে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া বাম চক্ষুটি উৎপাটন করিল। কুণাল তখন—

'ধর্মং শরণং গচ্ছামি'

'সংঘং শরণং গচ্ছামি'

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'

বলিতে লাগিলেন। প্রথম চণ্ডাল কুণালের অপর চক্ষুটিও উপাড়িয়া লইল।

কাঞ্চনমালা সেই রজনীযোগেই তক্ষশীলা যাইবার পথ আশ্রয় করিল। বিজ্ঞানবিৎ আপন বস্ত্রমধ্য হইতে একটি বাক্স লইয়া রানীর হস্তে দিল। তিষ্যরক্ষা শিহরিয়া উঠিল, বাক্সটি খুলিল, খুলিয়া চক্ষু দুইটি বাহির করিল···সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত করিয়া পদতলে দলিত করিল।...স্বামী বন্দী হওয়ার সংবাদ পাইয়া অবধি কাঞ্চনের মনেব স্ফূর্তি ছিল না। কাঞ্চনমালা আপন কুটীরে বসনভূষণ পরিত্যাগ করিলেন, শাক্য ভিক্ষুণী সাজিলেন।···কাঞ্চন স্বামীর কোন সন্ধান পাইলেন না। কাঞ্চন বায়ুবেগে·· এক কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং এই আসিয়াছি নাথ!' বলিয়া সেই কূপে পড়িলেন। কাঞ্চন·· চাহিয়া দেখেন কুণালের চক্ষুবিবরে চক্ষু নাই।

·· অশোকরাজা রাত্রিতে তক্ষশিলায় আসিয়া পুত্রবধুর গুণে দেশে শান্তির আবির্ভাব দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুণাল, তোমাব এ দশা কে করিল?' কুণাল কোন কথা বলিলেন না।

কুঞ্জরকর্ণ মিষ্টি মিষ্টি করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিল 'সেনাপতি অশোক! যাহাকে রাজেশ্বরী করিয়াছ, সে ভ্রষ্টা, সে-ই তোমার পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করাইয়াছে, সে বৌদ্ধ নহে, সে হিন্দু · অশোক রাজা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, অদ্য হইতে আমি নিজ রাজ্যভার গ্রহণ কবিলাম।···পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমেই তিষ্যরক্ষাকে বিচারালয়ে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। কাঞ্চনমালা রাজাকে বলিলেন, 'পিতঃ! ইনি এখন উন্মাদ পাগল।···আমি উহার উন্মাদ উপসম কবিব ও ধর্মপথে উহার মতি লওয়াইব।'

প্রতিহারী সংবাদ দিল বিজ্ঞানবিৎ আসিয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কেন আসিয়াছ?'

'আমি একের চক্ষু অন্যের চক্ষে লাগাইয়া দিতে পারি।'···শেষ বৌদ্ধ চণ্ডাল আপন গুরুর জন্য আপন চক্ষু উপড়াইয়া দিল। কুণালের যেমন চক্ষু ছিল, আবার তেমনি চক্ষু হইল।

রাজা কুণালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুণাল! তুমি বোধিসত্ত্ব··যদি তোমার কোন অভীষ্ট আমার দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে, বল, আমি এখনই

করিব।…কুণাল বলিলেন…তক্ষশিলায় সদ্ধর্ম প্রচার হয় নাই। আর আমায় তক্ষশিলায় ধর্মাধ্যক্ষ করিয়া দেন।'

এই দিবসে যে কার্য হইল, তাহার বলে এক হাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এশিয়া এই দিনের কার্যবলে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে।

শুনা গিয়াছে তিষ্যরক্ষা কাঞ্চনের অনুগ্রহে আপনার ঋদ্ধিমতী নাম সার্থক করিয়াছিল।

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা একবাক্যে স্বীকৃত হয়নি। বৌদ্ধ-ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে এই ধরনের কাহিনীর জনশ্রুতি অসম্ভব নয়। এই জাতীয় জনশ্রুতি ও প্রচলিত বৌদ্ধ কাহিনীগুলি নির্ভর করে, লেখক এই উপন্যাসের কাহিনী গ্রহন করেছেন বলে মনে হয়। হরপ্রসাদ 'জাতক-কাহিনী'র ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে অনেকটা নিঃসংশয় ছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। কুণাল, মহেন্দ্র, জলৌকা এবং তিবর নামে অশোকের চার-পুত্র ছিলেন। মহেন্দ্রকে অশোকের ভ্রাতা বলেও কেউ কেউ মনে করেন। অশোকের একাধিক স্ত্রী ছিল বলে জানা যায়। তাঁদের মধ্যে দেবী, অসন্ধি-মিত্রা, কারুবাকী (চারুবাকী) ও তিষ্যরক্ষিতা। পরিষ্যরক্ষিতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে। হিন্দু অশোক পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। হরপ্রসাদ পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার বিষয়ই কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

উপন্যাসটির শুরু সুন্দর। অশোকরাজের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ উপলক্ষে অভিনয়ের আয়োজন। এবং এই অভিনয়কে কেন্দ্র করে তিষ্যরক্ষিতার কুণালকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা। গ্রন্থের নাম 'কাঞ্চনমালা' হলেও কাঞ্চনমালা অপেক্ষা তিষ্যরক্ষিতার ভূমিকাই উপন্যাসে প্রধান। কাঞ্চনমালার সতীত্বের আদর্শ ও নৈতিক পবিত্রতা, তিষ্যরক্ষিতার তুলনায় তার চরিত্রকে মহত্ত্বদান করেছে। এই জাতীয় আদর্শের স্বীকৃতির স্বাক্ষর রয়ে গেছে গ্রন্থটির নামকরণে[২০]।

আদর্শের জয়গান রচনায় হরপ্রসাদ তাঁর গুরু বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুসরণ-করেছেন। শিল্পরীতির ক্ষেত্রে ও চরিত্রসৃষ্টিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়।

২০ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নাম 'শৈবলিনী' না হবার কারণ অনেকটা এইরকম।

দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে মানসিক যন্ত্রণাকাতর তিষ্যরক্ষিতার পাগল হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি অনায়াসেই শৈবলিনীর (চন্দ্রশেখর) প্রায়শ্চিত্তের প্রতিক্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বামী থাকা সত্ত্বেও পরপুরুষের প্রতি আসক্তি ও তজ্জনিত পতন এবং পুনরায় মানসিক সংকটের ধাপ পার হয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের ধারাটি, তিষ্যরক্ষিতা ও শৈবলিনী উভয় চরিত্রের—মধ্যেই বর্তমান। তবে তিষ্যরক্ষিতার প্রণয়ীর প্রতি প্রতিহিংসামূলকতার দিকটি শৈবলিনীর চরিত্রে অনুপস্থিত। তিষ্যরক্ষার পরিণতিও বঙ্কিম-অনুসৃত। হীরা (বিষবৃক্ষ) ও তিষ্যরক্ষিতার মধ্যে পার্থক্য ক্ষীণ। সিদ্ধান্ত-গ্রহণের পূর্বে তিষ্যরক্ষিতার মনে 'কু ও সু'-এর দ্বন্দ্ব, (সুমতি বলিল, 'কেমন সতীনপোর কাছে গিয়েছিলে, উচিত শাস্তি হয়েছে? কু। একদিনেই কি আশা ছেড়ে দিতে হবে না কি?" ··ইত্যাদি) বঙ্কিম-রীতি-অনুসৃত।

ভাষাপ্রয়োগে ও বর্ণনারীতিতে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে পিছিয়ে আছেন। বঙ্কিমের রচনার প্রসাদগুণের তুলনায়, হরপ্রসাদের রচনা অনেকটা ম্লান ও আড়ষ্ট।

কাঞ্চনমালা ও কুণাল চরিত্রদ্বয় লেখকের সহানুভূতি ও আদর্শের বর্ণে চিত্রিত। কাঞ্চনমালার চরিত্রবিকাশের ধাপগুলি উন্মোচিত হবার অবকাশ পায়নি। হরপ্রসাদের আদর্শতাড়িত মনেব প্রভাবপুষ্ট কাঞ্চনমালার চরিত্রটি স্বাভাবিকতা লাভ করতে পারেনি। কুণাল চরিত্রও দ্বন্দ্বাতীত। একটি বিশেষ আদর্শের ভাবকল্পনায় রচিত। স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য, বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং সেজন্য নিঃসংকোচে কঠিনতম ঃখভোগ তার চরিত্রকে একটি বিশেষ বর্ণদান করেছে।

আদর্শনিষ্ঠ বৌদ্ধ হিসাবে তার আচার ও আচরণে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠার দিকটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। বিদ্রোহদমনান্তে সে বিদ্রোহীদের ক্ষমা করে। তার চক্ষু উৎপাটনকালে সে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণগ্রহণমূলক মন্ত্র উচ্চারণ করে। কূপের মধ্যে পতিত থাকাকালেও ঐ মন্ত্র তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। লেখকের আদর্শবাদ প্রতিফলিত হয়েছে কুণাল-চরিত্রের মধ্যে। তবে, কাঞ্চনমালা ও কুণাল-চরিত্র দুটি সমান্তরাল রেখায় সমাপ্ত। তিষ্যরক্ষার চরিত্রে দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে ও সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে কুণালকে বশীভূত করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে চরম

প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। তারপর মানসিক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে সে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে উঠে, ধার্মিকা নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তিষ্যরক্ষার সঙ্গে শৈবলিনীর সাদৃশ্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিষ্যরক্ষার চরিত্রটি পাঠকের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজা অশোক এই উপন্যাসের ঘটনাবলীর যেন পশ্চাৎভূমিতে রয়ে গেছেন। 'ক্ষমা' উপন্যাসটির প্রাণবিন্দুরূপে ঘটনার গভীরে সঞ্চারিত হয়েছে।

এই উপন্যাসটির রচনায় হরপ্রসাদ বিশেষ সাফল্যের অধিকারী না হলেও উপন্যাসের বিষয়ভূমিতে তিনি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।[২১]

২১. অপর উপন্যাস, বেণের মেয়ে, ১৩২৬।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩ ১৯০৭)।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাসরচনায় দামোদর মুখোপাধ্যায় জনচিত্তজয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আজ দামোদর মুখোপাধ্যায় বিস্মৃত ঔপন্যাসিক। সাহিত্যসেবী দামোদরের রচনাবলীর মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যাই বেশী। দামোদর প্রবাহ (মাসিক), অনুসন্ধান (পাক্ষিক), নিউজ অব দি ডে (ইংরাজী দৈনিক) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'স্বদেশী'[১] পত্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, —'দামোদরবাবু কেবল সাহিত্যসেবী ছিলেন না, সাহিত্যজীবীও ছিলেন। সমগ্রজীবন তিনি সাহিত্যচর্চাতেই ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

'তাহার ন্যায় স্বদেশহিতৈষী একান্ত দুর্লভ। যেদিন হইতে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে সেইদিন হইতে একমাত্র ঔষধ ব্যতীত তিনি সর্ববিধ বৈদেশিক দ্রব্যের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। দামোদরবাবুর হিন্দুধর্মে গাঢ় অনুরাগ ছিল।' দামোদরের শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (১মখণ্ড, ১৮৯৩) ও ঈশ উপনিষদ (১৯০)-এর অনুবাদ তৎকালে সমাদৃত হয়েছিল।

দামোদর বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন।[২] তার মানসিকতা ও চিন্তাধারা অনেকটা বঙ্কিম আদর্শ-অনুসারী।

দামোদরের প্রথম উপন্যাস 'মৃন্ময়ী'[৩] বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার (১৮৬৬) পরিশিষ্ট বিশেষ। এই উপন্যাসরচনায় দামোদর বৈচিত্র্যসৃষ্টির চেষ্টা করলেও কাহিনী গ্রন্থনে গতানুগতিকতার পথ গ্রহণ করেছেন। কপালকুণ্ডলা পাঠের পর কৌতূহলবশত মৃন্ময়ী পাঠে মনোযোগ দিলে ও উভয় উপন্যাস সমান তৃপ্তিদায়ক বলে মনে হয় না। দামোদরের প্রতিভার দীনতাই এজন্য দায়ী বলে মনে হয়। মৃণ্ময়ীর সমস্ত চরিত্রই কিছু না-কিছু গুণবিশিষ্ট। একমাত্র রহিম ছাড়া আর কোনও দুষ্টচরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

পদ্মাবতী নবকুমারের কাছে আত্মনিবেদন করে। বন্ধু উমাপতির

১ শ্রাবণ ১৩১৪ (দ্রঃ সা সা চ. মা অষ্টম খণ্ড)

২ সামাজিক সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক ছিলেন (ভ্রাতুষ্পুত্র সতীশচন্দ্রের শ্বশুর)।

৩. মৃন্ময়ী, ১৮৭৪, পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত, পৃঃ ১৫৪।

পরামর্শমত নবকুমারের সঙ্গে পদ্মাবতীর মিলন হয়। নবকুমার তাকে পত্নীরূপে স্বীকৃতি দেয়। গোপালপুরের অরণ্যপথে উমাপতি যে মেয়েটিকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করলেন, সে ক্রমশ উমাপতির হৃদয়ে স্থান পেল। মুক্তকেশীকে তার বাবা কালিদাস ভট্টাচার্যের কাছে পৌঁছে দিল সে। উমাপতির মামা হরিহর রায়ের কাছে কালিদাস ভট্টাচার্য মুক্তকেশীর সঙ্গে উমাপতির বিবাহের প্রস্তাব করলে, অনুমোদিত হল। উমাপতি শত্রুহস্তে পড়লেন।

লুৎফার পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর, মেহেরউন্নিসা ও নূরজাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। বাদশাহকে সে জানাল যে, সে পরস্ত্রী।

সপ্তগ্রামের অরণ্যমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে ব্রাহ্মণবেশী লুৎফা যে আংটিটি দিয়েছিলেন, সেটি একটি ভিখারীর কাছ থেকে দশটাকার বিনিময়ে চেয়ে নিলেন।

এদিকে শ্যামা নবদ্বীপে, স্বামী মথুরানাথকে শুশ্রূষা করে, সুস্থ করে তুললেন। উভয়ে দাম্পত্য-জীবনে পুনর্মিলিত হলেন। অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে নবকুমার তাকে কপালকুণ্ডলার মৃত্যুর কথা জানাল। একদিন নবকুমার মথুরানাথ ও অধিকারী বনপথে ভ্রমণকালে মুমূর্ষু কাপালিকের মুখে শুনলেন, সতীলক্ষ্মী কপালকুণ্ডলা যশিপুরে আছে। বাদশাহ নবকুমারকে লক্ষ মুদ্রার আয়বিশিষ্ট একটি জায়গির দিতে চাইলেন।

উমাপতিকে দস্যু রহিমের হাত থেকে রক্ষা করল দেলবর। পরে জানা গেল সে উমাপতির ভাই,—নাম গোপালকৃষ্ণ রায়।

পীড়িত পদ্মাবতী নবকুমারকে বাদশাহের সঙ্গে মৃত্যুশয্যায় সাক্ষাতের বাসনা জানালে, নবকুমারের ব্যবস্থামত বাদশাহের সঙ্গে পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হল। পদ্মাবতী বাদশাহের কাছে দোষ স্বীকার করলে, 'জাহাঙ্গীর বাক্যহীন পুত্তলীপ্রায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।'

যশিপুরে নবকুমার একগৃহস্থের ছাদে, আলুলায়িতাকুন্তলা একটি পরমা সুন্দরী যুবতী নারীকে দেখে অচেতন হয়ে পড়লেন। এর কিছুকাল পরে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার পুনর্মিলন হল। সকলেই সুখী হলেন। উমাপতির সঙ্গে মুক্তকেশীর বিবাহ হল।

এই উপন্যাসে লেখক কপালকুণ্ডলার পরবর্তী ঘটনার কল্পিত রূপদান করেছেন। কপালকুণ্ডলার কয়েকটি চরিত্র ছাড়া লেখক আরও কয়েকটি

চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। উমাপতি-মুক্তকেশী কাহিনী এই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেছে। কপালকুণ্ডলার পরিণতিতে দেখি কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের নদীগর্ভে পতন। এবং 'কোথায় গেল' এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। এখানে নদীতীরে নবকুমারের সঙ্গে পদ্মাবতীর সাক্ষাৎকার ও পুনর্মিলন এবং পদ্মাবতীর মৃত্যুর পর নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার মিলনদৃশ্য রচিত হয়েছে। মতিবিবি অনুতাপের আগুনে শুদ্ধ, সতীধর্মসিদ্ধস্বামিগতপ্রাণা নারীতে রূপান্তরিত। উমাপতি-উপাখ্যান এই উপন্যাসে অনেকখানি স্থান দখল করেছে। মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের প্রণয় যতই আন্তরিকতাপূর্ণ হোক না কেন উভয়ের স্বামী-স্ত্রীরূপে পুনর্মিলনের পথ যে রুদ্ধ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই লেখক এই প্রণয়-সমস্যার সহজ সমাধান করেছেন, মতিবিবির মৃত্যু। মতির মৃত্যুকালে দিল্লীশ্বরের উপস্থিতি, এবং দিল্লীশ্বর কর্তৃক নবকুমারকে জায়গিরদানজাতীয় ঘটনা চমকপ্রদ। নবকুমার উপন্যাসে একটি প্রণয়কাতর দুর্বল পুরুষে পরিণত হয়েছে। যে নৈতিক চেতনা কপালকুণ্ডলায় নবকুমারকে মতিবিবির কাছ থেকে সরিয়ে এনেছিল, তজ্জাতীয় চেতনার অবলুপ্তি মৃণ্ময়ীর নবকুমারের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। একটি স্পর্শকাতর প্রণয়ীরূপে নবকুমারের চরিত্র এই উপন্যাসে অত্যন্ত লঘু বলে মনে হয়। শ্যামার স্বামীলাভ এই উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঘটনা-সংস্থাপনে আকস্মিকতা ও প্লটের শৈথিল্য উপন্যাসটিকে সার্থক শিল্পের মর্যাদা-দানে বিরত রেখেছে।

'জ্ঞানাঙ্কুর'[৪]-এ 'মৃণ্ময়ী'র দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক বলেছেন,—'মৃণ্ময়ী যখন কপালকুণ্ডলার উপসংহার-ভাগ, তখন কপালকুণ্ডলার কেন্দ্রই মৃণ্ময়ীর কেন্দ্র হওয়া উচিত। তাহা হয় নাই।...

কপালকুণ্ডলার নায়ক নবকুমার শর্মা, মৃণ্ময়ীর নায়ক তাঁহার বন্ধু।··

দামোদরবাবুর নবকুমার মানুষ নহেন তিনি, হয় দেবতা না হয় পিশাচ।···

'দামোদরবাবুর হাতে পড়িয়া, নবকুমার শর্মা, যেমন বিকৃত হইয়াছেন, তেমনি অনেকে হইয়াছেন। পদ্মাবতীতে কই আর সে গর্ব নাই। দস্যুদল সম্বন্ধে যত কথা লিখিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে 'আমার গুপ্তকথা' নামক সুদীর্ঘ উপন্যাসবর্ণিত দস্যুদলের বিচরণের অনেক সাদৃশ্য আছে। পাপের জয় দেখিতে

৪. জ্ঞানাঙ্কুর, চৈত্র ১২৮১, পৃ. ২৩২—৩৮; সমালোচক—শ্রী. চ. সে. মু।

আমরা নারাজ। সাধুর অধঃপতন দেখিতে আমরা ততোধিক নারাজ। যে গ্রন্থকার, এ সকল দেখাইতে আসেন, তাঁহার উপর আবার ততোধিক নারাজ।'

মৃণ্ময়ী কপালকুণ্ডলার অক্ষম অনুস্মৃতি।

দামোদরের দ্বিতীয় উপন্যাস 'বিমলা'[৫] একটি সামাজিক উপন্যাস। 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখক বলেছেন, বিমলা উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রচারিত করিয়া সাহিত্য-সংসারে অধিকতর ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলাম। ইহাতে উপন্যাসের চাতুর্য নাই, রচনার পারিপাট্য নাই, কুত্রাপি কবিত্বের সমাবেশ নাই। ফলতঃ ইহার রচনা, ভাব, ভাষা কিছুই আমার তৃপ্তিসাধন করে নাই। এরূপ গ্রন্থ প্রচার করা নিতান্ত অসমসাহসিকতার কার্য।

বিমলার নাম পত্রে, 'আখ্যায়িকা' বলে উল্লিখিত হলেও 'বিজ্ঞাপনে' লেখক উপন্যাস বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থ সম্পর্কে 'বিজ্ঞাপনে' লেখকের বিনয় 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এ 'মৃণ্ময়ী'-র সমালোচনার কারণ বলে অনুমান করা যায়। বিমলার অধিকাংশ 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত হয়।

বিমলার সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের প্রণয় দীর্ঘকালের। বিমলার পিতা রামকুমার বন্ধু গঙ্গাগোবিন্দের কাছে অবন্তীপুরে শিশুকালে বিমলাকে রাখেন। গঙ্গা-গোবিন্দের পুত্র যোগেশের সঙ্গে বিমলার প্রণয় জন্মে। অবন্তীপুরের জমিদার সমাজপতি বরদাকান্ত রায়, তার ত্রিশ বৎসর বয়স্ক শ্যালক রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিমলার বিবাহের প্রস্তাব আনলে রামকুমার তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে রামকুমার সমাজচ্যুত হলেন। বিমলার বয়স যখন বারো, তখন রামকুমার মারা গেলেন। বিমলা ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করলে যোগেশ তাকে চিঠি দিল বিবাহের প্রস্তাব জানিয়ে। দীর্ঘপত্রে বিমলা আপত্তি জানিয়ে উত্তর দিল। বরদাকান্তের দুশ্চরিত্র পুত্র রুদ্রকান্তের চাতুর্যে বিমলা একটি গৃহে অবরুদ্ধ হলে, প্রতিবেশিনী কুসুমের চিঠিতে যোগেশ এই সংবাদ পেল। রুদ্রকান্তের সঙ্গে যোগেশ সাক্ষাৎ করে অপমানিত হল। বরদাকান্তের সঙ্গে গঙ্গাগোবিন্দ দেখা করে, প্রতিকার প্রার্থনা করলে ফলস্বরূপ তাঁর 'গো-শালা, রন্ধনশালা নিবাসগৃহ সমস্ত এককালে ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল।'

ঘটনাচক্রে নদীতীরে মৃতপ্রায় যোগেশের সঙ্গে মনোরমা ও নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ

৫. বিমলা (আখ্যায়িকা), ১৮৭৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৫+১ (উপসংহার)=১৯৬, মোট ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ, শেষে উপসংহার।

হলে, মনোরমার শুশ্রূষায় যোগেশ সুস্থ হয়ে উঠল। যোগেশ জানল মনোরমার অকালবৈধব্য ও নরেন্দ্রের সঙ্গে তার প্রণয়ের কথা। নরেন্দ্র জানাল বলরাম-পুরের কুঠিতে অবরুদ্ধ বিমলার খবর। রুদ্রকান্তের চেষ্টায় রামকৃষ্ণের মামার সঙ্গে বিমলার বিবাহের পূর্বক্ষণে সে যোগেশের কথা স্মরণ করে, পিঁড়ি দিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করল। 'তাঁহার আঘাতকার্য শেষ হইতে না হইতে প্রকোষ্ঠের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইল এবং ব্যস্ততাসহকারে যোগেশ প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন।'

বিমলা সুস্থ হয়ে উঠল ক্রমশ। সরমার স্বামী কেশব, নরেন্দ্র-মনোরমার বিবাহের কথা জানালেন এবং সরমা জানালেন, যোগেশ ও বিমলার অবন্তীপুরে আসন্ন বিবাহের কথা। মালতী মৃত্যুকালে স্বামীর দর্শন প্রার্থনা করলেও রুদ্রকান্ত এল না। মালতী মারা যাবার পরে স্ত্রীর শোকে ও অনুশোচনায় সে পাগল হয়ে গেল।

তারপর মনোরমা-নরেন্দ্র, যোগেশ-বিমলার বিবাহ ও সুখে জীবনযাপন।

এই উপন্যাসে তিনটি প্রণয়-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। সরমা-কেশব (বিবাহিত যুগল) নরেন্দ্র-মনোরমা (অবিবাহিত-বিধবা) ও যোগেশ-বিমলা (প্রাক্-বিবাহ)। নায়ক-নায়িকা যোগেশ ও বিমলার প্রণয়বৃত্তান্ত ও পরিণতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অপর দুই প্রণয়ীযুগল ঘটনাচক্রে উপস্থাপিত হয়েছে। একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, এই প্রণয়ীযুগলেরা প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্বয়ংপ্রভ। নিজ নিজ প্রণয়ী প্রণয়িনী নির্বাচন এঁরা নিজেরাই করেছেন। তাঁদের প্রণয়ের পথে কোনও সামাজিক বাধানিষেধ আরোপিত হয়নি। কিংবা প্রণয়কর্মে কোন সামাজিক কুৎসা রটিত হয়নি। যদিও সমাজভয় তাদের মনে ছিল। বিবাহের ক্ষেত্রে সামাজিক অনুমোদনও সহজভাবে লব্ধ হয়েছে। বিবাহপূর্ব প্রণয়কর্ম চিত্রণে এত স্বাধীনতা গ্রহণ করতে ইতিপূর্বে কোন লেখককে দেখা যায় নি। এ জাতীয় প্রণয়-চিত্রণের ক্ষেত্রে আলিঙ্গন চুম্বন কিছুই বাদ যায়নি। বিমলা যোগেশের প্রণয়-কথা সর্বজ্ঞাত। সেজন্য উভয়ের মেলামেশা ও আচার-আচরণে তৎকালীন সমাজপ্রেক্ষিতে যে স্বাভাবিক সংকোচ থাকা উচিত ছিল তা না থাকায় তাদের আচরণে কিছুটা নির্লজ্জতার পরিচয় মেলে। বিধবা মনোরমার সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রণয় ও উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে পরিণয়ে পরিণতির পথে কোন সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না।

এই উপন্যাসে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায় তা দুর্নীতিপূর্ণ। পুত্রের অসামাজিক আচরণে সম্পদশালী সমাজপতির সমর্থন এবং বিরোধিতায় কিংবা প্রতিবাদে ক্ষতিসাধন (গঙ্গাগোবিন্দের গৃহে অগ্নিসংযোগ কিংবা বিনা কারণে সমাজচ্যুতি, বরদাকান্তের নির্দেশে রামকুমারের সমাজচ্যুতি প্রভৃতি ঘটনা) তৎকালীন গ্রাম্যসমাজ-জীবনের দুর্নীতির চরম স্বাক্ষর বহন করে।

উপন্যাসের মধ্যে স্থানে স্থানে লেখকের মন্তব্য গল্পরসকে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নীতিমূলক হয়ে উঠেছে। যথা, স্ত্রী মালতীর প্রতি রুদ্রকান্তের অত্যাচারের পর 'পরিণয় সম্বন্ধীয়' আলোচনা, সীমন্তিনীদের প্রতি দরদপূর্ণ মন্তব্য ইত্যাদি।

সুখী দম্পতি হিসাবে সরমা ও কেশবের ভূমিকা মনোরম। নরেন্দ্র, মনোরমার প্রণয়ীরূপে এই উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল চরিত্র। তার প্রণয়-চেতনার বলিষ্ঠতা, নিষ্ঠা, কর্তব্য ও আদর্শ তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশেষ। নরেন্দ্র ডুবার মনোরমাকে আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করে এবং তাকে চিরজীবনের জন্য গ্রহণ করার সংকল্প জানিয়ে মনোরমার বিশ্বাস যেমন অর্জন করেছে, তেমনি চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় রেখেছে। মনোরমার প্রণয়নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সংস্কারজনিত লোকলজ্জা তাঁর মিলনের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। যোগেশের সঙ্গে তার পরিচয়, নরেন্দ্রের সঙ্গে তার মিলন সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছে। বহুগুণের আধার যোগেশের চারিত্রিক দীপ্তি নরেন্দ্রকে যেন ম্লান করে দেয়। রুদ্রকান্তের ভূমিকা এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মিলনের সহজ পথটিতে জটিলতার সৃষ্টি করে কাহিনীর বৈচিত্র্য বিধান করেছে। স্ত্রীর প্রতি অপরাধ ও অবিচারের গুরুত্ব বোঝার পরে অনুতাপী অপরাধী রুদ্রকান্তের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণের পূর্বসূত্র না থাকায় ঐ বিকৃতি অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। দামোদরের পরবর্তী উপন্যাস 'দুই ভগ্নী'র কমলিনী চরিত্র এই জাতীয়।

বিমলার নূতন সংস্করণে[৬] বইটির কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৬) পরিচ্ছেদের নীচে শিরোনামের সংযুক্তি ছাড়া কোন বিষয়গত পরিবর্তন ঘটেনি।

৬. নূতন সংস্করণ ১৩০৯, ভূয়া বিবাহসভায় কেশবের বক্তৃতায় ব্রাহ্মদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে। মনোরমাকে বিধবা দেখান হয় নি, শুরু থেকেই নরেন্দ্রকে তার স্বামীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। নূতন চরিত্রগুলির মধ্যে কৃষ্ণগোবিন্দ অন্যতম।

'দুই ভগ্নী'[৭] তে দামোদর একটি সুখী বিবাহিত দম্পতির জীবনের ক্ষেত্রে প্রণয়তৃষাতুরা একটি বিধবার আশা-আকাঙ্ক্ষা যুক্ত করে, কাহিনীকে জটিলতার আবর্তে নিক্ষেপ করেছেন।

যোগেন্দ্র ও বিনোদিনীর প্রণয়-মধুর বিবাহিত জীবনে জটিলাবর্তের সৃষ্টি করল অষ্টাদশী বিধবা কমলিনী। কমলিনী যোগেন্দ্রকে ভালবাসে। যোগেন্দ্র, বিনোদিনী ও কমলিনীর পিতা রামনারায়ণ রায়ের পালিত পুত্র। সে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। বাড়ির ঝি, কমলিনীকে অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে। বিনোদিনীকে লেখা যোগেন্দ্রের চিঠিগুলি মাধী ডাকঘর থেকে এনে কমলিনীকে দেয় এবং পাঠান্তে নষ্ট করে ফেলে। মাধী ও কমলিনী যোগেন্দ্র সম্পর্কে বিনোদিনীর মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করলে সে জ্ঞান হারায়।

যোগেন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিনোদিনীর চিঠির উত্তর না পেয়ে বন্ধু সুরেশের সাহায্যে রেজিস্টারী করে চিঠি পাঠায়। মাধীর পরামর্শে কমলিনী আসে যোগেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে। সে যোগেন্দ্রকে জানায় যে, বিনোদিনী অন্তঃসত্ত্বা। কমলিনী লোভের আগুনে ঝাঁপ দিতে বদ্ধপরিকর হয়। বিনোদিনী অন্তঃসত্ত্বা নয়, মাধীর কাছ থেকে এখবর পেয়ে যোগেন্দ্র আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। কমলিনী যোগেন্দ্রকে পরোক্ষভাবে প্রণয় জ্ঞাপন করে এবং বিনোদিনী সম্পর্কে মিথ্যাপ্রচারে যো. ন্দ্রকে বিভ্রান্ত করে।

এদিকে বিনোদিনীকে কমলিনী জানায়, যোগেন্দ্র 'বারনারীর দাসবৎ'। মাস্টারমশায় হরগোবিন্দকে, বিনোদিনী কমলিনীর চিঠিগুলি দেখালেন। কমলিনী যোগেন্দ্রের ভালোবাসা অর্জন করে। যোগেন্দ্র স্ত্রীকে কুলটা মনে করে এবং মাধীর সাহায্যে জানে যে, হরগোবিন্দ বিনোদিনীর 'হৃদয়বল্লভ'। যোগেন্দ্র বাড়ি এল বিনোদিনী তাকে হৃদয়েশ বলে পায়ে পড়লে, বিনিময়ে সে পায় পদাঘাত। যোগেন্দ্র মনোযন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে, কমলিনী এসে পড়ে, বিনোদিনীর চরিত্র সম্পর্কে বক্র ইঙ্গিত করে এবং যোগেন্দ্রকে প্রণয় জ্ঞাপন করে প্রত্যাখ্যাত হয়।

যোগেন্দ্র হরগোবিন্দকে খুন করবে বলে ভয় দেখায়। শেষে হরগোবিন্দের

৭. THE TWO SISTERS (A STORY) BY DAMODAR MUKHERJI
দুই ভগ্নী (উপন্যাস) ইং ১৮৮১, পৃঃ ১৩৩।

কাছ থেকে প্রাপ্ত বিনোদিনীকে লেখা কমলিনীর চিঠিগুলি পড়ে, কমলিনীর প্রতি তার মন বিষিয়ে যায়। যোগেন্দ্র বিনোদিনীর কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলে।

বিনোদিনী মাধবীর সাহায্যে বিষ এনে পান করল। মাধবী লজ্জায় জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। যোগেন্দ্র বিনোদিনীর শীতল ওষ্ঠ চুম্বন করে মৃত্যু বরণ করল। কমলিনী পাগল হয়ে গেল। 'তাহার পর রায়েদের এই সোনার সংসার ছাই হইয়া গেল।'

একটি ত্রিভুজ-প্রণয়বৃত্তান্ত কাহিনীর কেন্দ্রে অবস্থিত। এই জাতীয় কাহিনীর পূর্বসূত্র পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শৈশব-সহচরী' (১৮৭৮)তে পাই। সমকালে রচিত এই জাতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত অপর উপন্যাস রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হিরণ্ময়ী' (১৮৮০)। বিধবা কমলিনী লালসাময়ী। ভগ্নিপতির উপর আসক্তিজনিত দুর্বলতার মূলে আছে তার লালসা। তার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সে ছলনা, মিথ্যা ও কাপট্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। সে তার আচরণের পশ্চাতে যুক্তি দেয়, 'কোন রমণী এ লোভ দমন করতে পেরেছে? আমিও অদম্য আকাঙ্ক্ষা কখন দমন করিতে পারিব না।' যোগেন্দ্রের চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব লক্ষণীয়। ঝির কাছে স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে সংবাদগ্রহণ ও বিশ্বাসজনিত দুর্বলতা তার বিড়ম্বনার অন্যতম কারণ। আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে অন্তর্বেদনা থেকে মুক্তির চেষ্টা এবং কমলিনীর কাছে তা অস্বীকার, হরগোবিন্দের দেওয়া বিনোদিনীকে লেখা কমলিনীর পত্রগুচ্ছদর্শনে তার মানসিক চাঞ্চল্য, অনেকটা মনস্তত্ত্বসম্মত। মাধবীর চরিত্রে হীরার (বিষবৃক্ষ) প্রভাব স্পষ্ট। বিনোদিনীর স্বামিপ্রেম উজ্জ্বল। ঘটনা-সংস্থাপনে নাটকীয়তা উল্লেখযোগ্য।

ঘটনা-সংস্থাপনে বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হরগোবিন্দের সঙ্গে বিনোদিনীর কথাবার্তা আড়াল থেকে সন্দেহাতুর যোগেন্দ্রের শ্রবণ ও তজ্জনিত মনোভাবের সঙ্গে 'কপালকুণ্ডলা'য় বনমধ্যে ব্রাহ্মণবেশী যুবকের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার কথোপকথনকালে নবকুমারের শ্রবণ ও মনোভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যোগেন্দ্রের স্বপ্ন অনেকটা কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নের মত।

যোগেন্দ্রকে কমলিনী প্রণয় জানালে, যোগেন্দ্র জানায়, সে অপাত্রে প্রণয় জানিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বসন্তকুমারের পত্র' (১৮৮২) এর নীলাব্জিকার প্রতি বসন্তকুমারের উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়।

যোগেন্দ্রের মৃত্যু অনেকটা নাটকীয়। এ যেন রোমিওর মৃত্যু। জুলিয়েট-রূপিনী বিনোদিনীর বিষাক্ত অধরে অধরসংযোগজনিত মৃত্যু।

'আর্যদর্শনে'[৮] দুই ভগ্নী সমালোচিত হয়। সমালোচক বলেছেন, 'সামাজিক কুরীতি বঙ্গসমাজের বক্ষে কি ভীষণ পদাঘাত করিতেছে। বিধবারা বিবাহার্থিনী কিন্তু কঠোর সমাজ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার ফল কি হয়? বিষপান আত্মহত্যা।

'দামোদরবাবুর এই আখ্যানের ঘটনাযোজনা মনোরম হইয়াছে, এবং ইহা অধ্যয়ন করিয়া অনুপম আনন্দ পাইয়াছি।'

'প্রতাপসিংহ[৯]' ঐতিহাসিক উপন্যাস। হিন্দু জাতীয়তাবোধের দৃষ্টি-কোণ থেকে বইটি লেখা। 'বান্ধব'-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বান্ধবে প্রকাশিত অংশের পর অধুনা আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল।' হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপের অসমসাহসিকতার পরিচয়, প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ, অরণ্যবাস প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মূল বিষয়ের সৃষ্টি।

ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা। উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। পাঠককে সম্বোধন, স্ত্রীর পুরুষবেশে আবির্ভাব, পরিচ্ছেদের শিরোনাম,—সবকিছুই বঙ্কিমরীতি-অনুসৃত। ঐতিহাসিক উপন্যাস হলেও প্রতাপসিংহ অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনাবলীর আড়ালে বেশির ভাগ সময়েই ঢাকা পড়েছেন। টডের রাজস্থান থেকে তথ্য গৃহীত। ইতিহাসের যে বৃহৎ ঘটনাটিকে (হলদিঘাটের যুদ্ধ) কেন্দ্র করে কাহিনীর গ্রন্থন, সেটি উপঘটনার চাপে প্রায় হারিয়ে গেছে।

বাদশাহ্ আকবরকে এই উপন্যাসে কামুক ও পরস্ত্রীলোভী রূপে চিত্রিত করে, লেখক তাঁর চরিত্রে অহেতুক একটি কুৎসিত বর্ণ প্রয়োগ করেছেন। পৃথ্বিরাজপত্নী যোধবাঈয়ের কাছে প্রেমনিবেদন ও যোধবাঈ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান এবং অপমান আকবরের চরিত্রকে কলঙ্ক দান করেছে। বরং সেলিম এদিক থেকে অনেকটা স্পষ্ট। সে মদ্যপায়ী কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ। মেহেরউন্নিসার প্রতি প্রেমনিবেদনে ব্যর্থ হয়ে, সম্রাটের কথায় সেই ব্যর্থতাকে বেদনার অশ্রুজলে সে মেনে নিয়েছে। অমরসিংহ-ঊর্মিলা, রতনসিংহ-যমুনার প্রেমলীলা কেবল

৮. আর্যদর্শন, কার্তিক, ১২৮৮।

৯. প্রতাপসিংহ, মিবারেশ্বর মহারানা প্রতাপসিংহের চরিত্র অবলম্বনে রচিত। দুটি খণ্ডে বিভক্ত। ইং ১৮৮৪, পৃষ্ঠা ২২৩।

গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করেনি, রতন ও যমুনার প্রণয়ে বিচ্ছেদের সম্ভাবনায়, হতাশাকে মিলনের আনন্দে পরিণত করে লেখক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। পরচুলার সাহায্যে যমুনার সন্ন্যাসীবেশ ও একটি বিশেষ মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে বেশ পরিবর্তনে যমুনায় রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা চমকপ্রদ। অনুরূপ চরিত্রের সন্ধান পাই তারকনাথ বিশ্বাসের চন্দ্রপ্রভা (১৮৮৬) উপন্যাসে। সেখানে সুগন্ধাকে চিত্রপটবিক্রেতা পুরুষ পটুয়ার বেশে এবং মনোরমাকে যোদ্ধাবেশে দেখা যায়। বলাবাহুল্য এই রীতি বঙ্কিম-অনুসৃত। রাজপুতের দীর্ঘজয়গাথা চারণকবি দেবী সিংহের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। 'চৈথক'-এর উল্লেখ ও তার প্রভুভক্তির বিস্তৃত চিত্র লেখক এঁকেছেন।

প্রতাপসিংহের ভাষা গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হবার অন্যতম অন্তরায়।

'মা ও মেয়ে'[১০] উপন্যাসে 'পুণ্যের জয় ও পাপের পতন' বিবৃত করা হয়েছে। এটি একটি সামাজিক উপন্যাস।

উমাচরণ একমাত্র কন্যা শরৎকুমারী ও স্ত্রী সুলোচনাকে রেখে অকালে মারা গেলেন। সুলোচনা তাঁতীদের কাপড়ে নকশা তুলে দিয়ে অতি কষ্টে সংসার চালাত। গ্রামের ডাক্তার দুশ্চরিত্র রামচরণের দৃষ্টি পড়ে সুলোচনার উপর। শরৎকুমারী দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কালে, তার খাবারের অন্বেষণে সুলোচনা বাইরে এলে, চারজন লোক তাকে ধরে নিয়ে গেল। শরৎকুমারীর স্থান হল গ্রামের সহৃদয় ব্যক্তি দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। দীননাথ তার বিয়ের সম্বন্ধ করলে তা ভেঙ্গে যেতে লাগল। কারণ, তার মা নাকি কুলটা। শরৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আনন্দপুরের জমিদার হেমেন্দ্রনারায়ণের পুত্র হোমিওপ্যাথ ডাক্তার দেবেন্দ্রনারায়ণকে দীননাথ ডেকে দেখালেন। চিকিৎসাপর্বে উভয়ের মধ্যে চিত্তদৌর্বল্যের আভাস দেখা দিল। দেবেন্দ্র ও শরৎ 'অবৈধ প্রণয়ে' লিপ্ত এরকম রটনা শুরু হলে, একদিন শরৎ গৃহত্যাগ করল এবং পথের বিপদ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রের বাড়ির সামনে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল। তার প্রথম স্থান হল জমিদারগৃহে।

এদিকে, একদিন দুপুরে রামচরণ ডাক্তার সোহাগিনী বৈষ্ণবীর উপর বল প্রয়োগ করার কালে, সোহাগিনীর স্বামী রাধারমণ তার মনিব হেমেন্দ্রনারায়ণ

১০. মা ও মেয়ে, ৬টি খণ্ড, ১২৯১, পৃঃ ১৬৪। প্রবাহে (১২৮৯, মাঘ, পৃঃ ২৭৪) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত, তৃ-সং, বাং ১২৯৪, ইং ১৮৮৭,—এই সংস্করণে একখানি ছবি যুক্ত হয়েছে।

সহ তাকে রক্ষা করল। হেমেন্দ্রের হাতে নিগৃহীত হল রামচরণ। রামচরণের প্রণয়িনী কামিনী, দয়িতের কাছে অপমানিত হয়ে সুলোচনাকে উদ্ধারে সচেষ্ট হল। সুলোচনাকে হত্যা করার পূর্বমুহূর্তে রামচরণকে ছুরিকাহত করল কামিনী এবং পরে আত্মহত্যা করল।

গুরুদেবের সম্মতি অনুযায়ী হেমেন্দ্রনারায়ণ শরৎকুমারীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। মৃত্যুর পূর্বে ক্ষণচেতনা পেলে, রামচরণ নরকের কথা ভেবে আঁৎকে উঠল, সুলোচনাকে মা বলে ক্ষমা চাইল এবং সুলোচনার দৈহিক শুদ্ধির কথা জানিয়ে গেল।

রূপনগরে উমাচরণের ভিটায় নবনির্মিত সৌধে সুলোচনা তার জামাতা, কন্যা ও নাতি-নাতনীর সঙ্গে সুখে কাল কাটাতে লাগলেন।

সুলোচনার কাহিনীর সূত্রে এই উপন্যাসে অন্যান্য কাহিনীর গ্রন্থন। পাপ ও পুণ্যের প্রতীক রূপে রামচরণ ডাক্তার ও সুলোচনাকে গ্রহণ করা চলে। উপন্যাসটিতে ঘটনা-সংযোজনে আকস্মিকতার ছাপ স্পষ্ট। শরৎকুমারীর গৃহত্যাগ আকস্মিক ও অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত। রামচরণের হাত থেকে সোহাগিনীকে রক্ষার প্রসঙ্গ চমকপ্রদ। দেবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে শরৎকুমারীর প্রণয়, 'অবৈধ প্রণয়' বলে কেন অভিহিত হয়েছে তা বোধগম্যের অতীত।

সুলোচনার সতীত্ববোধ, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জয়ী হয়েছে। চরম দারিদ্র্য ও বিপদকালে তিনি ডাক্তারের প্রলোভনকে জয় করেছেন। বন্দী হয়ে থাকার কালেও তিনি সতীত্বকে অক্ষত রেখে চারিত্রিক সম্পদ উজ্জ্বল করেছেন। দুশ্চরিত্রা স্বরূপার মেয়ে সোহাগিনী, প্রতিকূল পরিবেশে এবং মায়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও রামচরণ ডাক্তারের বলপ্রয়োগ ও প্রলোভনে আত্মদান না করে সতীত্ব-রক্ষায় যে নিষ্ঠা ও স্বামিপ্রেমের যে উদাহরণ রেখেছে, তা অকল্পনীয়। রামচরণের অবৈধ প্রণয়িনী কামিনীর চরিত্রে দ্বৈত রূপ প্রকাশিত। (১) রামচরণের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়ে সুলোচনার রক্ষার্থে রামচরণকে হত্যা। (২) রামচরণের প্রতি প্রেমের আনুগত্য ও নিষ্ঠা প্রদর্শন স্বরূপ আত্মহত্যার মাধ্যমে মরণ-মিলন। 'ভিলেন'-চরিত্র রূপে রামচরণের চরিত্রচিত্রণে লেখক কৃতকার্য হয়েছেন। দেবেন্দ্র-শরৎ-এর বিবাহের ব্যাপারে সন্ন্যাসীর প্রভাব লক্ষ্য করার মত (হেমেন্দ্র-সন্ন্যাসী কথোপকথন)। ঘটনাযোজনায় লেখক চমক দান করেছেন। রীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিম-প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

'বিষবিবাহ'[১১] একটি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজ্য আক্রান্ত হওয়ার পটভূমিকায়, রাজস্থানের অন্তর্গত গানোর প্রদেশের উত্তরাধিকারিণী রাজকন্যা রাধাবাঈ-এর সঙ্গে এক শ্রেষ্ঠীকুমারের প্রণয় ও দেশরক্ষায় উভয়ের আত্মদানের মধ্য দিয়ে প্রণয়-পরিণতি চিত্রিত হয়েছে।

সতের বৎসর বয়স্কা রাধাবাঈ পিতামাতার মৃত্যুর পর বৃদ্ধ মন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য ও ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা করে। শ্রেষ্ঠী কিষণলালের সঙ্গে তার প্রণয়, মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিবাহে পরিণতি লাভ করেনি। মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার কালে সেনাপতির মৃত্যুর পর রাধাবাঈ স্বয়ং সৈন্যাপত্যের ভার গ্রহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করে। কিষণলাল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। রাধাবাঈ বন্দিনী হন। নবাবের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তার উপর। নবাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে প্রাসাদশিখরে উঠলে প্রজারা 'জয় রাধারানী কি জয়' বলে জয়ধ্বনি করে ওঠে। রাধা হৃদয়দেবতা কিষণলালের সঙ্গে জন্মান্তরে মিলনের আশা নিয়ে নর্মদার জলে ঝাঁপ দেয়। অপরদিকে প্রাণেশ্বরীকে স্মরণ করে কিষণলালও নদীর জলে ঝাঁপ দেয়।

রাধাবাঈ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। চরিত্রটি কর্তব্যশীলতার চরম উদাহরণ। সে একদিকে রাজ্ঞী অন্যদিকে প্রণয়িনী। উভয় দিকে সে তার কর্তব্য পালন করেছে এবং বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগে আত্মরক্ষা করেছে। প্রণয়ী শ্রেষ্ঠী কিষণলালের প্রতি প্রেমনিষ্ঠার বলেই সে অবিবাহিতা। চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েও জাতিধর্মকুলরক্ষার দৃষ্টান্ত তার চরিত্রকে মহত্ত্ব দান করেছে। মন্ত্রীর চরিত্রটি কর্তব্যসচেতনতার পরিচয় বহন করে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'কৃতজ্ঞতা' (১৮৯৬) উপন্যাসের অকালী সিং-এর সঙ্গে মন্ত্রীর চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রাধাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে না পাবার যন্ত্রণাই কিষণলালকে অত্যধিক স্বদেশানুরাগী করে তুলেছে। রানীর সহচরী চুনী-পান্নার ভূমিকা অনেকটা দেবী চৌধুরানীর সঙ্গিনীদের মত।

মোটের উপর গ্রন্থটি সুপরিকল্পিত এবং সুগ্রন্থিত।

'শান্তি'[১২] 'হিন্দুধর্মে আস্থাবান ব্যক্তিবৃন্দকে বিনোদিত করিবার অভিপ্রায়ে

১১. বিষবিবাহ, ইং ১৮৮৮. আটটি পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭২। দ্বি-স, বাং ১৩০৪। 'প্রেম-পরিণয়' নামে গদ্যকাব্যসহ একত্রে প্রকাশিত।

১২ শান্তি, ইং ১৮৯৩, দুই খণ্ডে বিভক্ত।

লিখিত' হয়েছে। এই উপন্যাসের প্রথমার্ধ 'প্রচার'[১৩] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের সুবিমল শশধর' বঙ্কিমচন্দ্রকে[১৪] 'তদীয় একান্ত গুণপক্ষ-পাতী গ্রন্থকার' এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন। শান্তি ধর্মীয় উপন্যাস। গঠন-শিথিলতা, লেখকের অত্যুগ্র ধর্মচেতনাজনিত অলৌকিকতা, আকস্মিক ঘটনার যথেচ্ছ অবতারণা উপন্যাসটিকে অতি স্বাভাবিক ভাবে শৈল্পিক উৎকর্ষ-লাভে বঞ্চিত করেছে। 'প্রচারে' গ্রন্থটি প্রকাশকালে লেখকের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতাই হয়ত গ্রন্থটির অঙ্গশৈথিল্য ও অন্যান্য ত্রুটির কারণ। উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবও স্পষ্ট।

নৌকাদুর্ঘটনায় রমাপতি স্ত্রী সুকুমারীকে হারিয়ে আশ্রয়দাতা রাধানাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সুরবালাকে বিবাহ করল। সুকুমারীর কথা রমাপতি ভুলতে পারে না।

শশী ভট্টাচার্যকে তার স্ত্রী কালী এবং রামলাল হত্যা করার ফলে পুলিস তাদের চালান দেয়। কালীর ফাঁসির পূর্বমুহূর্তে দেখা যায় যে, আসামী কালীর স্থলে এক অসামান্যা সুন্দরী নারী। ফাঁসি স্থগিত থাকে। ঘটনাচক্রে রমাপতি ম্যাজিস্ট্রেটের আহ্বানে জেলপরিদর্শনকালে আসামী-প্রকোষ্ঠে নবীন সন্ন্যাসিনী সুকুমারীকে দেখেন। পরে রমাপতির সঙ্গে সুরবালা সুকুমারীকে দেখতে গেলে, সুকুমারীকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

রমাপতির কঠিন অসুস্থতাকালে নাটকীয়ভাবে সুকুমারীর আবির্ভাব ঘটে। সুরবালা তাকে সাদরে গ্রহণ করে।

মেদিনীপুর থেকে ময়ূরভঞ্জে যাবার পথে নিবিড় অরণ্যের এক সুরম্য অট্টালিকায় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপিত। সুরমা ও শান্তি সেখানে দেবসেবায় কাল কাটান। তীর্থযাত্রাকালে রমাপতি স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের দেওয়ান বিহারীর কাছে বরাকরে রেখে, কল্যাণেশ্বরী গেলে, বিহারী সুরবালার উপর বলপ্রয়োগ করতে উদ্যত হয়। সন্ন্যাসিনী সুকুমারী এসে তাকে রক্ষা করে। দেবী সুরবালাকে শান্তিনিকেতনের সুরম্য কক্ষে নিয়ে যান। বিহারী শান্তিনিকেতনের শাসনপুরীতে শাসিত হয়ে সুরবালাকে ভগ্নীরূপে গ্রহণ করে।

১৩ প্রচার ১২৯৩—১২৯৫ সাল।

১৪ বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থকারকে লিখেছিলেন, 'প্রিয়তমেষু, শান্তি প্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম পরলোকেও ভরসা করি, দামোদর তাহাতে আমায় বঞ্চিত করিবেন না'।

(সা. সা. চ. ম'. ৮ম খণ্ড)।

সুরমা, কালী, সুকুমারী এখন শান্তি। মহাপুরুষ জ্ঞানানন্দের ইচ্ছানুযায়ী সকলে শান্তিকে পূজা করে, 'তুমিই আশ্রয়, তুমিই সুখ, তুমিই স্বর্গ।' উপন্যাসটি অলৌকিক ও আকস্মিক ঘটনায় পূর্ণ।

নৌকাডুবির পর থেকে উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনাচক্রে উদ্ধারকর্ত্রীরূপে সুকুমারীর আবির্ভাব আকস্মিক এবং কষ্টকল্পিত। দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে সুরবালার সঙ্গে তার স্বামীর সাক্ষাৎ-প্রসঙ্গ দেবীর ইচ্ছানুমোদিত এবং মন্ত্রোচিত। বৃহৎপুরী বিকম্পিত করে বজ্রগম্ভীর স্বরে যে আদেশ ধ্বনিত হয় তা একান্তই অলৌকিক। সে আদেশ নাকি স্বয়ং ভগবানের। (২য় খণ্ড একাদশ পরিচ্ছেদ) পাঠককে আহ্বানরীতি, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় বঙ্কিম-প্রভাবের উদাহরণ। গ্রন্থের শেষ অনেকটা দেবী চৌধুরানীর মত। প্রফুল্লস্তবের মধ্য দিয়ে দেবী চৌধুরানী শেষ হয়েছে। এখানে শান্তি-বন্দনা, 'তবে আইস শান্তি, আমরা কায়মনোবাক্যে তোমার পূজা করি' ইত্যাদি। রামা ও যেদোর মত দুটি চরিত্রের সন্ধান পাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে। সে দুজন চণ্ডাল।

একমাত্র সুরবালা ছাড়া কোন চরিত্রকে রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না। সুরবালার চরিত্রে ঔদার্য, সহনশীলতা ও কর্তব্যবোধ স্পষ্ট। রমাপতি অস্বাভাবিক। সুকুমারী অ-লৌকিক। খুনের আসামী কালীর সরমায় পরিবর্তিত হবার কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রন্থটিতে ধর্মোন্মত্ততার যে প্রকাশ বর্তমান তা পরিকল্পনাহীন। উপন্যাসটি হিন্দুধর্মের প্রচারমূলক।

'যোগেশ্বরীর'[১৫] মধ্যে দামোদরের ধর্মপ্রেরণার আত্যন্তিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই উপন্যাসেও অলৌকিকতা ও অবাস্তবতা বর্তমান। কাহিনী-গ্রন্থনে শিল্পকৌশলের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নীতি-শিক্ষা ও ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা-কণ্টকিত পৃষ্ঠাগুলি উপন্যাসের স্বাভাবিক গতির পথে দুরূহ বাধার সৃষ্টি করেছে। এই সুবৃহৎ উপন্যাসটি সুখপাঠ্য না হবার এটি অন্যতম কারণ। পৃষ্ঠা হিসাবে উপন্যাসটি দামোদরের বৃহত্তম উপন্যাস। যোগেশ্বরীর উপসংহার 'অন্নপূর্ণার'[১৬] স্থান তারপরেই। যোগেশ্বরীর নায়ক

১৫ যোগেশ্বরী (উপন্যাস), বাং ১৩০৪ সাল, ইং ১৮৯৮, পৃ. ৬০৪, মোট ১২টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ড পরিচ্ছেদে বিভক্ত। খণ্ড ও পরিচ্ছেদের শিরোনাম আছে।

১৬ অন্নপূর্ণা (উপন্যাস) বাং ১৩০৯ সাল, ইং ১৯০২, পৃ ৫৯৯।

সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর, নায়িকা ধার্মিকা অন্নপূর্ণা। ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়ই প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভিক্ষা নেবার কালে নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের একাদশী কন্যা অন্নপূর্ণার সঙ্গে সন্ন্যাসী ভিক্ষুক উমাশঙ্করের পরিচয় হয়। গুরু ঘনানন্দ বলেন—নীলরতনবাবু তাঁর পরিচিত। যোগেশ্বরী দেবী তাঁকে দেখা দিয়েছেন জানালে, উমাশঙ্কর দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা জানায়। যোগেশ্বরীর সঙ্গে গুরুশিষ্যের দেখা হল, যোগেশ্বরী উমাশঙ্করকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেন। সোনাপুরের শ্যামলাল দুশ্চরিত্র। তার স্ত্রী বিধুমুখী ভ্রষ্টা। সে হরিচরণের দয়িতা। সারদা তার দূতী। শ্যামলালের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তার দেওয়ান হরকুমার পদত্যাগ করে কাশীযাত্রা করেন। সার্বভৌমের পুত্রবধূ সুহাসিনীকে গদা শ্যামলালের নির্দেশে হরণ করে, কিন্তু সুহাসিনী তাকে অলঙ্কার দিয়ে রক্ষা পায়। হরকুমার কাশীতে নীলরতনবাবুর সঙ্গে দেখা করে এবং উমাশঙ্করের জীবনরহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হবেন বলে জানান। যোগেশ্বরী বলেন উমাশঙ্কর রাজা হবে।

হরিচরণ কৌশলে শ্যামলালের প্রভূত সম্পত্তি তার স্ত্রী বিধুমুখীর নামে রেজিস্টারি করায়। যোগেশ্বরী যোগানন্দকে অন্নপূর্ণার সঙ্গে উমাশঙ্করের বিবাহের ইচ্ছা জানান। বিধুমুখী শ্যামলালকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়।

সনাতনপুরের জলাঙ্গী নদীসৈকতে এক মৃতপ্রায় রমণীকে হরকুমার বাঁচিয়ে হরিশকামারের বাড়ি রাখার ব্যবস্থা করে। যুবতী সার্বভৌমের পুত্রবধূ। বিধুমুখী হরিচরণ সহ ভারত পরিক্রমা-অন্তে কাশী আসে। হরিচরণ পরনারীগামী হওয়ায় বিধুমুখী তাকে তাড়িয়ে দেয়। উমাশঙ্করের সঙ্গে বিধুমুখীর দেখা হলে উমাশঙ্কর তাকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে এবং ভাগবত শিক্ষা দেয়। ভিখারী শ্যামলাল উমাশঙ্করের কাছে আশ্রয় পায়। বিধুমুখী উমা।

শঙ্করকে গুরুপদে বরণ করে কৃতকার্যের জন্য খেদ প্রকাশ করে। তারপর সে অন্তর্হিতা হয়। হরকুমার কৌশলে সার্বভৌমের ছেলে নবীনের সঙ্গে সুহাসিনীর মিলন ঘটাল। হরকুমারের চেষ্টায় জানা গেল যে, উমাশঙ্কর শ্যামলালের পিতা বলে কথিত বিনোদ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। শ্যামলাল দাসী কুলটার পুত্র। মাতা মাতঙ্গিনী গোপনে তাকে পুত্র বলে ঘোষণা করে। জানা গেল, উমাশঙ্কর ও সুহাসিনী মাসতুতো ভাই-বোন। শ্যামলাল বিধুমুখীকে

হরিচরণের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে নিয়ে অন্তর্হিত হল। উমাশঙ্করের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ হল। যোগেশ্বরী ছেলে-বৌ নিয়ে ঘরে গেলেন।

সন্ন্যাসজীবনের সঙ্গে সংসারজীবনের সামঞ্জস্যবিধান ও জীবনচর্যার মূলে ধর্মীয় প্রেরণার আবশ্যকতার বিষয় উপস্থাপিত করা হয়েছে এই উপন্যাসে। সন্ন্যাসজীবনই সংসারজীবনকে শিক্ষা দেয়। তাই সন্ন্যাসিনীর চেষ্টায় সন্ন্যাসী নায়কের বিবাহদান এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে তার সংস্পর্শে এনে ধর্মপথ প্রদর্শনের চেষ্টা এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসে লেখক তিনটি ঘটনাকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন। মূল ঘটনার সংঘটনস্থল কাশী; এবং এই কাশীতেই অপর দুই ঘটনার সঙ্গে মূল ঘটনার সংযুক্তি এবং পরিণতি। কাশী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুর উপসংহার-ভূমি।[১৭]

উমাশঙ্কর অন্নপূর্ণার কাহিনীই মূল কাহিনী। তাছাড়া শ্যামলাল হরিচরণ বিধুমুখী ও সার্বভৌমের পুত্রবধূকে নিয়ে আর দুটি উপকাহিনী।

লেখক ধর্মীয় তত্ত্ববিশ্লেষণে, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় ও গুরুশিষ্যের ধর্মমূলক কথোপকথনে বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করে উপন্যাসটিকে একটি তত্ত্ববহুল মন্থরগামী কাহিনীতে পরিণত করেছেন।

উমাশঙ্করের পিতৃপরিচয় উদ্ধার-প্রসঙ্গেও বহু মসীব্যয় করেছেন তিনি। এগুলি তাঁর শিল্পীজনোচিত মানসিকতার অভাব প্রকাশ করে। উমাশঙ্করের সঙ্গে অন্নপূর্ণার প্রণয়সম্পর্ক এবং যোগেশ্বরীর ইচ্ছানুযায়ী বিবাহসংঘটন, এই সমস্ত বিষয়টি অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে পড়ে।

উমাশঙ্করকে কোলে নেওয়ার কালে পীনোন্নত পয়োধরা দেবীর বক্ষোদেশের বসন সিক্ত হয়ে যাবার ঘটনা অলৌকিক এবং উদ্ভট কল্পনাজাত চিত্র। যোগানন্দ-যোগেশ্বরীর বিবাহ-কল্পনা অনেকটা আধ্যাত্মিক। এই জাতীয় বিবাহ-কল্পনার পূর্বসূত্র পাই, আলোচ্যকালে আরও কয়েকজন ঔপন্যাসিকের রচনায়।[১৮]

১৭ অনুরূপ উপসংহারভূমি—সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর রাধামতি (১৮৮৮)।

১৮ (১) শরৎ : শরৎকুমারী (১২৯১)
(নরেন্দ্র—শরৎ)

(২) কুসুমকুমারী দেবী : প্রেমলতা (১৮৯২)
(সুরেন্দ্রনাথ—কনক)

(৩) দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী : পুণ্যপ্রভা (১৩০২)
(প্রেমাঙ্কুর—পুণ্যপ্রভা, বিবাহান্তে ভবকিঙ্কর ভবকিঙ্করী)

সার্বভৌমের পুত্র নবীনের স্ত্রী সৌদামিনীর সঙ্গে স্বামীর পুনর্মিলনে যে কৌশল অবলম্বিত হয়েছে, তার পূর্বসূত্র পাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শৈশব-সহচরী (১৮৭৮) উপন্যাসে রজনী ও কুমুর বিবাহ-প্রসঙ্গে। আবার অনুরূপ রীতি লক্ষিত হয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' (১৮৯৮) উপন্যাসের ছোটু ও মণির বিবাহের ব্যাপারে। ব্রাহ্মদের প্রতি অহেতুক বক্রোক্তি (অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ) অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রীতিদায়ক। নীতিশিক্ষা, অবিশ্বাস্য ঘটনার অবতারণা, যথেচ্ছ অলৌকিকতার উপস্থাপন, স্থূল শিল্পকল্পনা, গ্রন্থটিকে শিল্পপদবাচ্য না করবার পক্ষে যথেষ্ট। নবীনকৃষ্ণের পিতামাতার প্রতি আনুগত্য-বোধ দেবী চৌধুরানীর ব্রজেশ্বরের অনুরূপ। সারদা, হীরার সাদৃশ্যবাহী।

প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই লেখকের ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হওয়ায় অস্বাভাবিকতার স্তরে এসে পৌঁছেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার সূত্র ধরে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দামোদরের আবির্ভাব, বঙ্কিম-উপন্যাসের পরিশিষ্ট লেখকরূপেই তাঁর পরিচয়কে সীমাবদ্ধ রাখে নি; তৎকালীন বাংলা উপন্যাসের জগতে তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদান অনায়াসে তাঁকে জনপ্রিয়তা দান করেছে। সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসরচনায় তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নারী-চরিত্রের রহস্য-উন্মোচনে, কাহিনীর ক্ষেত্রে কৌতূহল ও নাট্যরসসৃষ্টিতে তিনি পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে উপন্যাসের কাহিনী-পরিকল্পনায়, চরিত্রের আচরণ ও পরিণতি প্রদর্শনে সব সময়ে যুক্তিসিদ্ধ পথ অনুসৃত হয়নি। এসব ক্ষেত্রে তাঁর আবেগ ও ইচ্ছাই অনেক সময় প্রাধান্য পেয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও দামোদর গল্প-পরিবেশনের ক্ষেত্রে অনায়াস-সাফল্য লাভ করেছেন। এ কারণে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস সুখপাঠ্য হতে পেরেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত হতে না পারলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর উপন্যাসগুলি পাঠকসমাজে গৃহীত হয়েছিল এবং লেখক হিসাবে খ্যাতি-অর্জনে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।[১৯]

১৯ দামোদরের অনুবাদমূলক উপন্যাস:

কমলকুমারী (১৮৮৪) স্যার ওয়াল্টার স্কটের ব্রাইড অব লামেরমুর অবলম্বনে বিরচিত। শুক্লবসনা সুন্দরী—১ম ভাগ ১৮৮৫, ২য় ভাগ ১৮৮৮, ৩য় ভাগ ১৮৯০। উইলকি কলিনসের উম্যান ইন হোয়াইট, অবলম্বনে।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী (১৮৫৪-১৯০৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকরূপে ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর নাম আজ সারস্বত সমাজে বিস্মৃত। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ একদা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠায় তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। 'বান্ধব', 'সহচরী', 'বঙ্গমহিলা' প্রভৃতি পত্রিকার লেখকরূপে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৩০০ সালের ৮ই শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩) ক্ষেত্রপাল 'বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজে সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে এই সংস্থা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নামে অভিহিত হয় (১৩০১/১৮৯৪)। পুনর্গঠিত পরিষদের সঙ্গে ক্ষেত্রপাল যোগসূত্র ছিন্ন করেন।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী বঙ্কিমসমকালীন ঔপন্যাসিক রূপে একদা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে স্থানটি গ্রহণ করেছিলেন, অচিরকালের মধ্যে সেই স্থানটি বিস্মৃতির আবরণমণ্ডিত হয়ে পড়ে। তার কারণ স্বকৃত পথে উপন্যাসরচনায় যে পন্থাটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেটি বিদগ্ধসমাজে সমাদৃত হয়নি। তবু অটুট আত্মবিশ্বাসবলে ক্ষেত্রপাল সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে নিজস্ব পথটিকে অনুসরণ করে গেছেন।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর প্রথম উপন্যাস 'চন্দ্রনাথ'[২০]-এ প্রথম প্রচেষ্টার অপূর্ণতা বর্তমান। 'চন্দ্রনাথ'-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন, 'আমাদিগের দেশে ধনের কিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা দর্শান চন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির অবস্থাভেদে মহৎ ও নিকৃষ্ট চরিত্র ইহাতে দর্শিত হইয়াছে' (বিজ্ঞাপন)। উপন্যাসটিতে চারটি পৃথক কাহিনী একত্রে গ্রথিত হলেও এই কাহিনীগুলির সঙ্গে কোন গভীর যোগসূত্র রচিত হতে দেখি না। প্রতিটি কাহিনী যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। রচনাকৌশলের দীনতা প্লটকে গঠন-সংহতি দান করতে পারেনি। সৌরেন্দ্র-হেমলতা, নিস্তারিণী-

মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাস: সোনার কমল (১৯০১), নবাবনন্দিনী—'দুর্গেশনন্দিনীর অনুসরণে' (১৯০১), কর্মক্ষেত্র (১৯০২), অন্নপূর্ণা (১৯০২), সপত্নী (১৯০৪), ললিতমোহন (১৯০৫), অমরাবতী (১৯০৫)।

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত: নবীনা (১৯১০), শত্রুরাম (১৯১০), আদর্শ প্রেম (১৯১৩)।

২০ চন্দ্রনাথ ১৮৭৩, পৃ ১৮৮, দ্বি সং ১৮৮৩ (১২১০) পৃ ২১০।

সদানন্দ, নবীন-সুলোচনা ও মহেন্দ্র-মনোরমার এই চারটি কাহিনীর মধ্যে একটিতে (সদানন্দ-নিস্তারিনী) কিঞ্চিৎ রচনাকৌশল লক্ষ্য করি। ঘটনা-সংস্থানের ক্ষেত্রে একমাত্র নবীন-সুলোচনার কাহিনী উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসটির চরিত্রগুলি সম্পর্কে বঙ্গদর্শন[২১]-এর সমালোচনায় বলা হয়েছে যে 'সৌরেন্দ্র কিছু হয় নাই, হেমলতাও না। রঘুনাথ ভট্টাচার্য কেহ নহে। নবীন সামান্য প্রকার, সুলোচনা, কাপির কাপি তস্য কাপি। উপেন্দ্র সাধারণ নাটকের বওয়াটে বাবু মাত্র আলালের ঘরের দুলালের প্রপরা অপ পৌত্র। তাঁহার পারিষদেরা মতিলালের পারিষদের 'স্বউৎপরি দৌহিত্র' মাত্র'। বঙ্গদর্শন-এ লেখকের রুচির সমালোচনা করে বলা হয়েছে, 'একটি গুরুতর এবং মার্জনাতীত রুচির দোষ এই যে তিনি গাঢ়রঙে পাপের চিত্র আঁকিয়া তাহাকে পাঠকের নয়নপথে ধরিয়াছেন পাপের সে চিত্রের জন্য বহু যত্নে রঙ্গ ফলাইয়া, বহুযত্নে তাহাতে তুলি ঘসিয়াছেন। তাহাতে পাপের মোহিনী-শক্তিও পরিস্ফুট হইয়াছে।'[২২] ক্ষেত্রপালের চন্দ্রনাথ জনপ্রিয় হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ তার প্রমাণ।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর পরবর্তী উপন্যাস 'মুরলা'[২৩] একটি কাল্পনিক আখ্যায়িকা-জাতীয় রচনা। এক ঋষিপুত্রের সঙ্গে রাজকুমারীর প্রণয়-কাহিনী এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। গল্পটি বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত। 'ভূমিকায়' লেখক বলেছেন, 'এই উপন্যাসের প্রথম চারি পরিচ্ছেদ পূর্বে বঙ্গমহিলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন স্ত্রী-শিক্ষামাত্রই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।...আমাদিগের দেশীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমান রুচি-উপযোগী একটি চিত্তহারী উপন্যাস রচনা করা অতিশয় দুরূহ জানিয়া অনেকেই একমাত্র সাময়িক রুচির অনুরোধে ইয়রোপীয় প্রথা-সকল দেশীয় ঘটনায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু এ প্রকার অনুকরণে সত্যের বিশেষ অবমাননা হয় বলিয়া অসামাজিকতা ও অসাময়িকতা দোষ পরিহার করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না'। বর্তমান রুচির সঙ্গে দেশীয় আচার-ব্যবহারের সামঞ্জস্য স্থাপন করে লেখক 'অসামাজিকতা ও অসাময়িকতা দোষ পরিহার' করতে সচেষ্ট হয়েছেন

২১ বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮১, পৃ. ৯৭।

২২ তদেব।

২৩ মুরলা, ১৮৮০, পৃ ৯৪+১ শুদ্ধিপত্র

কিন্তু বলা বাহুল্য, তাঁর প্রয়াস অভিনব হলেও সার্থকতার গৌরবলাভে বঞ্চিত।

হিমাচলে বৈদ্যনাথের মন্দিরে রাত্রিকালে তুষারপাতের শব্দে ভীতা রাজকন্যার সঙ্গে ঋষি শৌনকের পুত্র হারিতের পরিচয় হল। কিছুকাল পরে রাজকন্যার অন্বেষণের বাসনায় পিতার অনুমতি নিয়ে হারিত গৃহত্যাগ করল। উজ্জয়িনীর কাছে ভাসমান হারিতকে উদ্ধার করল এক মৃত বস্ত্রব্যবসায়ীর একবিংশবর্ষীয়া পালিতা অনাথিনী কন্যা। সেই নারী যুবকের অভিপ্রায় জেনে তাকে আশ্বাস দিল, রাজকন্যা যখন ভৈরব-মন্দিরে যাবে তখন তাকে দেখাবে। হারিত যোগী মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার জীবনে ধনপ্রাপ্তির অভিনব কাহিনী শুনল।

মৃত্যুঞ্জয় রাজসমীপে হারিতকে নিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং জানালেন, তাঁর যাবতীয় ধন-ঐশ্বর্য হারিতকে দেবেন। রাজা তাদের কারাগারে প্রেরণ করলেন। একদিন রাজকন্যা মুরলা বীরনায়কের দস্যুদল কর্তৃক অপহৃতা হল। কুমায়ুন-রাজপুত্র রাজাকে সাহায্য করলে, মৃত্যুঞ্জয় ও হারিত মুক্তি পেল।

বিন্ধ্যদেশের পূর্বসীমায় নর্মদার পশ্চিমে পর্বতশ্রেণীর উচ্চতম শৃঙ্গে অবস্থিত পশুপতিনাথমন্দিরের পুরোহিত সুররাজের ক্রীতদাস, বহুরূপী ভজন্ত, ব্যাঘ্র-বেশে মুরলাকে উদ্ধার করে সুররাজের কাছে নিয়ে যায়। ঘটনাচক্রে জানা যায় উজ্জয়িনীর অনাথিনী, সুররাজেরই কন্যা। তিনি রাজকন্যাকে নিয়ে উজ্জয়িনী যাত্রা করবেন স্থির করেন। রাত্রে হারিতের বিলাপধ্বনির সূত্র ধরে রাজকুমারীর সঙ্গে হারিতের মিলন হল। পরদিন সকালে সৈন্যদলসহ বীর-নায়কের রাজ্যে যাত্রাকালে কুমারের সঙ্গে সুররাজের সাক্ষাৎ হলে, সকলে পুনর্মিলিত হল। মুরলা অনাথিনীকে পিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর পশুপতিমন্দিরে হারিতের সঙ্গে মুরলার এবং কুমায়ুন-রাজকুমারের সঙ্গে মান্ধাতা দ্বীপের ভূতপূর্ব রাজকন্যা সোহাগিনীর বিবাহ হল। কুমার দূতমুখে রাজার কাছে খবর পাঠিয়ে বীর নায়কের সন্ধানে সসৈন্যে যাত্রা করল। স্ত্রী অহল্যার গুণে বীরনায়ক রেহাই পেল। তারপর সকলে উজ্জয়িনী ফিরল।

উপন্যাসটির কাহিনী যেন কোন এক কল্পলোকের পটভূমিতে বিস্তৃত। উপন্যাসটির ভারি ভাষা গল্পের গতিকে মন্থর করে তুলেছে। প্লটে রচনা-

সংহতির অভাবও লক্ষণীয় ত্রুটি। পরিচ্ছেদের নামকরণ উদ্ধৃতির সাহায্যে করেছেন লেখক। রাজকুমারী মুরলার সঙ্গে হারিতের প্রথম দর্শনজাত প্রণয় একেবারেই মামুলিধরনের। আখ্যায়িকার রচনাকালে মহারাজ নীলধ্বজ স্বরূপার অধিপতি ছিলেন। উপন্যাসটির ঘটনাকাল এব বেশি জানা যায় না। অথচ ঘটনাসূত্রে একটি খ্রীষ্টান যুবতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সত্যবান গুলচঙ্গের কাহিনীকে উপকাহিনী রূপে সংযোজনের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্বে লেখক তার সদ্ব্যবহার করেন নি। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে অনাবশ্যক। মৃত্যুঞ্জয়ের রত্নগৃহের কল্পনা রোমান্টিক। চরিত্রচিত্রণে ও ঘটনাসংস্থাপনে লেখক অনেকটা উপকথার ধারা অনুসরণ করেছেন। 'নলিনী'[২৪] পত্রিকায় উপন্যাসটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'আমরা এই উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহার গল্পাংশে বিশেষ মনোহারিত্ব দেখিতে পাইলাম না। লেখক এই উপন্যাসে অনেকগুলি চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া সকলকেই সর্বাঙ্গীণ রাখিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যে স্বভাবের সুনিপুণ চিত্রকর এবং তাঁহার রচনা যে সুমার্জিত ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।'

লেখকের 'মধুযামিনী ও কুঞ্জা বা কলিকাতা শতাব্দী পূর্বে'[২৫] দুটি স্বতন্ত্র উপন্যাস। মধুযামিনীতে মধ্যপ্রদেশের গুণ্ডজাতির জীবনযাত্রার বাস্তবসম্মত চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক।

'সহচরী'র সম্পাদকের অনুরোধে লেখক গ্রন্থটি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন। লেখক মধ্যপ্রদেশের গুণ্ডজাতির আদিম বাসভূমির ভৌগোলিক পরিচয় দিয়েছেন। চতুর্দশী বালিকা হিঙ্গনার সঙ্গে গোচারণকালে এক অপরিচিত কুমারের আলাপ, প্রণয়-বিপত্তি ও মিলনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

হিঙ্গনার সঙ্গে উদয়গিরির বিবাহ হবে বলে হিঙ্গনার বাবা ও মা স্থির করেছিল। কিন্তু হিঙ্গনা আপত্তি করল। গুণ্ডদের প্রথানুযায়ী হিঙ্গনার প্রণয়ী কুমার তার দাসত্ব গ্রহণ করলে জানা গেল যে, কুমার হিঙ্গনার প্রকৃত অনুরাগী। ঈর্ষাতুরা অরুণা হিঙ্গনার ক্ষতি করতে চায়। অরুণা ঘনশ্যাম-

২৪. নলিনী, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৮৭।

২৫. মধুযামিনী ও কুঞ্জা বা কলিকাতা শতাব্দী পূর্বে, ১২৯২, (১৮৮৬,) পৃ ৫২+৪৩=৯৫।

দেবের মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে চুক্তি করে হিঙ্গনাকে ডাইন বলে প্রচার করতে বলে। উদয় ফিরে আসে। কিন্তু বাপমায়ের চেষ্টা সত্ত্বেও হিঙ্গনা উদয়কে বিয়ে করে না। এদিকে কুমার তার ভগিনীর অসুস্থতার সংবাদে দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ। হিঙ্গনা রোজ সন্ধ্যায় পর্বতশীর্ষে উঠে প্রার্থনা করে। শেষে অরুণা পুরোহিতকে তার নবযৌবন দান করলে, পুরোহিত হিঙ্গনাকে ডাইন বলে ঘোষণা করে এবং পরদিন তার বিচার হবে বলে জানায়। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে কুমার পুরোহিতের কাছে যায় এবং ভয়ে পুরোহিত সব রহস্য ফাঁস করে দেয়। পরে হিঙ্গনাকে অভয় দান করে। পরদিন বিচারকালে জাল-আবৃত হিঙ্গনাকে কুমার সদলবলে এসে মুক্ত করে। হিঙ্গনার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। অরুণা যোগিনী হয়ে দেশত্যাগ করে।

লেখক এই উপন্যাসের পটভূমিও একটি অপরিচিত আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত করেছেন। কাহিনীটি বৈচিত্র্যহীন। তবে কাহিনীর প্রসঙ্গে লেখক গুণ্ডদের সামাজিক রীতিনীতির কিছু পরিচয় দিয়েছেন। গুণ্ডদেব দুই ভাগ—রাজগুণ্ড ও রাবণবংশী। হিঙ্গনা রাজগুণ্ড। রাজগুণ্ড রাজপুতদের অপভ্রংশ। এদের সমাজে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত। কারণ স্ত্রীই তাঁদের সম্পত্তি। বিবাহের পর বর কন্যাকে চুড়ি দিয়ে সম্পত্তি নেয়। এদের সমাজে মামাতো বোন ও পিসতুতো ভাইয়ের বিবাহের সম্বন্ধ প্রচলিত। এই প্রথানুসারে উদয়গিরি হিঙ্গনার পিসতুতো ভাই হওয়ায় হিঙ্গনাকে স্ত্রী রূপে পাবার তার বিশেষ অধিকার। পুরোহিত কর্তৃক কোনও নারীকে ডাইন বলে ঘোষণার অধিকার গুণ্ডদের সমাজে পুরোহিতের প্রাধান্য-স্বীকৃতির উদাহরণ। পুরোহিত-সমাজে দুর্নীতির ধারাও বর্তমান। উপন্যাসটির ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা, তাই কাহিনীর গতি মন্থর। কাহিনী পরিকল্পনা ও ঘটনা-সংযোজনায় লেখকের রোমান্টিক মনের পরিচয় পাই। চরিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যহীন। অরুণার চরিত্রে পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই। গুণ্ডদের জীবনযাত্রার চিত্রবর্ণনাই উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

‘কৃষ্ণা বা কলিকাতা শতাব্দী পূর্বে’ অসম্পূর্ণ রচনা।[২৬] গ্রন্থটি পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ করবার ইচ্ছা সত্ত্বেও লেখকের সেই ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করেনি।

১২৯৭ সালের চৈত্র মাসের সংক্রান্তি উপলক্ষে হরমোহনবাবুর বাড়িতে

২৬. বান্ধব (একাদশ সংখ্যা, ১২৮৮, পৃ ৫২২)-এ প্রকাশিত।

চড়কপূজা উপলক্ষে বুলবুলির লড়াই প্রভৃতি চিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শুরু। চন্দ্রশেখর, গুরুকন্যা কৃষ্ণাকে ভালোবাসে। চন্দ্রশেখরের পিতা, পিতৃহীনা দরিদ্রকন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিতে নারাজ। কর্মোপলক্ষে চন্দ্রশেখর পাটনায় গিয়ে ঘটনাচক্রে এক রাজকুমারের বন্দী হলে, তার পরিচর্যাকারিণী তার প্রণয়াসক্ত হল। কৃষ্ণার মাতার মৃত্যুর পর হরমোহনের বাড়ি কৃষ্ণা দেবসেবায় নিযুক্ত হলে, হরমোহনের দৃষ্টি পড়ল তার যৌবনের উপর। বশীকরণ-রত্ন ধারণ করেও বাবু কৃষ্ণার মন ফেরাতে পারলেন না। কর্তাবাবুর জন্ম-তিথির আয়োজনের চিত্র দিয়ে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

কাহিনীতে সম্ভাবনার দিক থাকা সত্ত্বেও তার সদ্ব্যবহার লেখক করতে পারেননি। নামকরণের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক ক্ষীণ। শতবর্ষ পূর্বে কলকাতার সামান্য সামাজিক চিত্র পাই। বড়লোকের সমাজে বুলবুলির লড়াই, বিবাহে বরপণ-প্রথা, নারীর মনজয়ে বশীকরণ-রীতির কথা জানতে পারা যায়। সাধ্যের অভাবে লেখকের সাধ অপূর্ণ রয়ে গেছে।[২৭]

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৫৪- ১৯২০)

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক ছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলি সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হয়েছে। দেবীপ্রসন্ন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলিতে সাময়িক সামাজিক সমস্যাই বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হতে দেখা যায়। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রগতিবাদ ও ধর্মাচরণের পন্থা তাঁর উপন্যাসগুলিতে বিশ্লেষিত হওয়ায় সেগুলি তত্ত্বভারাক্রান্ত উপদেশাত্মক হয়ে উঠেছে। দেবীপ্রসন্ন তাঁর 'আত্ম-বিবৃতি'তে লিখেছেন,—'আমি বিধাতার কৃপার নানা পরিচয় পাইয়া প্রার্থনা-বাদী হইয়া পড়িলাম।·· টাকা রাখিলে অনেক টাকা থাকিত কিন্তু কিছুই রাখি নাই যখন যাহা পাই বিলাইয়া দেই···প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা এইরূপে গিয়াছে।···দারিদ্র্যের সেবা আমার চিরব্রত, তাহা আজীবন প্রতিপালন করিয়াছি।···আমার সুখই 'পরিব্রতা'য় শান্তিই 'অর্পণে' এবং আমার আনন্দই

২৭. The object of the story was to pourtray the condition of the people of the time, their mode of life, manners and amusements······(*Dedication*)

'সেবায়'[২৮]। 'তাঁহার (দেবীপ্রসন্ন) চরিত্রের আন্তরিকতা, তাঁহার রচিত সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হইত। তিনি চরিত্রে যেমন, সাহিত্যেও তেমনই চিরনির্ভীক[২৯]।' দেবীপ্রসন্ন নব্যভারত (১২৯০) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। আটত্রিশ বছর ধরে তিনি এই মাসিক পত্রিকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।

'শরৎচন্দ্র'[৩০] দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর প্রথম সামাজিক উপন্যাস। রচনাটি অপরিণত। বাল্যবিবাহের কুফল এবং সামঞ্জস্যহীন বিবাহিত জীবনের শূন্যতার কথা পরিস্ফুট করতে গিয়ে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন। পরিশিষ্টে লেখক বলেছেন, 'বিবাহ না করিলেও লোক ভাল থাকিতে পারে ইহাই প্রমাণ করা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য'। কিন্তু এই উদ্দেশ্য প্রায় উহ্য রয়ে গেছে উপন্যাসটিতে। লেখক শরৎচন্দ্রকে রমণীগণের পাঠোপযোগী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন (পরিশিষ্ট)। শরৎচন্দ্রের আদর্শবাদের পশ্চাতে কোন ভিত্তি ছিল না। ছাত্র হিসাবেও সে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। তবে সে তরবারিখেলা জানত। এটা আদর্শবাদের উদাহরণ নয়। সিপাহী-যুদ্ধে শরৎচন্দ্রের অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক বর্ণ দেবার চেষ্টা মাত্র। শরৎচন্দ্রের চরিত্রে দেশপ্রেম তথা ভারতের স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। তবে তার চরিত্রে পূর্বাপর পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি।

ঘটনা-সংস্থাপনে সঙ্গতি ও শৃঙ্খলার অভাব স্পষ্ট। অজস্র চরিত্র, অনাবশ্যক ঘটনা ও কাহিনীর সৃষ্টি করে লেখক গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করলেও পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করেছেন। সিপাহী-যুদ্ধে শরৎচন্দ্রের অংশগ্রহণের পূর্বে বিদ্রোহের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক কারণ নির্ণয়ে লেখক মসি ক্ষয় করেছেন। চারিত্রিক পরিবর্তনের পশ্চাতে মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা নেই। নীতিগর্ভ বক্তব্য বক্তৃতার মত প্রতি পদেপদে গল্পের গতিকে মন্থর করে তুলেছে। সুযোগমত প্রার্থনার গুণাগুণের কথাও লেখক বর্ণনা করেছেন।

উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের চিন্তার মধ্যে, 'যদি জানিতাম বিবাহ দাসত্ব, তবে কখনই বিবাহ করিতাম না', কথাটি

২৮. শ্রাদ্ধিকী, ১৩২৭।

২৯. বঙ্গবাসী, ২৩ আশ্বিন ১৩২৭, ('পরলোকে দেবীপ্রসন্ন' শীর্ষক সংবাদ)

৩০. শরৎচন্দ্র (দুই খণ্ড) ১৮৭৭—৭৮, দ্বি-স—১২৯১।

'কপালকুণ্ডলা'র শ্যামাসুন্দরীর প্রতি কপালকুণ্ডলার উক্তির মত। কাণপুরে আহত শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শুশ্রূষাকারিণী যবনীবেশী বিন্ধ্যবাসিনীর দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ-অন্তে বিন্ধ্যবাসিনীকে চেনা সত্ত্বেও আদর্শরক্ষাহেতু অকারণে নিষ্ঠুরভাবে শরৎচন্দ্রের পরিত্যাগ, শৈবলিনীর উপর আদর্শবাদী প্রতাপের আচরণ স্মরণ করিয়ে দেয়। পরিচ্ছেদগুলির নামকরণ-রীতি বঙ্কিম-অনুসৃত।

'বান্ধব'[৩১]-এ 'দেবীপ্রসন্নবাবুর গ্রন্থাবলী সমালোচনায়', 'শরৎচন্দ্রের গল্পটিকে মোটামুটির উপর প্রীতিকর' বলা হয়েছে।

'বিরাজমোহন',[৩২] পরবর্তী উপন্যাস। গল্পের নায়ক বিরাজমোহন বিধবার অবৈধ এবং পরিত্যক্ত সন্তান। লেখক জন্ম অপেক্ষা কর্মকেই উপন্যাসটিতে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাছাড়া লৌকিক বিবাহ অপেক্ষা আত্মিক বিবাহকে অধিকতর স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন।

বিধবা সৌদামিনী লোকলজ্জার ফলে অবৈধ পুত্রকে হাঁড়িতে করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। একটি চাষার কাছ থেকে এক জমিদার ৫০০ টাকায় ছেলেটিকে কিনে নিয়ে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে। জমিদারের মৃত্যুর পর উইল অনুযায়ী বিরাজমোহন সব সম্পত্তি পান; কিন্তু গৃহিণীর ইচ্ছায় উইল পরিবর্তিত হতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকায়, ভাই গোবিন্দপ্রসাদের প্ররোচনায় পালিকা মাতা উজ্জ্বলাময়ী উইল পরিবর্তন করে গোবিন্দকে বিষয়সম্পত্তির মালিক করেন। গোবিন্দ পরদিন ভগিনীকে হত্যা করে, বিরাজকে হত্যাকারী বলে জানায়। পুলিস, বিরাজ তার বন্ধু পূর্ণচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্রকে চালান দেয়।

পূর্ণ বিরাজের খুড়তুত বোন বিধবা বিনোদিনীর সঙ্গে আত্মিক বিবাহে আবদ্ধ ছিল। বিরাজ ও পূর্ণ মুক্তি পাবার কিছুকাল পরে, গোবিন্দ খালাস পায়। এক গণকঠাকুরের কাছ থেকে বিরাজের স্ত্রী স্বর্ণ বিরাজের জন্মকাহিনী জানে। পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ স্থির হলে, বিনোদিনীর বিমাতার প্ররোচনায় গোবিন্দচন্দ্র বিনোদিনীকে গ্রামান্তরে নিয়ে গিয়ে এক মূর্খের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। গোবিন্দ স্ত্রীকে হত্যা করে জেলে যায়। বিনোদিনী এক পত্রে জানাল পূর্ণই তার স্বামী। গোবিন্দপ্রসাদের ফাঁসির দিন স্বর্ণ তার সঙ্গে

৩১. বান্ধব, দ্বাদশ সংখ্যা, ১২৯১, পৃ ৫২৯—৩৩।

৩২. বিরাজমোহন, ১৮৭৭, দ্বি-স ১৮৮৫, তৃ-স ১২৯৫, পৃ ১৪৮।

সাক্ষাৎ করার কালে গোবিন্দ তাকে আলিঙ্গন করতে গেলে স্বর্ণ তিনবার পদাঘাত করে চলে এল।

নিগৃহীতা বিনোদিনী পিতার ক্রোড়ে মৃত্যু বরণ করল; তারপর বিরাজের মা সৌদামিনীর আবির্ভাব এবং মাতাপুত্রে মিলন। বিনোদিনীর মৃত্যুর তিন দিন পরে জানা গেল 'ঐ গণকের নামই কালীনাথ চক্রবর্ত্তী, বিরাজমোহনের পিতা'।

গল্পটিতে এ্যাডভেঞ্চারের স্পর্শ আছে। বিধবার অবৈধ সন্তানের সামাজিক স্থান, বিধবাবিবাহের গুরুত্ব এবং বিধবা জননীর সামাজিক স্থান নির্দেশ করা হয়েছে এই উপন্যাসে। এই তিনটি বিষয়ে লেখক আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন এবং এ বিষয়কে প্রতিবাদহীন সামাজিক স্বীকৃতি দান করেছেন। বিবাহসংস্কারের লৌকিক প্রথার ঊর্দ্ধে লেখক আত্মিক তথা আধ্যাত্মিক বিবাহের স্থান দিয়েছেন। (বিনোদিনী-পূর্ণচন্দ্র)

পূর্ণচন্দ্র উদার আদর্শবাদী একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম। বন্ধু বিরাজ তজ্জাতীয়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে, পূর্ণর দীর্ঘ আত্মচিন্তায় কর্তব্যপরায়ণতার মন্ত্রোচ্চারিত হয়েছে। পূর্ণচন্দ্রের মতে, রিপুচরিতার্থতার জন্য বিবাহ নয়, প্রণয়ীজনের মিলনের নামই বিবাহ, ভালোবাসারই এক বিভাগ বিবাহ। বিরাজমোহন যেন বিষণ্ণতার আবরণমণ্ডিত। স্বামীর বিষণ্ণমুখে হাসি ফোটানর জন্য স্বর্ণের প্রচেষ্টা দুঃসাহসিক। নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও স্বামীকে উদ্ধারের চেষ্টা (২য়। ৭ম) স্বামীর প্রতি চরম আনুগত্যের উদাহরণ হলেও কিছুটা অস্বাভাবিক। গণকঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিরাজমোহনের জন্ম-রহস্য উদ্‌ঘাটন করার মূলে স্বর্ণের প্রচেষ্টা স্মরণীয়।

উপন্যাসটি উপদেশমূলক। অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা এবং লেখকের জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য ক্লান্তিকর। বাঙ্গালী পাঠককে আহ্বান করে জ্ঞানগর্ভ উপদেশদান-সমৃদ্ধ পরিচ্ছেদটি (২য় খণ্ড। ৮ম) প্রবন্ধ জাতীয়। পরের পরিচ্ছেদেও (২।৯) প্রায় চার পৃষ্ঠাব্যাপী লেখক ধর্ম সম্পর্কে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। 'প্রার্থনার উপকারিতা কি?' শিরোনামের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রার্থনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক। এইসব বিষয় গল্পের গতিশীলতাকে পদে পদে বাধা দিয়েছে। গণকঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে পূর্ণ-চন্দ্রের উক্তি,—'আপনি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আপনি ভালোবাসার মর্ম কি বুঝিবেন?

বিনোদিনীর ভালোবাসা ও আমার মনের অবস্থা আপনি কি প্রকারে অনুমান করিবেন'…ইত্যাদি (পৃ—১১৪, তৃ-স), চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শেষে রামানন্দ স্বামীর প্রতি প্রতাপের উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া শিল্পরীতি, যথা, খণ্ড বিভাগ, পরিচ্ছেদ বিভাগ, পরিচ্ছেদের শিরোনাম ইত্যাদি বঙ্কিম-অনুসৃত।

আলোচ্যকালে কোন কোন ঔপন্যাসিক অবৈধ সন্তান সমস্যাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেছেন।[৩৩]

দেবীপ্রসন্নর 'সন্ন্যাসী'[৩৪] নীতিভারাক্রান্ত উপন্যাস। পর্বতগুহায় সন্ন্যাসীর সাধনক্ষেত্রে যশোবন্ত সিংহর কন্যা মরীচি যেতেন বিদ্যাভ্যাসের জন্য। মরীচির প্রেম, সারল্য ও স্বদেশানুরাগ এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু। দেশীয় সমাজে প্রচলিত পাপাচারের বিরুদ্ধেও লেখকের লেখনী উদ্যত। উপদেশ ও নীতি-শিক্ষার ভারে উপন্যাসটি জর্জরিত। ঐতিহাসিক বর্ণ দিয়ে লেখক কাহিনীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ইংরাজ সরকারের রাজনৈতিক কর্মধারাকে লেখক আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন। লেখকের স্বদেশানুরাগের এটা উদাহরণ হলেও ঘটনা ও বিষয়-সংস্থাপনে শিল্পকৌশলের অভাবে বিষয়টি প্রবন্ধমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ন্যাসী শিল্প হিসাবে ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও লেখকের ধর্ম ও নীতিচেতনা, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি বিষয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছিল।[৩৫] তৎকালীন সমাজ-মানসের প্রেক্ষিতে এহেন নীতিগর্ভ-রচনা প্রশংসিত হওয়া স্বাভাবিক। দেবীপ্রসন্নর 'আত্মবিবৃতি' থেকে জানা যায় যে, তিনি দার্জিলিং-ভ্রমণের সময় 'সন্ন্যাসী'র উপকরণ সংগ্রহ করেন।[৩৬]

'ভিখারী'[৩৭] বিধবা-প্রণয় ও বিবাহ-প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত। ত্যাগ ও

৩৩. রাধানাথ মিত্রের তারাতীর্থ (১৮৮৯), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের ভিখারিনী (১৮৯১)।

৩৪. সন্ন্যাসী ১৮৭৯, পৃ ১৩৫। অপর সং ১৮৯১, পৃ ১৩৬।

৩৫. (ক) ভারতমিহির, ২১শে চৈত্র ১২৮৫।

(খ) তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ফাল্গুন ১৮০২ শক,—'এইরূপ নীতিপূর্ণ উপন্যাস বাহুল্যরূপে প্রচার হইলেই লোকের কুরুচিপরিবর্তনের সম্ভাবনা।'

(গ) Brahmo Public Opinion, [illegible], 1882.

(ঘ) সোমপ্রকাশ, ৮ই চৈত্র ১২৮৮,—'প্রণয়ের ফল, অর্থের মোহিনী-শক্তি, জিগীষা-বৃত্তির পরিণাম প্রভৃতি ইহাতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি—এরূপ উপন্যাসের বহুলপ্রচার প্রার্থনীয়'।

৩৬. শ্রাদ্ধিকী, ১৩২৭।

৩৭. ভিখারী, ১২৮৮, পৃ ১২৮, দ্বি-স ১৮৮৮ খ্রীঃ।

আদর্শবাদ এই উপন্যাসের অন্যতম আবরণ। ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন দোষ-ত্রুটি ও আদর্শভ্রষ্টের কথা লেখক গ্রন্থে সন্নিবেশ করে গ্রন্থটির সামাজিক পটভূমির ধাপ রচনা করেছেন।

আষাঢ় মাসের বর্ষণমুখর নদীতে নৌকায় এক অসুস্থ বন্ধুকে আর এক বন্ধু নিয়ে চলেছেন কলকাতায়। এক কৃষকের আনুকূল্যে অসুস্থ বন্ধুর স্থান হল কৃষকের (ঈশান) বাড়ি।

কৃপানাথ ঘোষ বিলাতফেরত ব্যারিস্টার হলেও স্বদেশানুরাগী। রোগীযুবক ব্রজনাথ তাঁর ভাই, ব্রজনাথের বন্ধু বেহারীলাল রায়। জমিদার লাঠিয়াল সহ কৃষকের পালিতা কন্যা চিন্তামণিকে ধরে নিয়ে গেল। বেহারী পুলিসে খবর দিল। অবশেষে চিন্তামণি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 'কঠিন শৃংখলে বদ্ধ হইল।' বেহারীর চেষ্টায় ও কৌশলে চিন্তামণি মুক্তি পেল।

এর পরের ঘটনা শুরু হয়েছে দশবছর পরে। 'এই সময়ে কলিকাতায় মহা-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে ব্রাহ্মধর্ম এক হস্তে সত্য ন্যায় পবিত্রতা লইয়া কুসংস্কারের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অপর হস্তে সংস্কারের জীবন্ত উৎসাহ জলন্ত বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত করিয়া হিন্দুসমাজের কুক্ষিস্থিত অন্ধকারকে পরাজয় করিয়া জ্ঞানালোক প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিধবাবিবাহ যাহাতে দেশে প্রচলিত হয়, বাল্যবিবাহ যাহাতে দেশ হইতে উন্মূলিত হয়, কৌলীন্য-প্রথা যাহাতে আর সমাজের অস্তি-[৩৮] মজ্জাকে ভেদ করিয়া শক্তি অপহরণ না করে এজন্য আন্দোলন উঠিয়াছে।' কৃপানাথ এখন অর্থশালী। ব্রজনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাঙালী-বিদ্বেষী ম্যাজিস্ট্রেট। বিজয়গোবিন্দ বেহারীর সহায়তায় কৃপানাথের পরামর্শে বিধবা বোন গিরিবালাকে কলকাতায় কৃপানাথবাবুর বাড়ি রেখেছে। ৪।৫ বছর ধরে সে স্কুলে পড়াশুনা করছে। গিরিবালার পত্র পেয়ে বেহারী তাকে উদ্ধার করে ব্রজনাথের হাত থেকে। তারপর বিজয়গোবিন্দকে দিয়ে তাকে মুংগের পাঠায়।

বেহারী ভিখারীর বেশ ধারণ করল। গিরিবালা তার প্রতি প্রেমাসক্ত জেনে বেহারী মর্মাহত হল।

ঈশাণ কলকাতায় মুদির দোকান করল এবং চিন্তামণিকে খুঁজতে লাগল।

৩৮. অস্থি হবে।

বেহারীর সঙ্গে চিন্তামণির পত্রের যোগ থাকে। বিজয় বোন গিরিবালাকে নিয়ে কর্মস্থল সাবাজপুরে চলে গেলে, বেহারী বাড়ি গিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের গুণকীর্তন করতে লাগল।

চিন্তামণির পূর্বপরিচয়ে জানা যায় যে বৃদ্ধ কুলীনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মেঘনায় ডুবতে গিয়ে ডাকাতদের কবলে পড়ে। তার নাম কুসুম থেকে হয় চিন্তামণি। ডাকাতসর্দার চাষীতে পরিবর্তিত হয়ে ঈশান মণ্ডল হয়। ব্রজনাথ বেহারীর অনুপস্থিতিতে এক ভণ্ড সংস্কারকের সঙ্গে চিন্তামণির বিয়ে দেয়। স্বামী ভবানীর সঙ্গে ঘর করলেও কুসুম কথা বলে না। বেহারী ঈশানকে নিয়ে অসুস্থ ভবানীকে দেখতে এলে সে অনুতাপ ও আত্মগ্লানির কথা জানায়। এর পরে চিন্তামণি ভবানীর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে বেহারীকে বিবাহের ইচ্ছা জানায়। বেহারী টেলিগ্রাম পেয়ে বিজয়গোবিন্দের জলপ্লাবিত কর্মস্থলে গিয়ে গিরিবালার মৃতদেহ উদ্ধার করে। বেহারী চিন্তামণিকে চিঠিতে জানায় ঈশানের আশ্রমে ধর্মযোগিনী হতে। তারপর জীবনের বাসনা ছিন্ন করে বেহারী 'চিরদিনের জন্য পলায়ন করিলেন'।

লেখক চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'গ্রন্থকারের প্রতিজ্ঞা'য় বলেছেন—'দেশের প্রচলিত কতকগুলি আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্ন[৩৯] কটাক্ষপাত করিতে চেষ্টা করিব, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়।' লেখকের এক প্রকার উদ্দেশ্য শিল্পে রূপায়িত করতে গিয়ে লেখককে শিল্পীর ভূমিকা থেকে অনেকখানি দূরে সরে আসতে হয়েছে। যার ফলে, বক্তব্যও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। বরং প্রবন্ধাকারে লেখকের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হতে পারত। লেখকের সাধ্যের অভাবে সাধপূর্ণ না হওয়ায় তাঁর উচ্চকণ্ঠ নিস্ফলবাণী উচ্চারণ করেছে। লেখকের আত্মচিন্তা ও উপদেশ-মূলক সুদীর্ঘ বর্ণনা উপন্যাসটির গল্পরস ব্যাহত করেছে। কয়েকটি ঘটনাকে একসূত্রে বাঁধতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। প্লটের শৈথিল্য কাহিনীর ঐক্য রক্ষা করতে পারেনি। চরিত্রগুলির উপর লেখকের আত্মভাব অধিকমাত্রায় পড়ায় অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। গল্পের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করতে গিয়ে লেখকের অনাবশ্যক বর্ণনা বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন ভণ্ডামির প্রতি লেখক কটাক্ষপাত করেছেন। ব্রজনাথ, কৃপানাথের সহায়তায় বিধবা গিরিবালাকে তার ইচ্ছায়

৩৯. তীক্ষ্ণ হবে।

বিরুদ্ধে বিবাহ করতে গেলে গিরিবালা বেহারীকে জানায় 'আমি বিবাহ করিব না,—তবুও কি আমাকে ছাড়িবে না? এই যদি এই সমাজের ব্রত হয়, এই যদি এই সমাজের বিবাহের প্রণালী হয় তবে কেন দাদা আমাকে এই সমাজে আনয়ন করিয়াছিল?' (পৃ. ৩৯) শিক্ষিত ও ব্রাহ্ম-সামাজিকদের কাপট্যকে অনাবৃত করেছেন লেখক।[৪০]

বেহারীর আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটতে দেখি এই উপন্যাসে। বেহারীর সততা আত্মত্যাগ ও উপচিকীর্ষা তার চরিত্রের ত্রিবিধ গুণ। তবে তার ভিখারীর বেশধারী হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা তার আত্মত্যাগের বর্ম বিশেষ মনে করা যেতে পারে। গিরিবালার চরিত্রটি সহানুভূতিলাভের দাবি রাখে। স্বামীর মৃত্যুর পর বিচ্ছেদকাতরা চিন্তামণির বেহারীকে বিবাহেচ্ছাজ্ঞাপন তার চরিত্রের পূর্বাচরণের সঙ্গে অসঙ্গতিজনক। কৃপানাথ ভণ্ড-তপস্বী, ব্রজনাথ অকৃতজ্ঞ লোভী ও স্বার্থপর, ব্রাহ্মধর্মসংস্কারক ভবানীকান্ত তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্করূপে চিত্রিত হয়েছে।

পরিচ্ছেদের শিরোনাম, গ্রন্থমধ্যে পাঠককে আহ্বান প্রভৃতি শিল্পরীতি বঙ্কিম-অনুসৃত। 'বঙ্গবাসী'[৪১]র সমালোচক 'ভিখারী'র ভাষা ও চিত্রকল্পের প্রশংসা করেছেন। 'সোমপ্রকাশ'[৪২]এ সমালোচনায় বলা হয়েছে, 'দূষিত প্রণয়ে পুস্তকখানি কলঙ্কিত হয় নাই। জমিদারের অত্যাচার, ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা, শিক্ষিত লোকের বিশ্বাসঘাতকতা, চিত্তচাপল্য ও চিত্তদৌর্বল্যতা[৪৩] দস্যুর মনে ধর্মভাব, প্রকৃত জ্ঞানী বেহারীর ধৈর্য ও আশ্চর্য ধর্মপ্রবৃত্তি এবং চিন্তামণির অকৃত্রিম প্রণয়বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ করিয়াছি'। 'নব-বিভাকর'[৪৪] পত্রিকায় সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'ভিখারী পড়িলে যুগপৎ চিত্তবিনোদন ও উপদেশ লাভ হয়।' 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'[৪৫] ও 'হিন্দুদর্শন'[৪৬] পত্রিকায়ও গ্রন্থটি সমালোচিত হয়।

বিধবা-প্রণয় ও বিবাহের স্বাভাবিক অধিকার ভিখারীতে স্বীকৃত।

৪০. নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের অযৌক্তিকতার বিষয়ে রচিত উপন্যাস: পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের চিরসঙ্গিনী (১২৮৫)।

৪১. বঙ্গবাসী, ১লা ফাল্গুন ১২৮৮।

৪২. সোমপ্রকাশ, ২৯ চৈত্র ১২৮৮।

৪৩. দৌর্বল্য হবে।

৪৪. নববিভাকর, ২৯ চৈত্র ১২৮৮।

৪৫. ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন, মার্চ ২, ১৮৮৮।

৪৬. হিন্দুদর্শন, চৈত্র ১২৮৮।

'যোগজীবন'[৪৭] উপন্যাসে বহুবিবাহ ও কৌলীন্য-প্রথার কুফল দেখান হয়েছে। তাছাড়া এই উপন্যাসে নারীর সমানাধিকারকে স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা আছে। কৌলীন্য-প্রথাকে লেখক বহুবিবাহের জন্য দায়ী করেছেন। যার ফলে ভ্রূণহত্যা এমনকি স্বামিহত্যা সমাজকে কলঙ্কিত করছে।

হরিহরের পাঁচ স্ত্রীর মধ্যে অষ্টাদশী সুশীলা তার সর্বাধিক প্রিয়। তার অপর স্ত্রী জ্ঞানদার অবৈধ গর্ভ হলে তাকে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং শ্যালকেরা হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সুশীলার পরামর্শে হরিহর কলকাতায় হৌসের দালালি শুরু করে। ক্রমে সে একটি অসৎ মানুষে পরিণত হয়। তার ত্রয়োদশী স্ত্রী বসন্তকুমারীর সঙ্গে গৃহশিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রের বিবাহ দেয় ৩০০০ টাকার বিনিময়ে। শেষে জালিয়াতি করে জেলে যায়।

জ্ঞানেন্দ্র জমিদারিতে ফিরে নাম নেয় গজেন্দ্রনারায়ণ। বসন্তের নাম হয় প্রভাবতী। স্বামীর শোকে পাগলিনীপ্রায় সুশীলা ঘটনাচক্রে এবং প্রভাবতীর প্রচেষ্টায় রাজার সাহায্য লাভ করে। নায়েব শিবশঙ্করের কথায় গজেন্দ্র তাকে বিয়ে করে। প্রভাবতীর হয় নির্বাসন।

প্রভার পুত্র সরোজকে সুশীলা লোক দিয়ে হত্যা করায়। সুশীলার প্রিয়পাত্র হয়ে নায়েব শিবনারায়ণ ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। প্রজারা ক্ষিপ্ত হয়ে শিবনারায়ণকে হত্যা করে। প্রভাবতীর হস্তক্ষেপের ফলে রাজা রক্ষা পায়। শেষে প্রভাবতী ও গজেন্দ্রনারায়ণের পুনর্মিলন হলে অনুতপ্ত সুশীলা গৃহত্যাগ করে। অনুশোচনায় জর্জরিত হয় সে।

হরিহরের সঙ্গে জ্ঞানদার পুনর্মিলন হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে কোন অন্যায় কর্মের জন্য উভয়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

লেখক কৌলীন্য-প্রথার চরম অহিতকর ফল কল্পনা করেছেন এই উপন্যাসে। যার ফলে উপন্যাসের ঘটনাবলী ও চরিত্র অনেকাংশে অস্বাভাবিকতাকে আশ্রয় করেছে। রচনাটি বক্তৃতাধর্মী। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে লেখক সুযোগ বুঝে আক্রমণ করেছেন। বিবাহিতা কুলীন বধূর দ্বিতীয় বিবাহ (বসন্তকুমারী-জ্ঞানেন্দ্র এবং সুশীলা-গজেন্দ্রনারায়ণ) স্বচ্ছন্দে ঘটেছে এই উপন্যাসে। অথচ বিবাহিতা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ ও প্রণয় তখনকার সমাজে ছিল একটি অকল্পনীয় ঘটনা। বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের সাহায্যে লেখক

৪৭. যোগজীবন, ১২৮৪, পৃঃ ১২৭।

তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন। যেমন 'কিসের অভাবে বাংলার এই দুর্দশা' (৩য়। ৬ষ্ঠ) শীর্ষক পরিচ্ছেদে লেখক বাঙ্গালীর সার্বিক অধঃপতনের কারণ নির্ণয় ও সমালোচনা করেছেন। এই অংশটি জ্ঞানগর্ভ-প্রবন্ধজাতীয়। সুশীলাকে লেখা হরিহরের পত্রে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্ন লেখক উত্থাপন করেছেন—'একজন অধিকার পাইবে—বারংবার জঘন্য কার্য করিয়াও সমাজে স্থান পাইবে, আর একজন পাইবে না একথাকে আমি ঘৃণা করি' (পৃ. ১০৪)।

প্রভাবতী ও গজেন্দ্রনারায়ণের পুনর্মিলন, যোগজীবনের দীক্ষা প্রসঙ্গে সাধক সন্ন্যাসীদের ভূমিকা বঙ্কিমরীতি-অনুসৃত। তাছাড়া রচনারীতি, যথা খণ্ড, পরিচ্ছেদ, শিরোনাম, পাঠককে আহ্বান প্রভৃতি রীতি বঙ্কিম-অনুসারী।

হরিহর-সুশীলার চারিত্রিক পরিবর্তন অভাবনীয়। চরিত্রগুলির ভিত্তি-রচনায় লেখকের কোন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। হরিহরের অমানুষিক ও অসৎ মনোবৃত্তির মধ্যেও যে একটি সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ মন ছিল, লেখক সেটিকে সুপরিস্ফুট না করে, তার দোষগুলিকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। সুশীলা ও প্রভাবতী উভয় চরিত্রই অস্বাভাবিক। গজেন্দ্রনারায়ণ সংস্কারমুক্ত হলেও অবিবেচক। লেখক কলমের খোঁচায় মনুষ্য-চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করেছেন। মনস্তত্ত্বের পথ ধরেননি। তাই চরিত্রগুলি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি।

'বামাবোধিনী'[৪৮] পত্রিকায় 'নবেলের পাঠোপযোগিতা' নিবন্ধে 'যোগ-জীবনের দীক্ষা' নামে পরিচ্ছেদটির গুণকীর্তন করা হয়েছে।

বিবাহিতা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ-প্রসঙ্গ আলোচ্যকালে দুজন লেখকের উপন্যাসে পাই।[৪৯]

আলোচ্যকালে আরও কয়েকটি উপন্যাসে কৌলীন্য-প্রথার কুফল প্রদর্শিত হয়েছে।[৫০]

৪৮. বামাবোধিনী, শ্রাবণ ১২৯০, অগস্ট ১৮৮৩, পৃ. ১২৬।

৪৯. (১) পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য : কুলবালা (১৮৮৫) (কুলবধূর দ্বিতীয় বিবাহ বিষয়ে লিখিত)।
(২) হারাণ শশী দে : রাণী মৃণালিনী (১৯০০)

৫০. (১) প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় : সমাজকালিমা (১৮৮৫)
(২) রাম নৃসিংহ চট্টোপাধ্যায় : সুরেন্দ্রনন্দিনী (১৮৮৫)
(৩) নগেন্দ্রনাথ বসু : একটি চিত্র (১৮৮৬)
(৪) দীনেশচরণ বসু : নিরাশ প্রণয় (১৮৮৮)
(৫) কুসুমকুমারী : স্নেহলতা (১৯৮০)

'নবলীলা'য়[৫১] লেখক ধর্মের নবলীলার বিচিত্র-চিত্র অঙ্কন করেছেন।

অর্থলোভে ভ্রষ্টামাতা, কন্যাদ্বয় সুলোচনা ও কুলকামিনীকে বিপথে পরিচালিত করতে চায়। সুলোচনা ও কুলকামিনী একযোগে বিপদ্‌মুক্ত হবার চেষ্টা করে। কালীমন্দিরে পুরোহিতের আদেশে, মা কুলকামিনীকে সকলের সামনে সুরা পান করাতে বললে গোরাচাঁদ পারে না। নিরাশ্রয় সুলোচনা বনের মধ্যে জগন্মাতাকে ডাকতে থাকে। বিনোদ যেন স্বপ্নে সুলোচনাকে সাহস দান করে। বিনোদের কুলটা স্ত্রী শান্তিময়ী মৃত্যুর পূর্বে সুলোচনার হাতে বিনোদকে দিয়ে যায়। যোগানন্দ স্বামী এণ্ডারসন, জেলী, বিনোদ সুলোচনা নির্বাণ অরণ্যে কুটীর নির্মাণ করে আশ্রম স্থাপন করল। এণ্ডারসন ও জেলী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে মানবপ্রেমিক হল। এখানে সকলেই সকলের স্বামী সকলেই সকলের স্ত্রী। ভারতের বিন্দু পরিমাণ স্থানে 'নবলীলা' বা 'নবধর্ম' প্রতিষ্ঠিত হল। লেখকের আশা 'যখন দিন ফিরিবে, তখন মহামিলনের মহাশাস্ত্র ঘরে ঘরে অধীত হইবে, তখন গৃহে গৃহে নবলীলা অভিনীত হইবে।'

আদর্শবাদের চাপে 'নবলীলা' পঙ্গুত্বলাভ করেছে। লেখক যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে 'ইমোশানের' স্রোতে ভেসেছেন। 'নবলীলা' বা 'নবধর্ম'কে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে লেখক হিন্দুর শাক্ত মতবাদকে বিকৃত করেছেন। কালীমন্দিরে মদ্যপান সহ নগ্ন-উন্মত্ততা কালীকে নবশোণিত-পিপাসিনী বলে অভিহিত করা প্রভৃতি বিষয় শাক্তধর্মের বিকৃতরূপ প্রদর্শনের কৌশলরূপে গণ্য করা চলে। উলঙ্গ হয়ে মদ্য পান করে নারীসঙ্গ করা' বীভৎস রীতি (১।২) লেখক সমকালের ধর্মচারণার ক্ষেত্রে কোথায় পেলেন, জানা যায় না। এইসব ঘটনাই নবধর্মের ভিত্তিরচনার ধাপ! সুলোচনা, বিনোদ, এণ্ডারসন, জেলী, যোগানন্দ প্রভৃতি চরিত্র অতিরিক্ত আদর্শায়িত হওয়ায় অস্বাভাবিক।

সুলোচনার স্বপ্ন কুন্দনন্দিনীর (বিষবৃক্ষ) স্বপ্নের সাদৃশ্যবাহী।

'অপরাজিতা'[৫২]য় ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় এই প্রচলিত আপ্ত-বাক্যটিকে লেখক রচনার প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছেন। চরিত্রবল, সততা, দান, সেবা প্রভৃতি মানুষের মহৎ গুণাবলীর চরম বিকাশ ঘটিয়েছেন লেখক

৫১. নবলীলা, ১২৯২, পৃ ১৬৮।

৫২. অপরাজিতা, ১২৯৬, পৃ ১৩৬

এই উপন্যাসে। লোভ লালসা ও পাপের পতন এবং শাস্তির চিত্রও প্রদর্শিত হয়েছে।

স্বর্ণকলি কিভাবে বাধাবিপত্তি ও প্রলোভনের হাত এড়িয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করে ও আপন চরিত্রবলে অত্যাচারীকে ক্ষমা করে মহত্বের স্বাক্ষর রেখে শেষে ধর্মজীবনসাধনায় নিজেকে নিযুক্ত রাখল, সেই কাহিনীই লেখক গ্রন্থিত করেছেন এই উপন্যাসে। বুদ্ধি, শক্তি ও প্রেমের ত্রিবেণী-সংগম ঘটেছে এই উপন্যাসের তিনটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সেই তিনটি চরিত্র হল যথাক্রমে, শ্রীনাথ, বলরাম ও হরিদাস।

হরিদাস ভগিনী স্বর্ণের প্রতি কলঙ্কদানকারী কয়েকজনকে হত্যা করে, স্বর্ণের অনুরোধে পুলিসে আত্মসমর্পণ করতে গৃহত্যাগ করে। স্বর্ণকলির চরিত্রবল ও ঈশ্বরে বিশ্বাস (হরি), তাকে জীবনের সর্ববিধ কঠিন পরীক্ষা থেকে রক্ষা করে। সে গৃহে অতিথিশালা স্থাপন করলে, হতাশ প্রণয়ী দীননাথ আশ্রমে আগুন দেয়। মায়ের স্মৃতিবিজড়িত শ্মশানে অবস্থানকালে ভণ্ড রামানন্দ স্বামীর অত্যাচারের হাত থেকে সে রক্ষা পায়। স্বর্ণ হরিদাসের বন্ধু ধনী শ্রীনাথের লালসাগ্নির হাত থেকেও আত্মরক্ষা করে।

দাদার বন্ধু বলরামের গুলিতে শ্রীনাথের মৃত্যু হলে, সে সব সম্পত্তি জনহিতার্থে উইল করে। স্বর্ণকলি সাধনমানসে বৃন্দাবনে যায়, বৈদ্যনাথের কাছে তপোপাহাড়ে অপরাজিতা দেবী নামে তপস্যানিরত হয়। বলরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, বলরাম দান্তাবনে অপরাজিতা-আশ্রম স্থাপন করে।

হরিদাসের আশ্রয়দাতার গৃহে ডাকাতি হওয়ায় লীলার বাবা-মার মৃত্যু হয়। বিধবা লীলাকে বলরামের আশ্রয়ে রেখে হরিদাস আন্দামানে কারাবাসে যায়। দীননাথ ও রামানন্দের প্রাণ নেয় বলরাম। অপরাজিতা তপোপাহাড় ত্যাগের পূর্বে বলরামকে সোনাপুরে গিয়ে লীলাকে বিয়ে করতে বলে। ১২৮৩ সালে ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণকালে হরিদাস মুক্তি পেয়ে কলকাতায় আসে। শ্রীনাথের উইলমত স্বর্ণকলির মাতৃশ্মশানে 'অপরাজিতার অনাথ আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়।

নীতি ও আদর্শের তাড়নায় উপন্যাসটি লিখিত হওয়ায় রচনাটি শিল্প-পদ থেকে প্রচারের ক্ষেত্রে নেমে এসেছে। তত্ত্বের বাহুল্য, তর্কের অতি-বিস্তার, নীতিশিক্ষা ও উপদেশের বাড়াবাড়ি উপন্যাসটির প্রধানতম ত্রুটি।

আদর্শের চাপে অধিকাংশ চরিত্র আচ্ছন্ন। দেবীপ্রসন্ন দাতা ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। হরিদাস ও স্বর্ণকলির চরিত্রে তার প্রতিফলন ঘটেছে। লেখকের ব্রাহ্মমতবাদও এই উপন্যাসে প্রচারিত হয়েছে। বৃন্দাবনে ধর্মাত্মা ও স্বর্ণকলির কথোপকথনে পৌত্তলিকতার প্রতি অনাস্থাবাদ ঘোষিত হয়েছে (পৃ. ১৩৬)। প্রার্থনাবাদী লেখকের চারিত্রিক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় স্বর্ণের চরিত্রে।

স্বর্ণ আদর্শতাড়িত। সে ক্ষমার মূর্তবিগ্রহ। স্বর্ণকলির অপরাজিতায় রূপান্তর আদর্শবাদের উৎকট স্বাক্ষর। হরিদাস পরোপকারী ঈশ্বরবিশ্বাসী ও অতিথিবৎসল। তার ভগিনীপ্রীতি লেখকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকদীপ্ত। বলরাম দাস্তা ধনী ডাকাত হওয়া সত্ত্বেও আদর্শবাদী ও সহনশীল। তার অর্থ ব্যয়িত হত, নিম্নশ্রেণীর মানুষের সেবায়। সে অত্যাচারী কিন্তু লম্পটের দণ্ডদাতা। শ্রীনাথ, দীননাথ ও রামানন্দের হত্যাকারী বলরাম রক্তে-মাংসে গড়া মানুষের পর্যায়ে পড়ে। দীননাথের বিধবা স্ত্রী সেবার পতিতাবৃত্তি-গ্রহণ বালবিধবাদের পতনের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে গণ্য করেছেন লেখক। কলকাতার পতিতাদের মধ্যে অধিকাংশই যে গৃহস্থঘরের বালবিধবা একথাও তিনি বলেছেন।

হরিদাস, শ্রীনাথ এবং বলরামের প্রতিজ্ঞাবাণীর মধ্যে সমাজসেবী, চরিত্রবান, পরোপকারী প্রভৃতি হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংরেজের মুখাপেক্ষী না হবার এবং বিধাতার উপর নির্ভর করে 'এই জাতি ভবিষ্যতে যাহাতে স্বাধীন হইতে পারে তজ্জন্য প্রাণপণ' চেষ্টা করার কথা উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত শপথবাণী কার্যকরী করার কোন ধাপ বা পন্থা, এই উপন্যাসে রচিত হয় নি।

অপরাজিতা নীতি, ধর্ম, তত্ত্ব ও আদর্শভাবাক্রান্ত একটি প্রচারধর্মী উপন্যাস।

'মুরলা'[৫৩] তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের কোন্দল ও অনাচারের আবর্তসঙ্কুল পরিবেশে রচিত, একটি বালবিধবার চরিত্র হারিয়ে ফিরে পাওয়ার এবং তা রক্ষা-কল্পে জীবনবিসর্জনের কাহিনী। উপন্যাসের নায়িকা মুরলা, লেখকের সহানুভূতিধন্যা। উৎসর্গপত্রে লেখকের উক্তি উপন্যাসটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করে।

৫৩. মুরলা, ১২৯৯, পৃ ১৬৪।

'আমি ব্রাহ্মসমাজকে ভালবাসিয়াও সম্প্রদায়ের উপরে উঠিতে চাই। ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি পাপে ডুবিতেছে, ইহা আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার দু'টি উপায় বুঝিয়াছি। একটি উপায় বিধাতার নিকট প্রার্থনা করা; আর একটি উপায় নিরপেক্ষভাবে সত্য ঘোষণা করা...পবিত্রহৃদয়া মুরলার চিত্র আঁকিবার সময় অপরিহার্যরূপে, সত্যের অনুরোধে, ব্রাহ্মসমাজের অনেক কথা আসিয়া পড়িয়াছে।'

মুরলা বালবিধবা। সুপ্রসন্নের সংস্পর্শে এসে তার চরিত্র কলুষিত হয়। সে শেষপর্যন্ত ভগিনীপতি অরবিন্দের কাছে কলকাতায় চলে আসে। অরবিন্দ ব্রাহ্ম। মুরলা কলকাতায় এলেও সুপ্রসন্ন হাল ছাড়ে না। অরবিন্দের আশ্রয়ে এসে মুরলা পড়াশুনায় মন দেয় এবং সুপ্রসন্নের চিঠিগুলি অগ্রাহ্য করে ধর্মপথে চলার ধাপ রচনা করে।

ব্রাহ্মধর্মের প্রতি মুরলা আকৃষ্ট হয়। অরবিন্দ ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে সে উপহসিত হয়। মুরলা কলকাতায় এসেও বিপদমুক্ত হতে পারে না। সুপ্রসন্ন ছাড়াও ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দেবার কারণে, অনেকেই তার সঙ্গে শক্রতাচরণ করে।

সুপ্রসন্ন মুরলাকে লিখিত পত্রের উত্তর না পেয়ে, শেষে হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর বিদায়-অভিনন্দনে যোগ দিয়ে ফেরার পথে একরাত্রে মুরলা সুপ্রসন্ন কর্তৃক নিহত হয়। বিচারে সুপ্রসন্নর ফাঁসি হয়।

ব্রাহ্মসমাজের কোন্দল ও মতানৈক্যের দোদুল্যমান অবস্থার আবর্তে মুরলার সমস্যাপীড়িত জীবন যুক্ত করে লেখক ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতির এবং ঔদার্য ও মানবিকতার দিক যেমন উদ্ঘাটিত করেছেন, তেমনি মুরলার চরিত্র হারিয়ে চরিত্র ফিরে পাবার কঠিন পরীক্ষার ধাপগুলি গড়ে তুলেছেন ও চরিত্ররক্ষার জন্য মুরলার জীবনবিসর্জনের চিত্র অঙ্কন করে তার চরিত্রে মহত্ত্ব দান করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন রীতিনীতি, আচরণ, আদর্শগত দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ প্রভৃতি বিষয় লেখক উপন্যাসের মূলকাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে এবং কুটিল তর্কজাল বিস্তৃত করে উপন্যাসটিকে উদ্দেশ্যপ্রধান করে তুলেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, বালবিধবাদের সমস্যা। ব্রাহ্মদের কাছে গ্রন্থটি শিক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

অরবিন্দ আদর্শবাদী ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ-প্রথা ও সংকীর্ণতার

বিরুদ্ধে অরবিন্দের প্রচেষ্টা বিরোধীদল কর্তৃক উপহসিত হলেও তার অদম্য মনোবল তার মতবাদকে জয়ী করেছে। কেশব সেনের কন্যার বিবাহ নিয়ে লেখক ব্রাহ্মসমাজ-বিভক্তির কথা উল্লেখ করে, অরবিন্দকে কেশব সেনের বিরুদ্ধদলভুক্ত করেছেন। মুরলা ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দেবার যে পাঁচটি কারণ দেখিয়েছে এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে যে মত জ্ঞাপন করেছে (পৃ. ১২১—পৃ. ১২৪) প্রকৃতপক্ষে সেইগুলিই লেখকের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজের গলদ ও সমস্যা বলে ধরা যেতে পারে। তৎসত্ত্বেও মুরলার কাছে ব্রাহ্মসমাজ আদর্শ; উদারতার আলোকে উদ্ভাসিত।

কাহিনীভাগ তত্ত্বভারাক্রান্ত। বিষয়বস্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ায় শৈল্পিক ত্রুটি উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসটি তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের একটি প্রতিচ্ছবি বিশেষ।

'পুণ্যপ্রভা'[৫৪] স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়ে জনহিতায় নরনারীর আত্মোৎসর্গের কাহিনী। ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর সাবডিভিসনের এক দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাস শুরু। বিধিকৃষ্ণপুরের এক ব্রাহ্মণ তারানাথ, তার স্ত্রী প্রসন্নময়ী ও কন্যা পুণ্যপ্রভাসহ দুঃস্থদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। তার গৃহ ক্ষুধার্ত মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। কিন্তু তার দান ও মানব-প্রীতি স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও গ্রামের জমিদার হরিগোপালের কাছে বিসদৃশ লাগে এবং সে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। হরিগোপাল চোরনগরের রাজা কালীকান্তের সঙ্গে চক্রান্ত করে এক রাত্রে তারানাথের বাড়ি থেকে পুণ্যপ্রভাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য, কালীকান্তের সঙ্গে পুণ্যপ্রভার বিবাহদান। জমিদারদের ভয়ে তারানাথের পক্ষে কেউ সাক্ষ্য দিতে চায় না। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত পুলিস ঘুষ নিয়ে চুপ করে থাকে। বিচারে অপরাধীদের কারাদণ্ড হয়। দণ্ডলাভের অল্পকাল পরে কারাগৃহে তাদের মৃত্যু হয়।

পুণ্যপ্রভা গৃহে ফিরে আসে। তারপর ঘটনাচক্রে একজন আদর্শবাদী মানবপ্রেমিক যুবকের সঙ্গে তার ধর্মের মিলন হয়। প্রেমাঙ্কুর এবং পুণ্যপ্রভা জনসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে। প্রসন্নময়ী তাদের সংযম সম্বল করে সেবা-ধর্ম পালনের নির্দেশ দেয় এবং তাদের নামকরণ করে ভবকিঙ্কর ও ভবকিঙ্করী।

৫৪. পুণ্যপ্রভা ১৩০৩, পৃঃ ২৩৪। 'উৎসর্গ' পত্রের তারিখ ২৮শে চৈত্র ১৩০২ সাল।

বিবাহান্তে এই যুগল বিধিকৃষ্ণপুর ত্যাগ করে। হরিগোপালের স্ত্রী শান্তিশীলা তারানাথের দানকর্মের ভার নেয়।

এই উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র লেখকের আদর্শবাদের দ্বারা তাড়িত। তারানাথ, পুণ্যপ্রভা, প্রসন্নময়ী ও প্রেমাঙ্কুর চরিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত। পুণ্যপ্রভার বন্ধু দীপ্তির পুণ্যপ্রভার জন্য প্রাণদান সহজেই অন্তর স্পর্শ করে। আদর্শের আবেগে উপন্যাসটির ঘটনা ও চরিত্র স্পন্দমান। প্রেমাঙ্কুর ও পুণ্যপ্রভার আধ্যাত্মিক বিবাহ লেখকের অত্যাদর্শসম্ভূত অবাস্তব পরিকল্পনা। লেখকের অনুরূপ প্রচেষ্টা, তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস বিরাজমোহনএ (বিনোদিনী-পূর্ণচন্দ্র) লক্ষ্য করি। দেবীপ্রসন্নর উপন্যাসের মধ্যে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা যেমন দেখা যায়, তেমনি আদর্শবাদ, সংযম, কর্তব্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরবিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে দেখি। যার ফলে প্রগতিবাদী ও নীতিবাদী উভয়ের কাছে দেবীপ্রসন্নর উপন্যাস আদৃত ও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সমালোচকের কাছে তাঁর লিপিচাতুর্য ও শিল্পকৌশল আদৃত হয় নি। 'বামাবোধিনী পত্রিকায়'[৫৫] 'নভেলের পাঠোপযোগিতা শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'দেবীবাবুর' 'বিরাজ-মোহন' 'ভিখারী' এবং 'যোগজীবন' অতিসুখপাঠ্য সারগর্ভ এবং সাধুভাবে পরিচালিত। তবে এইস্থানে একথাটাও বলিয়া রাখি, যে লিপিচাতুর্যের কিঞ্চিৎ ত্রুটিবশত, মূলগল্প তত হৃদয়াকর্ষক হইতে পারে নাই আর উদ্দিষ্ট সদ্ভাবগুলিও তত সহজে মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না'। 'বান্ধব'[৫৬]-এ 'দেবী-প্রসন্নবাবুর গ্রন্থাবলী' সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন 'দেবীবাবু ভাষা সম্বন্ধে যেরূপ অসাধারণ, ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। গল্পরচনাতেও দেবীবাবুর অসাবধানতার ও অধৈর্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। শিল্পরীতির ক্ষেত্রে দেবীপ্রসন্ন বঙ্কিমপন্থী। গ্রন্থন-পারিপাট্যের অভাব, তাঁর প্রতিভার দীনতা। দেবীপ্রসন্নর মনোভাব ও হৃদয় তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত। এই কারণেই তাঁর উপন্যাস যেমন তত্ত্ববহুল তেমনি ভাবাবেগসমৃদ্ধ।

৫৫. বামাবোধিনী, শ্রাবণ ১২৯০, পৃ. ১২৬।

৫৬. বান্ধব, দ্বাদশ সংখ্যা, ১২৯১, পৃ. ৫২১—৩৩

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪—১৯০৫)

'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ইন্দ্রনাথ-নির্দেশিত পথে ব্যঙ্গ-সাহিত্যরচনার ধারাটিকে প্রসারিত করেছেন। ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক হিসাবে ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র একই জাতীয় মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের আবির্ভাবের পটভূমি রচনা করেছেন ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথের তুলনায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ আরও তীব্র ও প্রত্যক্ষ এবং অনেকাংশে অতিরঞ্জিত। চরিত্রচিত্রণে ও ঘটনাবর্ণনায় অতিশয়োক্তি তাঁর উপন্যাসকে পূর্ণমর্যাদাদানে বিরত থেকেছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের উগ্রহিন্দুত্ববোধ ও ধর্মচেতনা তাঁর উপন্যাসকে কখনও বা তত্ত্বভূষিত করে দৈহিক স্ফীতি ঘটিয়েছে এবং তার ফলে শিল্পসুষমামণ্ডিত না হয়ে তত্ত্বপ্রধান ও উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠেছে। ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক শিল্প সন্দেহ নেই। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের কলঙ্কমোচনের স্বেচ্ছাদায়িত্ব গ্রহণ করেছে ব্যঙ্গ-সাহিত্য। বিকৃতিহীন সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজগঠন এবং মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করাই ব্যঙ্গ-সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। তবে উদ্দেশ্যমূলকতার অবকাশের সূত্র ধরে শিল্পকে যদি একান্তভাবেই প্রচারের বাহনে পরিণত করা হয়, তাহলে শিল্প মর্যাদাভ্রষ্ট হয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে মাত্রার প্রশ্ন এসে পড়ে। উদ্দেশ্যমূলকতার মাত্রাধিক্যের ফলেই শিল্পে রসের হানি ঘটে এবং শিল্প বিরসবস্তুতে পরিণত হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্রের উপন্যাসে উদ্দেশ্য-মূলকতার মাত্রাধিক্য ঘটতে দেখি।

উনিশ শতকের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ও দায়িত্বশীল সামাজিকবৃন্দ ব্রাহ্মধর্মের নেতৃত্বে প্রগতিবাদী সমাজ-আন্দোলনকে সুনজরে দেখেন নি। কারণ ব্রাহ্মদের নৈতিক জীবনে এরা সততা ও শুদ্ধির অভাব লক্ষ্য করেছেন। ইন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মদের কাপট্য ভণ্ডামি ও ধর্মের নামে নষ্টামির বিরুদ্ধে ঘোষিত সংগ্রামে যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁর প্রধান সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং উৎসাহী যোদ্ধারূপে প্রয়োজনাতিরিক্ত আঘাত হেনেছেন। ব্রাহ্মদের নৈতিক দুর্বলতাজনিত সাহসের অভাব হঠাৎ সমাজনেতারূপে স্বীকৃতি-আদায়ান্তে হিন্দুসমাজভুক্ত গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা, নারীর অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও স্বাধীনতার ফলে ব্যভিচার ও সামাজিক অধঃপতন প্রভৃতি বিষয়কে যোগেন্দ্র-চন্দ্র তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন। অন্যদিকে হিন্দুধর্মের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষা, হিন্দু ব্রাহ্মণের সততা, শাস্ত্রানুশীলন ও অনাড়ম্বর

জীবন-যাপন, হিন্দুর শাস্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় কখনও বা শিল্পরীতির ঊর্ধ্বে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের উপন্যাসগুলি উপন্যাসের গঠনরীতিকে নিষ্ঠাপূর্ণভাবে অনুসরণ করেনি। নীতিপ্রচার, ধর্ম-ব্যাখ্যা, মন্তব্য, সমালোচনা প্রভৃতির সমবায়ে সৃষ্ট উপন্যাসে বাস্তব চিত্রাঙ্কন ও চরিত্রবিশ্লেষণের অবকাশ খুবই অল্প। এই কারণে উপন্যাসের গঠনপ্রণালীতে অনিবার্যভাবে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। বহুবিধ অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণার ফলে, গঠনসামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্যহীনতা উপন্যাসের ঐক্যের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। তৎসত্ত্বেও যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনাকে উপন্যাসের তালিকাভুক্ত করার পশ্চাতে যৌক্তিকতা বিদ্যমান। যোগেন্দ্রনাথের 'সমস্ত বিশৃঙ্খল, সুদূর-বিক্ষিপ্ত মন্তব্য-আলোচনার কেন্দ্রস্থলে ঔপন্যাসিক বীজ সুস্পষ্টভাবেই নিহিত আছে। মোটকথা, আমরা উপন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সমালোচনার আদর্শের খাতিরে যতই বিধি নিষেধের গণ্ডি রচনা করি না কেন, উপন্যাস কিন্তু এই সমস্ত সমালোচক নির্দিষ্ট ব্যবস্থা-পত্র অবজ্ঞার সহিত লঙ্ঘন করিয়া নিজ বিস্ময়কর, অফুরন্ত রূপবৈচিত্র্যের পরিচয় দিতেছে।'[৫৭]

যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'মডেল ভগিনী'[৫৮] তিন ভাগে সমাপ্ত 'মহাউপন্যাস'। একটি ব্রাহ্ম-পরিবারের শিক্ষিতা বিবাহিতা ও আধুনিকা কন্যার স্বামিত্যাগ, বহু পুরুষের সঙ্গে প্রণয়-লীলা ও পরিণতিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটিতে বহুচরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। 'নব্য বঙ্গের ইতিহাস' ও 'নব্য বাঙ্গালীর জীবন-চরিত' এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। ইংরাজী শিক্ষা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা নারীর দাম্পত্যজীবনে প্রচলিত সতীত্বের আদর্শের বিরুদ্ধে যে বিরোধের সৃষ্টি করেছিল তার বিষময় পরিণতির চিত্র লেখক অসহ্য শ্লেষ ও বিদ্রূপের সাহায্যে উদ্ঘাটিত করেছেন। লেখকের তীব্র পর্যবেক্ষণক্ষমতা, ব্যক্তি ও সমাজের হাস্যকর ও ক্ষতিকর অসঙ্গতিগুলিকে আবিষ্কার করে ব্যঙ্গবিদ্রূপবাণে জ্বালাময় করে তুলেছে। মডেল ভগিনী উদ্দেশ্যমূলক রচনা। 'স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা 'মডেল ভগিনী' পাঠে পরম জ্ঞান লাভ করুন, দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হউন, সংসারে সাবধান হউন—ইহাই গ্রন্থকারের প্রার্থনা।'

৫৭. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, প-সং পৃ. ৩৮৩

৫৮. মডেল ভগিনী. ১ম ভাগ, ১২৯৩ (১৮৮৬) পৃ. ১৪১ ; ২য় ভাগ ১২৯৩ (১৮৮৬) পৃ. ১৭৩ ; ৩য় ভাগ, প্রথম অংশ, ১২৯৪ (১৮৮৭) পৃ. ১৩৬ ; তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় অংশ ১৮৮৭ ; পৃ. ১৪৬।

'ইংরেজের পুচ্ছধারী বাঙ্গালী নর-নারীর নিমিত্ত' মডেল ভগিনীকে তিন-ভাগে বিভক্ত করেছেন লেখক। কারণ 'সত্ত্ব, রজ, তম —ত্রিগুণাত্মক না হইলে আদর্শ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় না। মডেল ভগিনী প্রথম ভাগ স্বর্গে উঠিবার পাকা সিঁড়ি, দ্বিতীয় ভাগে কেবল স্বর্গভোগ, তৃতীয় বা শেষ ভাগে মোক্ষ ফল লাভ (মুখবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগ)।' ভাগগুলি প্রথম ভাগের ঘটনার ক্রম-অনুসারে লিখিত হয়নি।

উপন্যাসটির প্রথম ভাগে বড়লোকের ড্রইংরুমের বর্ণনান্তে ডেপুটি-কন্যা কমলিনীর চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। গ্রীষ্মের দুপুরে হরিতাল রঙের হলঘরে যে রমণীকে দেখা গেল তিনিই কমলিনী। গায়ে জামা, ঘাম মোছার জন্য হাতে রেশমী রুমাল। পায়ে 'এষ্টাকিন'। বেয়ারাকে সে বরফপানি আনতে বলে। মাকে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করে। একে একে তার কয়েকটা চিঠি এল। নারীজন্মের শিক্ষক নগেন, ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ, কবি নবঘনশ্যাম, বৈজ্ঞানিক নিত্যানন্দ দাসের চিঠি। কমলিনী এদের প্রত্যেকের মনরাখা উত্তর দিল।

গৃহশিক্ষক নগেন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্যচর্চার ফাঁকে কমলিনী প্রেমচর্চা করে। ভাই বিপিন 'একসট্রা' করতে এলে নগেন্দ্র কৌশলে তাকে বিদায় করে। মা ডাকলে 'বুড়ী মাগী'র উপর বিরক্ত হয় কমলিনী। কমলিনীর গুপ্তকথা শোনার জন্যে নগেন্দ্র কাঁদতে থাকলে কমলিনী গুপ্তকথা বলে তাকে কৃতার্থ করে। কমলিনীর চারপ্রহরে চাররকম বেশ। 'যৌবন জনমের মত যায়' গান মুখস্থ করতে গিয়ে মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ৮ টাকা 'বিজিট' নিয়ে খিদিরপুরে যাবার পথে কমলিনীকে দেখতে আসে। কমলিনী কাগজে লিখে গূঢ় গোপন কথা ডাক্তারকে জানায়। ডাক্তার অভয়দান করে।

জামাতার আগমনে বাড়িতে কোলাহল শুরু হয়। কপিল খানসামার উপর জামাতা রায়মশায়ের পরিচর্যার ভার পড়ে। রায় প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ। তিনি হুঁকা চেয়ে পান না। গঙ্গাজল চাইলে 'রেকাইন করা ভাল কলের জল' দিতে চায় কপিল। পাঁজির বদলে, থাকার্স ডিরেকটরী আছে বলে জানায় বিপিন। বড়দাদা ডি. এন. চ্যাটার্জি এস্কোয়ার, ব্যারিস্টার আট-ল (ইনি বিপিনের কিরকম দাদা তা কেউ জানে না) ইংরাজীতে কথা বলেন। বিকৃত বাংলায় কখনও বা কথা বলেন। যথা, হামি আর থাইতে পারবে না।

কুৎসিত বাঁদরের মত ব্যক্তিটি কমলিনীর স্বামী, একথা তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। বাংলায় অর্থাৎ অসভ্যের ভাষায় কথা বলা ও শোনার তিনি বিরোধী। এদিকে জামাতা রায়মশায়কে সবাই পাগলজ্ঞান করতে থাকে। রায় এসব বুঝে পালালেন। মাতার নির্দেশে কপিল দ্বারবান ও লোকজনসহ রায়ের অন্বেষণে বার হল। তারপর তাদের ও পুলিস কনস্টেবলের হাতে নিগৃহীত রায়মশায়কে ধরাধরি করে বাড়ি আনা হল। ওদিকে কমলিনী মূর্ছিতা। তাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। 'কপিল দিদ্দিবাবুর জামার বোতাম খোলাকার্যে নিমগ্ন হইল।'

দ্বিতীয় ভাগে প্রথম ভাগের পূর্ববর্তী কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তবে বহু-ঘটনার অবতারণায় রচনার গতি মন্থর। দ্বিতীয় ভাগে, ডেপুটির পূর্বপরিচয় আছে। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব নরহরি ঘোষালের আটত্রিশ বছর বয়সের পুত্ররত্ন তিনি। ইংরাজী স্কুলে পড়বার সময়ে সহপাঠী বন্ধুদের তামাসায় তিনি রামদাস থেকে রামচন্দ্রে নাম পরিবর্তন করেন। জমিদার পিতার হস্তক্ষেপে রামচন্দ্র ডেপুটির কাজ পেয়ে দেশবিদেশ ঘুরে হুগলিতে বদলি হয়ে এলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের মহাধুম। পুতুলপূজার অযৌক্তিকতা, কৃষ্ণের কলঙ্ক, বিবাহের মন্ত্রে ব্রাহ্মণদের বুজরুকির কথা প্রচারিত হল। রামচন্দ্র ব্রাহ্ম হলেন। তারপর গৃহের ও নিজের বেশভূষায় পরিবর্তন ঘটল। আপন করে নেবার মন্ত্রে দীক্ষিত রামচন্দ্র নাপিতকে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করতে গিয়ে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করলেন। স্ত্রীকে মনের মত করার কাজে অগ্রসর হলেন। স্ত্রীকে বললেন, ইংরাজরা জ্ঞানচক্ষুদাতা হিন্দুরা কুসংস্কারাপন্ন, 'অতীব সুসার, সুমিষ্ট এবং সুহৃদ্য' মুরগী খেলে হিন্দুরা বলে জাত যায়।

ঠাকুরদাদা নরহরি, কমলিনীর আট বছর বয়সে একটি উচ্চবংশের বৈষ্ণব পরিবারের শিক্ষিত দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র রাধেশ্যাম রায়ের সঙ্গে তার বিবাহ দেন। কমলিনী শ্বশুরগৃহে যায় না। পিতৃগৃহে আধুনিক আবহাওয়ায় তার যৌবন মুকুলিত হয়। হুগলির বাড়িতে রাত্রে গোপনে কমলনিবাসে আসবার সময়ে নবঘনশ্যাম নন্দী কয়েকজন কর্তৃক প্রহৃত হয়। পরদিন হুগলিতে ডাকাতির গল্প ছড়িয়ে পড়ে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের হেড-মাস্টারের কাছে ডেপুটি চিঠি লিখলে তিনি কৈলাসচন্দ্রকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। বিচার করার পূর্বেই কৈলাস দারোয়ানকে চড় মেরে পালায় এবং কয়েকজন

ছাত্র ও একজন শিক্ষকের নামে ডেপুটির বাড়ি ঘন ঘন যাতায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হুগলির বাড়িতে প্রায়ই, ঢিল ফুল, মালা পড়তে থাকে। রামচন্দ্র কিছু দিনের জন্য দেশে যান। শ্বশুরবাড়ি যাবার নাম শুনলে কমলিনী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার শ্বশুরের মৃত্যুর পর প্রথম দিন হবিষ্যান্ন খেয়ে সে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। ডাক্তার মহেন্দ্র বলে, আতপ চালের তীব্র বিষে তার দেহ জর্জরিত। শ্রাদ্ধ-অন্তে চিকিৎসা ও বায়ুপরিবর্তনের জন্য কমলিনী বৃন্দাবন যাত্রা করল। সঙ্গে চলল বিপিন ডাক্তার, কপিল খানসামা ও রামচন্দ্রের বৃদ্ধা পিসী।

দ্বিতীয় ভাগের পরবর্তী অংশ বিবৃত হয়েছে তৃতীয় ভাগের প্রথম অংশে। এই অ শের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বপাঠে লোকের এখন বিরক্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের বিশেষ উপকারে আসিবে।'

মাঘমাসের শীতের দিনে একটি সাহেববেশী যুবক, ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণকালে গার্ডকে অনুরোধ করে, কক্ষটি 'ফর ইউরোপীয়ানস ওনলি' বলে চিহ্নিত করে দিতে। একটি ব্রাহ্মণ-সাহেবের কথা গ্রাহ্য না করে ঐ কক্ষে উঠলেন। সাহেবের তিরস্কারকে অগ্রাহ্য করে একটি বৃদ্ধাকে ব্রাহ্মণ তুলে নিলেন। গাড়িতে আর একটি বাবু ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের কাছে তামাক খেয়ে, গল্প করে রাত্রিজাগরণের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হলেন। ব্রাহ্মণ সাহেবকে অসুস্থ দেখে তার পরিচর্যা ক'রতে গিয়ে জানলেন, সাহেব বাঙ্গালী। কৃতকর্মের অনুশোচনায় যুবকটি ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা চাইল। পরিচয়ে জানা গেল সে হুগলির কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কুল থেকে পালিয়ে স্থির করেছিল প্রথমে পাটনায় দাদার কাছে যাবে। পরে বিলাতে যাবে ব্যারিস্টার হতে। বাকিপুর যাবার পথে এই ঘটনা। এই কৈলাসই ঈর্ষাবশে কমলিনীর প্রণয়প্রার্থী নবঘনশ্যামকে সদলবলে আহত করেছিল। রটেছিল ডাকাত পড়ার কথা।

ব্রাহ্মণ ট্রেনের কক্ষে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে স্তোত্রপাঠ করলে কৈলাস মুগ্ধ হল। বাবুটি বিরক্ত হলেন। কৈলাস সদানন্দ ব্রাহ্মণের পা জড়িয়ে ধরে তার শিষ্যত্ব পেতে চাইল, চাইল উপদেশ। দীর্ঘক্ষণ ধরে ব্রাহ্মণ কৈলাসকে শাস্ত্রোপদেশ দান করতে লাগলেন। কৈলাস তবুও যেন অতৃপ্ত থাকে। হিন্দুযোগীদের অসাধ্যসাধনের কথা শুনে সে বিস্মিত হয়। বাবুটি শাস্ত্রকথায় বিরক্ত হয়ে

বর্ধমান স্টেশনে নামবে জানালে, ব্রাহ্মণ জানান তিনি আর শাস্ত্রালোচনা করবেন না। এই বাবুটি হলেন নগেন্দ্রনাথ।

ডেপুটি রামচন্দ্র বিহারের এক রাজার অধীনে বন্ধুপুত্র নগেন্দ্রের চাকুরি করে দেন। দীর্ঘদিন কমলিনীর সংবাদ না পেয়ে রাজার আদেশ অমান্য করে তার অনুপস্থিতিকালে কমলিনীর সন্ধানে নগেন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়ে। কমলিনী ইতিমধ্যে বায়ুপরিবর্তনে বেরিয়ে পড়ে। বর্ধমান স্টেশন থেকে বিহারের এই রাজা দেশে ফেরার কালে ব্রাহ্মণকে দেখে আপ্যায়ন করতে থাকেন। রাজা নগেন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলেন ব্রাহ্মণকে। উভয়ের কথোপকথনের সূত্রে, ব্রাহ্মণকে ডেপুটি রামচন্দ্রের জামাতা জেনে, কৈলাস কৌতূহলী হল। ট্রেনে রানীর কক্ষ থেকে বহুমূল্য দ্রব্য চুরি গেল। কৈলাস মধুপুর স্টেশনে নেমে গেল। ব্রাহ্মণ তার সন্ধানে নেমে পড়লেন মধুপুরে।

নগেন্দ্র সন্ন্যাসী সেজে বৈদ্যনাথধামের নন্দনপাহাড়ে আস্তানা করলে এই নবীন ইংরাজী-জানা সন্ন্যাসীকে নিয়ে বৈদ্যনাথধামে তোলপাড় শুরু হল। সন্ন্যাসী সহসা নিরুদ্দেশ হল। কমলিনী কাশী, বৈদ্যনাথধাম ঘুরে শেষে বৃন্দাবনে থাকাকালে, সন্ন্যাসীবেশী নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। ছলনাময়ী কমলিনী নগেন্দ্রকে ব্রতত্যাগ করাল। রাধেশ্যাম ভাগবতভূষণ মথুরায় বাসা করলেন। দরিদ্র ও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা করা হল তাঁর নিত্যকর্ম। একদিন কাঙ্গালীদের ভোজনের পূর্বে অশ্বারোহী পুলিস এসে ভিখারীদের উপর অত্যাচার শুরু করল; এবং রাজার শাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র চুরির অভিযোগে ব্রাহ্মণকে ধরল। মথুরার আদালতে বিচারের পূর্বে ব্রাহ্মণ ভিখারীদের নিয়ে হরিনাম শুরু করলে, হাজার হাজার মথুরাবাসী নামগানে যোগ দিল। রাজার অমাত্য নগেন্দ্রনাথের সাক্ষ্যে সকলের বেত্রদণ্ড হল। ব্রাহ্মণকে বেত্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসের গুপ্ত লাঠির আঘাতে জল্লাদ ছিটকে পড়ল, নগেন্দ্রের গালে অদৃশ্য চড় পড়ল এবং রাজার অবির্ভাবে ব্রাহ্মণ মূর্ছা গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সব শুনে সকলকে মুক্তি দিলেন। এর চার বছর পরের ঘটনা প্রথম ভাগে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় অংশের শুরু হয়েছে প্রথম ভাগের সমাপ্তির পর থেকে। ক্ষুদ্র কক্ষে ব্রাহ্মণ আত্মচিন্তায় দিশেহারা। নারীকণ্ঠে প্রেমের গান শুনে ব্রাহ্মণের মনে প্রশ্ন জাগে, কমলিনী অসতী? কমলিনী বাছাই-করা

বত্রিশজন বন্ধু-ভোজনের জন্য কপিলকে দিয়ে বাজার থেকে প্রচুর মদ্য মাংস মোরগ ডিম প্রভৃতি আনাল। কপিল দিদিবাবুর ফর্দানুযায়ী জামাইবাবুর জন্য কিনল পাঁউরুটি, বিফষ্টিক, খানিক আস্ত গোমাংস, দুটা ধড়ফড়ে মুরগী, ধেনোমদ, পাঁচুই ও গাঁজা।

নগেন্দ্রনাথ এখন অধ্যাপক। মহেন্দ্র, নগেন্দ্র ও কপিলকে ভর করে কমলিনী বিলাতীবেশে পতিসেবায় এসে স্বামীকে চিনতে পারল না। সে ব্রাহ্মণের গায়ের গন্ধে মূর্ছা যাবার উপক্রম হল। বার শিশি-লাবেণ্ডার ও লাবেণ্ডারের জল কপিল ঘরে ও ব্রাহ্মণের গায়ে ঢালল। কমলিনী নাকে রুমাল দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পতিসেবা সে করবেই।

কৃষ্ণপোশাকপরিহিত এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে গঙ্গাজল ও মদনমোহনের প্রসাদী দিয়ে যায়। একটি চিঠিতে সে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এদের ষড়যন্ত্রের কথা জানায়। তার মধ্যে টিকি কাটা, প্রহার, বন্ধন, ভয়ঙ্কর অভিযোগ ও পাগলা গারদে যাবজ্জীবন বাসের কথা উল্লেখযোগ্য। যথাকালে ব্রাহ্মণকে পাগলাজ্ঞানে লাকলাইন দিয়ে বাঁধা হল। ডাক্তারের নির্দেশে তার টিকি কাটা হল। তারপর তার মুখে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে হাঁ করিয়ে পাগলের ওষুধ মুরগী ও গোমাংসের ক্বাথ ঢেলে দেওয়া হল। ব্রাহ্মণের কষ দিয়ে সব ক্বাথ গড়িয়ে পড়ল।

দশবছর পরে, ঘটনার পট উন্মোচিত হল [illegible] আশ্রমে। [illegible] এখন সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী। [illegible] পূর্বের সব কথা জানালেন। কৈলাসের কৌশলে সে যাত্রা তিনি মুক্ত পেয়েছিলেন। তাদের কলকাতা থেকে [illegible]। কৈলাসের চিঠি থেকে ব্রাহ্মণ জেনেছেন তার পরের সব ঘটনা। পিতার মৃত্যুর পর আঠার হাজার টাকা নিয়ে চৌরঙ্গীতে বিপদগামিনী কমলিনীর বাস, তারপর বছরখানেক পরে হৃত নিঃস্ব কমলিনীর রোগগ্রস্ত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি। '[illegible] তাহার গায়ে একটা বিষম দুর্গন্ধ উঠিয়াছে, সে যে রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়, মনুষ্যমাত্রেই তাহার সেই পচা গন্ধে নাকে কাপড় দিতে বাধ্য হয়।…চেহারাটাও কেমন একটা বিতি-কিচ্ছি হইয়াছে। নথটা ফলিয়াছে। ঠোঁটে ঘা দগদগ করিতেছে। দাঁত [illegible] পড়িয়া গিয়াছে। একটা চোক অন্ধ হইয়াছে। তথাচ এখনও মুচকি হেসে আড়নয়নে চাহিয়া দেখাটুকু ঘুচে নাই।'

মৃত্যুর পূর্বে কৈলাস গুরুর কোলে মাথা রেখে যখন হরিধ্বনি করছিল তখন 'উলঙ্গিনী পাগলিনীবৎ কমলিনী' এসে ব্রাহ্মণের কাছে তার পরিচয় দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। ব্রাহ্মণের ক্ষমা পাবার পর তার মৃত্যু হল। কৈলাসেরও মৃত্যু হল। ব্রাহ্মণ তপস্যার জন্য বিজনবনে গমন করলেন।

'মডেল ভগিনী'র পটভূমি বৃহৎ। এই বৃহৎ পটভূমিতে অজস্র চরিত্র ও ঘটনার জাল বিস্তৃত। মডেল ভগিনীতে একটি ব্রাহ্ম পরিবারের নৈতিক জীবনের গ্লানিকর দিকগুলির উপর লেখকের কটাক্ষপাত, তৎকালে একটি মহলে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মদের জীবনযাপনের ধারার প্রতি তীব্র আক্রমণ ও তার পাশে সনাতন হিন্দুসমাজের জীবনযাত্রার আদর্শপ্রচারে, লেখক শিল্পের সীমা লঙ্ঘন করে উপন্যাসটিকে উপদেশাত্মক ও নীতিশিক্ষার বাহনের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। আক্রমণের ক্ষেত্রে লেখক চরমপন্থী। ইন্দ্রনাথ হালকা রসিকতা ও রেখাচিত্রনের মধ্য দিয়ে ঘটনাগুলির মূলে হাস্যরস সঞ্চার করেছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘটনাগুলিকে বর্ণপাতে উজ্জ্বল করে বিদ্রূপাত্মক অতিরঞ্জনের সাহায্যে স্ফীত করে তুলেছেন। তার ফলে হাস্যরসের স্থূলতা উপন্যাসটির রুচি ও সৌন্দর্যকে ব্যাহত করেছে। লেখকের পর্যবেক্ষণক্ষমতা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রসারিত। এরই বলে লেখক ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভেদে সর্ববিষয়ের উপর শ্লেষমিশ্রিত বিদ্রূপকটাক্ষ বর্ষণ করেছেন। ডেপুটির ড্রয়িংরুমের বর্ণনায় একটি লঘুকৌতুকের সুর মিশ্রিত।

'প্রথমত মেজে মাদুরিত; তার উপর সতরঞ্চ; তদুপরি কারপেট বিছান। অর্থাৎ যেন প্রথমত ঘন দুধ, তার উপর দু আঙ্গুল পুরু সর, তার উপর বৌবাজারের ভীমবাবুর কাঁচাগোল্লা, এই দেবোপম তিন মহাপ্রভুর উপর কেমন করিয়া আমার সেই ছেঁড়াজুতা বসাই বল দেখি? (প্রথম ভাগ পৃ. ৭) লেখকের আর একটি পর্যবেক্ষণক্ষমতার দৃষ্টান্ত স্বামিসেবায় আগত কমলিনীর বেশভূষার চিত্র। 'কমলিনীবিবি গাউন-পরা; নবঘনদর্শনে ময়ূরবৎ পেখম-ধরা; কাপড় কসনে কঠিন উচ্চ কুচগিরি যেন ঊর্ধ্বে উড়িবার উপক্রম করিতেছে; বিলাতী কোমরবন্ধের সাহায্যে কটীতট ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর দেখাইতেছে; পায়ে জুতা, মুখে জাল।' (তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃ. ৮৬)

এই বৃহৎ উপন্যাসটিতে অজস্র অবান্তর প্রসঙ্গ, মন্তব্য ও দীর্ঘ বর্ণনা মূলগল্পের

ধারাটিকে কোন কোন স্থানে আবৃত করে দিয়েছে। লেখক উপন্যাসে আক্রমণকারী ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে আক্রান্ত হিন্দুধর্মের যুদ্ধে, হিন্দুধর্মকে অনায়াসেই জয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আক্রমণকারীদলের নেতৃত্ব করেছেন ডেপুটিকন্যা কমলিনী স্বয়ং। এবং তাঁকে সহায়তা করেছে তার ভক্ত বন্ধুবর্গ। আক্রান্ত হিন্দুধর্মের সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয়, রাধেশ্যাম।

লেখক হিন্দুধর্মের জাগ্রত প্রতিনিধি রাধেশ্যামকে বিভিন্ন প্রতিকূল ঘটনার সম্মুখে ঠেলে দিয়ে তাকে অহেতুক অশেষ নির্যাতনের ভাগী করে, তার ত্যাগ, সহনশীলতা, ক্ষমা-হিতৈষণা এবং সর্বোপরি ধর্মনিষ্ঠার বলে তাকে সর্বপরীক্ষায় জয়ী করে, মহত্ত্বের উচ্চতম সম্মানে ভূষিত করেছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র কেবল ব্রাহ্মদের জীবনাচরণের ধারাকে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সমান শক্তি প্রয়োগ করেছেন। এই কারণে তাঁর উপন্যাস 'মডেল ভগিনী'তে উদ্দেশ্যমূলকতা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে।

ব্রাহ্মধর্মাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গের হিন্দু আত্মীয় ও শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ও কর্তব্যচেতনার অভাবকে লেখক ক্ষুব্ধচিত্তে লক্ষ্য করেছেন। কমলিনী কর্তৃক মাকে 'বুড়িমাগী' বলে অভিহিত করা, পিতার প্রতি অসম্মান-প্রকাশ, স্বগ্রামে কুলগুরুকে অপমান, প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত রামচন্দ্র কর্তৃক নাপিতকে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ, নগেন্দ্র কর্তৃক কমলিনীকে 'ডেলি নিউজ' লেখা সত্বেও চিন্তাকুল পিতার প্রতি অবহেলা প্রভৃতি ঘটনা এর উদাহরণ। ব্রাহ্মদের কপটাচার, বিদ্যাচর্চার নামে প্রেমচর্চা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, সচ্চরিত্র ও হিন্দু আদর্শে বিশ্বাসী স্বামীকে নির্যাতন প্রভৃতি ঘটনা কখনও তীব্র শ্লেষ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে কখনও বা ক্রোধসঞ্চারী দৃশ্যের অবতারণায় পাঠকচিত্তকে সচকিত করে তোলে। লেখক পাশ্চাত্যরীতিতে জীবনযাপনের ধারার প্রতি বিদ্রূপবাণ হেনেছেন। বিপিনের দাদা ডি. এন. চ্যাটার্জী, ব্যারিস্টার এ্যাট-ল-র মুখে বিকৃত বাংলা উচ্চারণ, বাংলা ভাষাকে অসভ্যের ভাষা বলে গণ্য করা, প্রভৃতি বিষয় ইঙ্গ-বঙ্গসমাজের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। ডি. এন. চ্যাটার্জী, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নয়নতারা'য় ডাঃ ন্যাণ্ডে ও স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে'র রমানাথ ঘোষ-এর সমগোত্রীয়। একশ্রেণীর মানুষের নিজেকে সাহেব জ্ঞান করে গণ্যমান্য ব্যক্তি

হবার আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয়তাকে অস্বীকার করে বিজাতীয়তার মোহে জাতিত্ব-লোপের ইচ্ছার প্রতি লেখক তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন। কৈলাসচন্দ্রের সাহেবপরিচয়ে বাকিপুরযাত্রার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রামচন্দ্রের ছাত্রজীবনে নামপরিবর্তন, গোপন অভিসারকালে নবঘনশ্যামের নাকাল, কৈলাসের বিচার ও পলায়ন, পুলিসকর্তৃক মথুরায় চোর গ্রেপ্তার, বিচারের প্রহসন প্রভৃতি দৃশ্যগুলি নির্মল কৌতুকের অতিরঞ্জনে উচ্ছ্বসিত হলেও সত্যের সীমা লঙ্ঘন করেনি। লেখক ঘটনাসংস্থাপন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আকস্মিকতা ও চমককে স্থান দিয়েছেন।

একটি নির্ভেজাল ব্যঙ্গরসিকের মন নিয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র মডেল ভগিনী রচনা করেননি। তাঁর মানসিকতার মধ্যে গাম্ভীর্য ও সংকল্পনিষ্ঠা বর্তমান। এই জাতীয় মানসিকতার সঙ্গে হাস্যের সম্পর্কহীনতাই বিদ্যমান। মডেল ভগিনীতে লেখকের এই জাতীয় মানসিকতার পরিচয় পাই তৃতীয় ভাগের প্রথম অংশে রেলগাড়ির কামরায় রাধেশ্যামের দীর্ঘ ধর্মব্যাখ্যার মধ্যে। ব্রাহ্মণের মুখে অন্তহীন অনর্গল সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা সুদীর্ঘ স্থায়ী হয়ে উপন্যাসের কলেবরের অহেতুক বৃদ্ধি ঘটিয়ে উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য ছাপিয়ে, লেখকের স্বকল্পিত পথে অগ্রসর হয়েছে। এই দীর্ঘ ধর্মালোচনার সাময়িক বিরতির সূত্রটি বিস্তারের মাত্রা তুলে গল্প ধারাটিকে দীর্ঘপ্রবাহী করে তুলেছেন। এই দীর্ঘ ধর্মতত্ত্বালোচনার প্রধান কারণ, কৌতূহলী কৈলাসের ধর্মকথা শ্রবণে আগ্রহ ও পরোক্ষ কারণ, এরই সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অবহিত করা। এই ধর্মতত্ত্ব আলোচনা উপন্যাসে প্রায় জন্ম দিয়ে কৈলাসের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সেই সঙ্গে রাধেশ্যামের ভাব-ভাবনার পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। তবুও এই সুদীর্ঘ ধর্মালোচনা মাত্রার সীমাকে লঙ্ঘন করে উপন্যাসটির একটি প্রধান অংশকে (তৃতীয় ভাগ, প্রথম অংশ) যেন একটি ধর্মপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

উপন্যাসটির আবর্তন কমলিনীকে কেন্দ্র করে। একটি ব্রাহ্ম-পরিবারের বিবাহিতা কন্যার ইংরাজী শিক্ষালাভ ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে অনুকৃত জীবন-চর্যার ফলে চরিত্রদুষ্টি ও স্বামীর প্রতি চরম অশ্রদ্ধা ও বিরাগের ভয়ংকর পরিণতির চিত্র পাই কমলিনীর চরিত্রে। মডেল ভগিনী নামকরণের মধ্যেও

শ্লেষ বর্তমান। কমলিনীর পূর্বসূত্র পাই ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ক্ষুদিরাম’এ। প্রাচীন সংস্কারবিরোধী আধুনিকা কমলিনী সেখানে পাঠিকার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মডেল ভগিনীর কমলিনীর ছলনা ও চাতুর্যপূর্ণ প্রেমের অভিনয়ের প্রতিটি পর্যায় বিদ্রূপের আতিশয্যমণ্ডিত। কমলিনী শেকস্‌পীয়র অনুবাদ করে, শেলীর বই বুকে নিয়ে ঘুমায়। বায়রনের প্রেমপরায়ণতা তাকে মুগ্ধ করে। কমলিনীর ছলাকলা, পোশাকপরিচ্ছদ, পুরুষবন্ধুবর্গের সঙ্গে নিঃশর্ত প্রেমচর্চা, প্রেমের গান মুখস্থ করতে গিয়ে মাথাধরা, শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা শুনলে অসুস্থ হয়ে পড়া, একদিন হবিষ্যান্ন খেয়ে মাথাঘুরে পড়ে যাওয়া প্রভৃতি চিত্রগুলি বিদ্রূপের চড়া সুরে বাঁধা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের রাসলীলা ও বস্ত্রহরণের কথা শুনে নিত্য প্রেমলীলামত্ত কমলিনীর লজ্জার আতিশয্য, তার সতীত্বের ভানকে নগ্নভাবে অনাবৃত করে দিয়েছে[৫৯]। রাধেশ্যাম নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কমলিনীর উক্তির (উঃ রাধা আর শ্যাম এই দুজনে বৃন্দাবনে কোন অকর্মই না করিয়াছিল। সেই দুটা নামের সংমিশ্রণে একটা নাম তৈয়ারি হইয়াছে!) মধ্যে শ্লেষের ঝাঁঝ কমলিনীর চরিত্রের নিগূঢ় রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। কমলিনীর পুরুষবন্ধু ও গুণগ্রাহীদের আধিক্যের জন্য তৎকালীন সমাজ-প্রগতির প্রতি শ্লেষ প্রয়োগ করেছেন লেখক। ‘উনবিংশ শতাব্দী বন্ধুত্বের কাল, প্রীতি পবিত্র প্রণয়, ভাব ভালবাসার যুগ। এ কলিকালে পুরুষের বন্ধু কাহন কাহন মেয়ে; মেয়ের বন্ধু কাহন কাহন পুরুষ। কাহারো কথাটি কহিবার যো নাই, ভবের হাটে বন্ধুত্বের কেনা-বেচা একসা চলিয়াছে।” কমলিনীর বীভৎস পরিণতি-চিত্রণে লেখক শৈল্পিক নীতি ও কর্তব্যের সীমা লঙ্ঘন করেছেন। ব্যঙ্গরসিক, তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে নীতিবিদের গাম্ভীর্যের গভীরে নিমজ্জিত করেছেন। কমলিনীর পাপের নারকীয় পরিণতি ও মৃত্যুর পূর্বে স্বামীর কাছে ক্ষমা-প্রার্থনার চিত্র একান্তভাবেই নীতিবিদ্ যোগেন্দ্রচন্দ্রের সৃষ্টি। কৈলাসের চরিত্রে স্বাভাবিকতা রক্ষা করার প্রয়াস লক্ষিত হয় না। ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ, কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও গুরুপত্নীর প্রতি পাপমনোভাব পোষণের জন্য দীর্ঘ প্রায়শ্চিত্তকল্প জীবনযাপনের চিত্রদর্শনে পাঠকমন প্রস্তুত ছিল না।

৫৯. লেখকের মন্তব্য : আহা! আজ কমলিনীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনের সুখময় নাম করিতে হইল। অমৃতের অনন্ত সাগরে নরকের নৌকা বাহিতে হইল। অহো! কি মন্দ ভাগ্য! ইত্যাদি।

আত্মরক্ষার্থে তার পলায়ন ও বিলাতফেরত বন্ধুদের সংসর্গে সাহেব-বনার পশ্চাতে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের তত্ত্বকথার প্রতি তার সুগভীর আকর্ষণের বিন্দুমাত্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। তাই ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে এসে সহসা তার চারিত্রিক পরিবর্তন কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুসরণ করে না। রাধেশ্যাম, স্বাভাবিকতার বর্ণে উজ্জ্বল। হিন্দুধর্মে ও সনাতন আদর্শের প্রতিভূ রূপে চিত্রিত হলেও রাধেশ্যাম কোন ক্ষেত্রেই অতিমানবের স্তরে উন্নীত হয়নি। কমলিনীর স্বামিসেবার দৃশ্যে লেখক পাঠকচিত্তে কৌতুকরসের স্থলে সহসা রৌদ্ররসের সঞ্চার করেছেন। তার ফলে শিল্প ভাবগত ঐক্যভ্রষ্ট হয়েছে। কাহিনীর সংহতিহীনতা, ভাবগত ঐক্যের দীনতা, স্থানে স্থানে পরিচ্ছন্ন রুচির অভাব ও মাত্রাহীন অতিরঞ্জন সত্ত্বেও যোগেন্দ্রচন্দ্র এই 'মহা-উপন্যাস'টিতে 'নব্যবাঙ্গালী'র জীবনযাত্রার বিচিত্র ধারাটিকে একটি বিশেষ রীতির সাহায্যে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এখানেই শিল্পী ও শিল্পের সার্থকতা।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'চিনিবাস-চরিতামৃত'[৬০] ব্রাহ্মদের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণের অপর শিল্পাস্ত্র।

রাজনীতি ও সমাজনীতির বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মদের ভণ্ডামি ও দুর্নীতির চিত্রকে তিনি নবরূপে তুলে ধরেছেন। দেশসেবা তথা রাজনীতির নামে প্রতারণা, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, স্ত্রী-ব্যায়াম প্রভৃতির নামে স্ত্রী-সঙ্গ, প্রেম ও প্রচারের জোরে নীতিভ্রষ্ট মানুষকে মহানমানবে পরিণত করা প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে লেখক চরম রসিকতা করেছেন। এই উপন্যাস-রচনায় যোগেন্দ্রচন্দ্রকে ইন্দ্রনাথের কল্পতরু ও ক্ষুদিরামের অনুবর্তন করতে দেখি। লেখক কেবল হাসির জন্য চিনিবাস-চরিতামৃত পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। 'সাদাকে ঈষৎ গোলাপী আমেজ করাই বিদ্রূপ। কিন্তু যাহা স্বভাবতই ঘোর গোলাপী তাহার উপর আবার গোলাপী রঙ চড়াইয়া গোলাপী-তম করা বিড়ম্বনা মাত্র।...যাহা চরম, তাহাতে বিদ্রূপ বা অতিরঞ্জন খাটে না। বঙ্গভূমির এখন অবস্থা চরম, সুতরাং চিনিবাসে বিদ্রূপ বা অতিরঞ্জন স্থান পাইতে পারে না। চিনিবাস স্বভাব-উক্তি অলঙ্কারে পূর্ণ। 'স্বভাবোক্তিরলঙ্কারো যথাবদ্বস্তুবর্ণনম্'।' লোকে যেন নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে চিনিবাস-চরিতামৃত পাঠ করেন—ইহাই গ্রন্থকারের আশা।' লেখক শ্লেষ ব্যঙ্গ ও

৬০. চিনিবাস-চরিতামৃত (আদিলীলা), দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৯৩।

বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে যে সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে বঙ্গভূমির চরম অবস্থাই প্রতিফলিত। এই জাতীয় সমাজদর্শন বেদনাদায়ক বলেই লেখক মনে করেন।

চিনিবাস বহু দিন ধরে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র। এণ্ট্রেন্স পাস না দিয়ে বাবু গ্রামে এসে গ্রামের পথনির্মাণের জন্য রোডসেস কমিটিতে ইংরাজীতে দরখাস্ত লিখে, গ্রামবাসীর সই দিয়ে টাকা আদায় শুরু করল। সংবাদপত্রে প্রবন্ধলেখা ও তদ্বিরতদারকের জন্য গ্রামবাসীদের কাছে সে একশ টাকা দাবি করল। গ্রামে থাকাকালে সন্ধ্যার পর তাঁতীদের বিধবা বৌ রামমণির বাড়ির দিকে চেয়ে সে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইত (সযতনে বিছায়েছি হৃদয় আসন, বড় আশা তুমি এসে বসবে আজি প্রাণধন)। নারী ও পুরুষ মহলে চিনিবাসের চরিত্র সম্পর্কে তর্কবিতর্ক শুরু হল।

চিনিবাস কৃষ্ণনগরে এসে বাড়ি ভাড়া করে। দোতলা বাড়ি। হলে রাজনীতি ও চারটি 'কুঠারি'তে সমাজনীতি হয়। 'কুঠারি'র দ্বারে লেখা 'গোপনীয়—গৃহপ্রবেশ নিষেধ।' রামমণি এখন চিনিবাসের আশ্রিতা। চিনিবাসের চলে কি করে? 'আঃ পাগল—এটা আর বুঝ না যাঁর দেহ= রাজনীতি+সমাজনীতি তাঁর আর অকিঞ্চিৎকর, পার্থিব অর্থের ভাবনা কি? বিধবা বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, পতি-পরিত্যাগ, স্ত্রী-ব্যায়াম, মাদক-নিবারণ, প্রজা সিবিল সার্বিস, খোলাভাটী, পথকর, ফৌজদারী বিচার, পুলিস-অত্যাচার, ভারত-ভাণ্ডার—অতগুলি মহা মহা বিষয় যাঁহার করতলগত, রৌপ্যমুদ্রা, তাঁর কি কখন একতিলের জন্য ভাবনার কারণ হইতে পারে?'

কৃষ্ণনগরের বাসার নিচের তলায় স্ত্রী-বিদ্যালয় বসল। চিনিবাস মহারানী স্বর্ণময়ীদেবী থেকে শুরু করে রামতনু লাহিড়ী পর্যন্ত ৬০ জনের কাছে বিদ্যালয়ের সাহায্য চেয়ে রেজিস্টারী পত্র লিখল। স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে বন্ধুবর্গসহ চিনিবাস ব্রাণ্ডি পান করে। 'রমণীকুলউজ্জ্বলকারিণী' 'শ্রীশ্রীমতী' রামমণিদেবীর উপযুক্ত পতির অভাবের জন্য চিনিবাস দুঃখ প্রকাশ করে। ঘোষালমশায়ের ছেলে রামকানাইকে চিনিবাস দলভুক্ত করলে ঘোষাল এসে চিনিবাসের গালে চড় কষিয়ে দিয়ে যায়।

কৃষ্ণনগরে কোম্পানির বাগানে মেয়েদের অংশগ্রহণে ঘোড়দৌড় সম্পন্ন হল। রামমণি নায়িকাপ্রধান। পাঁচজন নারী অংশ গ্রহণ করল। চিনিবাস

বক্তৃতায় সীতা দ্রৌপদী ও রামমণিকে এক দলভুক্ত করল। কৃষ্ণনগরের জনগণ পঞ্চরমণীর মাহাত্ম্য কীর্তন শুরু করল,—

বিমলা কমলা বিন্দী বামী রামমণি স্তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং ভারত-দুঃখনাশনম্‌ ॥

কলকাতার লবঙ্গলতা পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে টাউনহলে চিনিবাসবাবুর প্রতিমূর্তি রক্ষা করা উচিত বলে, অভিমত প্রকাশিত হল। কলকাতার সাতজন ব্যক্তি, নারীদের পরিচালিত ঘোড়দৌড়ের সমর্থন করে, তাদের দেখার জন্য ব্যস্ত হলেন। চিনিবাসের বন্ধু মনোমোহন, স্ত্রী গিরিবালাকে বলে, রামমণি পাতঞ্জল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। কাশী যাবে বেদ পড়তে। তাকে বলে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও ডাইভোর্স সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে। শ্রীশ্রীমতী রামমণিদেবী এখন সংস্কৃতে কথা বলে।

কৃষ্ণনগরবিজয় সমাপ্ত করে চিনিবাস রামধন, রামকানাই, ননীগোপাল, মনোমোহন, বিধুভূষণ, রামমণি, কল্যাণী, কুঞ্জমালা, বিনোদিনী, বামাসুন্দরী, বিমলা সকলেই দিগ্বিজয়মানসে কলকাতা যাত্রা করল।

এদিকে চিনিবাস-জননীর অন্ন জোটে না। মায়ের কাছে প্রয়োজনমত টাকা না পেয়ে, চিনিবাস মাকে, কুলকলঙ্ককারিণী দুষ্টচরিত্র বলে চিঠি দিল। পাড়ার একটি বউ জগৎতারিণী তার মাকে দেখাশোনা করে। এদিকে টাউন-হলে মহাসভায় নিষ্কামধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে চিনিবাস নারীজাতির অবনতির জন্যই দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের কারণ বলে ঘোষণা করল। কুমারী ও বিধবার একশত বছর অন্তর পালাক্রমে বিবাহ-প্রথার পক্ষে মত জ্ঞাপন করল এবং জাতিভেদ-প্রথার সমাধানের জন্য ভ্রাতৃভাব জাগ্রত করে একনারীতে বহুপুরুষের উপগত হবার পক্ষে 'হুহুঙ্কার' করে আহ্বান জানাল। মহাভারতের দ্রৌপদী-প্রসঙ্গ তুলে উক্তি সমর্থিত হল। চিনিবাসের মা জগৎ-তারিণীর স্বামী অঘোরবাবুর সঙ্গে টাউনহলের নিচে অপেক্ষা করছে জেনে চিনিবাস 'পাপিয়সী' যাতে উপরে উঠতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে বলল।

চিনিবাস মিউনিসিপালিটির কমিশনার। ছোটলাটের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে দেখাসাক্ষাৎ হয়। অঘোরবাবু চিনিবাসের একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর দ্বারা তার মায়ের আগমনবার্তা জানালে চিনিবাস বলে তার মা পিতার সঙ্গে সহমৃতা হয়েছেন। ভারতমাতাই চিনিবাসের মা।

চিনিবাসের রাজা উপাধি পাওয়া উপলক্ষে বাড়িতে মহা মহোৎসব পতাকায় লেখা 'নিষ্কাম ধর্ম চিনিবাস রাজা'। কলকাতার জনসাধারণ নিমন্ত্রিত। সকলের অনুরোধে চিনিবাস রাজমুকুট পরলে 'রেলি ভ্রাতা ভবনের থানধুতি-পরিধানা নিরাভরণা ভগিনী রামমণি চিনিবাস-রাজের বামে আসিয়া দাঁড়াইলেন।' রাজা হবার সংবাদে চিনিবাসের মা কৌশল্যা কলকাতায় চিনিবাস-গৃহে এসে পুত্রকে স্নেহ জানালে, রামমণি ক্রোধে রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে চিনিবাসকে বলল, 'রাজন কিং করিতেছং ইয়াং বৃদ্ধাং দুষ্টাং পাপিনিং ভিখারিণীং পদাঘাতং কৃত্বা—দূরং কুরু, দূরং কুরু।' চিনিবাসের আদেশে দরওয়ানের ধাক্কা খেয়ে ভূতলশায়িনী কৌশল্যা মারা গেলেন। অঘোরবাবু ও অন্যান্যেরা তাঁর সৎকার করল। বালিকা জগৎতারিণী প্রার্থনা করল যেন তার সন্তান না হয়।

চিনিবাস উনিশ শতকের ব্রাহ্মসমাজের যুবসম্প্রদায়ের আদর্শ রূপে চিত্রিত। এই চরিত্রটির পূর্বসূত্র পাই ইন্দ্রনাথের কল্পতরুর নরেন্দ্র ও ক্ষুদিরামের ক্ষুদিরাম চরিত্রে। স্ত্রী-স্বাধীনতাকামী নরেন্দ্রের যেন নবরূপের সন্ধান পাই চিনিবাসের মধ্যে। নরেন্দ্রের পিসী ক্ষুদিরামের মায়ের প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও কর্তব্য-হীনতার চিত্রের আরও মর্মস্পর্শী অথচ ক্রোধ-উদ্দীপক চিত্র পাই মায়ের প্রতি চিনিবাসের ব্যবহারে। এই উপন্যাসটিতেও যোগেন্দ্রচন্দ্রের পর্যবেক্ষণক্ষমতার বিস্তৃতির পরিচয় পাই। তারই সহায়তায় তিনি অজস্র কৌতুককর সামাজিক-চিত্র অঙ্কন করেছেন। চিনিবাস-চরিতামৃতে একটি বিশেষ সমাজের বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে।

মাহিনা-করা ভিখারীদের সাহায্যে দ্বারে দ্বারে রাজনৈতিক গান প্রচার করে পুলিস ও ম্যাজিস্ট্রেটকে শঙ্কিত করা এবং এই কারণে বিপন্ন গভর্নমেণ্টের শ্রীমধুসূদন ডাক ছাড়ার ব্যবস্থা, চিনিবাসকৃত হাস্যকর পরিকল্পনা, তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের কর্মধারার প্রতি উপহাসজ্ঞাপক। রাজনীতি ও সমাজনীতির নামে ব্রাহ্মযুবকের নেতৃত্বে ভণ্ডামি, কাপট্য ও ইন্দ্রিয়সেবার অবাধ অধিকারকে লেখক শ্লেষ ও ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-ব্যায়ামের নামে ঘোড়দৌড়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ, এবং এজন্য চিনিবাস কর্তৃক ভারতমাতার আশু উদ্ধারের আশাপ্রকাশ বিদ্রূপমিশ্রিত হাস্যধারায় তুফান তুলেছে। লবঙ্গলতা পত্রিকায় ঘোড়দৌড়ের ফেনায়িত সংবাদ, সেজন্য

টাউনহলে চিনিবাসের প্রতিমূর্তিস্থাপনের প্রস্তাব, নিষ্কামধর্মের নামে বিধবা-সেবার প্রবন্ধ আতিশয্যদুষ্ট।

চব্বিশ বছরের কমবয়স্ক ঝিদের কাছে সিংহবিক্রমে গিয়ে তাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যা দিয়ে চিনিবাসের উদ্ধার করার ইচ্ছাজ্ঞাপন, মুচির সঙ্গে সাধুভাষায় জাতিভেদের বিরুদ্ধে আলোচনা, ঘোষাল কর্তৃক চিনিবাসকে চপেটাঘাত করা, ঘোষাল ও রামকানাইয়ের কথোপকথনে সাধুভাষা ও কথ্যভাষার লড়াই, রামমণির অনর্গল ভুলসংস্কৃতে কথা বলা, চিনিবাস রাজার পাশে থানধুতি পরিধানা দণ্ডায়মানা রামমণি, প্রভৃতি চিত্র কৌতুকরসের অতিরঞ্জনে স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে মাত্রার সীমা প্রায় লঙ্ঘন করেছে। টাউনহলে চিনিবাসের নিষ্কামধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতায় স্ত্রীজাতির অবনতির জন্য দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব এবং পরাধীনতা, কুমারী ও বিধবাদের বিবাহের শতবৎসরভিত্তিক পালা-প্রথা প্রচলনের অভিমত প্রভৃতি চিনিবাসের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা সম্পর্কে ভূয়া ও অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয়কে শ্লেষ ও কৌতুকের অতিরঞ্জনে উদ্‌ঘাটিত করে লেখক প্রায় দমফাটা হাস্যের কয়েকটি মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন।

জাতিভেদ-প্রথার সমাধানের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃভাব সৃষ্টিকল্পে, পঞ্চপাণ্ডবের আদর্শ ভ্রাতৃভাবের উদাহরণস্বরূপ একই নারী দ্রৌপদীতে উপগত হওয়ার যৌক্তিকতা প্রদর্শন ও বর্তমান সমাজে সেই 'মহাভাব' প্রচলিত হওয়ার পক্ষে চিনিবাসের উদাত্ত আহ্বান, পাশ্চাত্য শিক্ষিত সভ্য যুবকযুবতীদের মধ্যে অনুরূপ প্রথা অবলম্বনের স্বীকৃতি প্রভৃতি দৃশ্য অবতারণার মধ্য দিয়ে ব্যভিচার ও পাপাচরণের অবাধ সামাজিক অধিকার ও সমাজনীতির নামে ভণ্ডামির আতিশয্যকে লেখক শ্লেষ ও বিদ্রূপের অতিরঞ্জনে জ্বালাময় করে তুলেছেন।

মায়ের সঙ্গে চিনিবাসের সম্পর্কের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ অপেক্ষা লেখকের গম্ভীর ও নীতি-আশ্রয়ী মনের পরিচয় পাই। কৌশল্যা নামটির মধ্যে স্নেহশীলা মায়ের পরিচয় নিহিত। স্নেহকাতর মায়ের প্রতি চিনিবাসের ক্রোধ, অশ্রদ্ধা ও মায়ের অস্তিত্বস্বীকারে আপত্তি, সমকালীন ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষিত যুবকদের অনুরূপ আচরণের প্রতি কটাক্ষবাহী। নিজের মাকে অস্বীকার করে ভারত-মাতার প্রতি কর্তব্য ও আকর্ষণের আতিশয্য অনেকটা প্রহসনজাতীয়। চিনিবাসের মা অনায়াসে পাঠকের অনুকম্পা লাভ করে। কৌশল্যার মৃত্যুর দৃশ্য করুণরসসঞ্চারী।

ব্যঙ্গরসিকের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি হাসাবার বস্তু দিয়ে কাঁদান। যোগেন্দ্রচন্দ্রের এই উপন্যাসে সেই প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। 'নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে চিনিবাস-চরিতামৃত পাঠ' করার যে আশা লেখক পোষণ করেছেন তা অংশত ফলবতী হতে দেখি এই উপন্যাসে।[৬১]

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকতার অবকাশে সাহিত্যসাধনা করে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাসরচয়িতারূপে তিনি 'কল্পনা'র পৃষ্ঠায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয়শ্রেণীর উপন্যাস-রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। 'কল্পনা'র সম্পাদকরূপে তিনি পত্রিকাটিকে একটি সর্বাঙ্গীণ সাহিত্যপত্রে পরিণত করে সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় রেখেছেন।

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুহাসিনী'[৬২] ইতিহাসের ঈষৎরসপুষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের প্রভাব বর্তমান। বাংলার সুবাদার কাসিম খাঁর সঙ্গে, পর্তুগীসদের যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা প্রবঞ্চনা, প্রেম ও প্রতিহিংসার কাহিনী। সাজাহানের রাজত্বকাল তখন ভারতবর্ষে।

দিনাজপুরের রাজা সতীশচন্দ্রের কন্যা সুহাসিনী তার পিতার পালিত পুত্র চারুচন্দ্রকে ভালবাসে। সখী শৈল মনে মনে চারুচন্দ্রকে কামনা করে। এদিকে বিনোদের সঙ্গে সুহাসের বিবাহ স্থির। শৈল অভিমানে গৃহত্যাগ করে। বিনোদের পিতা রাজীবলোচনের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের কথানুসারে, বিনোদের সঙ্গে সুহাসিনীর বিবাহ দিতে সতীশচন্দ্র রাজী ছিলেন। কিন্তু শেষে কুতদার বিনোদের সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী হলেন না।

সতীশচন্দ্রের কাছে সুবাদার কাসিম খাঁ পর্তুগীসদমনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠালে, সতীশচন্দ্র অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। চারুচন্দ্র

৬১. যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অন্যান্য উপন্যাস :
কালাচাঁদ, (১ম—৫ম পর্ব) ১৮৮৯—৯০, পৃ. ৬৮২।
নেড়া হরিদাস, ১৩০৮ (১৯০১) পৃ. ২৮১।
শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১৯০২—০৬)।

৬২. সুহাসিনী, ১২৮৮। 'কল্পনা'য় (আশ্বিন, ১২৮৭) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

সতীশচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে পাঠানদের পক্ষে যোগদান করবে বলে স্থির করল। মোগল-পাঠানের যুদ্ধকালে চন্দ্রপুরের জমিদার চন্দ্রনাথ বাদশাহ্‌কে সাহায্য করতে গিয়ে মৃত হন। মন্ত্রীর চক্রান্তে তার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র এবং শিশুকন্যা বহিষ্কৃত হয়। বাদশাহের আদেশে চন্দ্রনাথের শিশুপুত্রের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রাজা হয়। ঢাকায় সুবাদারের সঙ্গে মন্ত্রণাকালে ভূপেন্দ্র চারুচন্দ্রের সাহস দেখে শঙ্কিত হল। ভূপেন্দ্রের কন্যা ইতিপূর্বে পর্তুগীস-দস্যুকর্তৃক লুণ্ঠিতা হয়েছে।

চারুর সঙ্গে যবনীবেশী শৈলর সাক্ষাৎ হয়। শৈল পরিচয় দেয় সে ভূপেন্দ্র-কন্যা। চারু যখন তাকে পর্তুগীসদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল তখন সে পরিচয় দেয় নি। পত্রে জানায়, সে যবনী হয় নি, দ্বিচারিণী হয়।

বিনোদ, স্ত্রী গিরিবালার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করল। সুহাসিনীর সখী মালতীর কাছ থেকে একটি ভুল সংবাদকে বিশ্বাস করে বিনোদের সঙ্গে সতীশ-চন্দ্র তার গোপনে বিবাহের আয়োজন করলে, সুহাসিনী আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদিকে ভূপেন্দ্র ও পর্তুগীস গঞ্জালে একত্রিত হয়ে চারুচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে চারু তাঁদের পরাভূত করল। ভূপেন্দ্র সুবেদারের কাছে ঘোষণা করল যে, সেনাপতিশ্রেষ্ঠ চারুচন্দ্র ঘোর বিদ্রোহী।

শৈলর সঙ্গে চারুর পুনরায় সাক্ষাৎ হলে, শৈল চারুকে তার অবস্থার জন্য দায়ী করে। সুহাসিনী গিরিবালাকে নৌকাযোগে পৌছে দেবার কালে যেখানে নামল, সেখানে এক পর্তুগীস শৈলবালাকে গুলি করল। মতিয়ারূপী শৈলর ছিন্নমুণ্ড ভূপেন্দ্রের হাতে পড়লে সে কন্যার মুণ্ড দেখে আছড়ে পড়ল। ভূপেন্দ্র বন্দী হল পর্তুগীসদের হাতে। পর্তুগীসদের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধে অংশ-গ্রহণকারী এক সৈন্যকে নদীগর্ভ থেকে মাঝিরা সুহাসিনীর নৌকায় তুলল। এক উন্মাদিনীর ত্রিশূলের আঘাতে ভূপেন্দ্রের প্রাণ গেল। উন্মাদিনী আত্মহত্যা করল শিবমন্দিরে এক যোগীর পদতলে। যোগীর কথা থেকে জানা গেল, তিনি চন্দ্রনাথ। সেই বনভূমি মিলন-ভূমিতে পরিণত হল। চারু পিতার পায়ে আছড়ে পড়ল। চারু ও গিরিবালা, দুই ভাইবোনের মিলন হল। সতীশচন্দ্র এলেন। বিনোদ পাগল হয়ে গেল। গিরির কোলে মাথা রেখে তার মৃত্যু হল। গিরিবালা গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিল। সুহাসের সঙ্গে চারুর বিবাহ হলে, চারু জমিদারি লাভ করল।

এই উপন্যাসটিতে লেখক ঘটনাযোজনায় ও চরিত্রচিত্রণে মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের মত ইতিহাসের জ্ঞান ও প্রতিভা হরিদাসের ছিল না। যার জন্য তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের পটভূমি যেমন নিষ্প্রাণ, গল্পের গ্রন্থিও তেমনি শিথিল। চারুচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে ত্রিভুজ প্রণয়-জাল বিস্তৃত হয়েছে, তার সঙ্গে রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতার ইন্দ্রনাথ সরলা-বিমলার প্রণয়চক্রের সাদৃশ্য বর্তমান। শৈলবালা যেন বঙ্গবিজেতার বিমলার প্রতিচ্ছবি; সুহাসিনী, সরলার ছাঁচে গড়া। বঙ্গবিজেতার চন্দ্রশেখরের সঙ্গে এই উপন্যাসের চন্দ্রনাথের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। চন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসে পুনর্মিলনের দৃশ্যপরিকল্পনার সঙ্গে বঙ্গবিজেতার চন্দ্র-শেখরের আশ্রমকে কেন্দ্র করে পুনর্মিলনের দৃশ্যরচনার গভীর মিল লক্ষ্য করি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে, সুহাসিনীর স্বপ্নে মালার সাপে রূপান্তর এবং সাপ থেকে বিনোদের রূপগ্রহণ, চন্দ্রশেখর-এর চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদের শৈবলিনীর অনুরূপ স্বপ্নকে মনে পড়িয়ে দেয়। চারুচন্দ্রের প্রতি শৈলর একটি উক্তির সঙ্গে প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর অনুরূপ উক্তিকে নিশ্চিন্তভাবে স্মরণ করায়। চারুর প্রতি শৈলবালা—

শৈলবালা গর্জিয়া উঠিল, 'কি করিয়াছ? সেই শৈশব হইতে কেন ও মোহন রূপে অভাগীকে মজাইলে? মজাইলে তো কেন এত যত্নের মালা কণ্ঠে ধরিলে না?...সেইদিন হইতেই [illegible] আমায় গৃহত্যাগিনী হইলাম। তোমারি জন্য—নহিলে কেন এখানে [illegible]। কাসিম খাঁ আমার কে?'

প্রতাপের প্রতি শৈবলিনী—

শৈবলিনী গর্জিয়া উঠিল—বানর, তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে?...

...আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? তুমি কি জান যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফস্টর আমার কে? (দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

ঝির মাধ্যমে একটি গোপন কথা বিস্তারিতভাবে সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করার পদ্ধতিও বঙ্কিম-অনুসৃত। তাছাড়া ঘটনার উপর লেখকের মন্তব্য প্রকাশও (পৃ. ৯২, পৃ. ১৪০) বঙ্কিম-রীতির স্বাক্ষর।

'কুলীনকাহিনী'[৬৩] একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। লেখক গ্রন্থটিকে 'নবন্যাস'রূপে চিহ্নিত করেছেন। লেখক বলেছেন, 'সমাজের কলঙ্কময় যে চিত্রটি অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা অতিরঞ্জন নহে।' উপন্যাসটিতে লেখক কৌলীন্য-প্রথার প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন। কুলীনকন্যা কামিনী স্বামীকর্তৃক গৃহীতা না হয়েও সে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বজায় রেখে পরের বাড়ির ঝিবৃত্তি-করে, মৃত্যুর পূর্বে ব্রাহ্মণ স্বামীর কুলমর্যাদা দিয়ে তার সতীত্বের পরিচয় রেখেছে।

লেখক কৌলীন্য-প্রথার কলঙ্কের অধ্যায়ের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরে এই প্রথাজনিত সামাজিক ক্ষতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিবাহের ত্বছরের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের অন্নপ্রাশনে স্বামীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করার ইচ্ছা, একশর অধিক বিবাহ, বয়স্ক স্বামার কিশোরী স্ত্রী হওয়ার ফলে সামাজিক সমস্যা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসটির রচনায় শিল্পনৈপুণ্য লক্ষিত হয় না। গল্পটিও সরলরেখায় সমাপ্ত।

'রায়মহাশয়'[৬৪] উপন্যাসটিতে লেখক জনৈক প্রতাপশালী হৃদয়হীন নায়েবের কাহিনী রচনা করেছেন। জমিদারি-শাসনের বাস্তব-চিত্র উপন্যাসটিতে পাই।

রায়মহাশয় বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন। বিল্বগ্রামে দশ আনা অংশের প্রতাপশালী নায়েব। স্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ শুনে ও অর্থলোভে যাত্রাভঙ্গ করেন। গোয়ালাদের বিধবা কন্যা আদরের সঙ্গে রায়মহাশয় অবৈধ প্রণয়-লিপ্ত। আদরের মোহে তিনচার বছর বাড়িছাড়া। প্রবঞ্চক রায়মশায় প্রজা বনমালীকে বঞ্চিত করে মাধবকে জমি দেন। বনমালী ও মাধবের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি করে তিনি বিচারের আশ্বাস দেন। বনমালী জমি ফিরিয়ে নিয়ে টাকাফেরত দিতে বললে, রায়মহাশয় রেগে যান এবং জমি নিতে রাজী হলে, লক্ষ্মণ ঘোষ বনমালীকে জমি দেয়। এর পর উভয়পক্ষের লাঠিয়ালের লড়াই এবং রায়মহাশয়ের পরাজয়। রায় দারোগাকে নিয়ে আদরের বাড়ি ওঠেন এবং দারোগার পরামর্শমত একটি বেওয়ারিশ লাসের জন্য রুপোর সাহায্যে মহুরী ফটিকচাঁদকে খুন করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আদরের কৌশলে

৬৩. কুলীনকাহিনী, ১২৯২, পৃ. ৪৪

৬৪. রায়মহাশয় ১৮৯২ (১২৯৯), পৃ.১১৭, 'সাহিত্যে' (২য় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ১২৯৮, পৃ. ৪০৯) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

ফটিকচাঁদ রক্ষা পায়। ঘটনাচক্রে নিহত হয় রায়মহাশয়ের পুত্র তিলকচন্দ্র। তিলকচন্দ্রের তিনদিন হল মাতৃবিয়োগ হয়েছে। গলায় কাছা। বাবাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছিল সে।

বিচারকালে রায়মহাশয় পাগল হয়ে যান।

পল্লী-অঞ্চলে নায়েবদের হৃদয়হীনতা ও রেষারেষির প্রসঙ্গ মূলত উত্থাপিত হয়েছে। লেখক উপন্যাসটির বিষয়বস্তু নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটির মধ্যে ঘটনাগত ঐক্য বর্তমান। রচনারীতিতে কোন সূক্ষ্ম শৈল্পিক নিদর্শন না থাকলেও মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনে কোনও জড়তা লক্ষ্য করা যায় না। তিলকচন্দ্রের হত্যার ঘটনাটি নাটকীয়। পুত্রহত্যার পর রায়-মহাশয়ের ভাবান্তর ও পরিবর্তন আকস্মিক। রায়মশায়কে কেন্দ্র করেই ঘটনার গ্রন্থনা।

রায়মশায়ের চরিত্রটি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। রায়মশায়ের লোভ, প্রবঞ্চনা, অত্যাচার, অসাধুতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির দিকগুলি নিখুঁতভাবে উদ্ঘাটিত। আদরের ছলনা ও দ্বৈত প্রেমলীলার চিত্র পরিস্ফুটনে লেখকের কৌশল লক্ষ্য করি। উপন্যাসটি একটি স্বতন্ত্র জীবনযাত্রার চিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য রচনা।

'হেমচন্দ্র[৬৫]' লেখকের 'কাব্যগুরু চিরপূজ্য স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর পাদপদ্মে' উৎসর্গীকৃত। উপন্যাসটিতে লেখক একটি সাহেবের চরিত্র সংযুক্ত করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। চক্রান্ত ও প্রবঞ্চনার ঘূর্ণাবর্তে উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলি আন্দোলিত। পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসটির কাহিনীভাগ সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

প্রথম খণ্ড। লোচনপুরের জমিদার শ্যামসুন্দরবাবু সজ্জন ব্যক্তি হলেও স্ত্রী মনোরমা স্বার্থপর ও অপ্রিয়ভাষিণী। শ্যালক শশিভূষণ শ্যামসুন্দরের কণ্টক-স্বরূপ। দুশ্চরিত্র লম্পট শশী প্রজার যুবতী কন্যার উপর অত্যাচার করে পালালে শ্যামসুন্দর অগত্যা স্ত্রীর অনুরোধে শ্যালককে ফিরিয়ে আনলেন। শ্যামসুন্দরের মামাত ভাই হেমচন্দ্র, তার বিধবা মা ও বোন মনোরমা, শ্যামসুন্দরের কৃপাপুষ্ট। হেম কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। শ্যামসুন্দর পামার সাহেবের কাছে পাওনা টাকা না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সময়মত

৬৫. হেমচন্দ্র ১৮৯৬, পৃ. ২১৬+৪ (উপসংহার) 'কল্পনায়' (চতুর্থ বৎসর, আশ্বিন ১২৯০, পৃ. ২১) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

কিস্তির টাকা না দিতে পারায় সম্পত্তি নিলাম হয়ে গেল। স্ত্রী মহামায়ার কাছে অলঙ্কার চেয়ে পাঠালে সে দিল না। হেমের বোন কুলীনপত্নী মনোরমার সঙ্গে মহামায়ার বিধবা বোনের গভীর বন্ধুত্ব। মনোরমার স্বামী রামকৃষ্ণ অর্থান্বেষণে আসে। বিরজা মনোরমার অসময়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। হেমচন্দ্রের মা মারা যান।

দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ গ্রামের ৺রামতনু চক্রবর্তীর অপূর্বসুন্দরী কন্যা বসুমতীর সঙ্গে হেমচন্দ্রের প্রণয়। শশীর দৃষ্টি পড়ল বসুমতীর উপর। ব্রহ্মঠাকুরাণীর সাহায্যে শশী বসুমতীর মায়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে বসুমতীর মা জানালেন, হেমচন্দ্র তাঁর ভাবী জামাতা। সদ্যমাতৃবিয়োগবেদনা-বিধুর হেমের সঙ্গে শ্মশানে বসুমতীর সাক্ষাৎ হল। বসুমতী হেমকে সান্ত্বনা দিল। পরদিন দুপুর থেকে বসুমতীকে পাওয়া গেল না।

তৃতীয় খণ্ড। সাহেবের কাছে টাকা না পাওয়ায় জমিদারি নিলাম হবার খবর শুনে, মহামায়া মা ও সন্তানাদি সহ জিনিসপত্র নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। রামকৃষ্ণও মনোরমাকে নিয়ে নিজের বাড়ি গেল। হেম নিরুদ্দেশ, বিরাজ বিরাট শূন্যপুরীতে একা। বনমালি একদিন অসৎ উদ্দেশ্যে বিরজার কাছে এসে, প্রাণেশ্বরী বলে আহ্বান করল। স্বামীর নাম স্মরণ করে শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করল বিরাজ। এমন সময়ে একজন খবর দিয়ে গেলেন যে, হেমচন্দ্রের পিতার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ মৃত্যুর পূর্বে হেমের নামে সব সম্পত্তি উইল করে গেছেন। বনমালির মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপল। সে হেমের সব সম্পত্তি দেবার লোভ দেখিয়ে, মহামায়ার কাছে বিরাজকে বিয়ে করার প্রস্তাব করল। এদিকে ব্রহ্মঠাকুরাণীর প্ররোচনায়, বসুমতী রোগজীর্ণ হয়ে পড়ল। হেমের মায়ের শ্রাদ্ধের দিনে, শশীর নিযুক্ত গুণ্ডারা হেমকে গঙ্গাতীর থেকে ধরে নিয়ে গেল জঙ্গলে পরিত্যক্ত নীলকুঠিতে। হেম সেখানে দেখল মশালহাতে শশী হাসছে।

চতুর্থ খণ্ড। কলকাতায় বাগবাজারের বাসায় বনমালি শ্যামসুন্দরকে জানাল, হেমের মৃত্যু হয়েছে। মহামায়াও এসেছে। বনমালি ও মহামায়া শ্যামসুন্দরকে অনুরোধ করল মাতুলের সম্পত্তি গ্রহণ করতে। শশী হেম সাজল। আদালত থেকে সম্পত্তি পেলেন শ্যামসুন্দর। শশী বসুমতীকে বিয়ে করল। আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিরাজ নদীতে ঝাঁপ দিল। হেমলতাকে উদ্ধার করলেও বিরাজ মারা গেল।

পঞ্চম খণ্ড। নীলকর হিল সাহেব ও পূর্বেকার পামার সাহেব একই ব্যক্তি। জর্জ হিলের সঙ্গে হেমের পরিচয় হল অরণ্যে। হিল সব ঘটনা অবগত হল। হেমের সম্পত্তির বিষয় সব জানা যায়। সাহেব হেমকে নিয়ে শ্যামসুন্দরের কাছে এলে শয্যাশায়ী শ্যামসুন্দর নিজেকে বারবার ধিক্কার দিতে থাকেন। বনমালি সাহেবের কাছে টাকা চায় কাশীবাস কবার জন্যে। কুকুরদষ্ট ক্ষত থেকে বনমালির রক্ত ঝরতে থাকে। কুকুরের মত চিৎকার করে নিজের হাত পা কামড়াতে কামড়াতে বনমালি মরে। মহামায়া পাগল হয়ে যায়। মৃত্যুব পূর্বে শ্যামসুন্দর প্রার্থনা করলেন হেমের কাছে। বসুমতী হেমের কাছে তার অনুতপ্ত স্বামীকে রক্ষা করাব আবেদন জানায়। হেম রাজী হয়। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বামকৃষ্ণ ও মনোরমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের পুনর্মিলন ঘটে। সাহেবের চিঠিতে হেম জানতে পারেন মত্ত স্ত্রীকে অত্যাচার করার কালে মহামায়া শশীকে মেরে ফেলেছে। শশীব বিধবা, শ্যামসুন্দরের সন্তানদের পালন করছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে হেম জানল যে, নীলকর হিল সাহেব বিলাতযাত্রার পূর্বে শ্যামসুন্দরের পুত্রকন্যার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেছেন। এরপর হেমচন্দ্রের গৃহত্যাগ।

লেখক তাঁর হিন্দুত্ববোধ ও রক্ষণশীল মনোভাবের আলোকে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু প্রসারিত করেছেন এবং চরিত্র ও ঘটনার পরিণতি প্রদর্শন করেছেন। কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও অনিবার্য শাস্তিভোগ, বিধবার গভীর সতীত্বচেতনা প্রভৃতি বিষয় উপন্যাসটিতে প্রতিফলিত। গল্পের মধ্যে বৈচিত্র্য আনার প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসটির শেষভাগ যেন একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণে রচিত। হিন্দুদেব শ্রাদ্ধ-প্রথাব প্রতি যৌক্তিকতা প্রদশন, লেখকেব হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠার অন্যতম উদাহরণ। কাহিনীগ্রন্থনে লেখক সচেতন মনের পরিচয় দিয়েছেন। তবে স্থানে স্থানে ঘটনাযোজনায় লেখক নাটকীয় চমক সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসটির মূল ভাব বঙ্কিম-আদর্শসম্ভূত।

শ্যামসুন্দরের শাশুড়ী ও শ্যালক চরিত্র পরিকল্পনায় তারকনাথের স্বর্ণলতার শশিভূষণের শাশুড়ী ও শ্যালক চরিত্রের প্রভাব লক্ষ-করা-যায়। এই উপন্যাসের শশিভূষণের প্রকৃতির সঙ্গে গদাধরচন্দ্রের অমিল লক্ষ্য করা গেলেও শশী, গদাধর-এর মত মা ও দিদির প্রশ্রয়লালিত। মহামায়ার মা, স্বর্ণলতার প্রমদার মায়ের নবসংস্করণ। পামার ওরফে জর্জ হিলের চরিত্র উপন্যাসের পরিণামের পথে

প্রয়োজন সিদ্ধ করলেও শ্যামসুন্দরের সন্তানদের এক লক্ষ টাকা দানের ঘোষণা, তার চরিত্রের পূর্ব আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। নীলকুঠীতে বন্দী হেমচন্দ্রের উদ্ধারের কারণ অনেকটা নাটকীয় হলেও কষ্টকল্পিত। হিলের কন্যা লুসিকে সর্পদংশনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই সাহেব কর্তৃক সে মুক্ত হয়। উপন্যাসটির শেষ পর্যায়ে কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা, পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছে ; কিন্তু একমাত্র বিরাজের মৃত্যুই পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। অপর মৃত্যুগুলি পূর্বকৃত পাপের অনিবার্য ফলজনিত। উপন্যাসটিতে হেমচন্দ্রের চরিত্রে লেখক আদর্শের বর্ণক্ষেপ করেছেন। উপন্যাসটি হেমচন্দ্রের কর্তব্যচেতনা, মননশীলতা ও আত্মত্যাগের নির্যাসসিক্ত।

শ্যামসুন্দরের অসহায় রূপটি নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত। স্ত্রীর স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীন আচরণ তাকে মানসিক বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দেয়। একটি উন্নত-হৃদয় সহানুভূতিপ্রবণ চরিত্র ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে শেষ পর্যন্ত একটি বিচারবুদ্ধিহীন অসহায় জড়বস্তুতে যেন পরিণত হয়। শশীর চরিত্রের শঠতা, ছলনা ও অমানবিকতা তার কর্মধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। খল-চরিত্র হিসাবে বনমালি উল্লেখযোগ্য। এই চরিত্রদ্বয়ের পাশে শ্যামসুন্দরের সততা উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। এদের মৃত্যু যেন তাদের কৃতকর্মের জন্য ধর্মনির্দিষ্ট দণ্ড। নৌকাডুবির ফলে মহামায়ার গহনা হারান তার কৃতকর্মের দৈবনির্দিষ্ট ফল। মহামায়ার পাগলিনীতে রূপান্তরের পশ্চাতে মানসিক যন্ত্রণাই দায়ী বলে মনে হলেও তার ঐ জাতীয় পরিণতির কোন ইঙ্গিত পূর্বে পাই না।

বিরাজ যেন কাব্যের উপেক্ষিতা। হেমচন্দ্রের কাছে স্বামীকে রক্ষা করার প্রার্থনাকালে বসুমতীর হেমচন্দ্রের প্রতি প্রণয়চেতনা ও স্বামীর প্রতি কর্তব্যের দ্বন্দ্বকাতর চিত্রটি অন্তরস্পর্শী।

বসুমতী যেন ক্ষমার প্রতীক, 'অনুসন্ধান'[৬৬]-এ উপন্যাসটি প্রশংসিত হয়েছে।

৬৬. এই উপন্যাসখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ সুন্দর ভাষা ও বর্ণনা আজকালের উপন্যাসে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ('অনুসন্ধান' ১৭ই আষাঢ় ১৩০৪ সাল, পৃ. ৪৮।)

প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় (?—?)

প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় একটি বক্র দৃষ্টি নিয়ে উপন্যাসরচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক প্রসঙ্গ তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। সমাজের আভ্যন্তরীণ কলঙ্ক অপনোদনপ্রয়াসে তিনি তাঁর রচনায় সমালোচনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। এবং প্রয়োজনমত ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও শ্লেষ প্রয়োগ করে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ সৃষ্টি করেছেন। প্রাণবল্লভের উপন্যাস তাই অনেকটা উদ্দেশ্যমূলক। প্রাণবল্লভ 'আলোচনা' পত্রিকার একজন লেখক ছিলেন।

প্রাণবল্লভের 'কুমারী, না বিধবা[৬৭]!' উপন্যাসটি সমাজ-চিত্র-প্রধান। এই কাহিনীর পটভূমিতে তৎকালীন সমাজের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, তীব্রব্যঙ্গ ও জ্বালাময়ী সমালোচনার মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সমাজের আভ্যন্তরীণ বীভৎসতা, নীতিহীনতা, কদর্যতা, ভণ্ডামি ও ব্যভিচারের চিত্র লেখক শক্তিশালী ভাষার মধ্য দিয়ে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করে তুলেছেন।

ধার্মিকা বিধবা দক্ষিণার পালিতা কন্যা জলবালাকে কেন্দ্র করে গল্পটি রচিত। জল থেকে প্রাপ্ত জলবালা কুমারী না সধবা, না বিধবা এই সমস্যার জাল বিস্তৃত হয়েছে কাহিনীর মধ্যে। এক যোগী কর্তৃক জল থেকে উদ্ধার পাবার পরে জলবালার পূর্বস্মৃতি লোপ পায়। মহিয়সী দক্ষিণা তাকে অপত্য-স্নেহে মানুষ করেন। তারপর জলবালা হারিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দক্ষিণার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ঘটনাচক্রে জলবালার স্বামিসম্মিলন ঘটে।

দক্ষিণার কাহিনীকে কেন্দ্র করে লেখক তৎকালীন সমাজের আভ্যন্তরীণ বহুমুখী চিত্র তুলে ধরেছেন এবং তা থেকে ব্যঙ্গের উপাদানের সন্ধান করেছেন। এজন্য গল্পরস লঘু হয়ে পড়েছে এবং স্থানে স্থানে কাহিনীর প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটেছে। তীব্র জ্বালাময় অন্তর্ভেদী ব্যঙ্গবাণের সাহায্যে সমাজে সংঘটিত অনাচার ও অবিচারকে তিনি বিদ্ধ করেছেন।

বঙ্কিমযুগে ব্যক্তি ও সমাজের অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গ রচনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, প্রাণবল্লভ নিঃসন্দেহে তাঁদের সঙ্গে একাসন পাবার যোগ্য। ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের ধারাপথেই প্রাণবল্লভের আবির্ভাব। অল্পকাল পরে ব্যঙ্গরচনাধারায় ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাবের ফলে সমাজ ও ব্যক্তির অসঙ্গতি ব্যঙ্গের বহুমুখী ফলার আঘাতে জর্জরিত হয়েছে।

৬৭. কুমারী, না বিধবা, ১৮১১, পৃ. ১৬০।

ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র মূলত ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই সূত্রেই সমাজ ও ব্যক্তি-চরিত্রের অসঙ্গতিকে তাঁরা ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের লক্ষ্য ছিল বহুমুখী। আক্রমণের পরিধিও ছিল বিস্তৃত। এদিক দিয়ে প্রাণবল্লভ ত্রৈলোক্যনাথের সমগোত্রীয় পূর্বগামী লেখক। ধর্মের আচরণে অধর্মচর্চা, সমাজের দোহাই পেড়ে অসামাজিক কর্ম, বিচারের নামে বিচারের প্রহসন, তথা অবিচার, সাধুতার নামে অসাধুতা প্রভৃতি ঘটনা প্রাণবল্লভের আক্রমণের কয়েকটি বিষয়। এই বিচারে গ্রন্থটি তৎকালীন সমাজ-সমালোচনার মূল্যবান দলিল বিশেষ।

কুমারী না বিধবা নামকরণের মধ্যে কাহিনীর নায়িকার জীবন-রহস্য পরিস্ফুটনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। জলবালা সত্যি বিধবা, না কুমারী এই কৌতূহল পাঠকের চিত্তে প্রায় শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। গ্রন্থকারের রচনা-কৌশলে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় প্রায় শেষমুহূর্তে। এই বিচারে নামকরণের ক্ষেত্রে লেখকের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। উপন্যাসটির বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণ চরিত্রগুলির পরিচয়জ্ঞাপক।[৬৮] এই জাতীয় চরিত্রবোধক নামকরণে পরবর্তীকালে পরশুরামের কৃতিত্ব স্মরণীয়।

এই গ্রন্থটির ঘটনাকাল ১২৯১ সাল। স্থান বঙ্গদেশ। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আস্থা ও অনাস্থাবোধ বাংলাদেশে তখন সমান্তরালভাবে প্রবহমান। লেখক ব্রাহ্মধর্মের নীতিহীনতার প্রতি ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করেছেন এই উপন্যাসে। 'ব্রহ্মজ্ঞানী'দের চরিত্রের কদর্যতার পরিচয়দানে লেখক বেশ বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। 'ব্রহ্মজ্ঞানীরা' অসৎ ও দুশ্চরিত্র। ধর্মের দোহাই দিয়ে পরস্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াই তাদের ধর্মীয় প্রেরণা। ব্রাহ্মদের ঐরূপ পরিচয় উদ্ধার করেছেন লেখক এই উপন্যাসের দুটি চরিত্র যন্নু ও বিনুর আচার, আচরণ ও মনোবৃত্তির মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মদের অনাচারের প্রতি তাঁর আক্রমণ প্রত্যক্ষ ও দুর্বিষহ। যন্নু ও বিনুকে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য় চিত্রিত মুদির দোকানে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্রাহ্ম যুবকদ্বয়ের পরিবর্ধিত রূপ বলা চলে।

বৈষ্ণবদের ভণ্ডামি ও চরিত্রহীনতা লেখক আক্রমণের বস্তু রূপে গ্রহণ

৬৮. যথা—দক্ষিণা, জলবালা, কুলান্তক, জটিলদত্ত, শ্বেতাম্বর, ভূতেশ্বরী (ভূতী) হটচন্দ্র চট্টরাজ, তত্ত্বনিধি ঠাকুর, বিদ্যানিধি তত্ত্ববোধ, বিধুমুখী ইত্যাদি।

করেছেন। 'ভূতির পিতার নাম ভণ্ডুল গোশাঞি। ভূতীর মা, জগদম্বার প্রসাদী মাংসের দোকান খুলিয়াছে। ভূতীর মাতামহী ব্রাহ্মণকন্যা, গৃহবাসে সন্তানসন্ততি হয় নাই, একজন রামায়ৎ বৈষ্ণবের আশীর্বাদে ভূতীর জননীর জন্ম হয়' (পৃ. ৭১)।

কৌলীন্য-প্রথাজনিত অকালবৈধব্যের ফলে বিধবার চরিত্রস্খলন ও সন্তানলাভের ঘটনা লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। পিতৃ-পরিচয়হীন এই জাতীয় সন্তানের কৌলীন্য-গর্বকে নিয়ে লেখক কৌতুক করেছেন। 'ভূতীর স্বামী হটু ঠাকুর। কুলীনকন্যার গর্ভজাত। তাঁর জননী বালিকাকালে বিধবা হইয়া কলিকাতায় পাচিকা-বৃত্তি করিবার সময়ে এই পুত্ররত্ন লাভ করেন। হটু আত্মবিস্মৃত ছিলেন, পিতার নাম জানিতেন না, এইজন্য পূর্বে চক্রবর্তী বলিয়া পরিচয় দিতেন। এক্ষণে তিনি হটুচন্দ্র চট্টরাজ (পৃ. ২)। ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজজীবনে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতার যে দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাকে মনে প্রাণে সমর্থন জানায় নি। স্ত্রী স্বাধীনতা সতীত্বের পরিপন্থী বলেই তাঁরা মনে করেছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী'র কমলিনী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থেও লেখক স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষীয় সামাজিকদের মনোভাবের প্রতি শ্লেষ-মিশ্রিত ব্যঙ্গ বর্ষণ করেছেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা, সতীত্বের আদর্শকে আহত করবে বলেই লেখক মনে করেন। তাই স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে ব্যভিচারকে লেখক আক্রমণের বিষয় বলে গণ্য করেছেন। দক্ষিণার পালিত জীবন দক্ষিণাকে বলে, 'পিসিমা! ভারতের দুঃখ দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়।...... আমরা বিলাতফেরত পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি এই বঙ্গবালিকারাই বিধাতার রাগ বাড়াইতেছে।......ইহারা স্বচক্ষে দেখিতেছে যে, ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর পশুপক্ষীকে পর্যন্ত স্বাধীন অধিকার দিয়াছেন, তারা ইচ্ছামত জোড়া মিলাইয়া পরম সুখে, ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় সাধন করে। দাম্পত্য সম্বন্ধে ইহাদের পিতামাতার কোন হাত নাই; তথাপি এই অবাধ্য নারী কুলশাস্ত্র-সংহিতার কুহকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে অমান্য করিতেছে। হায়! একি বলিবার কথা; যে নিষ্ঠুর চণ্ডাল নরাধম, অজ্ঞান বালিকাকে ভুলাইয়া তার পতি হইয়াছে...যে তাদের দুর্দশা করিল সেই-ই পরমেশ্বর, ইহাতে আসল পরমেশ্বরের রাগ হইবে না তো কি!' (পৃ. ৬) সতীত্বের প্রতি গভীর আস্থা পোষণ

করেন লেখক। গ্রন্থে উদাসীন-উক্ত আবেগমিশ্রিত বক্তব্য লেখকের সমর্থনপুষ্ট বলে মেনে নিতে দ্বিধা থাকে না।

'উদাসীন ইহা বুঝিয়া বলিল, 'বৎস হীরালাল! সতীত্বরত্ন, হিন্দু-সমাজের সর্বস্বধন।……সতীত্ব হিন্দুসমাজের মজ্জা, এই মজ্জাতেই প্রাণ আছে। ……কোন্ প্রাণে ইহাতে বিষ মিশ্রিত করিতে চাও? এইজন্যই বিধাতা কি তোমাকে রূপগুণ দিয়াছেন? সাপে সাপ খায়, কিন্তু তুমি কি মানুষ হইয়া মানুষ খাইবে?' (পৃ. ৯৭)

অবিবাহিত বংশজ ব্রাহ্মণতনয়ের সঙ্গে অবিবাহিতা কুলীন কুমারীর অবৈধ জীবনযাপনের চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে লেখক কৌলীন্য-প্রথাকেই উপহাস করেছেন। কৌলীন্য-প্রথাজনিত এই জাতীয় সামাজিক অধঃপতনকে লেখক শ্লেষাত্মক ভাষায় আক্রমণ করেছেন। সমাজশাসিত ব্যক্তি-মানুষের অসহায়তা লেখকের সহানুভূতিলাভে সক্ষম হয়েছে।

'এই পিয়ারা গ্রামে ভুলুঠাকুরের বাস। ভুলুর বিবাহ হয় নাই, তিনি একটি কুমারীকে লইয়া এই স্থানে থাকেন। কুমারীঠাকুরাণী কুলীনতনয়া, তাঁর সমযোগ্য বরপাত্র জুটে নাই, এবং ভুলুঠাকুর বংশজ ব্রাহ্মণ, তাঁর ভাগ্যে পনের টাকার জোগাড় হইল না। এঁদের দুজনের দুঃখ একই প্রকার, সুতরাং দুইজনে একত্রে মিলিয়া, এই নির্জন স্থানে মনের খেদ মিটাইতে আসিয়াছেন। ইহাকেই বলা যায় 'চাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগলয় কোলে' (পৃ. ৭৮)। এই হতাশাগ্রস্ত প্রণয়ীযুগলের সামাজিক স্থানের প্রতি লেখক অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। সমাজব্যবস্থাই এই অধঃপতনের জন্য দায়ী।

লেখকের ভাষা স্থানে স্থানে তৎসমশব্দবহুল। ব্যঙ্গ-রচনার ধর্মানুযায়ী বারবার কাহিনীর প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটেছে। যার ফলে উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হতে পারেনি।

প্রাণবল্লভের পূর্ববর্তী উপন্যাস 'সমাজকালিমা' (১৮৮৫)-য় ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত কৌলীন্য-প্রথার ক্ষতিকর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭—১৯৩২)

বিশশতকের প্রথমার্ধের অর্ধেকেরও বেশিকাল জীবিত থাকা সত্ত্বেও স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনার পর্বটি আজ প্রায় লোকস্মৃতির অন্তরালে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থকন্যা স্বর্ণকুমারী ১২৯১ সাল থেকে ১৩০১ সাল পর্যন্ত এবং পুনরায় ১৩১৫ সাল থেকে ১৩২১ সাল পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ভারতী ছাড়া 'সখী-সমিতি' ও 'মহিলাশিল্প মেলার' তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী। ১৮৯০ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী ছিলেন একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি। বঙ্কিমচন্দ্রের ছত্রছায়ায় স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনা-লালিত। তৎসত্ত্বেও বিষয়বৈচিত্র্যসাধনে ও স্বতন্ত্র মানসিকতায় স্বর্ণকুমারী তৎকালীন ঔপন্যাসিকবৃন্দের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম, যিনি উপন্যাস-রচনায় প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। কলকাতায় ১৯শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে[১] স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' দান করে শ্রেষ্ঠ লেখিকারূপে তাঁর প্রতিভার সমাদর করেছেন।

লেখিকারূপে স্বর্ণকুমারীর রচনাবলী বৈচিত্র্যপূর্ণ। উপন্যাস, গীতিনাট্য, নাটক, প্রহসন, ছোটগল্প ও অন্যান্য গদ্যরচনায় স্বর্ণকুমারীর দান অসামান্য। তবে বিভিন্ন শ্রেণীর রচনার মধ্যে উপন্যাসই সর্বাধিক। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস গুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা চলে,—(১) ঐতিহাসিক (২) সামাজিক-পারিবারিক। আলোচ্যকালে স্বর্ণকুমারী-রচিত মোট আটটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস চারটি,—দীপনির্বাণ, মিবাররাজ, বিদ্রোহ ও ফুলের মালা এবং সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস চারটি,—ছিন্ন-মুকুল, হুগলীর ইমামবাড়ী, স্নেহলতা (১ম ও ২য় খণ্ড) ও কাহাকে।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনার উৎসে আছে স্বদেশপ্রেম। ইতিহাসের গভীরে জাতীয় জীবনের গৌরবকে আবিষ্কার করার যে প্রয়াস আলোচ্যকালে

১. ১৯২১ মাঘ, ১৩৩৬ সাল।

লক্ষ্য করা যায়, স্বর্ণকুমারীর রচনার মধ্যে সেই জাতীয় প্রয়াসই স্পষ্ট। স্বর্ণকুমারীর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ'[২] এর রচনার মূলে স্বদেশপ্রেমই মুখ্য স্থান পেয়েছে। 'দীপনির্বাণ' এর উপহারপত্রে তিনি লিখেছেন,—

'আর্য্য-অবনতি-কথা পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,
বহিবে নয়নে তব শোক-অশ্রুধার,
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি,
ঢেকেছে ভার-ভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙ্গেছে কপাল!'

দীপ-নির্বাণ স্বর্ণকুমারীর অল্পবয়সের রচনা। রচনাটি অপরিণত। জয়চন্দ্রের সহায়তায় মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পৃথ্বীরাজের পরাজয়-কাহিনীই 'দীপ-নির্বাণ'-এর কেন্দ্রীয় কাহিনী। চিতোররাজ্যের পারিবারিক ইতিহাস মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। 'আর্য্য-অবনতিকথা' এই উপন্যাসে লিখিত হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে, এই বিষয়টিকে কেন্দ্রে রেখে বিভিন্ন কাহিনীর শাখা বিস্তৃত করে, মূল বিষয়টিকে আচ্ছাদিত করার ফলে মূল কাহিনী যথাযথ ভূমিকা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। এই কারণেই এই উপন্যাসটির মূল বক্তব্য অস্পষ্ট। উপন্যাসটির ঐতিহাসিক বক্তব্যকে গ্রাস করেছে কয়েকটি প্রেমকাহিনী (প্রভা-চন্দ্রপতি, কিরণ-শৈলবালা, রাজকন্যা-কল্যাণ, বিজয়-গোলাপ ইত্যাদি)। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সমরসিংহেব বন্ধুত্বের সম্পর্কহেতু সমর-সিংহের পারিবারিক জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা পৃথ্বীরাজের বিষয় অপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে বেশী। গ্রন্থপাঠে পৃথ্বীরাজ সম্পর্কে একটি ক্ষীণ রেখাচিত্র মাত্র আমাদের সামনে জেগে ওঠে। তাঁর প্রত্যয়দীপ্ত রাজরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। মূলবিষয়কে শাখাবিষয়গুলি যত না শক্তি দান করেছে, শক্তি হরণ করেছে ততোধিক। সমরসিংহের পারিবারিক কাহিনীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের পরাজয়কাহিনীর মিশ্রণে এই উপন্যাস রচিত। কিন্তু কাহিনীগ্রন্থনে শৈথিল্য ও ঘটনাসংস্থাপনের ক্ষেত্রে আকস্মিকতা শিল্পীর নৈপুণ্যের অভাব পরিস্ফুট করে। পাগলিনী কর্তৃক কুমারহরণ-প্রসঙ্গ কষ্ট-কল্পিত। যবনাক্রান্ত হয়ে প্রভাবতীর চিৎকারে দিলীপের অভয়বাণী দান, আগমন ও উদ্ধারের বিষয়টি অতিনাটকীয়। তেমনি অতিনাটকীয় সোমরাও

২. দীপনির্বাণ, ১৮৭৬, পৃ. ৩২১। রচয়িত্রীর নাম নেই। চ, সং ১৯০৩।

ধীবররূপী কিরণ সিংহ কর্তৃক চন্দ্রপতি উদ্ধার-প্রসঙ্গ। আকস্মিক ও অতি-নাটকীয় ঘটনা উপন্যাসটির বাস্তবতা ক্ষুণ্ন করে গঠনশৈথিল্যের অন্যতম কারণ হয়েছে।

প্রভাবতী ও শৈলবালার সখিত্ব সুন্দররূপে চিত্রিত হয়েছে। এই দুই সখীর চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে নারী-মনের সহজস্নিগ্ধ রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এই দুটি চরিত্র রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা'র সরলা ও অমলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার জীবন-পরিণতির ইঙ্গিত দান করার শিল্পকৌশল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লক্ষিত হয়। এই উপন্যাসে ও অসুস্থ ঊষাবতীর স্বপ্নদর্শনের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত জীবন ও পৃথ্বীরাজের জীবন-পরিণতির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

সমরসিংহ, কিরণসিংহ কল্যাণ পৃথ্বীরাজ প্রভৃতির মত চাঁদকবিও (কবিচন্দ্র) ঐতিহাসিক ব্যক্তি। চাঁদকবি লিখিত 'পৃথ্বীরাজ রসৌ' নামক কাব্যে পৃথ্বীরাজের রাজত্বের প্রধান ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে।[৩] সমরসিংহ যে পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি, লেখিকা তা উল্লেখ করেননি। সমযসিংহের যুদ্ধযাত্রার পশ্চাতে যে প্রেরণা, তা হলো দেশমাতৃকার সেবা। সন্ধির শর্তভঙ্গ করে ঘোরী যুদ্ধ শুরু করলে যুবরাজ কল্যাণ যুদ্ধে প্রাণ দিল। রাজকন্যার অকাল-মৃত্যু হলো। বিজয়ের বি[শ্বা]সঘাতকতায় হিন্দুরা পরাজিত হলে, রানী যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। ঘোরীর আদেশে একে একে পৃথ্বীরাজের সকল অঙ্গ ছেদন করা হলে স্বাধীনতা অনন্ত মূর্ছিত হল, দীপনির্বাণ হল। হিন্দুজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তথা গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে মহম্মদ ঘোরীর উক্তির মধ্য দিযে (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)। লেখিকার বর্ণনার প্রসাদগুণে থানেশ্বরের যুদ্ধ-বর্ণনা উজ্জ্বল রূপ পেয়েছে।

স্বর্ণকুমারীর প্রায় সকল উপন্যা[সে] গানের একটি স্থান আছে। প্রয়োজন-বিশেষে তিনি গানের সাহায্যে উপন্যাসের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই উপন্যাসে বিরহিনী প্রভাবতীর মনোভাব লেখিকা শৈলবালার

৩ The work of Chund is a universal history of the period in which he wrote. In the sixty-nine books, comprising one hundred thousand stanzas, relating to the exploits of Prithi Raja, every noble family of Rajasthan will find some record of their ancestors.—*Todd.*

একটি গানের (সজনি লো···) মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার কাফি-সুরে গাওয়া ধীবরের গানে নদীতীরে প্রহরীবেষ্টিত চন্দ্রপতির মনে সহসা চিন্তার তরঙ্গ উঠেছে। এই গানের ('কোন চুরায়লো তুমুঝ পরাণ বধুয়া···') প্রত্যক্ষফল চন্দ্রপতি-উদ্ধার।

মুসলমানদের যুদ্ধজয়ের পশ্চাতে তাদের ছল কৌশল ধূর্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং হিন্দুদের সততা ও বিশ্বাসপ্রবণতাই দায়ী বলে লেখিকা মনে করেছেন। ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্য রচনাটিকে যে পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করেন তা সর্বৈব সত্য।[৪] উনিশ শতকের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রেরণাকে লেখিকা স্পষ্টীকৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন এই উপন্যাসে। গ্রন্থের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলীর ঐতিহাসিক সত্যতা নিরূপিত হয়েছে 'উপক্রমণিকা'য়। 'দীপনির্বাণ' তৎকালে প্রশংসিত হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করে-ছিলেন গ্রন্থটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা।[৫]

ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের অভাব দীপনির্বাণের শৈল্পিক ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

'মিবাররাজ'[৬] মিবারের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত রাজপুত জাতির অভ্যুত্থানের কাহিনী। লেখিকা বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্য পরিশিষ্টে ঐতিহাসিক তথ্যাবলী উদ্ধার করেছেন। প্রায় নারীচরিত্রবর্জিত এই উপন্যাসটি অনেকটা বড়গল্প-জাতীয়। টডের রাজস্থান থেকে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন। লেখিকা গুহাকে মিবারের রাজা প্রতিপন্ন করেছেন ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণপঞ্জীর সাহায্যে। ভীল রাজপুতের সম্পর্কই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় কাহিনী। ভীল রাজপুত সম্বন্ধের পূর্বসূত্র পাই রমেশচন্দ্র দত্তের 'জীবনসন্ধ্যা'য়।

ভীলরাজ মন্দালিকের স্নেহে লালিত গুহার বাহ্যিক পরিচয় ব্রাহ্মণসন্তান হলেও আসলে সে ছিল সৌরাষ্ট্রের শেষ রাজা শিলাদিত্যের পুত্র। ভীল

৪. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং) পৃ. ২৮৩—৮৪।

৫. প্রথম সংস্করণে রচয়িত্রীর নাম ছিল না। মেজমামা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশে এই বইখানি হাতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুন মামার রচনা। তিনি লিখিলেন, জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে? কৈফিয়ত : হিরণ্ময়ী দেবী, ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩।

৬. মিবাররাজ, ১৮০৯ শক, ইং ১৮৮৭ খ্রী. পৃ. ৮০ (উপসংহার ও পরিশিষ্টসহ)।

যুবকেরা, তাদের প্রিয় 'তানা' চক্করে জিতলে তাকে রাজা করল। মন্দালিক সানন্দে অনুমোদন করল। মন্দালিকপুত্র 'তালগাছ' ক্ষুব্ধ হলো। অভিমানাহত মন্দালিকপুত্র পিতার স্নেহবঞ্চিত হয়েছে মনে করে বেদনা অনুভব করে। তারপর ঘটনাচক্রে ভীলপুত্র, গুহাকে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে জানায় যে, কমলাবতী তার মা নয়, সত্যবতী তার দিদি নয়। সত্যবতীর কাছে গুহা তার সত্য পরিচয় পায়। ভীলপুত্রের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধকালে গুহাদিত্যের তীরে মন্দালিক নিহত হয়। মৃত্যুর পূর্বে মন্দালিক জানে তার পুত্রই হত্যাকারী। লজ্জায় ক্ষোভে মন্দালিকপুত্র আত্মবিসর্জন করে। কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে গুহাদিত্য ইদরে রাজত্ব করতে থাকে।

উপন্যাসটির কাহিনীরচনায় লেখিকা ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করেছেন। নরনারীর প্রেমকাহিনী এই উপন্যাসে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মানব-হৃদয়ের স্নেহ ক্রোধ ঘৃণা প্রভৃতির সার্থক অভিব্যক্তি এই উপন্যাসকে অনেকখানি সুখপাঠ্য করে তুলেছে। কমলাবতীর ভূমিকা খুব ছোট। সত্যবতীর সঙ্গে গুহার ভ্রাতা-ভগিনীর সম্পর্কের প্রীতিমধুর চিত্র লেখিকার চরিত্রাঙ্কনের গুণে প্রাণবন্ত। মন্দালিকের সঙ্গে গুহার সম্পর্কটি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। গুহার প্রতি মন্দালিকের স্নেহ ও কর্তব্যবোধ আন্তরিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল। লেখিকার পরিবেশ-সচেতনতা ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা উন্নততর। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে প্রকৃতিবর্ণনা কাব্যিক। মন্দালিক এবং তার পুত্র 'তালগাছ'-এর চরিত্র, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পিতার প্রতি অভিমান, বন্ধুদের কাছে রাজা হবার বাসনাজ্ঞাপন, গুহার প্রতি শত্রুতা জানানর ব্যাপারে সে স্পষ্টবাদী। তার মানসিকতা যেন অরণ্যভূমির উন্মুক্ত বন্ধনহীন প্রেরণার উপাদানে গঠিত। ভীলদের সংলাপরচনায় লেখিকা যে বিভাষার আশ্রয় নিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে একদিকে বাস্তবনিষ্ঠা অন্যদিকে তাদের জীবনচর্যার স্বাতন্ত্র্যের দিকটি প্রকাশিত।

মিবাররাজ যেন 'বিদ্রোহে'[৭]র কথামুখ বা ভূমিকা। রাজপুত ও ভীলদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুশ বছর পরের কাহিনীর যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে। মেবাররাজ নাগাদিত্যের সঙ্গে ভীলদের দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহ

৭. বিদ্রোহ বাং ১২৯৭ সাল ইং ১৮৯০ খ্রীঃ। উপসংহার সহ পৃ. ২৮২। ভারতী ও বালক-এ (ভাদ্র ১২৯৪, পৃঃ ২৭৩ থেকে) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

একটি প্রেমকাহিনীর পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। সেই পুরানো আক্রোশের অর্থাৎ গুহাদিত্যের কালে মন্দালিক হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় ভীল-সমাজের কিয়দংশ বিদ্রোহী হয়ে রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে ভীলরাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়। কাহিনীর শুরুতে বিদ্রোহের পটভূমি রূপে এই কথাই বলা হয়েছে।

আশাদিত্যের পুত্র নাগাদিত্যের রাজত্বকালে ইন্দ্রের জাগরণ ঘটে। ভীলরা কেউ কেউ রাজার অনুগত, কেউ কেউ বিরোধী। জুমিয়া ভীল, মহারাজের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলে, সভাসদ্‌বর্গের একাংশ রাজার উপর ক্ষুব্ধ হন। জুমিয়ার বালিকা-কন্যা রাজাকে বর বলে সম্বোধন করে। জুমিয়ার বাবা জঙ্গ মন্দালিক-হত্যার প্রতিশোধগ্রহণের জন্য ভীলদের উত্তেজিত করতে থাকে। রাজার বিশবছর বয়সকালে, তিনি জুমিয়ার কন্যা সুহারের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হলেন। ক্রমে রাজার সঙ্গে সুহারের প্রণয় বৃদ্ধি পেলে, সুহারের পাণিপ্রার্থী ক্ষেতিয়া ঈর্ষা বোধ করল। পুরোহিতের ব্যবস্থায় একদিন মন্দিরে রানীর সঙ্গে সুহারের সাক্ষাৎ হলে, রানীর আবেদনে সুহার জানাল যে সে আর রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না। পুরোহিত রাজাকে বিদ্রোহের আভাস দিলেন। কথাটা ক্রমে জঙ্গু ও জুমিয়ার কানে উঠল। জঙ্গু জুমিয়াকে রাজহত্যায় প্ররোচিত করল। জুমিয়া জানাল তার মেয়ে ক্ষেত্রিয়া ভীল নয়। রাজার সঙ্গে সুহারের বিবাহসভায় কন্যাসম্প্রদানের পূর্বমুহূর্তে পুরোহিত হরিতাচার্য জানালেন সুহার ব্রাহ্মণকন্যা, সে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী গৌরী। জুমিয়া রাজাকে বিবাহ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলে, রাজা তরবারি হাতে সুহারকে গ্রহণের বাসনা জানালেন। জুমিয়া, রাজা ও রানীকে বর্শা নিক্ষেপ করে আহত করল, ভীলরা রাজবিদ্রোহী হল। রাজা মৃত্যুকালে জুমিয়ার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, রাজপরিবার ও শিশু সন্তানদের দেখবার অনুরোধ জানানর কালে মারা গেলেন। ভীলরা রাজগৃহ অবরোধ করল। ক্ষত্রিয়দের সাহায্য করতে গিয়ে বাণাহত হয়ে জুমিয়া ধরাশায়ী হল।

সুহার নির্জন বনদেশে রাজপুত্র বাপ্পাকে সন্তানস্নেহে মানুষ করল। বাপ্পা বড়ো হয়ে মিবার-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

নাগাদিত্যের বিরুদ্ধে ভীলদের বিদ্রোহের কারণ হিসাবে রাজার বিরুদ্ধে ভীলদের দীর্ঘসঞ্চিত ক্রোধকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। সেই ক্রোধ গুরুত্ব

পেল জুমিয়ার বিরোধিতায় তার পালিতা কন্যা সুহারের সঙ্গে বলপূর্বক রাজার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশে। ভীলদের দীর্ঘসঞ্চিত ধূমায়িত ক্রোধ বহ্নিমান হয়ে উঠল।

এই গ্রন্থের মধ্যে জুমিয়ার চরিত্রটি মনে রেখাপাত করে। পিতা জঙ্গুর বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজ-অনুরক্তি এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুহারকে বিয়ে করার চেষ্টার প্রতি চরম ক্রোধহেতু মৃত্যুরূপ শাস্তিদান, তার কর্তব্যবোধ ও ধর্মচেতনার পরিচয় বহন করে। আবার মুমূর্ষু রাজার মৃত্যুকালীন অনুরোধ রক্ষার কর্তব্যজ্ঞানে, সে রাজপ্রাসাদ রক্ষাকালে বিদ্রোহীদের হাতে মৃত্যুবরণ করল। কর্তব্যের প্রতি সচেতনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার বৃত্তিই জুমিয়ার চরিত্রের মর্মমূলে নিহিত।

রাজা নাগাদিত্যের চরিত্রে দৃঢ়তার স্পর্শ নেই। অস্থিরচিত্ততা ও উত্তেজনা-প্রবণতা রাজার মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করেছে। রাজার সঙ্গে রানীর মান-অভিমানের পালা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের স্তরগুলি সুপরিকল্পিত। তবে কতদূর মনস্তত্ত্বসম্মত সেকথা বিচার্য। জন-অপবাদ রাজা-রানীর বিরোধসৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। উভয়ের মনোমালিন্যের অপর কারণ, রাজার উগ্র আচরণ ও রানীর সারল্য। সুহারের সঙ্গে রাজার বিবাহে রানীর প্রধান ভূমিকাগ্রহণ এবং গৌরীপূজায় সুহারকে বিশিষ্ট পদদানের মধ্য দিয়ে রাজার প্রতি রানী সেমন্তী. নিঃস্বার্থ অকৃত্রিম প্রণয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিবাহসভায় রাজাকে রক্ষা করতে গিয়ে আত্মবলিদান সেমন্তীর চরিত্রে গভীর মহত্ত্ব আরোপ করেছে। রাজার প্রণয়বঞ্চিত রানীর মানসিক চিত্র লেখিকা নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিস্ফুট করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস হলেও নারীমনের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে লেখিকা পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন। নারীমনের স্নিগ্ধমধুর স্নেহ প্রেম ও ত্যাগের নির্যাসসিক্ত এই উপন্যাসের কাহিনী। রানী সেমন্তী তার উৎসধারা। সুহার সেই উৎসের প্লাবনী-শক্তি।

রাজা নাগাদিত্যের সঙ্গে সুহারের দ্বিতীয় দর্শনের পর থেকে সুহারের মানসিক পরিবর্তনের স্তরগুলি লেখিকা সূক্ষ্মরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম দর্শনে 'বর' সম্বোধনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় আভাসিত হয়েছে। রাজার প্রতি ভালোবাসার ঔচিত্য সম্পর্কে তার মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি। সুহারের প্রণয়-চেতনার মূলে আছে রাজার প্রতি আন্তরিক

আকর্ষণবোধ। এই আন্তরিকতাই তাকে প্রেমের গৌরবদীপ্তি দান করেছে। রাজ্য ও রাজসিংহাসন ভীলগণ কর্তৃক অধিকৃত হলে সে দূর অরণ্যভূমিতে রাজপুত্র বাপ্পাকে মাতৃস্নেহে মানুষ করে তুলে তার প্রেমের চরম মূল্য দান করেছে। স্বর্ণকুমারীর বিশ্লেষণ-পদ্ধতির ফলে সুহার-চরিত্র আদর্শবতী প্রেমময়ী নারীরূপে সহজেই পাঠকের হৃদয় অধিকার করে।

ভীলদের প্রেমচেতনা যে উন্নততর মানবশ্রেণী অপেক্ষা হীন নয়, তার প্রমাণ ক্ষেতিয়া। প্রেমবঞ্চিত ক্ষেতিয়া শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্রোত বিপথগামী হতে দেখে ব্যাপারটি জঙ্গুকে জানিয়ে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল, তার ফলে তার অজ্ঞাতসারে বিদ্রোহের নিভন্ত আগুনে সহসা ফুঁ পড়ল। এবং সুহারের প্রতি প্রণয়ের সে চরম উদাহরণ রাখল সুহারকে ভালোবেসে, তার দাসত্বে, তার ভক্তিপূজায় জীবন সমর্পণ করে (উপসংহার)।

হরিতাচার্যের চরিত্রে সাহস, অবিচলিত নিষ্ঠা, স্বার্থহীন রাজানুরক্তি ও কর্তব্যবোধের উদাহরণ মেলে।

ভীলসমাজের চিত্র এই উপন্যাস একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে। ভীলদের জীবনযাত্রার প্রণালী, কুসংস্কার ঈর্ষা অলৌকিকতায় বিশ্বাস এবং ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপনেচ্ছার উজ্জ্বল চিত্র লেখিকা অঙ্কন করেছেন। মিবাররাজ-এর মত এই গ্রন্থেও তিনি ভীলদের মুখে বিভাষা প্রয়োগ করে তাদের শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছেন।

গীতিকার ও কবি স্বর্ণকুমারী এই উপন্যাসেও গানের সন্নিবেশ করেছেন। 'কেন সখি আসিতে না চায়', গানটির মাধ্যমে রানীর মনোভাবকে ব্যক্ত করেছেন এবং রাজার মনের তজ্জনিত প্রতিক্রিয়াও ফুটিয়ে তুলেছেন (পৃ. ১৮৯—৯০)। স্বর্ণকুমারার রচনারীতি এই উপন্যাসে উৎকর্ষ লাভ করেছে।

তবে বিদ্রোহের সুর গ্রন্থটিকে আগাগোড়া আচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ থেকে চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ (পৃ ১০৬ থেকে ২৫৩) পর্যন্ত বিদ্রোহের আশঙ্কার স্থলে, রাজার ভবিষ্যৎ গণনা থেকে শুরু করে সুহারের সঙ্গে রাজার নতুন প্রণয়-প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রণয়ের প্রেক্ষিতে রাজা-রানীর মানসিক সম্পর্কেও বিরোধ লক্ষিত হয়। এই অংশটুকু বিদ্রোহের দ্বিতীয় কারণের ভিত্তিভূমি রূপে রচিত হয়েছে বলে মনে করা

যেতে পারে। প্রকৃতিবর্ণনায় তাঁর কবিমনের স্পর্শ নিহিত। পরিবেশ-রচনায়ও সার্থকতার স্বাক্ষর বর্তমান।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের প্রভাব এই উপন্যাসে লক্ষণীয়। নাগাদিত্যের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের, সেমন্তীর সঙ্গে সূর্যমুখীর এবং সুহারের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

দুশো বছর পরাধীন থাকার ফলে ভীলদের জীবনে যে কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ও আনুগত্যবোধ সঞ্চিত হয়েছিল তার মধ্যে সমকালের জাতীয়মানসের প্রতিচ্ছবি যেন উদ্ভাসিত।

'বিদ্রোহ' স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিণত রচনা।

'ফুলের মালা'[৮] স্বর্ণকুমারীর সর্বশেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ফুলের মালায় বাংলাদেশে মুসলমান সুলতানদের আমলে রাজা গণেশের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। রাজা গণেশের কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ নিঃসন্দেহ নন। স্বর্ণকুমারী কোন ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বনে এই উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আচার্য যদুনাথ রাজা গণেশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবের কথা জানিয়েছেন।[৯] শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী রাজা গণেশ সম্পর্কে 'গৌড়ের ইতিহাস'[১০]-এ ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করে বলেছেন, 'রাজা গণেশ (১৪০৫ খ্রীঃ—১৪১৪ খ্রীঃ) ভাতুরিয়া পরগনার জমিদার ছিলেন। 'রাজা গণেশ গিয়াসউদ্দিনের আ.লে, রাজসভার একজন প্রধান আমীর ছিলেন। ক্রমে রাজস্ববিভাগ ও শাসনবিভাগের সর্বময় হইয়া উঠেন। ১৪৯০ শকে রচিত ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—রাজা গণেশ, অদ্বৈতাচার্যের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে, গৌড়িয়া বাদশাহ্‌কে মারিয়া গৌড়ের রাজা হন। যথা—

'যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলিখ্যাত,
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াস্ত আবু ওঝার বংশজাত ॥

৮. ফুলের মালা, ইং ১৮৯৫ খ্রীঃ, পৃ. ১৫৯। 'ভারতী ও বালকে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (ভাদ্র ১২৯৯, পৃ. ২৫৬)। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে The Fatal Garland নামে Modern Review-এ প্রকাশিত হয়।

৯. Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol. II.

১০. রজনীকান্ত চক্রবর্তী : গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৬৫।

যেই নরসিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদ্‌শাহে মারি', গৌড়ে হৈল রাজা॥'

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'সৈফউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র 'দ্বিতীয় সামসুদ্দিন' নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া তিনি ভাতুরিয়ার রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হন'[১১]।

স্বর্ণকুমারী ইতিহাস ও কিংবদন্তী অবলম্বনে এই কাহিনী রচনা করেছেন। উপন্যাসটির উপসংহারে গণেশের পুত্র যাদব, গায়সুদ্দিন ও শক্তির কন্যা গুলবাহারকে বিবাহ করে জেলালুদ্দীন নামে বঙ্গের রাজা হয়েছিলেন বলে লেখিকা উল্লেখ করেছেন। যাদব বা যদুর প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে ক্ষীণ। যদুর পরিচয় সম্পর্কেও ঐতিহাসিকেরা একমত নন। আচার্য দীনেশচন্দ্র বলেছেন, 'যদু সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, তিনি গণেশের এক মুসলমানী উপপত্নীর গর্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, সুতরাং তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন। কেহ আবার বলেন, তিনি কুতুবউল আলাম নামক কোন মুসলমান সাধুর চর্বিত পান খাওয়াতে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি আসমানতারা নামক মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়িয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন।'[১২] যদু (যাদব)র যে পরিচয় লেখিকা তুলে ধরেছেন সেটি তাঁর কল্পনাপ্রসূত।

এই উপন্যাসে লেখিকা, গণেশ ও শক্তির বাল্যপ্রণয় ও পরিণয়ব্যর্থতাজনিত শক্তির প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও গণেশের প্রতি গভীর প্রণয়ের স্বাক্ষরস্বরূপ স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের উদাহরণ রেখেছেন। গণেশদেবের চারিত্রিক আদর্শের রূপও প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসে। শক্তির চরিত্রের ওজস্বিতা সংকল্প ও ত্যাগ তাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। গণেশদেবের প্রণয়বঞ্চিত শক্তি প্রতিশোধ-চরিতার্থতায় বাদশাহ্‌পুত্র গায়সুদ্দিনকে বিবাহ করলেও তাকে পূর্ণপ্রাণে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারেনি। শক্তির প্রতিশোধ-গ্রহণ পন্থা রক্তপাতের মধ্য দিয়ে নয়, বশ্যতা স্বীকারের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সে গণেশকে

১১. দীনেশ সেন : বৃহৎবঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৩৪২, পৃ. ৬২২।
১২. তদেব, পৃ. ৬২৬।

ভুল বুঝেছিল। এই ভুল তার ভাঙল যখন যবনী শক্তি জানল, মহারানীর অমতেই গণেশদেব তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। গণেশদেবের কাছে তার অকলঙ্কিত হৃদয়মন নিবেদন করতে গেলে গণেশ তাকে জানালেন, 'স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন'। শক্তি আশ্রয় চেয়েও ব্যর্থ হয়ে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হৃদয়ে গায়েসউদ্দীনের কাছে ফিরে গেল। তারপর প্রেমের ব্রত উদ্‌যাপনের চরম স্বাক্ষর রাখল সে। বন্দী গণেশদেবকে কারামুক্ত করে দিয়ে নিজেই সেই স্থান গ্রহণ করে আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে।

শক্তির সঙ্গে গণেশদেবের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ভিত্তি করেই মূলত উপন্যাসটির গ্রন্থন। এই কাহিনীর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে ইতিহাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গণেশদেব সত্য ও আদর্শনিষ্ঠ চরিত্ররূপে লেখিকার সমর্থন পেয়েছেন। নারী-মনের আশা-নিরাশা ও মানসিক পর্যায়গুলি লেখিকা সুন্দরভাবে উদঘাটিত করেছেন এই উপন্যাসে।

উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের প্রভাব স্পষ্ট। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে গায়েসউদ্দীন-বেগম শক্তির প্রতি গণেশদেবের উপদেশবাণী, শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার শক্তির উক্তিও অনেকটা শৈবলিনীর অনুরূপ। হৃদয়ধর্ম ও সমাজধর্মের দ্বন্দ্বে সমাজধর্মের জয়ঘোষণা বঙ্কিম-আদর্শ-অনুরূপ। গণেশদেবের স্বপ্নপ্রসঙ্গও বঙ্কিমরীতিসম্মত (ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ)। কুতুব-চরিত্র শেকস্‌পীয়রের ওথেলো, নাটকের আয়াগো-জাতীয়। লেখিকা এ সম্পর্কে নিজেই সচেতন (অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ)। সেকেন্দার শাহ্‌ ও গায়েসউদ্দীনের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি।

উপন্যাসটিতে সন্ন্যাসিনী যোগিনীর ভূমিকা অতিলৌকিক। কালীর মূর্তি-পরিকল্পনায় ও দৈববাণী-সংঘটনে অলৌকিকতার ছাপ স্পষ্ট (দশম পরিচ্ছেদ)। ফুলের মালায় ও গানের ছড়াছড়ি। অবশ্য লেখিকা সেগুলিকে সচেতনভাবে কাজে লাগিয়েছেন। রাজা গণেশকে নিয়ে সমকালে একাধিক লেখক উপন্যাস রচনা করেছেন।[১৩]

১৩. (১) গঙ্গাচরণ দত্ত: বীরাঙ্গনা (১৮৮৪) এই উপন্যাসটিতে গণেশের রাজত্বকালে সম্রাট ফিরোজ শাহের মোঘল সৈন্য কর্তৃক গৌড় আক্রান্ত হবার সময়ে, গোলাপকুমারী নাম্নী এক মহিলার শৌর্যের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং যুদ্ধ-অন্তে গোলাপকুমারী বা বীরাঙ্গনার সঙ্গে গণেশের বিবাহের কথা আছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনার ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য না হলেও স্বর্ণকুমারী যে এক্ষেত্রে অনেকটা রমেশচন্দ্র দত্তের সমগোত্রীয় একথা বলতে বাধা নেই। বঙ্কিমের মত কল্পনাসমৃদ্ধি তাঁর ছিল না। বরং ঐতিহাসিক তথ্য ও যাথার্থ্যের প্রতি আনুগত্যবোধ তাঁকে রমেশ-চন্দ্রের সমকক্ষ করে তুলেছে। স্বর্ণকুমারীর হাতে ঐতিহাসিক কাহিনী ভাষা ও বিশ্লেষণ-শক্তির প্রয়োগে সরস উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে। ভাষা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য স্বর্ণকুমারীকে কোন কোন ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। স্বর্ণকুমারী যেখানে ইতিহাসের চেয়ে গল্পের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী, রমেশচন্দ্র সেখানে ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে সরস আলোচনার জাল বিস্তার করেছেন। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্রের প্রাধান্যদানে। এমনকি গ্রন্থের নামকরণের ক্ষেত্রেও উভয়ের সাদৃশ্য বর্তমান। ফুলের মালা ও মাধবীকঙ্কণ তার উদাহরণ। এই দুই উপন্যাসে প্রেমের ক্ষেত্রেও শক্তি ও নরেন্দ্রনাথের (মাধবীকঙ্কণ) ব্যর্থতার কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনার ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর প্রেরণাগত মিল দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

স্বর্ণকুমারীর 'ছিন্নমুকুল'[১৪] এক ভগিনীর ভ্রাতৃপ্রেমের নিঃস্বার্থ কাহিনী। একটি নারীর ভালোবাসা ও কর্তব্যদীপ্ত ব্যক্তিত্বের জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে এই উপন্যাসে। প্রমোদের প্রতি ভগিনী কনকের ভালোবাসা শিশুকাল থেকেই দেখা যায়। প্রণয়ীকে স্বামীরূপে পাবার আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও দাদার অনুমতির অভাবে সে তাকে পতিরূপে বরণ করতে পারল না এবং দাদা ও বৌদির অপ্রীতিকর ব্যবহারে সে পাগল হয়ে মৃত্যু বরণ করল। নানা ঘটনার স্রোতে 'ছিন্নমুকুল'-এর বিষয়বস্তু সংহত রূপ লাভ করতে পারেনি। উপঘটনা ও উপকাহিনীর ধারা কাহিনীর মূলপ্রবাহকে স্তিমিত করে দিয়েছে। ভ্রাতার প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে ভগিনী কনকের ভূমিকা মহৎ। দাদাকে

(২) শ্রীশচন্দ্র ঘোষ: বঙ্গেশ্বর (১৮৯৫)

উপন্যাসটিতে চতুর্দশ শতকে দিনাজপুরের জমিদার রাজা গণেশ কর্তৃক বঙ্গদেশে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের সিংহাসন লাভ ও ইসলামধর্ম গ্রহণের কথা আছে।

১৪. ছিন্নমুকুল, ৪ নভেম্বর ১৮৭৯, পৃ. সং ২৩৮। পৌষ ১২৮৫ থেকে ভারতীতে, (পৃ. ৪১২) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। ৩য় সং ১৯০০ (পরিবর্ধিত)।

অর্থসাহায্য করতে গিয়ে কনকের শাড়ি ও গহনা বিক্রয়ের চেষ্টা প্রমোদের প্রতি গভীর ভালোবাসাজনিত ত্যাগস্বীকারের উদাহরণ। এই জাতীয় ত্যাগস্বীকারের উদাহরণ প্রমোদের আচরণে পাওয়া যায় না। এবং কনক অপেক্ষা বন্ধু যামিনীনাথের প্রতি প্রমোদের আকর্ষণের আধিক্য প্রকাশ পায়। বিবাহের পরেও প্রমোদ ভগিনী কনকের প্রতি যে জাতীয় দুর্ব্যবহার করে, তার মূলে আছে বন্ধু যামিনীনাথের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা। তার ধারণা নীরজাকে স্ত্রীরূপে পাবার পশ্চাতে আছে যামিনীনাথের নিঃস্বার্থ মন। যামিনীনাথ তাকে সবদিক দিয়ে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে, তাকে বাদ দিয়ে তার জীবনের সঙ্গে জড়িত অন্য কোন মানুষকে চিন্তা করা অসম্ভব-প্রায় ছিল। তাই প্রমোদ কনককে ভুল বুঝেছিল। ভুল বুঝেছিল তার শুভার্থী হিরণকুমারকে। অবশ্য, কনকেব প্রতি ভুল তার পরবর্তীকালে ভেঙ্গেছিল। এবং কনকের জীবনদীপ নির্বাণের কালে প্রমোদ নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে জানিয়েছিল।

ছিন্নমুকুলের গল্পাংশ বিশেষত্ববর্জিত। অরণ্যবালিকা নীরজাকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধু প্রমোদ ও যামিনীনাথের প্রণয় ও প্রতিহিংসার কাহিনী গল্পের মূলরসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। প্রতিটি পরিচ্ছেদের শিরোনামা, অরণ্যভূমিতে অরণ্যবালা নীরজার চিত্র, সন্ন্যাসীর ভূমিকা, ইত্যাদি বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রকে সহজেই স্মরণ করিয়ে দেয়। নীরজা চরিত্র যেন কপালকুণ্ডলার প্রত্যুত্তর। সেও অরণ্যবালা। অরণ্যে আজন্ম প্রতিপালিতা। তবে তার জীবনে কাঠুরিয়াশ্রেণীর মানুষ, অরণ্যসন্নিহিত হিন্দুস্থানী নারী, মন্দিরের দাবোয়ান প্রভৃতিদের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সে সংস্কৃত শিখত। বিবাহপূর্বকালে তাঁর প্রেম সম্পর্কে ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায় যামিনীনাথের গৃহে থাকার কালে। অবাস্তবতা ও অলৌকিকতা উপন্যাসটির বক্তব্যের গৌরবকে লঘু করে দিয়েছে। ঘটনা-সংস্থাপনে আকস্মিকতা ও নাটকীয়তা উপন্যাসটিতে চমকের সৃষ্টি করেছে। যথা:

অরণ্যভূমিতে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত (২য় পরিচ্ছেদ)।

পেঁচার অমঙ্গলসূচক কর্কশ স্বরে নীরজার শিহরণ ও অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে কয়েকটি মূর্তি কর্তৃক নীরজাকে শূন্যে তুলে নিয়ে যাওয়া (অষ্টম পরিচ্ছেদ)। সুশীলার মৃত্যুকালে দূরাগত সঙ্গীত-

ধ্বনি (চতুর্বিংশ), সুশীলার মৃত্যুকালে সন্ন্যাসীর আগমন (চতুর্বিংশ), হিরণকুমার কর্তৃক গঙ্গাবক্ষ থেকে কনককে উদ্ধার (সপ্তবিংশ), নৌকাডুবির পর মূর্ছাপন্ন নীরজাকে নিয়ে পথচলার কালে বিদ্যুতালোকে প্রমোদ কর্তৃক মুমূর্ষু সন্ন্যাসীদর্শন এবং সন্ন্যাসী কর্তৃক যামিনীর স্বরূপ প্রকাশ (উনচত্বারিংশ)।

যামিনীনাথের চরিত্রে শেকস্পীয়রের ওথেলো নাটকের আয়াগোর প্রভাব বর্তমান। নীরজাকে কথিত উক্তির সঙ্গে আয়াগোর একটি উক্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।[১৫] তাছাড়া তার চরিত্রের বাহ্যিক সাধুতা ও আভ্যন্তরিক খলতা আয়াগোর অনুরূপ। কনকের চরিত্রের দ্বৈতরূপ লক্ষণীয়। (১) ভ্রাতৃপ্রেমে নিষ্ঠা (২) নিজ ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ সম্পর্কে সচেতনতা। হিরণের চরিত্রে সংযম, প্রেমনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রমোদ অনেকটা স্বার্থপর ও বুদ্ধিহীন।

গান, স্থানে স্থানে এই উপন্যাসে নাটকীয় চমক এনেছে। বইটির প্রথম পরিচ্ছেদে একটি প্রজাপতিকে কেন্দ্র করে, সুন্দর ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে কনক-চরিত্রের ভবিষ্যৎ আভাসিত হয়েছে। ছিন্নমুকুল উচ্চতর শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখে না।

'হুগলীর ইমামবাড়ী'[১৬] ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত হলেও প্রকৃত পক্ষে সামাজিক উপন্যাসেরই লক্ষণযুক্ত। মহম্মদ মসীন ও তাঁর ভগিনী মুন্নার প্রীতি-মধুর সম্পর্কই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। কিন্তু তত্ত্বালোচনার আধিক্য উপন্যাসের মূল গল্পরসকে সহজেই শোষণ করে নিয়েছে। সমস্ত কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে, ঘটনানিয়ন্ত্রণে প্রধানপদ গ্রহণ করেছেন সন্ন্যাসী। ফলে অতিরিক্ত ধর্মতত্ত্বালোচনা ও অলৌকিক প্রভাব উপন্যাসটির মূল ত্রুটির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৫. যামিনীনাথ—Nor poppy nor mandragora can give me that sweet sleep which···(তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। Iago—Nor poppy nor mandragora nor all the drowsie Syrups of the world shall ever medicine thee to that sweete sleepe which···Othello (Act III, Scene III).

১৬. হুগলীর ইমামবাড়ী (ঐতিহাসিক উপন্যাস), বাং ১২৯৪, ইং ৮ই জানুয়ারি ১৮৮৮, পৃ. ২৫৬। পৌষ ১২৯১ থেকে 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

মসীন মায়ের প্রথম বিবাহের সন্তান। মুন্না দ্বিতীয় বিবাহের। তৎসত্ত্বেও ভ্রাতাভগিনীর সম্পর্ক প্রীতিমধুর। মসীন ধর্মপ্রাণ, মুন্না কর্তব্যপরায়ণা ও সতীত্ববোধসম্পন্না। স্বামী সলেউদ্দীন তাকে পরিত্যাগ করলেও সে স্বামিগতপ্রাণা। প্রলোভন ও অর্থ তাকে সত্যচ্যুত করেনি। সে ভিখারিনী সন্ন্যাসিনী হয়েই জীবন অতিবাহিত করেছে। পিতৃদত্ত অর্থ সে স্বেচ্ছায় মসীনকে দান করেছে। মসীনের ভগিনী-প্রেম তার চরিত্রকে অনায়াস মাধুর্য দিয়েছে। মুন্নার দুরবস্থার কথা ভেবে মুন্নার পিতা মতাহারের সন্ধানে মগরপীরের পথে সরাইখানায় রুগ্‌ণ মতাহারকে সে আবিষ্কার করল। করাচির পান্থশালায় অসুস্থ মতাহার সব জেনে প্রাণত্যাগ করলে মহম্মদ ফিরে এল। মুন্না পিতার দানপত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থসম্পদ সব মসীনকে দান করলে, মসীন জনকল্যাণে সেই অর্থ নিয়োগ করল। বহু বিদ্যালয়, অতিথিশালা স্থাপিত হল। হুগলীর ইমামবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হল। এই টাকার অংশে সরকার মসীন কলেজ করলেন। মসীনের ঔদার্য, সততা, ধর্মনিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞান তার চরিত্রের অপর দিক। সলেউদ্দীন বৈশিষ্ট্যহীন। খাঁজাহান একদিকে ঘটনাগত বৈচিত্র্যসৃষ্টির উপাদান, অন্যদিকে মুন্নার চারিত্রিক দৃঢ়তা পরিস্ফুটনের উপায়। মসীনের সঙ্গীতগুরু ভোলানাথ কর্তব্যে ও কৃতজ্ঞতায় সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। কাহিনীর মধ্যে এ্যাডভেন্‌চারের স্পর্শ বর্তমান। ঘটনায় নাটকীয়ত্ব লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ণনায় লেখিকা নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কাহিনীর গ্রন্থনশৈথিল্য উপন্যাসটির স্বচ্ছন্দ গতিধারার অন্তরায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনার শিল্পরীতি গ্রহণ করলেও হুগলীর ইমামবাড়ী যে সামাজিক উপন্যাস, কাহিনীই তার প্রমাণ।

‘স্নেহলতা’[১৭] সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কিত তার্কিকতায় প্রসঙ্গভ্রষ্ট একটি কাহিনী। স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসের নিজস্ব রীতি প্রবর্তিত হতে দেখা যায় এই উপন্যাসে। উপন্যাসটির মধ্যে লেখিকা তৎকালীন সমাজচিত্র প্রতিফলনে সচেতন মনের পরিচয় দিয়েছেন। বিধবাবিবাহ-প্রসঙ্গ, ব্রাহ্ম-সমাজের যুক্তিবাদ, গুপ্তসভা এবং ইংরাজ বিদ্বেষের বিষয় এইটিতে স্থান পেয়েছে।

১৭ স্নেহলতা বা পালিতা প্রথম ভাগ, বাং ১২৯৯, পৃ. সং ২৩৮; স্নেহলতা দ্বিতীয় খণ্ড, ইং ১৮৯৩, বাং ১২৯৯, পৃ. ১৮২। বৈশাখ ১২৯৬ থেকে ‘ভারতী ও বালকে’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। বৈশাখ ১২৯৭ থেকে নামবদলে ‘পালিতা’ করা হল।

তর্কবিতর্ক হৈ চৈ ও হট্টগোলের ঘূর্ণিপাকে স্নেহলতার কাহিনী স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করতে পারেনি। আদর্শবাদী ও সমাজসংস্কারক ডাক্তার জগচ্চন্দ্র—গঙ্গোপাধ্যায়ের ভগিনীর ননদ-কন্যা স্নেহলতা জগৎবাবুর পালিতা। মাতৃহীন বালিকার সঙ্গে নিজপুত্র চারুর বিবাহেচ্ছায় বাদ সাধলেন তাঁর স্ত্রী। প্রতিবেশিনী জীবনের মায়ের ইচ্ছে ছিল জীবনের সঙ্গে স্নেহলতার বিয়ে দেবার। কিন্তু জীবন রাজী না হওয়ায় তাঁর মধ্যস্থতায় মোহনের সঙ্গে স্নেহলতার বিয়ে হয়ে গেল। মোহনের সঙ্গে স্নেহলতার সম্পর্ক মধুর হলেও মোহনের জ্যেঠাইমা স্নেহলতাকে বিরূপ চোখে দেখতে লাগলেন। মোহন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে রুরকি চলে গেলে স্নেহ জগৎবাবুর বাড়ি ফিরে এল। জীবনের সঙ্গে জগৎবাবুর মেয়ে টগরের বিয়ে হল। জীবন বিবাহকালে বুঝতে পারল স্নেহলতাকে বিয়ে না করে সে কতবড় ভুল করেছে। বিয়ের পরদিন একটি চিঠি মারফত জীবন জানল মোহনের মৃত্যু হয়েছে। স্নেহলতা বিধবা হল জেনে জীবনের মনস্তাপের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের প্রথম ভাগের উপর উপসংহার টানা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড। দশবছর পরের ঘটনা। চারু এখন বিপত্নীক। স্ত্রীবিয়োগ-বেদনাজনিত দুঃখের মুহূর্তে স্নেহের সান্নিধ্য ও তার সমবেদনাপূর্ণ অশ্রুময় করুণ দৃষ্টির মধ্যে চারু নতুন করে স্নেহলতাকে আবিষ্কার করল, সে বিধবা। চারু ও স্নেহের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে ওঠে। স্বামী মোহনের দশবছর আগেকার ফটোগ্রাফ দেখতে গিয়ে স্নেহ অস্পষ্ট মোহনের স্থলে চারুকে দেখল, —'চক্ষু খুলিয়া আবার ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল, সেখানি স্পষ্ট চারুর ছবি' (পৃ. ৩২)। স্নেহ সংসার ও সমাজের কথা ভেবে বিবাহে আপত্তি করল। জগৎবাবুর স্ত্রী কৌশলে স্নেহকে তার শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিল। স্নেহের দেবর কিশোরীর মিথ্যাচরণের জন্যে জগৎবাবুর সঙ্গে স্নেহের দেখা হল না এবং চারুর সঙ্গে স্নেহের সম্পর্কও ছিন্ন হল। কিশোরীর অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে গিয়ে স্নেহ জীবন ও টগরের আশ্রয় নেয়। চারুর বিয়ে হয়ে গেলে স্নেহ জগৎবাবুর বাড়ি আসে। জগৎবাবু স্নেহকে তাঁর সম্পত্তির অর্ধাংশ দিতে গেলে চারু বাদ সাধে এবং নিজের দোষস্খালনের জন্য স্নেহের একটি অসমাপ্ত চিঠি বাবাকে দেয়। স্নেহ স্বীকার করে চিঠি তার লেখা। তারপর বিষপান করে আত্মহত্যা করে। স্নেহের মৃত্যুর পর

জগৎবাবু নাতিনাতনি নিয়ে আনন্দে থাকেন। 'তিনি এখন পূর্ণমাত্রায় রক্ষণশীল হিন্দু'।

গ্রন্থটিতে স্বর্ণকুমারী তৎকালীন বিভিন্ন সমাজ-আন্দোলনের ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কাহিনীতে অযথা জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। আদর্শবাদিতার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কসূত্র রচনা করে লেখিকা পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মসমাজের ঔদার্যের পরিচয় উদ্ধার করেছেন। লেখিকা গ্রন্থমধ্যে গুপ্তসভার প্রসঙ্গ এনে এবং তার সঙ্গে কয়েকটি যুবকের সম্পর্ক রচনা করে উপন্যাসটির মধ্যে তর্ক ও কোলাহলের জাল বুনেছেন। মোহন এবং জীবনকে স্নেহ ও টগরের স্বামী রূপে পাওয়ার মধ্যেই এই চরিত্রদ্বয়ের অস্তিত্বসূত্র বর্তমান। অন্যথায় এরা অপাংক্তেয়। মোহন ও জীবনের আদর্শবাদের সঙ্গে গুপ্তসভার নির্দেশজনিত সম্পর্ক বর্তমান। এই সভার সদস্যদের খড়্গ স্পর্শ করে শপথ করতে হত ভারতের মঙ্গলকার্যে প্রাণপণ করার। চন্দননগরে জগৎবাবুর বাগানে অধিবেশনকালে সমস্বরে গান হত—'আজি হতে একসূত্রে গাঁথিনু জীবন, জীবনমরণে রব শপথ বন্ধন।' নবীনকে লিখিত জীবনের পথে কংগ্রেসের জয়গান রচিত হয়েছে। কংগ্রেস মহাপ্রাণ জাগ্রত করেছে। রাজনৈতিক উন্নতি বা সামাজিক উন্নতি এর আনুষঙ্গিক ফল (২য় খণ্ড পৃ. ১৩৬)। এই গুপ্তসভার প্রভাব ও কংগ্রেসের প্রসঙ্গ উপন্যাসের প্রয়োজনসিদ্ধির অন্তরায়। এই জাতীয় গুপ্তসভার চিত্র পাই, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে।

বিধবা-প্রণয় ও বিবাহ-প্রসঙ্গ এই উপন্যাসের একটি প্রয়োজনীয় দিক। ব্রাহ্ম-আদর্শে বিশ্বাসী জগৎবাবু, প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিধবাবিবাহে স্বয়ং উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু এহো বাহ্য। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে চারুর সঙ্গে বিধবা স্নেহলতার প্রণয় ও বিবাহেচ্ছার প্রসঙ্গই অন্যতম বিচার্য বিষয়। বিধবা-বিবাহ অহিতকর একথা লেখিকা স্পষ্ট করে কোথাও বলেন নি। তবে সমাজ ও সংসারের বিরোধী বলে মনে করেছেন। চারু ও স্নেহের মধ্যে প্রণয় সংঘটিত হলেও বিবাহ সম্ভব হয় নি। এর পেছনকার একমাত্র কারণ জগৎবাবু ও তাঁর স্ত্রীর বিরোধিতা নয়, বিধবাবিবাহ সম্পর্কে স্নেহলতার ধারণা,— 'তাহলে তোমার বাপ-মা তোমাকে ত্যাগ করবেন, সমাজ ত্যাগ করবে, এখন তুমি যাকে সুখ ভাবছ তা তোমার চিরস্থায়ী অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'[১৮]

১৮. রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর উক্তির সাদৃশ্যবাহী।

(চারুর প্রতি স্নেহের উক্তি ২য় খণ্ড, পৃ, ৬৫ একাদশ পরিচ্ছেদ)। তাই প্রণয় সম্ভব হলেও বিবাহ সম্ভব নয়। প্রেমের যূপকাষ্ঠে স্নেহের মৃত্যু বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া স্ত্রী-শিক্ষার মঙ্গলজনক, বাল্যবিবাহ রহিত করার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গও (২য় খণ্ড পৃ. ১৬০) এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে জীবন-পরিণতি-দর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায় (কপালকুণ্ডলা, শৈবলিনী, কুন্দনন্দিনী ইত্যাদি)। স্নেহের ক্ষেত্রে লেখিকা বঙ্কিম-এর এই রীতি অনুসরণ করেছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পৃ. ৬৮—৬৯, একত্রিংশ পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৮২)।

স্নেহ ও টগরের বিবাহের স্ত্রী-আচার ও লৌকিক আচারের লেখিকা বাস্তবসম্মত চিত্র অঙ্কন করেছেন। এদিক থেকে তাঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতা প্রশংসার দাবি রাখে ; কিন্তু ঘটনার বাহুল্য, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা, অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের ভিড় উপন্যাসটির গ্রন্থনশৈথিল্য এনেছে। তাছাড়া চারু-স্নেহলতার প্রণয়প্রসঙ্গ জলের দাগের মত অস্থায়িভিত্তিক।

স্নেহলতা উপন্যাসটির নায়িকা। তাকে কেন্দ্র করেই ঘটনার অনুবর্তন। স্নেহলতার জীবনের উত্থান-পতন সুখ-দুঃখ-নৈরাশ্যের প্রসঙ্গই মূলত উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন লেখিকা। স্নেহলতার চরিত্রে আদর্শবাদের ছাপ পড়েছে। চারুকে ভালোবাসলে ও চারুর পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণের কথা ভেবে বিধবা স্নেহ বিবাহে রাজী হয়নি। তার মতে ভালোবাসা এক, বিবাহ অন্য। চারু গ্রন্থের নায়ক হলেও তার ভূমিকা সংকীর্ণ। সে কবি, কিন্তু অস্থিরচিত্তসম্পন্ন। পত্নীবিয়োগের পর চারু মদ্যপে পরিণত হল। স্নেহের প্রতি ভালোবাসার পশ্চাতে তার দৈহিক প্রেরণাই প্রধান। তাই দ্বিতীয়বার বিয়ের পর স্ত্রীর প্রতি অত্যাসক্তিবোধ ও স্নেহকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা সমভাবেই তার মধ্যে দেখা যায়। আদর্শবাদী জগৎবাবুর চরিত্রের মূলকথা, 'জগৎবাবু যেরূপ সরলপ্রকৃতি, সেরূপ সবল প্রকৃতি নহেন এবং আসলে তাহা নহেন বলিয়া তাঁহার যত সহ্য করিতে হয় সরল বলিয়া তত নহে।' আদর্শবাদী ও সমাজসংস্কারক থেকে পূর্ণমাত্রায় 'রক্ষণশীল হিন্দু'তে পরিণত হবার জন্য দায়ী তাঁর দুর্বল প্রকৃতি এবং ঘটনাবর্তের প্রতিক্রিয়া। স্নেহলতা স্বর্ণকুমারীর একটি সার্থক সৃষ্টি রূপে গণ্য না হলেও সম্ভাবনাপূর্ণ রচনা।

"কি আর বল্‌ব, my life and death are in your hands."

[কাহাকে ? ৪২ পৃষ্ঠা ।

Paragon Press

'কাহাকে'[১৯] স্বর্ণকুমারীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে গৃহীত হবার দাবি রাখে। বইটি আগাগোড়া উত্তম পুরুষে লেখা। একজন শিক্ষিতা কুমারী তার প্রণয় ও প্রণয়-পরিণামের কাহিনী বিবৃত করেছে।

গ্রন্থের নায়িকা মণির বয়স ১৯ কিংবা ২০ কিংবা ২১ বছর। শিশুকালে পাঠশালে ছোটুর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়। ছোটু গান গাইত—'হায়! মিলন হোলো, যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো।' দিদির বাড়ির টেনিস-পার্টিতে বিলাতফেরত মিস্টার ঘোষের কণ্ঠে মণি গানটি শোনে। পরে আবার শোনে দিদির বাড়িতে ডিনারে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে এলে। গানটি শুনতে শুনতে 'বাল্যের স্মৃতি-ধারা পূর্ণ প্রবাহে উথলিয়া কুমারী-হৃদয়ের সুপ্ত অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে স্ফীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিত।' মিস্টার রমানাথ ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হবে জেনে মণি আত্মপ্রসাদ লাভ করল। ভগিনীপতির বন্ধু ডাক্তার বোস ও মিস্টার ঘোষের কথোপকথন থেকে মণি জানল যে, মিস্টার ঘোষ বিলাতে বিবাহিত (Engaged)। অমায়িক ও সহানুভূতিশীল ব্যবহারের জন্য ডাক্তারের প্রতি মণির শ্রদ্ধা জন্মাল। দিদিকে সে জানাল মিস্টার ঘোষ তার স্বামী হবার যোগ্য নয়। ক্রমে আশাহত মণি ডাক্তারের মধ্যে ছোটুর অস্তিত্বের আভাস যেন খুঁজে পেল। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। মণি দোটানায় পড়ল। মণি ঘোষকে জানিয়ে দিল যে, সে তার কাছ থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। মণি শোনে ডাক্তারের সঙ্গে দিদির জর্জ এলিয়েটের নভেল নিয়ে আলোচনা হয়। মণির ভগিনীপতি ও স্ত্রীর কাছে ডাক্তারের সঙ্গে মণির বিয়ের কথা তোলে। ডাক্তারের প্রতি তার প্রণয়ের গভীরতা অনুভব করে। এমতাবস্থায় মণির বাবা জানান, তিনি পাত্র পছন্দ করে মণির বিয়ে দেবেন। বাবার সঙ্গে মণি ঢাকা যাত্রা করল। মণির বাবা ছোটুর সঙ্গে মণির বিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মণি প্রমাদ গুনল। একদিন ডাক্তার এল। কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তার জানাল মণি ছাড়া তার জীবন নিষ্ফল। অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হল মণির। তারপর একটি নাটকীয় মুহূর্তে রহস্যের জাল মুক্ত হল। মণি জানল ডাক্তারই ছোটু। মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে বিনয়কুমার ওরফে ছোটুর সঙ্গে মণির ভালোবাসা গভীরতর হল।

১৯. কাহাকে? বাং ১৩০৫ সাল, ইং ১৮৯৮, প. ১২১। 'ভারতী ও বালকে' ১৩০৩ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

আধুনিক শিক্ষিতা ও ব্যক্তিত্বময়ী নারী মণির প্রণয়সংকট ও পরিণাম লেখিকার রচনাশৈলীর গুণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটিতে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজচিত্রনে লেখিকার পর্যবেক্ষণক্ষমতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এই সম্পর্কে তৎকালীন সামাজিক মনোভাবও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। মণির পূর্ণ যৌবনাবস্থায় বিলাতফেরত রমানাথ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় ও তার কণ্ঠে মণির বাল্যবন্ধু ছোটুর কণ্ঠনিঃসৃত গান শ্রবণে তার মনে যে প্রেমের অঙ্কুর জাগে, তাকে আরও বেশি উদ্দীপ্ত করে তোলে তার স্বামী সম্পর্কে সংস্কারজাতীয় বিশ্বাস। মণি যখন জানল রমানাথ তার স্বামী হবেন, তখন তার—'একমাত্র পূজ্য আরাধ্য দেবতা, প্রাণের প্রিয়তম, জীবনের সর্বস্ব,' এই সংস্কার-জনিত বিশ্বাসই মণির 'প্রেমাঙ্কুরিত করিবার যথেষ্ট কারণ' (পৃ. ২৩)। কিন্তু যুক্তিবাদিনী মণি নিজের আদর্শ ও যুক্তির ভিত্তিতে প্রণয়ী ও স্বামীর পার্থক্য রচনা করে স্বামী সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্টতর করে তোলে, 'যে আমার ক্ষমার পাত্র সে আমার প্রণয়ী, আমার স্বামী হইবার যোগ্য নহে, আমার স্বামীতে আমি সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান গৌরবমণি দেখিতে চাই। সংসার যেমনই হোক, পৃথিবীতে সে আমাকে স্বর্গ দেখাইবে, আমি তাহাতে দেবতা পাইব (পৃ. ৩৭—৩৮)।' মণির চরিত্র স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের আলোকে উদ্ভাসিত। রমানাথের প্রেমবঞ্চিত পূর্বপ্রণয়িনী বিলাতী মহিলার প্রতি সে সমবেদনাশীল। সে উত্তেজিত স্বরে তাই তার সুখের পথের কাঁটা না হবার নিশ্চিত অভিপ্রায় জানায়। আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষায় সে যে রমানাথের বিবাহ-প্রার্থিনী নয় এবং এজন্য যে সে অব্যাহতি প্রার্থনা করে, একথা সে অসংকোচে জানিয়েছে। তার আত্মসম্মান সম্পর্কে সে পূর্ণসচেতন। মণির মন যখন বঞ্চনার বেদনায় নিঃসঙ্গ, এহেন মুহূর্তে ডাক্তারের উপস্থিতি, আচরণ ও স্নেহবাক্য মণির অভিমানী মনকে অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে। তারপর ধীরে ধীরে ডাক্তারের প্রতি আকর্ষণবোধ এবং প্রণয়ের স্বীকারোক্তি এবং পরিণামে নাটকীয় ভাবে উভয়ের মিলন। ডাক্তারকে ছোটুরূপে আবিষ্কার করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মণির অন্তর্দ্বন্দ্ব মনস্তাত্ত্বিক। একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্দীপ্ত কর্তব্যসচেতন অনুরূপ নারী-চরিত্রের সন্ধান পাই শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নয়নতারা'য় নয়নতারা-চরিত্রে।

নারী-মানসের স্বচ্ছন্দ চিন্তাপ্রবাহ ও মনোভাব এই উপন্যাসটিকে অকৃত্রিম

মাধুর্য দান করেছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, 'উপন্যাসের সমস্ত ব্যাপারেই নারীসুলভ সূক্ষ্মদর্শিতা ও ভাবপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়।'[২০]

উপন্যাসটিতে তর্কবিতর্কের যেমন স্থান আছে, তেমনি নভেলিস্ট ও নীতি-শিক্ষকের তুলনা প্রসঙ্গে জর্জ এলিয়ট ও শেকস্পীয়রের আলোচনা, বিলাতী-জীবনযাত্রা-পদ্ধতির কথা, এদেশে নারী-স্বাধীনতার আশু প্রয়োজনীয়তার বিষয় প্রভৃতি বহুবিধ প্রসঙ্গ উপন্যাসটির কলেবর পুষ্ট করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মূল গল্পরস কোথাও ব্যাহত হয়নি।

এই উপন্যাসের ঘটনানিয়ন্ত্রণে গানের বিশিষ্ট ভূমিকা স্মরণীয়। একটি গানকে কেন্দ্র করেই (হায়! মিলন হোলো। ···) মণির প্রণয়-চেতনায় গ্রন্থিপাত এবং এ গানটিকে কেন্দ্র করেই সংশয়মোচন ও মিলনের স্থায়ী বন্ধন রচনা। উপন্যাসটির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বঙ্কিমের 'ইন্দিরা' ও 'রজনী'র সূত্রেই এর আবির্ভাব। সমকালে এই রীতিতে রচিত কয়েকজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়[২১]। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই রীতিরই অনুক্রমণ। স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে' তাঁর প্রতিভার স্বর্ণচিহ্ন।

উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস-রচনায় স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। গঠনপদ্ধতির কোন কোন ক্ষেত্রে বঙ্কিমপ্রভাব-মুক্ত হতে না পারলেও তিনি বিষয়বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনুশীলিত মনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও মন যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ উপকরণের সন্ধান-পর হয়েছে তেমনি মানবচরিত্র ও সমাজচেতনার মর্ম স্পর্শ করে অভিজ্ঞতার আলোকপাত ঘটেছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসগুলি সংযম ও স্নিগ্ধতার বলয়ে পরিমণ্ডিত। নারী-মানসিকতা পরিস্ফুটনে, তার অধিকার, স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনে, সহানুভূতিপূর্ণ একাত্মতায় লেখিকা অভিনবত্ব এনেছেন।

২০. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (প. সং), পৃ ২৮৮-৮৯।

২১. (ক) সতীশচন্দ্র বসু: পল্লীগ্রাম, (১৮৯২)।

(খ) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়: অদৃষ্ট (১৮৯২)।

(গ) পঞ্চানন রায়চৌধুরী: কুলকলঙ্কিনী বা, কলিকাতার গুপ্তকথা (১৯০০)

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

তারকনাথ বিশ্বাস (১২৬৫—১৩৪৪)

বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তারকনাথ বিশ্বাসের অবদান সামান্য নয়। তারকনাথ যে সমকালে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, তাঁর অনেক উপন্যাসের একাধিক সংস্করণ তার প্রমাণ।

'আদরিণী'র সম্পাদক রূপেও তারকনাথের সাহিত্যসাধনা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তারকনাথ সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয়বিধ উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস আযতনে বৃহৎ নয়। ববং কয়েকটি উপন্যাস ক্ষুদ্র উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত। তারকনাথ বঙ্কিম-প্রভাবিত লেখক।

তারকনাথের সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে 'গিরিজা' 'কমলা' ও 'বিজয়-সিংহে'র নাম করা যেতে পারে। এই তিনটির মধ্যে 'গিরিজা' সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'সুহাসিনী' 'কমলকুমারী' 'চন্দ্রপ্রভা' ও 'বিরজা' উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস-গুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক কাহিনীর ক্ষেত্রে ইতিহাসের চরিত্র ও ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ঐতিহাসিক বর্ণ দেবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

'গিরিজা'[১] তারকনাথ বিশ্বাসের প্রথম উপন্যাস। লেখকের 'মানসতরুর প্রথম মুকুল'। একটি জটিল প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

হরকুমারকে গিরিজা (১৩) ভালোবাসে। গিরিজাকে ভালোবাসে বসন্ত। বসন্তকে ভালোবাসে বিরজা। বিরজার প্রণয়বঞ্চিত বসন্তের কাছে বিরজা প্রণয় নিবেদন করলে বসন্ত বিরজার প্রেমকে অস্বীকার করে না। কিন্তু গিরিজাকে ভুলতে পারে না। একদিন রাত্রে ব্রহ্মচারীবেশী হরকুমার গিরিজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেশান্তরী হবে বলে জানায়। কারণ গিরিজার বাবা রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিজার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন বসন্তের সঙ্গে। গিরিজা হরকুমারের সঙ্গে দেশত্যাগিনী হল।

হরকুমার মুর্শিদাবাদে গিরিজাকে নিয়ে সুখে বাস করতে থাকে। অসুস্থ রামশঙ্কর নদীপথে ভ্রমণকালে মুর্শিদাবাদের কাছে স্নানরতা কন্যাকে দেখে

১. গিরিজা, ১৮৮২, চ, সং ১৮৮৭, (১২৯৪), পৃ. ৪৯। গ্রন্থটি ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়।

মূর্ছিত হয়ে পড়েন। পিতাপুত্রীর মিলন হয় এবং শাস্ত্রমতে রামশঙ্কর হরকুমারের সঙ্গে গিরিজার বিয়ে দেন। এর কিছুকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

হরকুমার পরনারীতে আসক্ত হয়। এদিকে বসন্ত পাগল হয়ে মুর্শিদাবাদে ঘুরতে থাকে। তাকে অনুসরণ করে চলে বিরজা। বসন্তের সঙ্গে গিরিজার দেখা হলে গিরিজা গভীর বেদনা অনুভব করে। বসন্ত পথে পথে গান গায়।

হরকুমার স্থির করে গিরিজাকে বাড়ি রেখে আসবে। নদীপথে যাবার কালে গিরিজা নদীগর্ভে পড়ে যায়। ঘটনাচক্রে বসন্ত পাগল ছুটে আসে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। গিরিজাকে পাওয়া যায় না। গিরিজা তাকে চায় না এই চরম ক্ষোভ শেষবারের মত প্রকাশ করে, নদীগর্ভেই বিরজাকে জীবনের সাথী করে নেয়। তারপর জন্মান্তরে মিলনের আশায় উভয়ে ডুব দেয়।

উপন্যাসটির মধ্যে অবাস্তব কল্পনা ও নাটকীয় চমক লক্ষণীয়। লেখক কল্পনার সূত্রকে যথেচ্ছাচারী হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে যেন গল্পের জাল বুনেছেন। উপন্যাসটির প্রণয়কাহিনীর জটিলতার গ্রন্থিমোচনেও লেখক কোনও উন্নততর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেননি। তবে উপন্যাসটির গল্পরস পাঠকমনকে টেনে নিয়ে যায়। বিবাহ না হওয়া সত্ত্বেও হরকুমারের সঙ্গে গিরিজার বিবাহিত জীবন-যাপন বিসদৃশ ও নীতিবিগর্হিত। ভবিষ্যতে উভয়ের বিবাহের পূর্বধাপ রূপে এই আচরণ আদৌ সুস্থ কল্পনাপ্রসূত নয়। মুর্শিদাবাদে পাগল বসন্তের সঙ্গে বিরজার সান্নিধ্যও অনেকটা এই জাতীয়। বসন্তকুমারের গান শুনে মুর্শিদাবাদে গিরিজাকে চিনতে পারার ঘটনার মধ্যে, লেখক প্রেমপাগল বসন্তের জন্য পাঠকের সহানুভূতি আদায়ে কিছুটা সক্ষম হয়েছেন। এই জাতীয় শিল্পকৌশল গৃহীত হয়েছে স্বর্ণকুমারীর ছিন্নমুকুল-এ। গিরিজার প্রণয়নিষ্ঠা তার পূর্বাপর আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও কর্তব্যচেতনা তার প্রণয়নিষ্ঠার উজ্জ্বল উদাহরণ। অন্য নারীতে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হরকুমারের চরিত্রকে জটিল করে তুলেছে। গিরিজার মত বিরজাও আদর্শতাড়িত। 'বঙ্গদর্শন'[২]এ 'গিরিজা'র সমালোচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করছি,—'তিনি (গ্রন্থকার) এই অল্প আয়তনের মধ্যে উপন্যাসের

২. বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৯

সর্বাঙ্গ ঠিক রাখিয়াছেন, স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যে তিনি সুলেখক হইবেন তাহার যথেষ্ট চিহ্ন দেখাইয়াছেন।'

তারকনাথের অপর দুটি সামাজিক উপন্যাস 'কমলা'[৩] ও 'বিজয়সিংহ'[৪] গতানুগতিক ও বৈশিষ্ট্যহীন রচনা। কমলায় বিধবা-সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে। বিজয়সিংহ একটি প্রেমের গল্প, সরলরেখায় সমাপ্ত। কমলার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'প্রবাহ' পত্রিকায় বলা হয়েছে, 'প্রকৃত প্রস্তাবে সমালোচ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিকে 'নভেল' বলা যায় না—ইহা সরল কথায়, সরল ভাবে সরল পথে একটি উদ্দেশ্যের চরম ফল (consu nmation) দেখাইবার অভিপ্রায়ে ধাবিত[৫]'।

তারকনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'সুহাসিনী'[৬] প্রথম রচনা। উপন্যাসটির শেষের দিকে সহসা সিরাজউদ্দৌলার আবির্ভাব ও কাহিনীর পরিণতির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক বর্ণ দান করেছে। এটি একটি ত্রিভুজ প্রণয়কাহিনী, প্রেম ও প্রতিহিংসা উপজীব্য বিষয়।

সুহাসিনী ও নীরজা সখিত্বের বন্ধনে গভীরভাবে আবদ্ধ। পঞ্চদশী সুহাসিনী দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক বিপিনের সঙ্গে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ। গ্রাম্য দলাদলির ফলে উভয়ের পিতার মধ্যে জাতক্রোধ থাকায়, এই প্রণয়ীযুগলের প্রণয়-পরিণাম বিবাহে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা কম ছিল। সুহাসিনী মনে করে 'আত্মসমর্পণ বিবাহের উদ্দেশ্য' এবং ঠিক সেই কারণেই সে বিপিনের স্ত্রী বলে নিজেকে জ্ঞান করে।

নীরজা জানায়, সে বিপিনকে ভালোবাসে। কিন্তু, এই কথাটি যে নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হয়ে সুহাসিনীর জীবনে দুঃখের আবর্ত সৃষ্টি করবে তা সে ভাবেনি। সুহাসিনীর কাকার হত্যার সঙ্গে মিথ্যা সন্দেহে জড়িত বিপিনের গৃহত্যাগের পূর্বে, সুহাসিনী তার সঙ্গ নেবে এমন অভিপ্রায় জানালে, সে নির্দিষ্ট দিনে শিবিকা ও বাহক পাঠাবে জানাল। নীরজা সুহাসিনীকে তার 'ভবিষ্যৎ তমোময়' দেখে, তাকে নিবৃত্ত করতে চাইল এবং তাকে মিথ্যা আশা

৩. কমলা, ১৮৮৩।

৪. বিজয়সিংহ, ১৮৮২, পৃ. ১১৯। আদরিণী থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৫. প্রবাহ, ২য় ভাগ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১২৯০, পৃ. ৩৩৫—৩৬।

৬. সুহাসিনী, ১৮৮২ (১২৮৯), পৃ. ১২৫। শুরুতে অশুদ্ধ সংশোধন পৃষ্ঠা।

দিয়ে সুহাসিনীর জন্য প্রেরিত শিবিকায় নিজে আরোহণ করে বিপিনের কাছে গিয়ে প্রেম নিবেদন করল। বিপিন প্রেম প্রত্যাখ্যান করলে, নীরজা নিকটস্থ অরণ্যে আশ্রয় নিল এবং জগৎ শেঠের ভ্রাতুষ্পুত্র কমল শেঠের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ চলে গেল।

মুর্শিদাবাদে নীরজা কমলের কাছে দেহ সমর্পণ করতে বাধ্য হল। এক বৃদ্ধা দাসীর ষড়যন্ত্রে সে সিরাজউদ্দৌলার হাতে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত সিরাজের বাঁদীতে পরিণত হল। এই বৃদ্ধার ছল-চাতুর্যে বিরহিণী সুহাসিনী একদিন লুণ্ঠিতা হয়ে সিরাজউদ্দৌলার কাছে আনীতা হল। সুহাসিনী সিরাজকে পিতা বলে সম্বোধন করেও তার হাত থেকে মুক্তি পেল না।

মোহনলালের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদে পলাশীর প্রান্তরে মিরজাফরের বিরুদ্ধাচরণের কথা জেনে নবাব চিন্তিত হলেন। নবাবের পরাজয় হলে তিনি নীরজাকে নিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। সুহাসিনীও সুযোগমত পালাল।

গঙ্গাতীরে ব্রহ্মচারীবেশী বিপিনের সঙ্গে সুহাসিনীর পুনর্মিলন হল। নীরজার আবির্ভাবে আনন্দময় পরিবেশ তিক্ততায় পরিণত হল। সে জানাল, সুহাসিনী নবাবের বেগম। কিন্তু দাসী জানাল সে সতী। সহসা নবাব সুহাসিনীকে মা বলে সম্বোধন করে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নবাব শাণিত ছুরিকায় 'নারকী শয়তান' নীরজার হৃদয় বিদ্ধ করলেন। বিপিনের কোলে মাথা রেখে নীরজা মরল।

উপন্যাসের ঘটনাকাল সিরাজউদ্দৌলার শাসনকাল। এই ঐতিহাসিক কালপরিচয়ে কাহিনীর গ্রন্থন। লেখক সিরাজকে নৃশংস বলে অভিহিত করেছেন। লেখক বলেছেন, সিরাজউদ্দৌলার সময়ে 'সুন্দরী যুবতীগণের ত্রাসের আর ইয়ত্তা ছিল না। অধিক কি পিতামাতা সুন্দরীর পরিবর্তে কুৎসিত কন্যা কামনা করিতেন' (পৃ. ১২)। তৎকালীন ইতিহাসে সিরাজ-চরিত্রের নৃশংসতার কথা জানা যায়। পরবর্তীকালে অবশ্য সিরাজ সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সিরাজের পরাভবের পূর্বকালে এই ঘটনার বিস্তৃতি। মিরজাফরের শত্রুতা, সিরাজের পরাজয় ও পলায়ন ঐতিহাসিক ঘটনা। উপন্যাসটিতে আকস্মিক ঘটনার ছড়াছড়ি। বিন্ধ্যপর্বতের সন্নিহিত অঞ্চলের বনদেশে জগৎ শেঠের ভ্রাতুষ্পুত্র কমল শেঠের আবির্ভাবের কারণ অজ্ঞাত ও আকস্মিকতাপূর্ণ। তেমনি মুর্শিদাবাদে বিপিনের সঙ্গে

সুহাসিনীর সাক্ষাৎকালেও নীরদা ও নবাবের আবির্ভাব আকস্মিক। নীরদা ও সুহাসিনীর প্রতি অত্যাচার ও অত্যাচারের চেষ্টার মধ্য দিয়ে সিরাজের চরিত্রের কলঙ্কময় দিকটি উদ্ঘাটিত।

রমণী হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তার স্বরূপ নীরজার চরিত্রে পরিস্ফুট। নীরজা সম্পর্কে লেখকের উক্তি, 'নারীহৃদয় কে তোমারে কোমল বলে? কে রমণীকে সরলা বলে? যে বলে বলুক, কিন্তু আমরা তোমাদের উদ্দেশে প্রণাম করিব। চক্ষুলজ্জা নাই, লোকলজ্জা নাই, কেবল আছে—হিংসা, ঈর্ষা+ ও প্রতিহিংসা। নীরজা। তুমি আবার সেই রমণীকুলভূষণ। অতএব তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি (পৃ ১০৯)'। সুহাসিনী ক্ষমাশীলা। তার প্রেমে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সন্দেহাতীত। আই ও হীরা অনুরূপ।

সংলাপের ভাষায় সাধু ও চলিতের মিশ্রণ লক্ষণীয় ত্রুটি। উপন্যাসটিতে বঙ্কিম-এর প্রভাব স্পষ্ট। প্রতিটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম, পাঠককে আহ্বান প্রভৃতি রীতি বঙ্কিমচন্দ্রীয়। তাছাড়া আহত নীরজার মৃত্যুর পূর্বকালে সুহাসিনীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা এবং মৃত্যুর পূর্বে নীরজার উক্তির সঙ্গে শৈবলিনীর নরকদর্শনের অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সিরাজ কর্তৃক সুহাসিনীহরণপ্রসঙ্গ সিরাজ কর্তৃক ফুলজানি (শ্রীশ মজুমদারের ফুলজানি)—হরণের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। উপন্যাসটিতে নীরজার কণ্ঠে দুটি গান ছাড়াও আরও দুটি গান আছে। তার মধ্যে একটি সিরাজের নর্তকী ভামিনীর।

সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালের পটভূমিতে রচিত তারকনাথের অপর উপন্যাস, 'বিরজা'[৭]। উপন্যাসটির ঘটনাকাল সম্পর্কে লেখক বলেছেন 'যখন বাঙ্গালা-বেহার উড়িষ্যার রত্নময় সিংহাসনে বাদশাহ্ সিরাজউদ্দৌলা আধিপত্য করিতেন, যখন সেই ঘোর নির্দয় পাষণ্ডের অত্যাচারে বাঙ্গালা বেহার-উড়িষ্যা রোদন করিত, আমরা সেই সময়ের একটি ঘটনা বিবৃত করিতে অগ্রসর' (পৃ ১)। এই উপন্যাসের ঘটনাটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। এই ঘটনার সূত্রেই সিরাজউদ্দৌলার প্রসঙ্গ যুক্ত।

চতুর্দশী বিরজা দরিদ্র অম্বিকাচরণকে ভালোবাসে। কিন্তু বিরজার বাবা

+ ঈর্ষা হবে।

৭. বিরজা. ১৮৮৭, (১২৯৪), পৃ. (পরিশিষ্ট সহ) ১০৮। 'আদরিণী (৫ম খণ্ড ১২৯১, পৃ ২৬৫) তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

বিজয়কৃষ্ণর হাতে সমর্পণ কবে বাজবানী কবতে চান। বিরাজ বিজয়েব প্রণয় প্রত্যাখ্যান কবে। 'অম্বিকা বাজকুমাব বিজয়েব পবম শত্রু, তাঁহাকে হত্যা কবিবাব চেষ্টায় আছে' এমন মিথ্যা ঘটনাব পব অম্বিকাকে মুর্শিদাবাদে নবাবেব কাছে বিচাবার্থ পাঠান হল। যাত্রাকালে বিবজা অম্বিকাকে আলিঙ্গন করে খেদপ্রকাশ কবল

গোপালচন্দ্র বিবজাকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে গেলেন মামলাব তদবিবেব জন্য বিজয়েব সঙ্গে পবেব দিন বিবজাব বিয়ে দেবেন বলে অম্বিকাকে জানালেন। বিবজাব সখী বিজলীব কৌশলে মুক্ত অম্বিকাব সঙ্গে বাত্রে এক বৃক্ষতলে বিবজাব মিলন হল তাবপব উভয়েব পলায়ন এবং কালনায় বিবাহ

গোপালচন্দ্র কন্যাকে ত্যাজ্য কবে এক চতুর্দশী বালিকাকে বিবাহ কবলেন। বিজলী গোপালেব স্ত্রী মোক্ষদাব সঙ্গে বেশী মেলামেশা কবে বলে, গোপাল কুপিত হয়। অম্বিকা কৃষ্ণনগবে মহাবাজেব পাবিষদ নিযুক্ত হল। বিবাহেব দুবছব পবে তাদেব পুত্র হল বিভূতি

[illegible] নদীপথে কৃষ্ণনগব অধিপতিব সঙ্গে অম্বিকাকে দেখে কৌশলে তাকে গ্রেপ্তাব কবে মুর্শিদাবাদে পাঠান। বিবজা ও বিজলী পুত্রসহ মুর্শিদাবাদ এল। কাজীব বিচাবে যাবজ্জীবন কাবাদণ্ড হল অম্বিকাব। এদিকে কৃষ্ণনগবেব মহাবাজা অম্বিকাকে খুঁজে না পেয়ে চলে গেলেন তীর্থেব পথে।

অম্বিকা বাজসবকাবে [illegible] টাকা বেতনে কাজ কবে এবং পনেব দিন অন্তব স্ত্রীব কাছে তিন ঘণ্টা [illegible] থাকবাব অনুমতি পায়। একদিন [illegible] বিবজাব সতীত্বহানি কবাব [illegible] এক [illegible] এসে পড়ে এবং তাকে চবম [illegible] হাত থেকে রক্ষা কবে। অম্বিকাব অশান্তি বাড়তে থাকে। ক্রমশ সে মদ্যপানে আসক্ত হয়। বিবজাব কাছে আসা বন্ধ কবে।

বিবজা চবম দাবিদ্র্যেব কবলে পড়ে। গোপালচন্দ্র অম্বিকাকে ত্যাগ কবাব কথা জানালে সে বলে, 'এই কষ্টই আমাব স্বর্গ।' বিজলীব সঙ্গে তীর্থ প্রত্যাগত বাজাব দেখা হলে, তিনি বিবজা ও বিভূতিকে নিয়ে যান।

মোক্ষদা, বৃদ্ধ স্বামী গোপালচন্দ্রকে অবজ্ঞা কবে। জমিদাবপুত্র বিজয়ের সঙ্গে সে অবৈধ প্রণয়ে রত হয়। বিজয়কে শাস্তি দেবাব জন্য গোপালচন্দ্র

৭. বিরজা, ১৮৮৭ (১২৯৪), পৃ (পরিশিষ্ট সহ) ১০৮। 'আর্যদর্শন' (৫ম খণ্ড ১২৯১, পৃ. ২৬৫) তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

একদিন আত্মগোপন করল। বিজয় গোপালকে হত্যা করল। বিজয়ের কাছে মোক্ষদা প্রস্তাব করল তাকে বিয়ে করার। কারণ তার গর্ভে তখন বিজয়ের সন্তান। উমাচরণকে আহত এবং হত্যা করার দায়ে, রাজবাড়ির লোকেরা মোক্ষদাকে বিচারার্থে কাজীর কাছে চালান দিল।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তক্ষেপের ফলে অম্বিকাচরণ মুক্তি পেল। সিরাজউদ্দৌলা কাজীকে ভর্ৎসনা করলেন এবং বিজয় ও তার বাবার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বার হল। মৃত উমাচরণ বিচারের দায় থেকে রক্ষা পেলেন। বিজয়কে বেত্রাঘাতে হত্যা করা হল। নবাব বিজয়ের সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ বিরজাকে দিলেন। অম্বিকা সপরিবারে চন্দনপুর চলে গেল। বিজয়ার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধান পাওয়া গেল। বিরজার আরও সন্তানাদি হল। 'এতদিনে বিষবৃক্ষে অমৃতের ফল ফলিল।'

উপন্যাসটিতে ইতিহাসের গন্ধ আছে মাত্র। ঘটনার সূত্রে সিরাজউদ্দৌলার মত একটি ঐতিহাসিক চরিত্রের আকস্মিক সংযোজন ঘটিয়ে লেখক উপন্যাসটিতে ইতিহাসের বর্ণক্ষেপ করেছেন। জমিদারের স্বেচ্ছাচারিতা, কাজীর বিচারের পক্ষপাতিত্ব ও রাজকর্মচারীর কর্মশৈথিল্য, সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালের শাসনযন্ত্রের অক্ষমতার নিদর্শন। উপন্যাসটির উপকাহিনী মোক্ষদা-বিজয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

বিরজার চরিত্রে আদর্শবাদের প্রভাব পড়েছে। তার সতীত্ববোধ, স্বামীর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রেমে আন্তরিকতা তার চরিত্রকে আদর্শ নারীর স্তরে উন্নীত করেছে। বিরজার বিপরীতে মোক্ষদা চরিত্রের সৃষ্টি। তার সতীত্ব-বোধে অনাস্থা ও পরপুরুষসঙ্গ, তুলনায় বিরজার চরিত্রকে আরও স্পষ্টীকৃত করেছে। এই জাতীয় শিল্পরীতি বঙ্কিম-প্রদর্শিত। মোক্ষদার উক্তি ও আচরণ নিম্নস্তরের। মোক্ষদা স্বামীর উপর পূর্ণপ্রভুত্ব করে এবং শাসায়, 'আর কোন শালি তোমার কাছে শোবে।' তার কথায় লেখক এক জায়গায় হাস্যরস সৃষ্টির অবকাশ পেয়েছেন।[৮] বন্দী জীবন যাপনকালে অম্বিকার মদ্যাসক্তি ও

৮. বৃদ্ধ গোপালচন্দ্রের নিদ্রাকালে মোক্ষদার পর্যবেক্ষণ—"নাক মুখ দিয়ে যেন ঝড় বচ্ছে। নি-দস্তে বুড়ো হওয়া কি মহাপাপের কাজ রে। মুখে যেন টানা পাখা খেলছে, ঘড়র ঘপ, ঘড়র ঘপ, এঁকি! ছি ছি ছি কি পোড়াকপালই করেছিলাম। মুখের গন্ধে ভূত পালায়। বলি মরগে।" (পৃ. ৮১)।

স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্তিহীনতার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘটনা সংস্থাপনে আকস্মিকতা এ উপন্যাসেও লক্ষ্য করি। বিজয়া কর্তৃক অম্বিকার মুক্তির ব্যাপারটি অজ্ঞেয় ও আজগুবী। গোপালচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তার বাড়িতে সন্ধ্যায় উমাচরণের যাওয়ার কারণও যেমন অজ্ঞাত, তেমনি গোপালচন্দ্র কর্তৃক উমাচরণের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাটিও আকস্মিক। অর্থলোভী পিতারূপে গোপালচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু'র তনুরায়ের প্রায় সমগোত্রীয়।

তারকনাথের 'কমলকুমারী'[৯] উপন্যাসে রাজপুতবালা কমলকুমারীর সঙ্গে সাহাজাদা খসরুর প্রণয় ও মৃত্যুকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। খসরু ও কমলকুমারীর প্রণয়ের ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটিতেও ইতিহাসের কোনও কাহিনী বর্ণিত হতে দেখি না। ইতিহাসের বর্ণোজ্জ্বল পটভূমিও এখানে অনুপস্থিত।

ভিখারিণী কমলকুমারী ভিক্ষাকালে বৃষ কর্তৃক আক্রান্ত হলে, কুমারসিংহের ছদ্মবেশী সাহাজাদা খসরু তাকে রক্ষা করেন। এই সূত্রে উভয়ের সঙ্গে পরিচয় ও প্রণয় হয়। খসরু কাশ্মীরে যুদ্ধে গেলে কমল বিচলিতা হয় এবং এক বৃদ্ধের পরামর্শে সাহাজাদা সেলিমের পত্নীর বাঁদীর কাজ নেয়। কমলের মা মৃত্যুকালে কমলকে ধর্মত্যাগ করতে নিষেধ করেন। কমলকুমারী তখনও জানে না যে, কুমারসিংহ হলেন খসরু।

আকবরের মৃত্যুর পর খসরু বন্দী হল। কমল কর্মত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হল। স্বামীর কর্তৃক মুক্ত হয়ে খসরু কমলের অন্বেষণে গেল। উভয়ের সাক্ষাৎ হলে, সন্ন্যাসিনী কমল জানাল ধর্মই তার একমাত্র অবলম্বন।

গোয়ালিয়র দুর্গে কমল কৌশলে প্রবেশ করে খসরুর প্রতি উৎক্ষিপ্ত ঘাতকের তরবারি বক্ষে ধারণ করল। মৃত্যুর পূর্বে খসরুকে সে জানাল, 'কুমার, আজ আমাদের বিবাহ। আজ আপনার আদেশ পালন করিলাম, এই অন্তিম সময়ে দেহে দেহে শোণিতে শোণিতে মিলন হইল।' পরমুহূর্তে ঘাতকের হাতে সাহাজাদা খসরুর মৃত্যু হল।

কাহিনীটি শাখা-প্রশাখাহীন, একমুখী। পরিচ্ছেদগুলি শিরোনামযুক্ত।

৯. কমলকুমারী, ১২৯৩ (১৮৮৬) পৃ. ৫৫, আদরিণী (৫ম খণ্ড, ১২৯১, পৃঃ ১৬৯) তে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত।

বঙ্কিমপ্রভাব এই উপন্যাসে স্পষ্ট। নারীর রূপবর্ণনার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করানর রীতিও বঙ্কিমচন্দ্রীয়। নারীর রূপ বর্ণনায় লেখক দীর্ঘস্থান নিলেও স্থূলতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটির শেষাংশ চন্দ্রশেখরের শেষাংশের মত। কমলের প্রতি লেখকের মন্তব্য 'যাও কমল সেই অক্ষয় স্বর্গরাজ্যে যাও ' ইত্যাদি পূর্ববক্তব্যের সমর্থক।

সাহাজাদা খসরুর প্রণয়ের গভীরতা যে রাজ্যলোভ অপেক্ষাও বেশি তার প্রমাণ পাই। কমলের প্রণয়-চেতনা হিন্দুধর্মভাব দ্বারা খণ্ডিত। প্রণয় পরিণাম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম তার কাছে বড় —'সাহাজাদা, কুমার, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সনাতন হিন্দুধর্মের তুল্য ধর্ম নাই। যে আপন সুখেচ্ছায় ধর্মে জলাঞ্জলি দেয়, তাহার ইহলোক পরলোক কিছুই নাই—এই অনিত্য সুখের জন্য কি সেই নিত্য সুখ হারাইব ?' (পৃঃ ৪৯) অবশ্য খসরুর প্রতি তার প্রণয়ের গভীরতাব প্রমাণ তার স্বেচ্ছামৃত্যু। কমলের সন্ন্যাসিনীবেশে গোয়ালিয়র কারাগারে প্রবেশের ঘটনাটি রোমান্টিক কল্পনাজাত। চণ্ডীচরণ সেনের 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' (১৮৮৬) উপন্যাসে সত্যবতীর ছদ্মবেশে কারাগারে প্রবেশেব ঘটনা, কমলকুমারীব অনুরূপ আচরণের সাদৃশ্যবাহী।

তারকনাথের 'চন্দ্রপ্রভা'র[১০] গল্পাংশ সত্য বলে জানিয়েছেন লেখক। এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য 'বাঙ্গালীর পূর্বগৌরবের জীবন্ত প্রতিকৃতি'কে আদৃত করা এবং বাঙ্গালীর 'লুপ্ত কীর্তি'কে স্মৃতিপথে আনা। 'ভূমিকা'য় লেখক এসব কথা জানিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের পর্যালোচনাও করেছেন। তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে উপন্যাসটির একটি চরিত্রের নাম পরিবর্তনপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'রজনীকান্ত নামের পরিবর্তে এবার জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত হইল। ইতিপূর্বে প্রকৃত নাম জ্ঞাত না থাকায় রজনীকান্ত নামে একটি কাল্পনিক নাম প্রদত্ত হইয়াছিল।' এই উপন্যাসের ঘটনাকাল, আরংজেবের রাজত্বকাল।

চেতবরোদার রাজা সভাসিংহ অত্যাচারী ও নারীলোলুপ ছিলেন। শিবায়নকবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের স্ত্রীর উপর অধিকার স্থাপন করতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত তিনি তার স্তনদ্বয় কেটে মেরে ফেলেন। এই সভাসিংহের ভাই হিম্মতসিং। সভাসিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভা, এই উপন্যাসের নায়িকা। সুমিত্রাকে

১০. চন্দ্রপ্রভা', ১৮৮৬, পৃঃ ১২০, তৃ. সং ১২৯৯ (১৮৯২), পৃঃ ২১৪। এই সংস্করণটি পরিবর্ধিত কিন্তু ঘটনাবলী অপরিবর্তিত আছে।

নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার জন্য সভাসিংহ দেবী কর্তৃক অভিশপ্ত হন, তাঁর বংশ থাকবে না। চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথসিংহের দর্শনজাত প্রণয় হয়। কিন্তু বিবাহে আপত্তি করেন সভাসিংহ।

সভাসিংহ বর্ধমান আক্রমণ করে রাজ-অন্তঃপুর থেকে রাজ ভগিনীকে নিয়ে আসেন। রাজা জগৎরায় বহু চেষ্টাতেও স্ত্রী ও ভগ্নীর সন্ধান পেলেন না। শেষে, সভাসিংহ কর্তৃক অত্যাচারিতা হবার পূর্বকালে রাজকুমারী সভাসিংহকে ছুরিকাহত করে। পরে নিজে আত্মহত্যা করে জগৎরায় এক যুবকসহ সেই সময়ে এসে পড়েন।

সভাসিংহের মৃত্যুর পর হিম্মতসিং রাজারক্ষায় মন দিলেন। জগৎরায় দুর্গ (চেতুয়বরদা) আক্রমণ করলে রঘুনাথসিংহ সসৈন্যে জগৎরায়কে নিবৃত্ত করেন। তারপর রঘুনাথ চন্দ্রপ্রভাকে বিষ্ণুপুর নিয়ে গিয়ে বিবাহ করেন। চন্দ্রপ্রভার সখী সুগন্ধা স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়। তার স্বামী রঘুনাথের বন্ধু রজনীকান্ত (৩য় সংস্করণে জগদীশ)

সভাসিংহের অনুচর রহিম রাজমহল থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পশ্চিমবাংলা দখল করলে, জবরদস্ত খাঁ কর্তৃক নিহত হয়। তার সুন্দরী স্ত্রী ও পরিজনবর্গ বিষ্ণুপুরের রাজার আশ্রয় নেয়। রঘুনাথসিংহ রহিমের স্ত্রী লালবাঈ-এর ছলনায় ভুললেন। অথচ স্ত্রী চন্দ্রপ্রভার প্রেমকে অস্বীকার করলেন না। লালবাঈ রঘুনাথকে বশে আনলে হিন্দুধর্ম বিপন্ন হবার লক্ষণ দেখা দিল। অবশেষে ধর্মরক্ষার্থে প্রজারা চন্দ্রপ্রভার অনুমতি নিয়ে রাজাকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করে। চন্দ্রপ্রভা স্বামীর চিতার আশ্রয় নিলেন সভাসিংহের বংশ বস্তুতই লোপ পাইল।'

নায়িকার করুণ পরিণতির মূলে একটি অভিশাপ বর্তমান। এই অপ্রাকৃত ঘটনাটির সমর্থনে লেখক বলেছেন, 'দেবীর অভিসম্পাত ভবিষ্যৎবাণী, তাহার আদেশ অবমাননার প্রতিফল, প্রভৃতি আধুনিক বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে কিন্তু, পূর্বকালে এ ঘটনা বিরল ছিল না' (ভূমিকা)। কাহিনীসূত্রে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ পরিবারের একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তারকনাথের হিন্দুধর্ম-চেতনার বিষয়ও এই উপন্যাসে প্রতিফলিত। 'কমলকুমারী'তে প্রণয় পরিণামের বাধা হয়ে দেখা দিয়েছিল, ধর্ম। এখানে স্বামীকে হত্যা করার অনুমতি-দান, ধর্মরক্ষার ভয়ঙ্কর নিদর্শন।

উপন্যাসটিতে অপ্রাকৃত ঘটনা ও আকস্মিকতা স্থান পেয়েছে। দেবীপ্রদত্ত অভিশাপ, সন্ন্যাসীর কাছ থেকে চন্দ্রপ্রভার পিতার অভিশাপের কথা ও বৈধব্যযাতনাহীন মৃত্যুর কথা জ্ঞাত হওয়া, অপরিচিত মহাত্মার কাছ থেকে মৃত্যুর পূর্বে ভবিষ্যৎ-বাণী শ্রবণ প্রভৃতি ঘটনা এর উদাহরণ। চিত্রপট-বিক্রেতা পটুয়ারূপে গোপনে রাজা রঘুনাথসিংহের কাছে সুগন্ধার যাত্রা এবং চিত্র দিয়ে চন্দ্রপ্রভার তৎকালীন মানসিকতার কথা জ্ঞাপন অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত পরিকল্পনা। যোদ্ধাবেশী মনোরমা অনুরূপ কল্পনাজাত। বর্ধমানের রাজপুরী আক্রান্ত হলে জগৎসিংহের সঙ্গে যে যোদ্ধার সাক্ষাৎ হল, এবং যে যোদ্ধা রাজকুমারীর মৃত্যুর পূর্বে জগৎরায় সহ উপনীত হল, সে মনোরমা। ভিন্নবেশী মনোরমার নিকট-সান্নিধ্যে থেকেও রাজার মনোরমাকে চিনতে না পারার বিষয়টি আশ্চর্যজনক। মনোরমার বিয়োগ 'বেদনায় রাজা জগৎসিংহ যখন নিজেকে ছুরিকাহত করতে চলেছেন, এমন সময়ে মনোরমার বিকৃত নিষেধবাক্য শ্রবণে রাজা মনোরমাকে চিনলেন' (প্র. সং পৃঃ ৬৫, তৃ. সং -পৃঃ ১৩১)। তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থটির ঘটনাগত পরিবর্তন না ঘটলেও কলেবর বৃদ্ধি ঘটেছে। এর অন্যতম কারণ, গ্রন্থমধ্যে লেখকের অংশগ্রহণ। ঘটনাপ্রেক্ষিতে লেখক তৎকালীন সমাজের দীর্ঘ সমালোচনা করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির এটিও একটি কারণ।

চন্দ্রপ্রভা ও রঘুনাথ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য 'চন্দ্রপ্রভাই আমাদের নায়িকা ...স্বামী লালবাঈকে লইয়া সুখী হইলে চন্দ্রা সুখী কিন্তু দুঃখ লাল বিধর্মিনী— আর দুঃখ রাজা তাহার কুহকে পড়িয়া সনাতন হিন্দুধর্মের বিনাশসাধনে উৎসুক। তাই বলি চন্দ্রার হৃদয় পবিত্র, চন্দ্রার হৃদয় স্বর্গীয়। (রঘুনাথ) লালকে ভালবাসিরাও চন্দ্রাকে তাচ্ছিল্য করিতেন না। লালকে ভালবাসিয়া ও চন্দ্রাকে ভক্তি করিতে বিরত হয়েন নাই, এইটিই সাধারণ লোকচরিত্রে বিরল' (ভূমিকা)। রঘুনাথের চরিত্রের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সে পাপ সম্পর্কে সচেতন এবং সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত। কিন্তু অসহায়। লালবাঈয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও চন্দ্রপ্রভার প্রতি তার ভালবাসা অটুট। তার কৃতকর্মের জন্য সে নিজের কাছে যে কতখানি সংকুচিত, তার পরিচয় চন্দ্রপ্রভার প্রতি তার উক্তি, 'আমার ন্যায় পশু স্বামী নয় আমি তিরস্কারের উপযুক্ত পাত্র।' আসলে রঘুনাথ দুর্বল চরিত্রের। ধর্মের জন্য স্বামীকে হত্যা করার অনুমতিদান চন্দ্রপ্রভার চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। স্বামীর প্রতি

তার ভালবাসার চরম উদাহরণ, মৃত স্বামীর অনুগমন। সতীত্বের এ এক বিচিত্র নিদর্শন।

রাজভ্রাতা গোপালের হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠা, তজ্জনিত ত্যাগস্বীকারের ইচ্ছা জ্ঞাপন, লালবাঈয়ের পা ধরে লালবাঁধ প্রতিষ্ঠার অনুমতি গ্রহণ এবং লালবাঈয়ের গর্ভজাত সন্তানকে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসানর দুরভিসন্ধিমূলক অভিপ্রায়ের কথা দাদাকে জানান, প্রভৃতি আচরণ, তার চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উপন্যাসটিতে বহুঘটনা ও চরিত্রের সংযোগ ঘটলেও চন্দ্রপ্রভাকে কেন্দ্র করেই মূলত কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

লালবাঈ, চন্দ্রপ্রভা ও সুগন্ধার কণ্ঠে কয়েকটি গান লক্ষ্য করি। উপন্যাসটিতে বঙ্কিম প্রভাব স্পষ্ট। পরিচ্ছেদের শিরোনাম, নারীর রূপবর্ণনায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ, অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা বঙ্কিম-অনুসারী। রঘুনাথের মৃত্যুর পূর্বে এক মহাত্মার আগমন, রঘুনাথের স্বর্গরাজ্য প্রাপ্তি ও মরণান্তে চন্দ্রার সঙ্গে মিলনের ভবিষ্যৎ-বাণী ঘোষণার ঘটনা অপ্রাকৃত। চরিত্রটি চন্দ্রশেখরের রমানন্দস্বামীর সঙ্গে ঈষৎ সাদৃশ্যযুক্ত।

তারকনাথের 'চন্দ্রপ্রভা' জনসমাদৃত হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণ তার প্রমাণ। 'চন্দ্রপ্রভা' তারকনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা। তারকনাথ তাঁর সমস্ত উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষা গল্পরস পরিবেশনে অধিকতর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তৎকালীন লেটলাট স্টুয়ার্টবেলি, তারকনাথ দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র হবেন বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন।[১১]

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮—১৯০৯)

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস রচনায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুক্রমণ করেছেন। বঙ্কিম সমকালের লেখক হওয়া সত্ত্বেও যোগেন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ বঙ্কিম নির্দেশিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণভাবে না হতে পারলেও, যোগেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাকে স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত করে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়েছেন। উপন্যাস রচনায় তিনি তারকনাথের মানসগোত্রীয়। বঙ্কিমসমকালে তিনি যে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন তাঁর একাধিক গ্রন্থের একাধিক

১১. 'I hope you will become second Bankimchandra in time.'
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, বংশপরিচয় (বিংশ খণ্ড)।

সংস্করণ তার প্রমাণ। যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক। তিনি 'সুধাকর' (পাক্ষিক সংবাদপত্র), 'কল্পনা' (মাসিকপত্র), 'অবকাশ' (নবন্যাস পূর্ণ মাসিকপত্র) এই তিনটি পত্রিকার প্রথম দুটির প্রকাশক ও তৃতীয়টির সম্পাদক ছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'প্রেমপ্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা'[১২] অপরিণত রচনা। এক ব্রতচারিণী বিধবার আদর্শনিষ্ঠ জীবন-কাহিনী। প্রিয়ম্বদা-চরিত্র আদর্শায়িত।

উমীপুরের রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠপুত্র উপেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রিয়ম্বদা। ভাই নবগোপালের অর্থে রামগোপাল বিষয় সম্পত্তি করে। উপেন্দ্র নবগোপালের পুত্র ধীরেন্দ্রকে কলকাতায় লেখাপড়া শেখায়। তার এম. এ. পরীক্ষার সাতদিন আগে উপেন্দ্রর মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুকালে সে স্ত্রীকে জানায় ধীরেন্দ্রকে সন্তানসম দেখতে। প্রিয়ম্বদা পিতৃগৃহে থাকাকালে ব্রাহ্মণ প্রচারক বীরেশ্বর ও তার স্ত্রী সুহাসিনী তাকে পুনর্বার বিবাহ করতে বললে, সে তীব্র-ভাবে আপত্তি করে। পিতার মৃত্যুর পর প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েও সন্ন্যাসিনীরূপে সে ঈশ্বরসেবায় ও মানবসেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখে।

ধীরেন্দ্র স্ত্রী ও ঝি শ্যামা সহ কলকাতায় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। পরে, স্টানলে সাহেবের অফিসে কাজ করে বিত্তশালী হয়। এক মামলায় রামগোপাল নিঃস্ব হয়ে যান। কলকাতায় ধীরেন্দ্রের সঙ্গে প্রিয়ম্বদার পুনর্মিলন হয়। ধীরেন্দ্র পিতৃবন্ধুর কাছে তার পিতার দেয় গচ্ছিত ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে সবাইকে নিয়ে দেশে ফিরে যায়। প্রিয়ম্বদা ধর্ম জীবন যাপন করতে করতে মারা যায়। আদর্শের চাপে প্রিয়ম্বদার চরিত্রের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রিয়ম্বদার চরিত্রে তারকনাথের স্বর্ণলতার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। রামগোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শশিকলা অনেকটা স্বর্ণলতার প্রমদার মত। শ্যামদাসীও স্বর্ণলতার শ্যামাদাসীর অনুরূপ। ধীরেন্দ্রের স্ত্রী চপলার চরিত্রে সরলার প্রভাব বর্তমান।

প্রিয়ম্বদার শিল্পরূপ সংহত নয়। কিছুটা শিথিল বিন্যস্ত। কাহিনী তিনটি।

১২. প্রেমপ্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা, ১৮৮৬, পৃ. ১৩৬। কল্পনা (১২৮৯ ৯০, পৃ. ২৫)য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। ৪র্থ সং ১৩২১।

প্রথম, মূলকাহিনী উমীপুরকে কেন্দ্র করে রামগোপালের পরিবারভিত্তিক। দ্বিতীয়, প্রিয়ম্বদার বসন্তপুরের জীবনকেন্দ্রিক। এবং তৃতীয়টি, ধীরেন্দ্র ও চপলার যৌথজীবন। প্রথম কাহিনীর কেন্দ্রে যে দুষ্ট উদ্দেশ্য ছিল তা পরাভূত হয়েছে অপর দুটি কাহিনীর সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির মহানুভবতায়।

ব্রাহ্মধর্মের সম্পর্কে লেখকের মনোভাব জানতে পারি প্রিয়ম্বদা ও সুহাসিনীর দুটি কথায়।

প্রিয়ং॥ আচ্ছা দিদি, ব্রাহ্মধর্ম কিরূপ?

সুহা॥ আমার মাথা আর তোমার মুণ্ড (বিংশ পরিচ্ছেদ)।

গুরুদেব ও প্রিয়ম্বদার কাছে মাত্র একদিন ধর্মোপদেশ পেয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক বীরেশ্বরের হিন্দুধর্মে বিশ্বাস ও ভক্তি ফিরে পাওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক। লেখকের ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে অনাস্থা ও হিন্দুধর্মের উপর গভীর বিশ্বাসবোধ অভিব্যক্ত হতে দেখি এই উপন্যাসে। যৌথ পারিবারিক জীবনের ভাঙনের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে, উত্থান পতনের ধাপের সঙ্গে একটি সাধ্বী বিধবা নারীর জীবন যুক্ত করে লেখক কাহিনীতে একটু বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছেন। 'প্রেমপ্রতিমা বা প্রিয়ম্বদার বিষয়বস্তু বাস্তবজীবননির্ভর হলেও দুর্বল রচনা।

'প্রণয়পরিণাম'[১৩] প্রণয়ের বৈধাবৈধ বিষয় অবলম্বনে রচিত। নিষ্কাম প্রণয় ও স্বার্থময় প্রণয়ের চিত্র এই উপন্যাসে পরিস্ফুট।

ললিতপুরের জমিদার প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে শ্যামনগরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব। প্রবোধ এবং মনোখিনীর কন্যা বিরাজমোহিনীর রূপগুণে মুগ্ধ। সুরেন্দ্রনাথ প্রবোধের আশ্রিত ও মনুমারীর প্রণয়াসক্ত। যদিও, কুসুম মনে মনে প্রবোধকেই আত্মসমর্পণ করেছে। ব্যর্থ ও নৈরাশ্য পীড়িত সুরেন্দ্র রমা পাগলার নির্দেশানুসারে বিশ্বপ্রেমিক হন। দানপত্র করে সুরেন্দ্র কুসুমকে তার সম্পত্তি দিলে, কুসুম সেই দানপত্র ছিঁড়ে ফেলেন। সুরেন্দ্রনাথ লোক কল্যাণে রত হন।

প্রবোধের ভগ্নী মাধবী সরলার স্বামী হরদয়াল বশমের কুঠিয়াল মেকিণ্টস

১৩ প্রণয়পরিণাম, ১৮৮৭, পৃ ১৬৬। 'প্রণয়পরিণাম' অবলম্বনে 'প্রণয় না বিষ, বা রমা পাগলা' নাটক রচনা করে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০৫ এ ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় করেন।

পঞ্চম পরিবর্ধিত সং শ্রাবণ ১৩১৪।

সাহেবের স্ত্রী মেরীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হল। সাহেব গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার শুরু করল। প্রবোধকে পুলিশ গ্রেফতার করলে, সুরেন্দ্রনাথ তাকে মুক্ত করল। বিরাজ সাহেব কর্তৃক লুণ্ঠিতা হল। কুসুম ভিখারিণীর বেশে অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ বিরাজকে উদ্ধার করতে এলে, কুসুমকে বিপদে ফেলে সে যাবে না জানাল। মেকিণ্টস যখন বিরাজের উপর অত্যাচারোদ্যত তখন প্রবোধ ও সুরেন্দ্র পুলিশের সহায়তায় বিরাজকে উদ্ধার করল। মেকিণ্টস ধৃত হল।

হরদয়াল ছাদ থেকে পড়ে দুটি চোখ হারাল। বিরাজের সঙ্গে প্রবোধের বিয়ে হয়ে গেল। কুসুমের শয্যায প্রবোধ একটি চিঠি পেল। তাতে লেখা, 'প্রবোধ তুমিই আমার প্রাণেশ্বর। আজ হইতে হতভাগিনী কুসুমের নাম পৃথিবী হইতে লোপ হইল। ইহাই আমার প্রণয়-পরিণাম।'

প্রণয-পরিণাম এর রচনা সাবলীল। প্রণয়ে নৈরাশ্যই সুরেন্দ্রের মহানুভবতার কারণরূপে লেখক দেখাতে চেয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথের আত্মত্যাগই এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। সুরেন্দ্রনাথের আদর্শবাদ, তার বিশ্বপ্রেমচেতনা তার চরিত্রকে রক্তমাংসে-গড়া মানুষে পরিণত করেনি। এদিক থেকে প্রবোধ অনেকটা স্বাভাবিক।

এই উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রে বঙ্কিম-প্রভাব স্পষ্ট। এর কারণ মনে হয় কল্পিত ঘটনার শিল্পরূপ। প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তব দৃষ্টির সম্যক বিকাশ এই উপন্যাসে ঘটেনি। সরলার চরিত্র ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল) কে স্মরণ করিয়ে দেয়। হরদয়ালের চরিত্রে গোবিন্দলালের ছাপ স্পষ্ট। ভিখারিণীর সাজে কুসুম কর্তৃক বিরাজ-উদ্ধারের চেষ্টা, পাগলিনীর ছদ্মবেশে শৈবলিনী কর্তৃক প্রতাপ উদ্ধারের প্রসঙ্গ মনে পড়িয়ে দেয়। 'কল্পনা'[১৪]য় গ্রন্থটির বিস্তৃত সমালোচনায়, যোগেন্দ্রনাথকে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস-লেখকের মর্যাদা না দেওয়া হলেও, বাঙ্গালার একখানি অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাসরূপে প্রণয-পরিণামকে গণ্য করা হয়েছে। 'কর্ণধার'[১৫] পত্রিকায় উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'এখানি অতি উচ্চদরের উপন্যাস হইয়াছে। স্বর্গীয় নিষ্কাম প্রণয় এবং ঘৃণিত স্বার্থময় প্রণয়ের পরিণাম যে কিরূপ তাহা অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে'।

১৪. কল্পনা, ৬ষ্ঠ বৎসর (আশ্বিন ১২৯২, ভাদ্র ১২৯৩) পৃ. ৫৯—৬১।

১৫. কর্ণধার, প্রথম খণ্ড, ১২৯৪, পৃ. ২১৯।

'কনে বউ'[১৬] একটি পারিবারিক উপন্যাস। যৌথপরিবারে নারীর কল্যাণময়ী ভূমিকাই পারিবারিক শান্তিরক্ষার কারণ। বিরুদ্ধ ভূমিকা, পারিবারিক সুখ ও শান্তির অন্তরায়। নারীর এই দুই রূপ প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসে এবং প্রথমোক্ত রূপের সার্থকতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

কাপড়পুরের মুখুজ্জেবাড়ির দুই ছেলে। বড় ছেলে রামকুমারের স্ত্রী শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে দুই পুত্র সহ (নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র) বাপের বাড়ি চলে গেল। মায়ের কথায় স্ত্রীকে আনতে গিয়ে সে আটকে পড়ল। শ্যামকুমার খবর নিয়ে জানল, শ্যালক রসিকলালের কণ্ট্রাক্টের কাজে সে নিযুক্ত হয়েছে। মায়ের অনুরোধে শ্যামকুমার বহু জিনিসপত্রসহ তার শ্বশুরে শিক্ষিতা স্ত্রীকে নিয়ে এল।

সুশীলা বা কনে বউ গহনা বিক্রী করে ধান কিনে রাখে, নফরের সহায়তায় চাষ আবাদ করিয়ে অর্থাগমের ব্যবস্থা করে শ্যামের নেশাও বন্ধ হয় রসিক মদ ও বেশ্যাসক্ত হয়। পিতার মৃত্যুর পর প্রভূত অর্থ অপব্যয় করে। চেক জালিয়াতির অভিযোগে রসিকলাল ও রামকুমার গ্রেফতার হয়। নগেন্দ্রের চিঠিতে এই খবর জেনে কনে বউ কলকাতায় গিয়ে তার মামা কালীনাথবাবুর সাহায্যে মামলা তদ্বির করালে, উভয়ের মুক্তির উপক্রম হয়। তবে রসিকের অপরাধ স্বীকৃতির ফলে তার একবছর কারাবাস হয় ও রামকুমারের মুক্তি ঘটে।

রামকুমার কনে বউ এর অনুরোধে স্ত্রী পুত্রসহ বাড়ি এল খল ও মুখরা কামিনী এসে জুটল বড়বউ যামিনীর সঙ্গে। কামিনী নগেন ও খগেনের খাবারে বিষ মিশিয়ে দোষ চাপাল কনে বউ এর উপর। রসিক জেল থেকে ফিরল। তারই মুখ থেকে রামকুমার কামিনীর স্বভাবের কথা জানল। কনে বউ সংসার পৃথক হতে না দিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। ভুল ভাঙলে সকলে মিলে কনে বউকে আনতে গল কামিনী গোলায় আগুন লাগিয়ে সেই আগুনে মরল। রসিক সবাইকে বসন্তপুরে নিয়ে গেল। কনে বউকে

১৬ কনে বউ, ১০ আষাঢ় ১২৯৭, তৃ সং, ১লা বৈশাখ, ১৩০৩ সাল। কল্পনায় (ষষ্ঠ বৎসর আশ্বিন ১২৯২—ভাদ্র ১২৯৩, পৃঃ ১৪২) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। কনে বউ এর উপসংহার 'খুড়ীমা বা প্রায়শ্চিত্ত' (বং ১৩১৩, ইং ১৯০৭, পৃ ২৬০)। "তাঁহার 'কনে বউ' ও 'খুড়ীমা' সর্বোৎকৃষ্ট" (জন্মভূমি, পৌষ ১৩১৫)।

নিয়ে রামকুমার, শ্যামকুমার, যামিনী ও মা কাপড়পুরে ফিরে এলে মুখুজ্জেবাড়ি আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এই উপন্যাসের ঘটনা-বৈচিত্র্য ও পারিবারিক কোন্দল অনায়াসেই তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। উপন্যাসটির কাহিনী একান্তভাবেই বাস্তবজীবননির্ভর। চরিত্র চিত্রণে যোগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবানুসৃত। রামকুমার ও শ্যামকুমার অনেকটা স্বর্ণলতার শশিভূষণ ও বিধুভূষণের মত। শ্যামকুমার বিধুভূষণের মত যাত্রা করলেও গাঁজা খেয়ে পরোপকার করে অনাথা নারীর শবদাহ করে দিন কাটাত। বিধুর মত প্রথমের দিকে সংসার সম্পর্কে কোন চিন্তা তার ছিল না। রামকুমার পত্নীর বশীভূত, দুর্বল প্রকৃতির চরিত্র। 'স্বর্ণলতায়' সংসারে ফাটল ধরানর অন্যতম কারণ ছিল প্রমদার মা। এই উপন্যাসে বড় বউ যামিনীর দিদি বিধবা কামিনী। যামিনীর চরিত্র অনেকটা প্রমদার মত। ফাটল ধরা সংসারে যখন জোড় লাগল, তখন যামিনী ফিরে এসেছিল স্বামীর সংসারে। কিন্তু স্বর্ণলতা'র প্রমদা আসেনি। এটাই তফাৎ। কনে বউ এর চরিত্র আদর্শ প্রভাবিত। শহুরে ও শিক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও সে কর্তব্যবিমুখ কিংবা স্বার্থপর নয়। তার আত্মত্যাগ ও ঔদার্যের ফলে মুখুজ্জে পরিবার আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যামিনী উপন্যাসটির সমস্যা সমাধানের পথকে বরাবর জটিল করে তুলেছে। এই চরিত্রটি সংকীর্ণতা ও অহেতুক ঈর্ষার একটি জীবন্ত রূপ। নিজের অপরাধ ও দুর্বুদ্ধি যখন সকলের কাছে ব্যক্ত হয়ে পড়েছে তখন আগুনে পুড়ে তার আত্মহত্যা করার ঘটনাটি তার চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি বলে মেনে নিতে কষ্ট হয় না। নরেশচন্দ্র স্বর্ণলতা'র নীলকমলের প্রভাবপুষ্ট।

কনে বউ উপন্যাসের নাম হলেও চরিত্রটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদে, অর্থাৎ গল্পের প্রায় মধ্যাংশের মুখে। অথচ লেখক সুকৌশলে এই কনে বউ বা শশীনার মধ্য দিয়েই উপন্যাসটির ঘটনাপর্ব একসঙ্গে গেঁথে একটি সুন্দর পারিণতির চিত্র এঁকেছেন। কনে বউ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[১৭]

বিমাতা[১৮] যোগেন্দ্রনাথের একটি সফল সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসটিতে

১৭. দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন (১লা আশ্বিন, ১২৯৮) থেকে জানা যায় যে 'দুই মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত' হয়েছিল।

১৮. বিমাতা, বাং ১৩০০, পৃ ১৮৭, 'অনুসন্ধান' (১৫ শ্রাবণ, ১২৯৯, পৃ ১৯) এ ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত।

একাধিক বিবাহের ফলে পারিবারিক তথা বিবাহিত জীবনে যে অসঙ্গতি ও অশান্তির সৃষ্টি হয় তারই পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

পশুপতির সন্তান না হওয়ায় স্ত্রী তারাসুন্দরীর আগ্রহাতিশয্যে মায়ের মনোমত পাত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ে হল। দ্বিতীয়া স্ত্রী চারুশীলার চক্রান্তে তারাসুন্দরীর সঙ্গে পশুপতির প্রণয়ে ছেদ পড়ল। বিশ্বেশ্বরী পিসীর প্ররোচনায় চারুশীলা শাশুড়ির হাত থেকে সংসারের ভার কেড়ে নিল। রামকমল অসুস্থা তারা ও তার শাশুড়িকে নিয়ে গেল চারুর একটি পুত্র হলে সংবাদদাতাকে তারা পুরস্কৃত করল। পিতার মৃত্যুর পর উইল অনুযায়ী ৭।৮ লাখ টাকা তারা পেল। তার মদ্যপ দাদা সন্তোষ, তারাকে ও তার রক্ষিতাকে ছুরি মারল। তারা ক্রমশ সুস্থ হল।

তহবিল তছরূপের অপরাধে পশুপতির চাকুরি গেল এবং বিশ্বেশ্বরীর বশীকরণ ওষুধে সে পাগল হয়ে গেল। তারা কোন্নগরে স্বামিগৃহে এলে পশুপতির উন্মত্ততা কমল। বিশ্বেশ্বরীর চক্রান্তে ভুলক্রমে তারা দুধে বিষ মিশিয়ে দিলে সেই দুধের একটু খেয়ে চারুর ছেলের চোখ কপালে উঠল। চারু ছুটে এসে বাকি দুধটা খেয়ে নিলে তার মৃত্যু হল। কিন্তু ছেলে বাঁচল। পশুপতি ও তারাসুন্দরীর জীবনে নূতন অধ্যায় শুরু হল। পুত্র সুবোধচন্দ্র তারার স্নেহে বর্ধিত হতে থাকল।

একটি কর্তব্য সচেতন আদর্শ বিমাতার চিত্র এঁকেছেন লেখক। সপত্নীদের সম্পর্কে ঈর্ষাবোধ অনেক সময় অহেতুক হলেও স্বাভাবিক। চারুর মনে সপত্নী সম্পর্কে বিষ ছড়িয়েছেন তার শাশুড় এবং বিশ্বেশ্বরী পিসী তাকে বিষাক্ত করে তুলেছে। তারাসুন্দরী প্রেমে, ধৈর্যে, সহনশীলতায় ও কর্তব্যে অতুলনীয়া। অনেকটা 'কনে বউ' এর সুশীলার মত, তারকনাথের 'অদৃষ্টে'র মহামায়ার মত। চারুর সঙ্গে 'কনে বউ' এর বড়বউ এর সাদৃশ্য আছে। চারুর মৃত্যুর পরিকল্পনায় আকস্মিকতার স্পর্শ বর্তমান। কাহিনীটি রচনাগুণে স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করেছে।

যোগেন্দ্রনাথের 'বড়-ভাই'[১৯] অনেকটা 'বিমলা'র পরিপূরক। সৎমা কর্তৃক নিগৃহীত ও বিতাড়িত সন্তানের সততা ও কর্তব্যবোধের স্বাক্ষরবাহী এই উপন্যাস।

১৯. বড়ভাই (সামাজিক উপন্যাস) ১৩০১, ১৮৯৪, চারটি খণ্ডে বিভক্ত, পৃ. ১৮৮। 'অনুসন্ধান' (১৫ ভাদ্র, ১৩০০, পৃ. ৩৮৭) এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

নবকুমার স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায মুমূর্ষু স্ত্রীকে আশ্বাস দেয়, দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে না। কিন্তু শিশুপুত্র সতীশের কথা ভেবে এবং ঘটনাচক্রে সে বিয়ে করে। স্ত্রী শৈলজার চক্রান্তে, সতীশের আইন পডাব খরচ বন্ধ হল। দূর সম্পর্কের আত্মীয অমৃতলাল ও তাব স্ত্রী সতীশকে সাদরে গ্রহণ করল। শৈলজার মূর্খ ও গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলে ললিতেব বিয়ে হযে গেল। নবকুমারেব রোগশয্যায় শৈলজা কৌশলে সব সম্পত্তি ললিতেব নামে উইল কবিযে নিল, এবং পবে নবকুমাবেব প্রতি চরম অনাদর দেখিযে এবং তাকে পিপাসার্ত কবে রেখে মাতা-পুত্র তাব মৃত্যু-মুহূর্ত গুনতে লাগল। অমৃতলাল ও সতীশ শেষ মুহূর্তে এসে পডায নবকুমাব জল পেল। তাব চৈতন্যোদয হল। উইল সংশোধন করতে চাইল। কিন্তু তা তখন নাগালেব বাইবে।

অমৃতলাল সতীশেব বিয়ে দিল। মাতা ও স্ত্রী হত্যাব অপবাধে অপরাধী ললিতকে সতীশ বাঁচাবাব চেষ্টা কবল। ফাঁসিব আগে বড ভাই সতীশেব সঙ্গে মিলনে ললিতেব ভুল ভাঙ্গল। সে অনুতপ্ত হল।

বাবা, বিমাতা ও সংভাইযেব অকথ্য ব্যবহাবেব প্রতি চবম সহিষ্ণুশীলতা ও পবিবাবেব সম্মান বক্ষাব চেষ্টাব মধ্য দিযে সতীশেব চবিত্রেব ঔদার্য ও কর্তব্য সূচিত হযেছে। চবিত্রটি কিছুটা আদর্শান্বিত। সন্তানকে বিপথগামী করানব পশ্চাতে শৈলজাব অপবাধেব চবম শাস্তি ঘটেছে সন্তানেব হাতেই। সে যেন বিদ্যাসাগবেব দ্বিতীয় ভাগেব দশম পাঠেব ভুবন ও মাসিব সম্পর্ক ও পবিণতিব চবম রূপ। নবকুমাব অনেকটা 'কনে বউ' এব পশুপতিব মত। দ্বিতীয স্ত্রীব প্রেমমোহে অন্ধ দ্বিতীয বিবাহেব পব সতীশেব পতি নবকুমাবেব স্নেহভাব হ্রাস ও স্ত্রীব প্রতি বিশ্বাস স্থাপন স্বাভাবিক ভাবে পবিস্ফুট। মাতৃহাবা বালকেব মাকে চেযে ও না পাবাব বেদনা এবং পাবাব আশায ব্যর্থ হযে হতাশাজনিত মর্মযাতনাব চিত্র পাঠকমন স্পর্শ কবে।

অমৃতলাল লেখকেব উজ্জ্বল সৃষ্টি। হাস্য পবিহাসে কঠিনকে সহজ করতে, সঙ্কটকে শঙ্কাহীন কবতে তাব জুডি নেই। বামবতনেব চবিত্র তাবকনাথেব স্বর্ণকুমাবীব শ্যামাব অনুরূপ। পাত্রপাত্রীব আচবণেব উপব লেখকেব মন্তব্য অনেকটা বঙ্কিমবীতি অনুসৃত (পৃঃ ১৭৪)।

'আমাদের ঝি'[২০] উত্তম পুরুষে লেখা লেখকেব আত্ম-অভিজ্ঞতার কাহিনী।

২০. 'আমাদের ঝি', ১৩০২, পৃ. ৯২। দ্বি. সং ১৩০৭, পৃ. ১০০।

'আমাদের ঝি উপন্যাস নহে—সত্য ঘটনা।' 'ডায়মণ্ড হারবারের শ্বশুরগৃহ থেকে স্ত্রীর অনুরোধে আনীত 'আমাদের ঝি'। বাল্যবিধবা সুন্দরী ও লালসাময়ী 'আমাদের ঝি'র নজর পড়ে গৃহকর্তার উপর। ফলে সে বহিষ্কৃত হয়। পরে, 'আমাদের ঝি'র কুপ্রস্তাবকে লেখক মেনে না নেওয়ার জন্যে তার চক্রান্তে লেখকের চাকুরি যায়। লেখক লক্ষ্ণৌ যান। তারপর 'আমাদের ঝি' লেখককে গুণ্ডা দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। কিছুকাল পরে কলকাতায় ফিরে এক ভিখারিণীর সাক্ষাৎ পেলেন তিনি। লেখকের স্ত্রী সুরবালা আবিষ্কার করলেন, এ 'আমাদের ঝি'।

এক লালসাময়ী বিধবা নারীর লালসা চরিতার্থতার চেষ্টা ও ব্যর্থতাজনিত চরম প্রতিশোধ গ্রহণের পথে ভিখারিণীতে রূপান্তরিত হবার কাহিনী এটি। গল্পটি সরলরেখায় সমাপ্ত। উত্তম পুরুষে লেখা কাহিনীটি 'সত্য ঘটনা' বলে লেখক অভিহিত করেছেন। উপন্যাসটির প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে ও শেষে আমাদের ঝি' কথাটি লিখিত হয়েছে। উপন্যাসটির রচনা-রীতিতে বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষণীয়। 'আমাদের ঝি'-র একটি উক্তি, 'তখন সেই পাপীষ্ঠা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল -কি আমি পাপীষ্ঠা! কিন্তু তুমিই আমার পাপীষ্ঠা হবার মূল। আর যে বলে বলুক, কিন্তু তোমার মুখে এই কথা!' (পৃ. ৫৬, দ্বি. স.) 'চন্দ্রশেখর'-এ প্রতাপের প্রতি প্রত্যাখ্যাতা শৈবলিনীর উক্তি মনে করিয়ে দেয় (চন্দ্রশেখর, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

'প্রসন্নকুমারের উইল'[২১] এর কাহিনীভাগ কৌতূহলপ্রদ এবং আকর্ষণীয়। নকল ব্যক্তি সেজে অপরের স্ত্রীর সতীত্ব হানি না করেও বিষয় ভোগ করার চমক-প্রদ কাহিনী রচিত হয়েছে এই উপন্যাসে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্ন-দীপ' (১৯১৫) এর কাহিনীর সঙ্গে এই উপন্যাসের কাহিনীগত সাদৃশ্য উল্লেখনীয়।

ডাক্তার অভয়াচরণ চৌধুরীর পুত্রের অন্নপ্রাশনের উৎসব-চিত্র দিয়ে উপন্যাসটির শুরু। প্রসন্নকুমার, ভাগিনেয় নগেন্দ্রনাথকে উইলে সর্বস্ব দিয়ে যাবার আগেই মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করে। নগেন্দ্রের ভাই সুরেশ পূর্বেই গৃহত্যাগ করেছিল। প্রসন্নর কন্যা বিধবা মুক্তকেশীর দাপটে নগেন্দ্রের স্ত্রী নির্মলকুমারী পিতৃগৃহবাসিনী হল।

দীর্ঘ বার বছর পরে গ্রামে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটলে, গোলকমুদি

২১. প্রসন্নকুমারের উইল, ১৩০৬, পৃ. ১৭০।

ও তার স্ত্রী শ্যামা আবিষ্কার করল যে, সন্ন্যাসীই গৃহত্যাগী নগেন্দ্রনাথ। প্রসন্ন-কুমারের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ অভয়াচরণ তাকে রুদ্ধ ঘরে পরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন যে সন্ন্যাসী নগেন্দ্রনাথ। সন্ন্যাসীরূপী নগেন্দ্রনাথ উইলের ব্যবস্থানুযায়ী মাতুলের সম্পত্তি ভোগে তৎপর হল। কিন্তু নির্মলকুমারীর বাবা তাকে নিয়ে যেতে চাইলে সে গেল না। নির্মলকুমারীও স্বামীর কাছে না আসায়, ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে উঠল। ডাক্তার তার শালী কমলার সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিয়ে দিলেন।

গ্রামে এক পাগলের আবির্ভাব ঘটল। এই খগা পাগলার আচরণে মনে হল সে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। নির্মলকুমারীকে আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করে সে ঘোষণা করল যে, সে গৃহত্যাগী নগেন্দ্রনাথ। নকল নগেন্দ্র আর কেউ নয়, তার ভাই সুরেশ সুরেশ আত্মহত্যা করল। ডাক্তার জানালেন দেনার দায়ে তিনি সুরেশচন্দ্রকে নগেন্দ্রনাথ বলে স্বীকৃতি দিয়ে-ছিলেন। কমলার স্থান হল নির্মলের কাছে। তার ভাই জানকীও নির্মলের সাহচর্যে বড় হয়ে উঠল।

নকল নগেন্দ্র ও খগা পাগলাকে ঘিরে কাহিনীতে কৌতূহল সৃষ্টি করা হয়েছে। রহস্য দানা বেধেছে খগা পাগলার আবির্ভাবের পর থেকে। খগা পাগলার আত্মপ্রকাশের অহেতুক বিলম্বের কারণ পাঠকের কৌতূহল বজায় রাখার চেষ্টা। খগা পাগলার আবির্ভাব, ঘটনার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক রহস্যজনক। তার গান, 'জাল জুয়াচুরি ভরা, নব কি তোমার ধরা ?'—বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। খগা পাগলার আত্মপ্রকাশই কাহিনীকে পরিণতি দান করল। তাই তার ভূমিকা ক্ষুদ্র হলেও শিল্প-কৌশলের দৃষ্টান্ত। নির্মল-কুমারীর চরিত্র কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক। যখন দেশশুদ্ধ লোক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে নগেন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করল এবং ডাক্তার অভয়াচরণ দেহ-পরীক্ষান্তে সন্ন্যাসীকে নগেন্দ্রনাথ বলে ঘোষণা করলেন, তখনও তার মনের তরঙ্গহীন স্তব্ধতা, কৌতূহলহীন মানসিকতা যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। সে তার অনুভূত সত্যের দৃষ্টিতেই জেনেছে নকল নগেন্দ্রনাথ তার স্বামী নয়। লেখক বলতে চেয়েছেন সতীরা আসল নকলকে মনে মনে বুঝতে পারে। নির্মলকুমারীর সততা ও সতীত্ববোধ আদর্শস্থানীয়। সুরেশের নগেন্দ্র-সাজার প্রধান কারণ, বিষয় ভোগ। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের পূর্বে গৃহত্যাগী হওয়া সত্ত্বেও,

বারবছর পরে নগেন্দ্রনাথরূপে আত্মপ্রকাশের ব্যাপারটি আকস্মিক। মুক্তকেশী ঈর্ষাতুরা। সম্পত্তিলাভের লোভে তার সর্বস্ব খোয়ানর বিষয়টি মর্মান্তিক। খগা পাগলাকে দেখে তার 'প্রাণের ভিতর কেমন ধড়াস ধড়াস করা'র ব্যাপারটি ইঙ্গিতবাহী। ডাক্তার অভয়াচরণের সততা সম্পর্কে জনস্বীকৃতি সত্ত্বেও দেনা পরিশোধের জন্য সন্ন্যাসীকে নগেন্দ্ররূপে জনসমক্ষে ঘোষণা, তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গতিহীনতার পরিচয়। উপন্যাসটিতে নারী সমাজের চিত্র খুব স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। 'বড়ভাই' উপন্যাসে নবকুমারের দ্বিতীয় বিবাহের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আচারের কয়েক পরিচ্ছেদব্যাপী বর্ণনায় নারীচরিত্র ও সমাজের বিচিত্র ধারা চিত্রিত হয়েছে। জানকীর বোকামি ও সারল্য, হাস্যরসের যোগান দিয়েছে। জানকীনাথের তিন সহোদর,—'আমি, মা আর পিসীমা আমরা তিন সহোদর হলুম না?' (পৃঃ ১০৫) জানকী নির্মলকুমারীকে দিদির বদলে মাসী বলে এবং সেজন্য যুক্তি দেয়, 'কেন দিদি হলে বুঝি আর মাসী হতে নেই? তবে আমার মাব দিদিকে আমি মাসী বলে ডাকি কি করে?' (পৃঃ ১৬৭) জানকীনাথ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতার' গদাধরের নিকট-সম্পর্কিত। ঘটনা সংস্থাপনে কুশলী শিল্পীর রচনা-চিহ্ন বর্তমান।

'প্রসন্নকুমারের উইল' সুখপাঠ্য উপন্যাস।

যোগেন্দ্রনাথের 'ঠাকুরঝি'[22] একটি উপভোগ্য পারিবারিক উপন্যাস। বিবাহিত জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও অভিমানের ফলে কিভাবে দাম্পত্য জীবনে অবাঞ্ছিত অশান্তির কুটিল ছায়া পড়ে, তার চিত্র লেখক সহানুভূতি ও পর্যবেক্ষণের আলোকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বিবাহিত জীবনে পুরুষ ও নারী এক অপরের উপর নির্ভরশীল। কর্মে, আচরণে ও জীবনচর্যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস ও আন্তরিক ভালবাসা, বিবাহিত জীবনের অন্যতম সম্পদ। স্বামীর প্রতি সামান্য সন্দেহে স্ত্রীর অতিরিক্ত রূঢ়তা, অভিমান ও অনুযোগ এবং দীর্ঘদিন বাক্যালাপ বন্ধের পর, স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় অধঃপতনের পথে স্বামীর ত্বরিত উত্তরণ ও স্ত্রীর প্রতি গভীর অবিশ্বাস পোষণ, মানুষের জীবনকে যে কত নিঃস্ব, শূন্য এবং আদর্শহীন করে তোলে, তার নিপুণ বিন্যাস এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা

২২. ঠাকুরঝি, দ্বি. সং ১৩০৭, পৃঃ ১৯২। 'অনুসন্ধান' (২১ বৈশাখ ১৩০১, পৃঃ ৩১) এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

যায়। এই ক্ষুদ্র কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত একটি বিধবার (অমলা) মহানুভবতা, দয়া, অশেষ সহানুভূতি ও স্বার্থত্যাগ মূল ঘটনার ঊর্ধ্বে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

সিদ্ধিপান করার ফলে হীরালালকে তার স্ত্রী মাতাল বলায় অভিমানাহত হীরালাল সত্যিই মদ্যপান শুরু করে। তার সহায়ক বন্ধু হয় পরেশ। স্ত্রী হীরালালকে ঘৃণা করে, মাতাল দুশ্চরিত্র বলতে দ্বিধা করে না। একদিন গভীর রাত্রে মা, বোন অমলা ও স্ত্রী শরৎ এর কাছে মাতাল হীরালাল ধরা পড়ে। প্রতিজ্ঞা করে মদ ছেড়ে দেবে কিন্তু ছাড়তে পারে না।

পরেশের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তার স্ত্রী নিস্তারিণী দশ বছরের মেয়ে সুখদা ও ছমাসের শিশু অমরনাথকে রেখে আত্মহত্যা করে। পরেশনাথের শিশুদুটিকে অমলা সাদরে গ্রহণ করে। পরেশকে পুলিশের হাত থেকে মুক্ত করে, নিজের বাড়ির একাংশে হীরালাল পরেশ ও তার সন্তানদের আশ্রয় দেয়। হীরালাল ও শরৎকুমারীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বাক্যালাপ বন্ধ থাকে। উভয়ের মধ্যে মান অভিমান তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও অনেকটা শিথিল হয়ে আসে। শরৎ স্বামীর পরিচর্যায় যত্নবতী হয়েও স্বামীর বিশ্বাস হারায়।

অফিস থেকে তহবিল তছরূপের অভিযোগে অভিযুক্ত হীরালালের পাশে দাঁড়ায় তার বন্ধু সুরেশ। হীরালালের মা, অমলা ও শরতের গহনা ও সঞ্চিত অর্থ, বাড়ি বিক্রির টাকা ও জমি বন্ধক দিয়ে মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে, সেই টাকা অফিসে জমা দিয়ে জেলের দায় থেকে সে মুক্তি পায়। শরৎ সম্পর্কে হীরালালের ভুল ভাঙ্গে।

পরেশ মদ খেয়ে খেয়ে, পাগল হয়ে উন্মাদ আশ্রমে স্থান পায়। সকলে শ্যামবাজারে অমলার বাড়ি চলে আসে। হীরালালের আবার চাকুরি হলে সে আবার বাড়ি আসে। অমলা সুখদাকে ভালো পাত্রে বিয়ে দেয়। শরৎ স্বামীকে পেয়ে ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

বহু ঘটনার সমাবেশেও উপন্যাসটি লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। হীরালালকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের ঘটনাবিস্তার। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা, সঙ্গ ও পরিবেশের প্রভাব মানুষের জীবনে কি জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, তার সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়, হীরালাল ও শরৎকুমারীর চরিত্রে। পরেশের কাহিনীটি মূল কাহিনীর সঙ্গে কৌশলে যুক্ত করে লেখক অমলার মহত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরেছেন। পরেশ-নিস্তারিণীর কাহিনী, উপকাহিনী। অমলার চরিত্র

গ্লানিহীন। মা ও দাদার প্রতি শ্রদ্ধা, বৌদির প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি, আর্তজনে দয়া, দাদার সংসারের চরম বিপদকালে নিজের সর্বস্ব দিয়ে এবং বাড়ি ভাড়ার অর্থে সংসার চালিয়ে, অমলা অশেষ গুণ ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় রেখেছে। শরৎকুমারীর চরিত্রে ক্রোধ ও অভিমানের যুগ্মধারা প্রবাহিত।[২৩] স্বামীর পতনকে সে কলঙ্করূপে গণ্য করে। তার ক্রোধ সম্পর্কে সে অবহিতা। স্বামী চলে গেলে বিচ্ছেদের মর্মভেদী চিন্তা তার মনে জাগে এবং স্বামীর সঙ্গকামনায় সে অধীরা হয় (পৃঃ ২৭)। সংকটকালেও, চোখের কোলে অভিমানের অশ্রু নিয়ে বাহ্যিক কঠোরতাকে সে ত্যাগ করে না। স্বামীর অবিশ্বাস ভঙ্গের জন্য, বিগলিত মনের অশ্রুসেকে স্বামীর পদসিক্ত করেও, স্বামীর বিশ্বাস ফিরে না পাবার যন্ত্রণা তার চরিত্রে তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শরৎকুমারী পাঠকের অনুকম্পালাভে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন হীরালালের অধঃপতনের কারণ কেবল তার স্ত্রী নয়, বন্ধু পরেশনাথও। 'পরেশনাথের কৌশলজালে আবদ্ধ হইয়া হীরালাল শরৎকুমারীর হৃদয়ে নিহিত গভীর প্রণয়ের কোন অনুসন্ধান লইতেন না' (দ্বি. সং, পৃঃ ৫০)। স্ত্রীর পায়ে পড়ে অপরাধ স্বীকার করার পর ও স্ত্রীর মুখে একটিও আশ্বাসের কথা না শুনে পৌরুষাহত হীরালালের পরেশের ঘরে গিয়ে মদ প্রার্থনার বিষয়টি মানব চরিত্রের সংবেদনশীল দিকটি উদ্ঘাটিত করার সার্থক নিদর্শন। হীরালালের মা হীরালাল ও শরৎকুমারীর মানসিক সংকটকে বাড়িয়ে দিয়ে ঘটনাকে আরও জটিল করে তুলতে সহায়তা করেছে। কাহিনীর সংকট-মুহূর্তগুলিতে অমলার আবির্ভাব, সংকটের গ্রন্থিগুলি একে একে মুক্ত করে দিয়েছে। তবে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রাথমিক সংকটের সূত্রটি যেন একটি অসুস্থ অনুভূতিকে কেন্দ্র করে রচিত।

ঠাকুরঝি যোগেন্দ্রনাথের একটি সার্থক রচনা।

উপন্যাসে বাস্তব রসসিক্ত সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডল রচনায় ও চরিত্রসৃষ্টিতে, যোগেন্দ্রনাথ যে তার অগ্রজের পন্থানুসারী একথা পূর্বেই বলেছি। বঙ্কিম সমকালে উপন্যাস রচনায় বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রধারার প্রবর্তন করলেও তৎকালীন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথের প্রতিভার দীনতা তাঁকে কালজয়ী

২৩. শরৎকুমারী সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য, 'তাহার যে নয়নে এই ক্রোধাগ্নি সেই নয়নেরই এক প্রান্তে কিন্তু অশ্রুবিন্দু। একাধারে অগ্নিও জলের একত্র সম্মিলন।' (পৃঃ ১২২, দ্বি. সং)

করতে পারেনি। কিন্তু তারকনাথের সূত্র ধরে যোগেন্দ্রনাথের এই উত্তরণ, শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের অদৃশ্য পটভূমি রচনা করেছে বললে, অত্যুক্তি হয় না।[২৪]

নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ স্মৃতির অন্তরালে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে গৌণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আঙ্গিক রীতির ক্ষেত্রে যাঁরা অভিনবত্ব এনেছেন, ইনি তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্যকালে নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাত্র একখানা উপন্যাস পাই। উপন্যাসটির নাম 'বসন্তকুমারের পত্র'।[২৫] উপন্যাসটিতে নটেন্দ্রনাথ এক নবতর আঙ্গিক রীতির প্রবর্তন করেছেন, যা তৎকালীন শিল্পরীতির ক্ষেত্রে অভিনব। কয়েকটি পত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির আখ্যানভাগ পরিবেশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রজনীর (১৮৭৭) কাহিনী, চরিত্রগুলির বক্তব্যের ভিত্তিতে রচিত ইন্দিরায় (১৮৭৩) ইন্দিরাই একমাত্র বক্তৃী। ইন্দিরা ও রজনীর শিল্পরীতির সূত্রেই এই নবতর রীতির প্রবর্তন। নটেন্দ্রনাথের হাতেই বাংলার প্রথম পত্রোপন্যাসের জন্ম।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে গল্পের মূলরস ও তার পরিবেশন কৌশল, এই দুটি জিনিসকে পৃথকভাবে দেখার প্রয়োজন আছে। এই দৃষ্টিতে দেখলে এই ধারণাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির মত উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রেও শিল্পরীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল, পাঠকের কাছে লেখকের বক্তব্যবিষয় তুলে দেবার চেষ্টায় তৎপর হওয়া। যুগের রুচি ও মর্জির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মত উপন্যাস শাখাতেও রীতিগত পরিবর্তন ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কেবল ব্যক্তির অভিরুচি নয়, যুগের প্রভাব ও রীতির বদল ঘটায়। তাই শিল্পরীতির আলোচনায় একদিকে যুগরুচি বা যুগসংস্কারের প্রভাব,

২৪. যোগেন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনা—লীলাময়ী (সামাজিক উপন্যাস) ১২৯৮, পৃঃ ৯৬ রতিরমণ, ১৮৯১, পৃঃ ১০২, স্ত্রী ও স্বামী (সংসার চিত্র) ১৩০১ ; পঞ্চপ্রদীপ (গল্পসমষ্টি), ১৩০২ . কলঙ্কিনী (সমাজচিত্র) ১৩০২ , রমাবাই (ক্ষুদ্র উপন্যাস), ১৩০২, পৃঃ ৪৮ ; উপন্যাস লহরী, ১৩০৭, পৃঃ ১০৪ , চাকুলীর আত্মকাহিনী ১৩০৮, পৃঃ ১৪০ , জঙ্গলী মেয়ে (উপন্যাস), ১৯০২ পৃঃ ১৪৬ ; প্রতিশোধ (ঐ—উপন্যাস), ১৩১০, পৃঃ ২২৬ , সংসার চিত্র, ১৯০৫ , সমাজ চিত্র ১৯০৬ ; পাহাড়ী বাবা, ১৩১৩ , খুড়িমা বা প্রায়শ্চিত্ত (কনে বউ এর উপসংহার), ১৩১৩, পৃঃ ২৩৮ শোভাসিংহ (ঐ—উপন্যাস), ১৩১৫ , ইত্যাদি।

২৫. বসন্তকুমারের পত্র, ১৮৮২।

অন্তদিকে লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ববোধ, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বিশেষত্ব অর্থাৎ এই দুই বিষয়ই বিচারসাপেক্ষ। যদিও গল্পমাত্রই উপন্যাস নয়, তবুও গল্পই যে উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ একথা অস্বীকার করারও নয়। এসব কথা সত্ত্বেও একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে যে, রচনাভঙ্গির কোন কৌশলই যেন পাঠকের রসগ্রহণের পক্ষে জটিলতা সৃষ্টি না করে।[২৬] বসন্তকুমারের পত্রের বিচার সম্পর্কেও এসব কথা প্রযোজ্য।

নটেন্দ্রনাথের বসন্তকুমারের পত্র, উপন্যাস নামে লেখক কর্তৃক চিহ্নিত। প্রায় চার বছরের ঘটনাপুঞ্জ এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। গল্পটি একজন পুরুষ ও দুজন নারীকে কেন্দ্র করে একটি জটিল প্রণয়-কাহিনী।

হরকুমার ও বসন্তকুমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। হরকুমার বিবাহিত, বসন্তকুমার অবিবাহিত। প্রতিবেশী মৃত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তের বৎসর বয়স্কা সুন্দরী কন্যা কুসুমিকাকে সে ভালবাসে। পূর্বতন ছাত্রী কুসুমিকা বসন্তকুমারের 'জীবনের আনন্দ, পৃথিবীর স্বর্গ, ভবিষ্যতের আশা'। কুসুমের মৃত্যুপথযাত্রিনী মা বসন্তের সঙ্গে কুসুমের বিয়ের মত দিলেন।

কুসুমের সখী নীলাব্জিকা এদিকে মনে মনে বসন্তকুমারকে ভালবেসেছে। হরকুমার আনন্দ পায় বসন্তকুমার কুসুমিকাকে স্ত্রীরূপে পাবে জেনে। কুসুমের মার মৃত্যুর পর কুসুমিকা নিরুদ্দিষ্টা হল। কারণ বসন্ত ও নীলাব্জিকার মিলনের পথ মুক্ত করা। নীলাব্জিকাকে লেখা কুসুমিকার একটি পত্রে জানা যায় যে, বসন্তকুমারকে বিয়ে করে নীলাব্জিকা সুখী হোক এই তার ইচ্ছা। কুসুমিকার অন্বেষণকালে বসন্তকুমার একদিন সকালে কুসুমিকাকে দেখল পুকুরের এক বৃহৎ বাগার উপর। তারপর তাকে নিয়ে দেশে ফিরল।

নীলাব্জিকার বিয়ে হয়ে যায়। আর, বসন্তকুমারের সঙ্গে কুসুমিকারও। বিয়ের পরেও নীলাব্জিকা বসন্তকুমারকে ভুলতে পারে না। বসন্তকুমারকে একটি পত্রে নীলাব্জিকা তার শেষ আকাঙ্ক্ষা জানায়, মৃত্যুর পূর্বে বসন্তের মুখ দেখে মরা। হরকুমারকে বসন্তকুমার তার শেষ পত্রে জানায়, নীলাব্জিকার পাগল হওয়ার সংবাদ। শ্মশানের চিতাশয্যার একপার্শ্বে উন্মাদিনী সঙ্গীতরতা নীলাব্জিকাকে দেখল বসন্ত। নীলাব্জিকা গান গাইছে, 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।' সে যেন শ্মশান-বিহারিণী ভৈরবী। ক্রমে

২৬. হরপ্রসাদ মিত্র, সাহিত্যের নানাকথা, পৃঃ ১১৩।

প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি এল। তারপর নীলাব্জিকা কোথায় হারিয়ে গেল। কদিন ধরে বহু অন্বেষণেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

একদিকে প্রেমের স্নিগ্ধ অচঞ্চল রূপ, অন্যদিকে বন্ধনহীন উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা এই দুয়ের সমাবেশ ও পরিণতির চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক উপন্যাসটিতে। বসন্তকুমারের পত্রে প্রধান চরিত্র মোট চারটি। বসন্তকুমার, হরকুমার, কুসুমিকা ও নীলাব্জিকা। অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে হরকুমারের স্ত্রী, বসন্তকুমারের ভগিনী ভুবনমোহিনী, কুসুমিকার মা ও রামকুমার দত্ত ওরফে হরিহর ঘোষাল। প্রায় সমগ্র গ্রন্থখানি বসন্তকুমারের সঙ্গে হরকুমারেব পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে রচিত। মোট উনিশখানি পত্রের মধ্যে মাত্র দুখানি পত্র কুসুমিকা ও নীলাব্জিকার মধ্যে ও দুখানি বসন্তকমার ও নীলাব্জিকার মধ্যে বিনিমিত হয়েছে।

বসন্তকুমার নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও কর্তব্যপরায়ণ পুরুষ। কুসুমিকার প্রতি তার প্রেম অকৃত্রিম। তৎকালে প্রচারিত দেহোত্তর প্রেম বা নিষ্কাম প্রেমে সে আস্থাবাদী নয। অথচ সমাজ ও সংসারের মতের বিরুদ্ধে সে কুসুমিকার পাণি-গ্রহণে অক্ষম। বসন্তকুমারেব উক্তিব মধ্যে যে পেসিমিজমের সুর পাওয়া যায় তা একান্তই যৌবনধর্মে রঞ্জিত। নীলাব্জিকার প্রণয়কে অস্বীকার করে সে জানায, 'স্নেহ এক ভালবাসা আর'। নীলাব্জিকাব প্রতি স্নেহবশে সে তার শেষ কর্তব্য করতেও দ্বিধা করেনি। হরকুমার ভাবুক। নদীস্রোতে 'শ্বেত পদ্মকোরক' ভেসে যেতে দেখে মনে পড়ে বালবিধবাদের অশ্রুসজল মুখমণ্ডল। হরকুমার নিষ্কাম প্রেমে বিশ্বাসী। সে বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী, সহানুভূতিশীল ও সত্যনিষ্ঠ।

কুসুমিকার প্রেম কলঙ্কহীন। ত্যাগের মধ্য দিয়ে সে প্রেমকে মহত্ত্বদান করতে জানে। নীলাব্জিকার প্রেম ত্যাগের স্পর্শহীন, আকাঙ্ক্ষাসর্বস্ব। সামাজিক নিয়ম-নীতির ঊর্ধ্বে তার অবস্থান। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েও সে পূর্ব প্রেমাস্পদের সঙ্গ কামনায় আকুল। এই আসঙ্গলিপ্সার ব্যর্থতার মধ্যেই তার জীবনের ট্রাজেডি। অশেষ অনুকম্পা ও সহানুভূতির আলোকে লেখক নীলাব্জিকার অবৈধ প্রণয়কেও হৃদয়বেদ্য করে তুলেছেন। গ্রন্থ-পরিণতিতে প্রেমের দুর্বার গতিশীলতার মধ্যে অবৈধজনিত পাপপ্রতিক্রিয়ার চিহ্ন মেলে না বরং প্রেমের অবৈধতা সম্পর্কে সংশয় জাগে। নীলাব্জিকার চরিত্রে শৈবলিনীর প্রভাব লক্ষ্য করি।

নটেন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি বঙ্কিমপ্রভাব বর্জিত নয়। দ্বিতীয় পত্রে 'চিত্ত-সংযম মহাধর্ম' উক্তিটি বঙ্কিমকে স্মরণ করানর পক্ষে যথেষ্ট। তৃতীয় পত্রের একটি বাক্যাংশ (বহুকাল বিস্মৃত সুখ-স্বপ্নের ন্যায় ইত্যাদি) বঙ্কিমচন্দ্রের 'একা' প্রবন্ধের রচনাংশের সঙ্গে হুবহু মিল বহন করে। পঞ্চম পত্রে, ফুলের সঙ্গে নারীজাতির তুলনার প্রসঙ্গ ও আলোচনার ধারা, বঙ্কিম অনুসৃত। বসন্তকুমারকে লেখা নীলাব্জিকার পত্রের লিখিত অংশ 'নন্দনকানন থাকিতে পদ্ম পৃথিবীর পঙ্কে ফুটে কেন? ললাটলিখন', 'কপালকুণ্ডলা'র মতিবিবির একটি উক্তিকে (আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকতে জল অধোগামী কেন? ললাট-লিখন।) সহজেই মনে পড়িয়ে দেয়।

পত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাস রচনারই প্রয়াস অভিনব এবং সেযুগে প্রথম। প্রথম প্রয়াস হলেও এই উপন্যাসটির শিল্পরীতি এই গ্রন্থের আখ্যানের স্বচ্ছন্দ প্রবাহে বাধা দেয়নি। বসন্তকুমারের বিবাহরাত্রে নীলাব্জিকার হৃদয়-দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত মনস্তত্ত্বসম্মত। নীলাব্জিকা মনের অসুখে যখন ক্ষীয়মান, তখন তার স্বহস্ত রোপিত মাধবীলতাটি শুকিয়ে যাবার খবরের মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিত-ধর্মিতার পরিচয় পাই তা সূক্ষ্ম শিল্পকৌশলের পরিচয়জ্ঞাপক (১৬শ পত্র)। নীলাব্জিকার মালাগাঁথা ও ফল জলে ভাসিয়ে দেবার মধ্যে প্রিয়মিলনের সম্ভাব্যহীনতা ও প্রেম-পরিণামের ইঙ্গিত তৎকালের পটভূমিকায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হরকুমারকে লেখা বসন্তকুমারের পত্রের মধ্যে চিঠি লেখার প্রণালীর স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দানের মধ্য দিয়ে, লেখক পরোক্ষভাবে, এই গ্রন্থ রচনার পদ্ধতির প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন (৪র্থ পত্র)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস রচয়িতা নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হয়ে থাকার মত।[২৭]

বসন্তকুমারের পত্র আলোচ্যকালের শিল্পরীতির ক্ষেত্রে একটি অভিনব নিদর্শন।

২৭. এই ধরণের উপন্যাসের অপর লেখক, রাধারমণ মাহাত, শরতের চিঠি (১৮৮৭)।

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জনৈক বন্ধুর অনুরোধই দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস রচনার প্রধান কারণ। ঔপন্যাসিক-প্রতিভা নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হননি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে জনপ্রিয় কয়েকটি উপন্যাসের অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের উপসংহার রচনায় কোন কোন লেখক ব্রতী হন।[২৮] শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ'-এর জনপ্রিয়তাই লেখককে উপন্যাসটির 'উপসংহার' রচনার প্রেরণা দান করে। প্রমদা চরিত্রের পরিণতি প্রদর্শনই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেবেন্দ্রনাথের মোট দুখানি উপন্যাস পাই। একটি অনুবৃত্তিমূলক, অপরটি মৌলিক। কিন্তু লেখকের প্রতিভার দীনতা উপন্যাস দুটিকে পূর্ণ সার্থকতা দান করেনি।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ' এর উপসংহাব দেবেন্দ্রনাথের 'শান্তিমঠ'[২৯] এ প্রমদার পরবর্তী জীবন বর্ণিত হযেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে প্রমদার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার ত্যাগ, দয়া, ক্ষমা, কর্তব্য-চেতনা ও ঈশ্বরানুরাগের পরিচয় সমৃদ্ধ বর্ণনাই গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস 'শান্তিমঠ' এ শিবনাথের অনুবর্তন কবলেও শিল্পী হিসাবে দুর্বলতার পরিচয় রেখেছেন।

বিধবা প্রমদা পিত্রালযে আসার পূর্বেই পিতার চাকরি যায। বেকার অবস্থায় থাকাকালে দারিদ্র্যের মধ্য দিযেই পরিবাবের দিন কাটে। প্রমদার দাদা এক উকিলের কাছে অল্প বেতনে কাজ কবে ও মাঝে মাঝে সামান্য টাকা পাঠায়। ঋণগ্রস্ত পিতা অসুস্থ হয়ে পডলে প্রমদা বেনাবসী শাডি বিক্রয় করে ৭০৲ টাকা পায ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে কিন্তু পিতাকে বাঁচাতে পারে না।

প্রকাশ কলকাতায় ডাক্তারি করে ভাল আয করে। হরিতারণও ডাক্তার। প্রকাশের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে প্রমদা এলে তার রূপলাবণ্যহীনতা সকলের চোখে পড়ে। তার উপর 'প্রায ৫।৬ মাস সসত্ত্বাবস্থা। প্রবোধচন্দ্র যখন পীড়িতাবস্থায় পশ্চিমে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সময প্রমদার এই গর্ভের

২৮. দামোদর মুখোপাধ্যায়, মৃন্ময়ী (১৮৭৪), কপালকুণ্ডলার পরিশিষ্ট। বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আয়েষা (১৮৯৭), দুর্গেশনন্দিনীর পরিশিষ্ট। কেদারনাথ বিশ্বাস, ভবানী পাঠক (১৯০০), দেবীচৌধুরাণীর পরিশিষ্ট।

২৯. শান্তিমঠ, ১২৯৪ (১৮৮৭), পৃঃ ৯৪।

সঞ্চার হয়।' প্রকাশের কাছে প্রমদা জানল যে, বেশ্যালয়ে মদখেয়ে মারামারি করার জন্য উপেন্দ্রকে পুলিশ ছমাস আটকে রেখেছে।

প্রমদা পূর্বমত সংসারের কর্ত্রী হলে সেজবউ খুব ঈর্ষাবোধ করল। তার স্বামী গোঁয়ার গাঁজাড়ে পরেশ। বড়বউ এর অসুখে প্রমদা গোপালের সাহায্যে ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসা করাল। কুলপুরোহিতের কন্যার বিবাহে গিয়ে বিধবা বলে পুরুত-গৃহিণী কর্তৃক বিবাহের কাযে বাধা পেলেও ক্ষুন্ন হল না। প্রমদার ঈশ্বর আরাধনায় দিন কাটে। প্রমদা হরিতারণের সঙ্গে তের বছরের পুঁটির বিয়ের সম্বন্ধ করলে বড়বউ রাজি হয়।

অসুস্থ শ্যামা মেজবউ এর যত্নে আরোগ্যলাভ করে। হরিতারণের সঙ্গে পুঁটির বিয়ে হয়ে গেল। সেজবউ পৃথক হতে চাইলে, মেজবউ সংসারের কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে দিতে চাইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা আলাদা হয়ে গেল। হরিশচন্দ্র কাজে ইস্তফা দিয়ে ত্রিবেণীতে গঙ্গাতীরে বাস করতে লাগলেন।

পরেশের সংসারে শ্যামার দুঃখে দিন কাটে। যাত্রার দলের অধিকারী রামজয় মুখুজ্জের সঙ্গে সে নষ্ট এমন কলঙ্ক রটে। শ্যামা শেষে প্রমদার আশ্রয়ে এসে নিশ্চিন্ত হয়।

অত্যধিক মদ্যপানে জীর্ণ অসুস্থ পরেশ প্রমদার হাতে স্ত্রী-পুত্রকে সমর্পণ করে মারা গেল। সেজবউ-এর মন পারিবর্তিত হল। প্রমদার ভালবাসায় সে নবজীবন লাভ করল। প্রমদা তীর্থস্থানে ধর্মসাধনা করতে চাইলে, প্রকাশচন্দ্র অনেক চিন্তার পর কাশীতে দশাশ্বমেধঘাটে প্রমদার বাসের উপযোগী একটা মঠ করে দিল। ধর্মসাধনেচ্ছু বিধবাদের জন্য মঠের দ্বার উন্মুক্ত রইল। শান্তিমঠে প্রমদা গৈরিক বসন পরল। সেখানে ব্রহ্মচারিণীদের সমাগম হতে থাকল। দুবছর পরে প্রমদার মৃত্যু হলে শান্তিমঠ ব্রহ্মচারিণীদের নামে উৎসর্গীকৃত হল।

প্রমদার জীবনকাহিনীর পর নারী অর্ধাংশের চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। প্রমদার চরিত্রে আদর্শের অতিরঞ্জন ঘটায় বাস্তবতা ক্ষুন্ন হয়েছে। কাহিনীটি একটি নারীর কাযকলাপের ধারা অনুসরণ করে শীর্ষবিন্দুতে এসে পৌছেছে। লেখক প্রমদার সংকার্যাবলীর মধ্য দিয়ে উন্নত হৃদয়ের পরিচয় তুলে ধরেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রমদাকে দেবী প্রতিপন্ন করার জন্য স্থানবিশেষে তাঁর মন্তব্যকেও কাজে লাগিয়েছেন। প্রমদার বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের

প্রশস্তিবাচন। জ্ঞান ও উপদেশদানের অধিকারও লেখক স্বহস্তে তুলে নিয়েছেন (পৃঃ ৫৯, ৭৬, ৮৫)। কথোপকথনের ভাষা কোথাও সাধু (পৃঃ ৩৬, ৭৮, ৮৬) কোথাও চলিত (পৃঃ ৫৪)। উপন্যাসটির রচনা-রীতি বঙ্কিম-অনুসৃত।

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী উপন্যাস 'নব্যবঙ্গে'[৩০] জাতিভেদ প্রথার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। নিম্নবর্ণের পরিবারে ভগ্নীর বিবাহদানের জন্য সমাজ সংস্কারক সেজে স্বার্থপর ভ্রাতার সামাজিক অধিকার লাভের চেষ্টা উপহসিত হয়েছে।

একটি গ্রাজুয়েট যুবক নিজের আশাকে ফলবতী করবার জন্য এবং হাইকোর্টে পশার বৃদ্ধির আশায়, অর্থের বিনিময়ে একটি নিম্নবর্ণের পরিবারে ভগ্নীর বিবাহ দেয়। পরে ভগ্নীর সঙ্গে তার সম্পর্ককে অস্বীকার করে। কলকাতায় সে সমাজ-সংস্কারকদের দলভুক্ত হয়। সেই সঙ্গে সমাজে তার হৃত স্থান পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়।

মূলত উপন্যাসটিতে একটি স্বার্থপর ভণ্ড ভাইয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে নব্যবঙ্গের চালকদের প্রতি লেখক কটাক্ষপাত করেছেন। রচনায় কোন শিল্প-নৈপুণ্যের চিহ্ন নেই। একটি বিশেষত্বহীন রচনা।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকরূপে প্রগতিবাদীদের দলভুক্ত ছিলেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে চণ্ডীচরণ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলির একাধিক সংস্করণ তার প্রমাণ। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর আস্থাবোধ, তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত। বিধবার আদর্শ, প্রণয় ও বিবাহ প্রসঙ্গই তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয়। বিষয়টি চণ্ডীচরণ বিশেষ সহানুভূতির মধ্য দিয়ে বিচার করেছেন। বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতাকে তিনি যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি বিধবার ব্রতচারিণী কল্যাণী মূর্তির প্রতি তিনি অশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। এই বিচারে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সমকালীন ব্রাহ্ম লেখকদের সমগোত্রীয় ও সমমানসিকতার অধিকারী।

৩০. নব্যবঙ্গ, ১৮৯৭, পৃঃ ১৭৪।

চণ্ডীচরণের প্রথম উপন্যাস 'দুখানি ছবি'[৩১] তে বিধবার দুই ধরণের রূপ চিত্রিত হতে দেখি প্রেমমালা ও মনোরমা বৈধব্য জীবনের 'দুখানি ছবি'। প্রথম চরিত্রটিতে বিধবার ব্রহ্মচারিণী, কল্যাণী রূপটি চিত্রিত। দ্বিতীয়টিতে, বিধবার পুনর্বিবাহিত রূপটি অশেষ সহানুভূতির আলোকে অঙ্কিত। লেখক উপন্যাসটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'বিধবার ব্রহ্মচর্য ও বৈধব্যের সদ্ব্যবহার কিরূপে সহজসাধ্য ও শুভকর হয় এবং বিধবার বিবাহের আবশ্যকতা থাকিলে কোন্ শ্রেণীর বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত, তাহাই দেখানো এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য' (বিজ্ঞাপন)। উপন্যাসটি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গীকৃত। কুলীন কায়স্থ উদয়চাঁদ ঘোষের দুই স্ত্রী। প্রথম পক্ষের পুত্র হৃদয়ভূষণ। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র বিনয়ভূষণ ও কন্যা মনোরমা। উদয়চাঁদের মৃত্যুর পর হৃদয়ভূষণ ভগ্নীর বিবাহ দিলেন এক তৃতীয় পক্ষ বৃদ্ধের সঙ্গে। মনোরমা নবচর বয়সে বিধবা হল। বিনয় মামার বাড়ী পড়তে গেল। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে, ঘটনাক্রমে সে কৃষ্ণনগরের গোপালবাবুর গৃহে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে উঠল।

বিনয়ের বিয়ের যখন স্থির হল, তখন সে এল. এ. ক্লাশের ছাত্র। বিনয় মাকে তার আপত্তি জানালেও সে রেহাই পেল না। বন্ধু শরতের সঙ্গে পরামর্শ-ক্রমে সে বাড়ি গেল। সে শরতের কাছে জেনেছিল, গোপালবাবু তার একমাত্র বিধবা কন্যা সরমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে ইচ্ছুক। মায়ের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত কুসুমপুরের প্রেমমালার সঙ্গে তার বিয়ে হল। পরীক্ষা-অন্তে বিনয় শ্বশুরবাড়ী গিয়ে প্রেমমালার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হল। তারপর উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয়।

কিছুকাল পরে দাদা হৃদয়ভূষণ মা ও বোনকে পৃথক করে দিলে, অধ্যাপক তারাপ্রসাদ বাবুর চেষ্টায় বিনয় ২৫্ টাকা বেতনের একটি কাজ পেল। তা থেকে সে মাকে সাহায্য করতে লাগল। এদিকে সরমা মারা গেল। বিনয় অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি এল। প্রেমমালার বাপের বাড়িতে তার একটি সন্তান হয়ে মারা গেল। কিছুকাল পরে বিনয়ের মৃত্যু হল। বিনয়ের মৃত্যুর পর, হৃদয়ভূষণ আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করল।

শরৎচন্দ্রের সহায়তায় বিনয়ের মা ও বোন বিনয়ের মামার বাড়ি সাধুহাটীতে

৩১. দুখানিছবি, ১২৯৫ (১৮৮৮), পৃঃ ২১৩, দ্বি., সং. ১৩৭৫।

চলে গেল। ইতিমধ্যে প্রেমমালা শরতের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন মনোরমাকে বিবাহ করার। সাধুহাটী থাকাকালে শরৎ ও মনোরমার মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান চলছিল। শরৎ সাধুহাটী এসে অসুস্থা মনোরমাকে ক্রমে সুস্থ করে তুলল এবং মনোরমাকে বিবাহের প্রস্তাব করল। মনোরমার মামা রামবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ খোকার মা মনোরমার মার সম্মতি আদায় করলে বিধবা ষোডশী মনোরমার সঙ্গে শরতের বিবাহ হল।

লেখক উপন্যাসটিতে সহানুভূতির আলোকে বৈধব্য জীবনের সংযতস্নিগ্ধ প্রেমের রূপকে মূর্ত করে তুলেছেন। কৌলীন্য প্রথা হেতু বাল্যবিবাহের ফলে অকালবৈধব্য নারী জীবনে অভিশাপ বয়ে এনেছিল। নারীর এই অভিশপ্ত জীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাসে লেখক বিধবা সমস্যা সমাধানের উপরি-উক্ত বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবার সংযতচিত্ত ব্রতচারিণী বিধবার প্রতি লেখক অশেষ শ্রদ্ধার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাহিনী পরিকল্পনায় লেখকের সচেতনতার পরিচয় মেলে। ঘটনা সংস্থাপনে শিল্প-কৌশল উল্লেখযোগ্য। প্রেমমালা ছাড়া অধিকাংশ চরিত্র স্বাভাবিকতার বর্ণে উজ্জ্বল। প্রেমমালার আদর্শবাদ, সারল্য, স্বামিভক্তি, কর্তব্যচেতনা ও জনহিতার্থে আত্মনিযুক্তি তাকে অনায়াসেই প্রেমপ্রতিমার স্তরে উন্নীত করেছে। প্রেমমালা, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রেমপ্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা' (১৮৮৬) উপন্যাসের প্রিয়ম্বদা চরিত্রের অনুরূপ সংস্করণ। বিনয়ের চরিত্রে মাতৃভক্তির পরিচয় পাই। স্ত্রী ও পরিবার ছাড়াও বন্ধু ও উপকারকের প্রতি তার কর্তব্য-চেতনার দিকটি তার চরিত্রে অনায়াসে উদ্ঘাটিত হতে দেখি। মনোরমা ও শরৎচন্দ্রের প্রণয়ের চিত্র সংযমের আবরণমণ্ডিত। তাদের সংযমনিষ্ঠ প্রণয়-গভীরতা অনায়াসেই গুরুজনের সম্মতির মধ্য দিয়ে বিবাহে পরিণতি লাভ করেছে।

উপন্যাসটির রচনাপদ্ধতিতে বঙ্কিমের প্রভাব বর্তমান। পাঠককে আহ্বান ঘটনাক্ষেত্রে লেখকের মন্তব্য, বঙ্কিমরীতি অনুসৃত। লেখক উপন্যাসটির মধ্যে আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরিচয় রেখেছেন।

চণ্ডীচরণের পরবর্তী উপন্যাস 'মনোরমার গৃহ'[৩২] তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস দুখানি ছবির অনুক্রম। উপন্যাসটি শিক্ষামূলক। 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখক

৩২ 'মনোরমার গৃহ', ১২৯৯ সাল, পরবর্তী সং ১৯০০ খ্রীঃ।

বলেছেন, 'বঙ্গ ললনাগণ কিরূপভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ' করলে 'বঙ্গগৃহ তৃপ্তিপ্রদ, আরামস্থান, শান্তিধাম হইতে পারে, ইহা তাহারই আভাসমাত্র।' তাছাড়া, উপন্যাসটিতে, 'বর্তমান সময়ের উপযোগী সন্তান পালনের একটি নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, এবং সেজন্য গৃহের সকল শক্তি, সকল চিন্তা, সকল সামর্থ নিয়োগ করা হইয়াছে।'

মনোরমা ও শরৎচন্দ্র তাদের সন্তান বসন্তকুমারসহ সুখে জীবন যাপন করে। দীনদুঃখীদের সেবা, বিনাব্যয়ে ঔষধ বিতরণও তাদের নিত্যকর্ম। শরতের মাতামহ কৃষ্ণগোবিন্দ প্রথমে বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন। শরতের বিবাহের পর তার স্ত্রীকে দেখে, মনারমাকে ৫০০০৲ টাকা ও শরংকে কাশীপুরের বাগানবাড়িটা দেন। শরতের শ্যালকদাদা রামগোপাল, তাঁর স্ত্রী ও তাঁদের পুত্র অবিনাশ শরতের কাছে থাকেন। সন্ন্যাসিনী প্রেমমালা মনোরমার আদর্শ।

শরৎ ও মনোরমা নবপদ্ধতিতে বসন্তকে শিক্ষিত করে। চিড়িয়াখানায় গিয়ে পশুপক্ষিদের পরিচয় প্রসঙ্গে অন্যান্য শিক্ষা দেয়। মনোরমা ও শরতের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ও সরকারী সহায়তায় দুঃস্থ ছেলেদের জন্য একটি ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা হয়। শরৎ মাসতুত ভাই সীতানাথের চিঠি পেয়ে বর্ধমান গিয়ে দেখে সীতানাথ ও সরমার সংসারে শান্তি নেই। সরমা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে কলকাতায় শরতের বাসায় আনা হয়। সে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং মনোরমার গৃহের প্রভাবে উভয়ের দাম্পত্য জীবনে শান্তি ফিরে আসে। এক অনাথা বিধবার দুটি সন্তানকে শরৎ নিয়ে এলে, মনোরমা তাদের সাদরে সন্তানস্নেহে গ্রহণ করে। শিশিরকুমারকে বোর্ডিং-এ দেওয়া হয়, এবং সরমা থাকে মনোরমার কাছে।

অবিনাশ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পায়। সরলা ও অবিনাশের মধ্যে প্রেম হয়। সরলার কাছ থেকে মনোরমা একথা জানতে পারে। বৃদ্ধ দাদামশায় কাশীপুরে এসে দেহরক্ষা করলেন। অবিনাশের বাবা রামগোপাল পীড়িত হয়ে মারা গেলেন। শরৎচন্দ্র ও মনোরমা অবিনাশের সঙ্গে সরলার বিয়ে দিল।

লেখকের শ্রম, একটি আদর্শ পরিবারের চিত্র অঙ্কনে ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির সার্থকতা প্রদর্শনে ব্যয়িত হয়েছে। শিক্ষামূলক এই উপন্যাসটিতে লেখক শিক্ষণায় বিবিধ উপকরণের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এই কারণে উপন্যাসটির উদ্দেশ্যমূলকতা শিল্পকে অনেকাংশে বিঘ্নিত করেছে। উপন্যাসটিতে রচনা-

সংহতির অভাব লক্ষ্য করি। উপন্যাসটি চিত্র ও বর্ণনাধর্মী। পরোক্ষভাবে উপন্যাসটিতে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি গভীর আস্থা পোষিত হতে দেখি।[৩৩]

বিধবা বিবাহের কল্যাণকর রূপটি লেখক এই উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। মনোরমা ও শরৎচন্দ্র লেখকের আদর্শের রং এ গড়া দুটি আদর্শ চরিত্র। দুখানি ছবির প্রেমমালাকে এই উপন্যাসে সংকীর্ণ পরিসরে খুঁজে পাওয়া গেলেও তার ভূমিকা পরোক্ষভাবে বিস্তৃত। তার আদর্শে বিশ্বাসিনী মনোরমার হৃদয়বত্তার পরিচয় এই উপন্যাসের অন্যতম বক্তব্য বিষয়। সীতানাথ ও সরমার কাহিনীটিকে উপকাহিনীরূপে চিত্রিত করার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও লেখক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপাদানরূপে কাহিনীটিকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। বসন্তকে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি অভিনব। বিবাহপূর্ব প্রেমপ্রসঙ্গ ও দাম্পত্য জীবনের চিত্র থাকা সত্ত্বেও লেখক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটিকে একটি স্নিগ্ধ সংযমের সুরে বেঁধে রেখেছেন। লেখকের আদর্শবাদী মনের স্পর্শ সমগ্র উপন্যাসটিতে ছড়ান।

চণ্ডীচরণের অপর উপন্যাস 'কমলকুমার'[৩৪] বিধবাবিবাহমূলক সামাজিক উপন্যাস। গ্রন্থটি রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষকে উৎসর্গীকৃত।

কমলকুমার ও সুন্দরীর মধ্যে প্রণয় হলে, সুন্দরীর মা কমলকুমারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেও কমলের পরিচয় না জানা থাকায় বিবাহ হল না। সুন্দরীর অন্যত্র বিবাহ হবার অব্যবহিত পরে সে বিধবা হল। কমলকুমারের সঙ্গে একটি শূদ্রনারী বিলাসিনীর প্রণয় হলে, সে অতীতের সব দুঃখ-বেদনা ভুলতে চাইল। তারপর কিছুদিন পরে, সে এক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। কমলকুমার ঘটনাচক্রে একটি জলমগ্ন মেয়েকে উদ্ধার করলে দেখা গেল সে সুন্দরী। শেষে সন্ন্যাসীর হস্তক্ষেপে এবং বিলাসিনীর চেষ্টায় কমলকুমারের সঙ্গে বিধবা সুন্দরীর বিবাহ হল।

উপন্যাসটির কাহিনী আকর্ষণীয়। কিন্তু, প্লট সংহতিহীন। কোন কোন ঘটনার অনাবশ্যক বিস্তৃতি ও অহেতুক বর্ণনা, মূল ঘটনার গতিপথে মাঝে মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রেমের চিত্র রচনায় লেখক সংযত মনের পরিচয় দিয়েছেন।

৩৩. শরৎ সীতানাথকে বলে 'ব্রাহ্ম হইতে পারিলে সুখী হইতাম—অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে তবে ব্রাহ্ম হওয়া যায়।' (পৃঃ ৪৪

৩৪. কমলকুমার, ১৩০৩।

সত্যচরণ মিত্র

সত্যচরণ মিত্র কয়েকটি গার্হস্থ্য ও সামাজিক উপন্যাস রচনা করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ উপন্যাসিকদের মধ্যে, সত্যচরণ বিষয়বস্তুর নির্বাচনে কিঞ্চিৎ মৌলিকতার পরিচয় দিলেও তার উপন্যাসে রক্ষণশীল মনের পরিচয় পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী লেখকরূপেই তাঁর পরিচয়।

সত্যচরণ মিত্রের প্রথম উপন্যাস 'অবলাবালা'[৩৫]-তে একটি কিশোরীর, স্বামীর সন্ধানে গৃহত্যাগ ও পরে স্বামীর সঙ্গে মিলনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই উপন্যাসটিতে লেখকের রক্ষণশীল মনের প্রতিফলন ঘটতে দেখি।

মহামারী আক্রান্ত একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের একমাত্র রক্ষাপ্রাপ্ত একটি বার বছরের বালিকা স্বামীর একটি ছবি হাতে নিয়ে তার অন্বেষণে গ্রাম ত্যাগ করে। মেয়েটির স্বামী কলকাতায় পড়াশুনা করে। তার প্রচেষ্টায় বার বার ব্যর্থ হয়ে এবং প্রতি মুহূর্তে বিপদে পদক্ষেপ করে শেষে সে কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চল ত্যাগ করে এবং রাণীগঞ্জের একটি পল্লীতে বসবাস শুরু করে।

রাণীগঞ্জে বাসকালে সে বাজার সাফ করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ করতে থাকে। তার জীবনের দুঃখের কাহিনী শুনে এবং তাকে দেখে সকলেই তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। একদিন সে তার স্বামীকে দেখতে পেল। স্বামীর সঙ্গে দেখল, একটি সুন্দরী যুবতী বিধবা মহিলা। মেয়েটি তার স্বামীকে চিনতে পারে কিন্তু তার কাছে নিজের পরিচয় দেয় না।

বিধবাটির পিতৃবিয়োগ হলে মেয়েটি কৌশলে স্বামীর নতুন গৃহে ঝিয়ের কাজ জোগাড় করে এবং এইভাবে স্বামীর সেবায় রত হয়। এই গৃহে বাস-কালে সে স্বামীর বিধবা স্ত্রীর চক্রান্ত থেকে স্বামীর জীবনরক্ষা করে। বিধবাটি ইতিমধ্যে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়। শেষে স্বামীর এক বন্ধুর মাধ্যমে উভয়ে পুনর্মিলিত হয়। দীর্ঘদিন পরে ভাগ্যপীড়িত মেয়েটি স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকার ফিরে পায়। উভয়ে কিছুকাল সুখে বাস করে। কিছুকাল পরে তার স্বামী তার প্রতি সন্দেহ পরবশ হলে মেয়েটি আত্মহত্যা করে জীবনযন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পায়।

৩৫. অবলাবালা, ১৮৮৭, পৃঃ ২৬০।

একটি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নারীর সতীত্বের প্রতি বিশ্বাস ও তারই প্রেরণায় হৃত স্বামী ফিরে পাওয়ার কাহিনী লেখক নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। স্বামীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস অপেক্ষা সতী নারীর মৃত্যুই শ্রেয় এই বিশ্বাসই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নায়িকার জীবন-পরিণতির মধ্য দিযে। বিধবা প্রণয ও বিবাহের নিষ্ঠাহীনতার প্রতি লেখক অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বিধবার প্রেম যে লালসা-সঞ্জাত এবং পরিবর্তনশীল, লেখক এই মত প্রতিফলিত করেছেন। নায়িকা চরিত্র লেখকের সহানুভূতির বর্ণে উজ্জ্বল। উপন্যাসটি সুখপাঠ্য।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যাযের 'হরিযে বিষাদ', শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'শক্তি কানন' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টে 'অবলাবালা' সর্বাধিক প্রশংসিত হয়েছে।[৩৬]

সত্যচরণ মিত্রের 'বড বৌ বা সুধাবৃক্ষ'[৩৭] একটি পারিবারিক উপন্যাস। শ্বশুর ও শাশুড়ী কর্তৃক নিগৃহীতা একটি নারীর, সন্ন্যাসী-স্বামীর অন্বেষণে গৃহত্যাগ ও পুনর্মিলনের কাহিনী বর্ণিত হযেছে এই উপন্যাসে।

হুগলী জেলার কোন এক গ্রামের জমিদার বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। 'নিজগ্রাম ও নিকটবর্তী বিশ-ত্রিশখানা গ্রাম তাঁর হুকুমে চলিত।' বিশ্বনাথের দুই পুত্র সুরেন্দ্রচন্দ্র ও অবিনাশচন্দ্র। সুরেন্দ্র এম. এ. পাশ আদর্শবাদী যুবক। মাতাপিতৃহীন সরলাসুন্দরীকে সুরেন্দ্র বিয়ে করে। সরলা শিক্ষিতা—'ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভালরূপ শিখিয়াছিল।'

সুরেন্দ্র কিছুকাল পরে ঈশ্বরলাভেচ্ছায সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করল। সরলাকে চিঠিতে জানাল যে, বিধাতার ইচ্ছায সে সন্ন্যাসী হয়েছে। সরলার ওষুধে পাগল হয়ে সুরেন্দ্র গৃহত্যাগ করেছে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শাশুড়ী সরলাকে তাড়াবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। সরলার বিশ্বাস স্বামীর সঙ্গে সে

৩৬. '...And the best of these is 'Abalabala' by Babu Satyacharan Mitra. The characters in this book are boldly and distinctly drawn and they are real...'
—ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট, ১৮৮৭।

৩৭. বড়বৌ বা সুধাবৃক্ষ (ধর্মোপন্যাস), দ্বি. সং. ১২৯৯ (১৮৯২), পৃঃ ১৩৯।

ঈশ্বর আরাধনা করতে পারবে। ভগবানের নাম স্মরণ করে এক বর্ষণমুখর রাত্রে সরলা গৃহত্যাগ করল। তারপর সরলার জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকল।

বিশ্বম্ভরের বাড়িতে সরলা আশ্রয় নিলে, বিশ্বম্ভরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুশ্চরিত্র গোকুলের দৃষ্টি পড়ল সরলার উপর। সাপে-কাটা সরলা বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সন্ন্যাসীর বেশে সুরেন্দ্র বিশ্বম্ভরকে একটি শিকড় দেয় সরলাকে শুঁকতে দেবার জন্যে। তার ফলে সরলার জ্ঞান সঞ্চয় হয়। কিন্তু সন্ন্যাসী চিনতে পারে না সরলাকে। গোকুলের কামোন্মত্ত আলিঙ্গনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সরলা পুকুরের জলে ঝাঁপ দিল। মৃত্যু নয়, স্বামীকে পাওয়াই তার কামনা। সরলা বেঁচে উঠল। এক দাসীর সাহায্যে গণেশসুন্দরীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটল। ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদিনী হল সরলা। সে গান গায়,—

অনন্তের অধিকারী।
অনন্তের বাস করি
অনন্তজ্ঞানের প্রার্থী,
অনন্ত প্রেম যে চাই।

সুরেন্দ্র কাশীতে এসে তন্ত্রসাধনায় দীক্ষিত হয়ে কালী প্রতিষ্ঠা করল। ক্রমে ৬।৭ জন শিষ্য জুটল। ঘটনাচক্রে সরলার সঙ্গে সুরেন্দ্রের দেখা হল। কিছুকাল পূব থেকেই সুরেন্দ্র গৃহ ও স্ত্রী সরলার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছিল। শেষে গৃহে ফিরল তারা। বিচারে সুরেন্দ্রের পিতামাতার চোদ্দ বছর মেয়াদ হল। ভাই অবিনাশের হল দ্বীপান্তর। ছোট বৌ বড়বৌ-এর কাছে রইল। গণেশ-সুন্দরীকে সরলা নিজের বাড়ি নিয়ে এল। গণেশসুন্দরীর স্বামী সুরেন্দ্রের বন্ধু হল।

সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরলাকে লেখক সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তার পদ অনুযায়ী গ্রন্থের নামকরণ। স্বামীর সঙ্গলাভের জন্য সর্বপ্রকার বিপদ ও দুঃখকে অগ্রাহ্য করে এবং লক্ষ্যে স্থির থেকে সরলা সতীত্বের গৌরব-দীপ্ত হয়েছে। আদর্শবাদী সুরেন্দ্রের ঈশ্বরলাভের জন্য সংসারত্যাগ এবং স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলনের পর সংসারে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা তার চরিত্রকে কিছুটা অস্বাভাবিকত্ব দান করেছে। ঘটনা সংযোজনার ক্ষেত্রেও আকস্মিকতার স্থান লক্ষ্য করি। সর্পদষ্ট সরলাকে সন্ন্যাসীবেশী সুরেন্দ্রের ঔষধদান এবং তাকে

চিনতে না পারার ঘটনা কষ্টকল্পিত। ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় প্রদর্শন করা লেখকের অন্যতম লক্ষ্য। ঘটনাবৈচিত্র্যে ও গল্পের প্রসাদগুণে কাহিনীটি স্বচ্ছন্দ-গতিসম্পন্ন।

সত্যচরণ মিত্রের 'সহমরণ'[৩৮] একটি স্বামী-পরিত্যক্তা ধর্মশীলা নারীর ধর্মনিষ্ঠা ও সতীত্ববোধের কাহিনী। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও ধর্মাচরণের প্রতি আস্থা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি এই উপন্যাসে পাই। উপন্যাসটি জনপ্রিয় হয়েছিল।[৩৯]

অম্বিকাচরণ গুপ্ত ঃ

অম্বিকাচরণ গুপ্ত উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন সামাজিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 'অনুসন্ধান' পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ঐতিহাসিক ও সামাজিক উভয় শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় অম্বিকাচরণের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

অম্বিকাচরণের 'সংসার চিত্র'[৪০] একটি জমিদার পরিবারের ষড়যন্ত্র ও বঞ্চনার কাহিনী। নন্দনপুরের জমিদার মোহিনীমোহন চৌধুরীর মৃত্যুর পর তার ভাই কিশোরীমোহন, মোহিনীর পুত্র সুধীর ও সরোজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। ভৃত্য গোপালের সহায়তায় তারা গৃহত্যাগ করে। কিশোরী জমিদারী হস্তগত করে। সুধীর বিনোদ নামে একজনের গৃহে পালিত হতে থাকে। সরোজা বিরাজমোহিনী নামে বর্ধমানের এক ব্রাহ্মণীর কাছে আশ্রয় পায়। চাকরী করার সময়ে মিথ্যা জালিয়াতির অভিযোগে সুধীরের একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বারুনীর স্নানকালে বর্ধমানের ব্রাহ্মণীর কলেরায় মৃত্যু হলে, বিরাজ তেজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজনের সঙ্গে কলকাতায় যায়। তারপর তেজচন্দ্রের পুত্র করুণার সঙ্গে প্রণয় হয় ও করুণার কর্মস্থল মজঃফরপুরে পলায়ন করে।

জেল থেকে মুক্ত হয়ে বিনোদ বিমলাচরণ নাম গ্রহণ করে, ব্যবসা শুরু করে। এবং ঘটনাচক্রে করুণার সঙ্গে তার আলাপ হয়। ভৃত্য গোপাল, দেওয়ান কৈলাসের সঙ্গে কলকাতায় সরোজাকে খুঁজতে এলে বিমলাচরণের সঙ্গে

৩৮. সহমরণ, ১৮৯২, পৃ. ১৬২ ; ভূ সং. ১৯০৩।

৩৯. অপর উপন্যাস, আকাশ গঙ্গা, ১৯০২।

৪০. সংসারচিত্র, নবন্যাস, ১২৯৭, পৃ. ১৫৬।

আলাপ হয়। ওদিকে কিশোরীকে প্রজারা হত্যা করতে চায়। বিরাজের সঙ্গে বিমলার সাক্ষাৎ হলে ভাইবোনের পুনর্মিলন ঘটে। বিমলাচরণের সঙ্গে হেমপ্রভার বিবাহ হবে স্থির হলে ওরা নন্দনপুর আসে। কিশোরী অপরাধ স্বীকার করে, জমিদারী সুধীরকে ফিরিয়ে দেয়।

লেখক কাহিনীর মধ্যে ঘটনা-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে গিয়ে গঠনশৈথিল্য এনেছেন। একটি জমিদার পরিবারের অভ্যন্তরীণ চিত্র দিতে গিয়ে, লেখক লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ঘটনাপুঞ্জে তরল রহস্যের জাল বিস্তার করে কাহিনীর গতির ক্ষেত্রে অসংলগ্ন ধাপ রচনা করেছেন। ঘটনা সংযোজনার ক্ষেত্রে গৃহীত কৌশল স্থূল এবং আকস্মিকতাপূর্ণ। তবে স্বল্প পরিসরেও কয়েকটি চরিত্র মানবিক বর্ণে উজ্জ্বল। গোপাল, কৈলাস, সন্ধ্যাবতী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। প্রাক-বিবাহ প্রণয়চর্চাকে লেখক স্বাভাবিকতা দান করেছেন (করুণা-বিরাজ এবং বিমলাচরণ-হেমপ্রভা)। একটি জমিদার পুত্রের ভাগ্য-বিপর্যয় ও বিপর্যয়ান্তে সম্পদশালী হবার কাহিনীতে লেখক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়েছেন।

'বুন্দেলাবালা'[৪১] অম্বিকাচরণের একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। বুন্দেলখণ্ডের দুটি রাজ্যের দ্বন্দ্ব ও শত্রুতার পটভূমিতে একরাজ্যের মৃত রাজার বীরাঙ্গনা কন্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী। জৈতপুরের রাজা মহীপতসিংহ, সুবর্ণগড়ের রাজা জয়মঙ্গল কর্তৃক বন্দী হন এবং মৃত্যুর পূর্বে কন্যা সরযূকে আজ্ঞা করেন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। মহীপতের স্ত্রী বিয়োগের পর ধাত্রী গাঙ্গিয়া সরযূকে পালন করে। জয়মঙ্গল তার পুত্রের সঙ্গে সরযূর বিবাহদানে ইচ্ছা প্রকাশ করলে সরযূ যুদ্ধে জয়মঙ্গল ও তার পুত্র অজিতসিংহের সম্মুখীন হন। সরযূ চন্দেলরাজের কাছে যুদ্ধে সাহায্য প্রার্থিনী হলে দুর্বল চন্দেলরাজ অজিতসিংহকে খবর দিলে, সরযূ পালায়। শেষে ক্ষুৎপিপাসাকাতর সরযূ এক যুবকের কুটীরে আশ্রয় পায়। এই যুবক চৌহান বংশের বংশধর সুধীরনারায়ণ সিংহ। গাঙ্গিয়া সুধীরনারায়ণের পার্বত্যরাজ্য আক্রান্ত হবে জানালে সরযূ পলায়ন করে। অজিতসিংহের সঙ্গে সরযূর দেখা হলে, অজিতসিংহ সরযূর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ রাখে, সরযূর হাতের ত্রিশূল-

৪১. বুন্দেলা বালা. ১৩০১, পৃ. ৭৮+১

দিয়ে আপন বক্ষ বিদ্ধ করে। সরয়ূ মৃত অজিতের পোশাক পরে জয়মঙ্গলকে হত্যা করে। পরে সুধীরনারায়ণের সঙ্গে তার বিবাহ হয়।

বুন্দেলাবালার কাহিনী একমুখী। সরয়ুকে কেন্দ্র করেই কাহিনীর আবর্তন। পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য সরয়ূর অশেষ ক্লেশ ও লাঞ্ছনাবরণ, তার সাহসিকতা ও বীরত্ব তার চরিত্রকে বীরাঙ্গনার মর্যাদা দান করেছে। ঘটনা সংস্থাপনে কুশলী মনের অভাব লক্ষ্য করা যায়। লেখক, ঘটনা বিশ্লেষণে অলৌকিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। সন্ন্যাসীর দ্বারা সরয়ূর সাহস পরীক্ষার দৃশ্যে এই চিত্র বর্তমান (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)। গাঙ্গিয়ার ভিখারিণীবেশে সংবাদ সংগ্রহের চিত্র রোমান্টিক কল্পনাজাত। অজিতসিংহের প্রণয়নিষ্ঠা এবং প্রণয়বঞ্চনাজনিত আত্মহত্যা তার প্রণয়কাতর মনটিকে অনাবৃত করে দেয়। তুলনায় সুধীরনারায়ণের চরিত্র ম্লান ও গভীরতাহীন। স্বল্প পরিসরে ভীলদের জীবনযাত্রার চিত্র উজ্জ্বল। বুন্দেলাবালা 'অনুসন্ধান'[৪২] এ সমালোচিত হয়।

'পুরাণ কাগজ বা নথীর নকল'[৪৩] আঙ্গিক বৈচিত্র্যসম্পন্ন রচনা। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'এরকমের উপন্যাস রচনা এই সর্বপ্রথম একথা বলিতে পারা যায়।' কয়েকটি দলিলপত্র, মোকদ্দমার আর্জি রিপোর্ট প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু পরিবেশিত হয়েছে। গঠন পরিকল্পনায় অসাধারণত্বের ছাপ অনস্বীকার্য। এই জাতীয় রচনারীতি অনেকটা পত্রোপন্যাস শ্রেণীর। বাংলায় প্রথম পত্রোপন্যাস নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসন্ত কুমারের পত্র' (১৮৮২) প্রকাশের প্রায় সতের বছর পরে এই উপন্যাসের প্রকাশ। এই জাতীয় রচনাকৌশল সাধারণত গল্পের ধারাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। লেখক নিজেও এবিষয়ে অবহিত। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'ইহা যেভাবে রচিত তাহাতে গল্প রচনার প্রধান অঙ্গ ঘটনাবৈচিত্র্য ও রক্ষা করা কঠিন। উপাখ্যান-বর্ণিত নায়ক নায়িকাদি ব্যক্তিগণের চরিত্র গঠন ও তাহার পূর্ণতা সাধন দূরের কথা।' (ভূমিকা)। লেখকের এই স্বীকৃতি সমালোচকের অনুকম্পা আদায় করতে সক্ষম হলেই রক্ষা, অন্যথায় কষ্টপাঠ্য এই উপন্যাসটি আখ্যান বস্তু পরিবেশনের ক্ষেত্রে নিতান্তই অক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

৪২. অনুসন্ধান, ৬ই পৌষ, ১৩০১, পৃ. ৮৫৫।

৪৩. পুরাণকাগজ বা নথীর নকল, ১৮০

পত্র, অর্পণনামা, একরারনামা, বন্দোবস্তনামা, ইয়াদদস্তের নকল, মোকর্দ্দমা নং, পলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেবের রিপোর্ট, না-দাবীপত্রসমেত প্রায় ৩৩টি বিষয়ের উপাদানে উপন্যাসের আখ্যান রচনার প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আঠারশ শতকের প্রথমদিককার পুরাণকাগজের দপ্তর, প্রয়োজন-বোধে খুঁজতে গিয়ে লেখক কয়েকটি অতিরিক্ত কাগজপত্র পান এবং কৌতূহল-বশত পড়তে আরম্ভ করেন। একখানি মোকদ্দমার নথি, সেই সংশ্লিষ্ট কতকগুলি দলিল দস্তাবেজ, অনেকগুলি চিঠিপত্র এবং কয়েকখানি চিরকুটকাগজ পড়ে, তিনি প্রচুর আনন্দ পান এবং অদ্যোপান্ত ভেবে দেখেন 'একটি অপূর্ব উপন্যাস।'

জনার্দনগড়ের রাজা ৺রত্নধ্বজসিংহ বীব নরেন্দ্র বাহাদুরের কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর সঙ্গে রাজা রত্নধ্বজের পুত্র বলে কথিক ময়ূরধ্বজের জনার্দনগড় রাজ্যের অধিকার সম্পর্কে বাংলা বিহার-উড়িষ্যার সদর দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমার উদ্দেশ্য ও পরিণাম দেখান হয়েছে এই উপন্যাসে। কৃষ্ণ-ভাবিনী পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারিণী বলে গভর্ণরজেনারেল কর্তৃক স্বীকৃতি পান।

কৃষ্ণভাবিনী, ময়রধ্বজ, অনঙ্গমোহিনী, দেবেন্দ্রবিজয়, বীরেন্দ্রসিংহ, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, স্বর্গপ্রতাপ প্রভৃতি বহুচরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। কৃষ্ণ-ভাবিনীকে গ্রন্থের শেষে স্বার্থত্যাগী ও দানশীলা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। অনঙ্গমোহিনীকে আজীবন রাজ্য ভোগদখলের অধিকার দান ও জনহিতকর বিভিন্ন দানের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণভাবিনীর চরিত্রে দুর্লভ মহত্ত্ব আরোপের প্রয়াস আছে।

এই উপন্যাসের কাহিনী প্রেমবর্জিত নয়। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর আশ্রমে বিজয়গড়ের রাজকুমারের সঙ্গে কৃষ্ণভাবিনীর পরিচয় এবং দীর্ঘকাল আশ্রমবাসের পরিণতি, শিক্ষালাভ ও উভয়ের মধ্যে প্রণয়। কিন্তু জ্যোতিষীর গণনায় উভয়ের শুভদর্শনে প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকায় উভয়ের মিলন সম্ভব হয় না। জ্যোতিষীর এই গণনার সঙ্গে উপন্যাসের মূলঘটনা ও পরিণতির কোন সম্পর্ক নেই। ঘটনা গ্রন্থনে বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষম অনুসৃতির প্রয়াস লক্ষ করার মত।

বিভিন্ন শ্রেণীর বহু পত্র, নথী প্রভৃতির সমাবেশে এই উপন্যাস কণ্টকিত এবং গতিপ্রবাহ স্তিমিত। তবুও অম্বিকাচরণের এই জাতীয় দুষ্কর শিল্পপ্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনীয়।[৪৪]

৪৪. অম্বিকাচরণ গুপ্তের অন্যান্য উপন্যাস: কপটসন্ন্যাসী ১৮৭৪; সংসার সঙ্গিনী ১৮৮৫, পৃ. ১৬৩; শান্তিরাম (১৮৮৫), পৃ. ১০৬, কৃষকসন্তান (১২৯৪)।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০—১৯০৮)

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পেশায় ডেপুটি ছিলেন, নেশায় সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মহাজনপদাবলীর উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি 'পদরত্নাবলী' (১৮৮৫) নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছিলেন। ঔপন্যাসিকরূপে শ্রীশচন্দ্র আলোচ্যকালে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ধর্ম সম্পর্কিত মোট চারখানি উপন্যাস তিনি রচনা করেন। (শক্তিকানন, ফুলজানি, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বনাথ এই চারখানি উপন্যাসের মধ্যে ফুলজানি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সমালোচিত হয়।) শ্রীশচন্দ্র বিভিন্ন মাসিকপত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেগুলির মধ্যে, মাসিক 'সমালোচনা, বালক, সাধনা, ভারতী, সাহিত্য, প্রদীপ, বঙ্গদর্শন, সমালোচনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রথম উপন্যাস, 'শক্তিকানন'[১] লেখক 'দেড়শত বৎসরের আগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর উপর নির্ভর' করে লিখেছেন। অর্থাৎ উপন্যাসের ঘটনাকাল আঠারশ শতকের প্রথমার্ধের বঙ্গদেশ। এই উপন্যাসে লেখক মূলত শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধের চিত্র অঙ্কন করে উভয়ের মধ্যে মীমাংসার সূত্র আবিষ্কার করেছেন। 'সত্যের বিভিন্ন পথ, কিন্তু সত্য এক। শক্তিধর্ম বৈষ্ণবধর্ম ধর্মের সোপান মাত্র—স্তরের উপর স্তর, প্রকারের ভেদ মাত্র, আসলে জিনিস এক' (পৃঃ ১৫৬)। রচনাটি ধর্ম সম্পর্কিত হলেও সে যুগের সামাজিকচিত্রের স্পর্শ-বিরহিত নয়। এই উপন্যাসের কাল পলাশি-যুদ্ধ-পূর্ব বঙ্গদেশ, 'আমরা পলাশী যুদ্ধের আগের কথা বলিতেছি। তখন বড় অরাজক—দেশের প্রায় সর্বত্র ডাকাইতের হাঙ্গামা। তবে এ অঞ্চলে ভয় কিছু কম কেননা রাজধানী মুরশীদাবাদ খুব কাছে। অন্যত্র যাহাই হউক, এখানে তখনও শাসন তেমন শিথিল হয় নাই। ··তখন সচরাচর গভীর রাত্রে পদ্মাগর্ভে অনেক যাত্রীর নৌকা মারা পড়িত। জলের ডাকাইত ধরা তত সহজ ব্যাপার ছিল না।' (পৃঃ ৩—৪)

১. **শক্তিকানন, ১৮৮৭, ১৮০৯ শক। মোট বিয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদ। পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত শেষে উপসংহার, পৃ. ১৯৯।**

লেখক উৎসর্গপত্রে 'ভাই রবি'*-কে সম্বোধন করে বলেছেন যে, 'তোমার ন্যায় আমিও বিশ্বাস করি বাঙ্গালার আসল যে মহত্ব তাহা খাঁটি বাঙ্গালিত্ব হইতে সম্ভবে। কিন্তু আসলের নামে নকলের প্রশ্রয় দেওয়া না হয। সেইজন্য আমি দেড়শত বৎসরের আগে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর উপর নির্ভর করিয়াছি'।

কাটোয়ার সন্নিকটে পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ আচার্যের বাড়ি। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মৃন্ময়ী, স্ত্রী হৈমবতী, পুত্র লোকনাথ, পালিতা কন্যা প্রভা এবং গৃহদেবতা গোপীনাথকে নিয়ে সংসার। ঘটনাচক্রে শক্তিকাননে মৃন্ময়ীর পলাতক দুশ্চরিত্র স্বামী, অধুনা তান্ত্রিক সন্ন্যাসী জগদীশের সঙ্গে জগন্নাথের সাতবছর পরে দেখা হলে, জগন্নাথ জগদীশকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। জগদীশ বলেন, তন্ত্রই ইহলোকের উপযোগী। জগন্নাথ জগদীশের কন্যা প্রভাকে পুত্রবধূ করার ইচ্ছা জানালে, সন্ন্যাসী আপত্তি জানিয়ে বললেন, যদি হয় সাতবছর পরে হবে। জগন্নাথ তাঁর ভক্ত হরিকে নিয়ে প্রবাস গেলে নাপিতবৌ প্রভাকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

জগদীশ ও তাঁর শিষ্য ভৈরব, পাহাড়িয়া সমাজে সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করলেন। তাদের সহায়তায় দস্যুদমন করার কালে দস্যুসর্দার উদ্ধব কাপালিক ধরা পড়লেও ভৈরব তাকে মুক্তি দিল। ঢাকায় প্রভু খবর পেয়ে, গৃহে ফেরার পথে স্বরূপগঞ্জের কাছে নৌকায় ডাকাতি হবার কালে মূর্ছাগত হলেন। প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বরূপগঞ্জে এলেন হরির খোঁজে। সেখানে মিথ্যা ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত মাঝিদের জবরদস্ত খাঁর নিগ্রহ থেকে রক্ষা করলেন। অনুতপ্ত জবরদস্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইল। আচার্য এক গভীর রাত্রে অশ্বত্থ গাছের নিচে হরিসংকীর্তনরত হরিকে দেখতে পেলেন। তারপর গুরু-শিষ্যে 'ভুজে ভুজে নিবিড় বন্ধনের পালা।' আচার্য কল্যাণপুরে ফিরে শুনলেন গোপীনাথের বিগ্রহ লুণ্ঠিত হবার কালে, বিগ্রহ রক্ষা করতে গিয়ে মৃন্ময়ী শয্যা নিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে মৃন্ময়ী শেষ অনুরোধ জানাল, প্রভাকে পাওয়া গেলে লোকনাথের সঙ্গে যেন তার বিয়ে দেওয়া হয়। জগন্নাথ আচার্য সপরিবারে বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। হরি ও তাঁর স্ত্রী সঙ্গ নিল।

সাতবছর পরে রাজমহলের শৈলশ্রেণীর একপারে নাপিত বৌ ও প্রভাকে

*রবীন্দ্রনাথ

দেখা গেল। প্রভা প্রায় যুবতী। নাপিত বৌ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাতপ্ত তার দাদা উদ্ধবের অভিপ্রায়, প্রভার সতীত্ব নাশ করে সিদ্ধিলাভ কর।।

গুরু, শিষ্য জগদীশকে জগন্নাথ আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিতে আদেশ করলেন। রাজমহলের শক্তিকাননে সন্ন্যাসিনী নাপিত বৌ প্রভাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। প্রভাকে দেখে ভৈরবের দুর্বলতা জেগেছে মনে। ভৈরব বৃন্দাবনে গিয়ে হরিকে জানাল প্রভার কথা। আচার্য হরির সঙ্গে রাজমহলের পথ ধরলেন। জগদীশ বৃন্দাবন ঘুরে অপেক্ষাকৃত সহজপথে জগন্নাথকে ধরল এবং জগন্নাথের কাছে মন্ত্র গ্রহণের অভিপ্রায় জানাল। এদিকে উদ্ধব প্রভাকে দাবি করলে সন্ন্যাসিনী, তরবারি দিয়ে প্রভার দেহ দ্বিখণ্ডিত করে পরে আত্মহত্যা করল। ভৈরব উদ্ধবের বুকে তরবারি বসাল এবং আত্মহত্যা করে গুরু-কন্যার প্রতি দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করল।

জগদীশ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হলেন।

লেখক আচারসর্বস্ব উৎকট তান্ত্রিকতার পতন এবং শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম বিরোধের মীমাংসিত সূত্ররূপে বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বব্যাপী শক্তি প্রদর্শন করেছেন। কাপালিক সন্ন্যাসী উদ্ধবের চরম তান্ত্রিকতা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাসী সন্ন্যাসী জগদীশ ও শিষ্য ভৈরবের দ্বারা। উপন্যাসের প্রথমাংশে চিত্রিত সুন্দর গ্রাম্য জীবনের পরিবেশে, জগন্নাথের শান্ত সংসার-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নরনারীর বিচিত্র জীবন-লীলার সঙ্গে উপন্যাসের শেষে পর পর কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের সামঞ্জস্যবিধান করা দুরূহ। উদ্ধবের মৃত্যু, পাপের শাস্তি। 'মানব শৃগালী' নাপিতবৌএর আত্মহত্যা তার পরিবর্তিত জীবনের বিবেকদংশনজনিত পরিণতি। ভৈরবের মৃত্যু গুরুত-কন্যার প্রতি লালসা পোষণের বিবেক-নির্দেশিত শাস্তি। সর্বোপরি লোকনাথের সঙ্গে প্রভার বিবাহ যখন প্রায় নিশ্চিত, এমন সময়ে প্রভার সতীত্ব রক্ষার জন্য নাপিতবৌ কর্তৃক অস্ত্রাঘাত ও তজ্জনিত তার মৃত্যু পাঠকের পীড়ার কারণ। রক্তবন্যার অন্তে বৈষ্ণব প্রেমবারি সিঞ্চনে উপন্যাসটিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে।

জগন্নাথ আচার্যের হরিভক্তি, কর্তব্যনিষ্ঠা, মৃন্ময়ীর কর্তৃত্ব ও স্নেহপ্রবণতা, হৈমবতীর ঔদার্য, হরির গুরুভক্তি, ভৈরবের কর্তব্যবোধ ও আত্মসচেতনতা জগদীশ শর্মার অনুশোচনার মধ্য দিয়ে চারিত্রিক পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি

পরিস্ফুটনে লেখক শৈল্পিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধবের সঙ্গে জগদীশের সাক্ষাৎকার নাটকীয়। ফাঁড়িদার জবদস্ত খাঁর মানসিক রূপান্তর ও আচার্যের শিষ্যত্ব নেবার অভিপ্রায়ের পশ্চাতে কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনি, দস্যু হরিশের ভক্ত-বৈষ্ণবে রূপান্তরের বিষয়টিও আকস্মিক। নাপিত বৌএর মানসিক পরিবর্তনেরও কোন ধাপ রচিত হয়নি। চারিত্রিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লেখক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা নিজের ইচ্ছাবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হরি এই উপন্যাসে হাস্যরসের আধার। পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রের মানসিক সঙ্গতি রচনায় লেখক কৃতকার্য হয়েছেন। প্রাকৃতিক চিত্র রচনাও পরিবেশ পরিস্ফুটনে লেখকের দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট।

'ভারতী ও বালক'এ[২] প্রকাশিত শক্তিকাননএর সমালোচনা উল্লেখযোগ্য।

'বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ন্যায়, বাঙ্গলার মনের দৃশ্যও সাধারণতঃ লেখক বেশ আঁকিয়াছেন কেবল নাপিত বৌএর স্বভাবটি লেখক ভাল ফুটাইতে পারেন নাই। সে আগে নিতান্ত মন্দ লোক ছিল—সহসা একেবারে ভাল হইয়া গেল। নিপুণ চরিত্র চিত্রকর মনুষ্যস্বভাবের এই এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত সূক্ষ্মবর্ণের আভা ফলাইয়া এই পরিবর্তনটি এত স্বাভাবিক করিয়া আনেন যে দর্শক যে সে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হয় কিন্তু আশ্চর্য হয় না। নাপিত বৌএর স্বভাবের পরিবর্তনটিতে এই স্বাভাবিক ভাবের অভাব। উপন্যাসের প্রথম দিকের গামা ভাবের গামা ঘটনার সহিত শেষাশেষির খুনাখুনি রক্তস্রোত ব্যাপার আদপেই মিশ খায় না। লেখক যেরূপ শান্তিময় সাধারণ বঙ্গের ছবি আঁকিতে পারস্ত করিয়াছেন শেষের ঐরূপ অসাধারণ ঘটনাতে তাহার সে সরলশ্রী যেন কতকটা নষ্ট করিয়াছে, বাঙ্গালী মেয়ের উপর যেন গাউন চপিয়াছে। লেখক শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যে একতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছেন তাহাও বেশ স্বাভাবিকভাবে আনিয়া ফেলিতে পারেন নাই। নদীর মত সরলভাবে উপন্যাসের [illegible] আপনা আপনি স্বাভাবিক পথে যাইবে, জোর করিয়া এরূপ কোন উদ্দেশ্য বা মতের দিকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার সম্মুখে যদি ঘটনা বা তর্কের বাধ দেওয়া হয় তবে উপন্যাসের সৌন্দর্য হানি হয়। ইহা সত্ত্বেও শক্তিকানন একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস—ইহার ভাষা চমৎকার, বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী চরিত্র ও সাধারণতঃ প্রস্ফুট।'

২. ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৪, পৃষ্ঠা ৩৫৯—৩৬১।

'কল্পনা'[৩]য় ও শক্তিকানন সমালোচিত হয়।...'এই উপন্যাসচ্ছলে গ্রন্থকার প্রধানতঃ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম বিরোধীধর্ম নহে, তাহারা একই ধর্ম।...লেখকও পুস্তকে কেবল গল্পই লিখিয়া যান নাই, তাঁহার নিজের জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।...আমরা এত মিষ্ট ভাষায় উপন্যাস আর কখন পড়ি নাই। স্থানে স্থানে বর্ণনাগুলি অতি সুন্দর; এত সুন্দর যে তাহা পড়িতে পড়িতে আমরা মুহূর্তের জন্য আমাদের আশপাশ সব ভুলিয়া কেবল তাহাই প্রত্যক্ষ করিতে থাকি। লেখকের ইহা সাধারণ ক্ষমতা নহে।' আলোচ্যকালে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মসম্পর্কিত কয়েকটি উপন্যাস রচিত হতে দেখা যায়।[৪]

শ্রীশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'ফুলজানি'[৫]র উপর ইতিহাসের কিঞ্চিৎ ধারা বর্ষণে ঐতিহাসিক বর্ণ দেবার চেষ্টা আছে। ষষ্ঠ খণ্ডের শুরুতে লেখক উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রচ্ছদপট চিত্রিত করেছেন এবং প্রসঙ্গত এই উপন্যাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র-পরিচয় দিয়েছেন। 'আমরা সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রের কলঙ্ক কালিমা মুছিবার চেষ্টা করিতেছি না। আমাদের কথা এই যে ঘনকৃষ্ণ বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দি এবং সিরাজের নরাধম অনুচরবর্গ তাহার প্রধান কারণ'। সিরাজের ন্যায় সর্বগ্রাসী ইন্দ্রিয়পরায়ণতা নবাব মণ্ডলে বেশী শুনা যায় না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ সিরাজের লালসার অগ্নিবৃন্তে ফুলজানিকে সমর্পণ করে, লেখক তাকে সতীত্বের পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন এবং স্বামী পুরন্দর প্রদত্ত বিষ গ্রহণে আত্মহত্যার ভিত্তিতে সতীত্বের পরীক্ষায় ফুলজানিকে জয়ী করেছেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার প্রসঙ্গটি প্রায় আকস্মিকতার পর্যায়ে উঠেছে। পুরন্দর ও ফুলকুমারীর পিতামাতার মধ্যে বিরোধ, নায়ক-নায়িকার বিবাহিত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, মিলন-বিচ্ছেদের দ্বন্দ্বদোলায়

৩. পঞ্চম বৎসর, আশ্বিন ১২৯১—ভাদ্র ১২৯২, পৃ. ১৯৮—২০০।

৪. (ক) কেদারনাথ দত্ত, প্রেম প্রদীপ, ১৮৮৫। বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কিত।

(খ) যাদবচন্দ্র রায়, পটলদাস মহাপ্রভুর লীলা সম্বর্দ্ধন, ১৮৯২। বৈষ্ণব ধর্মকে ব্যঙ্গ করে লেখা।

(গ) সুরদাস, মাতাজী আশ্রম, ১৮৮৮। বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কিত। লেখক অন্ধ ছিলেন।

(ঘ) অধর চন্দ্র দাস, ত্রিবেণী, ১৯০০। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের পটভূমিতে লেখা।

৫. ফুলজানি, ১৩০০ সাল, ইং ১৮৯৪ খৃঃ, পৃ. ১৬৬ (মোট ৭টি খণ্ড, সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ, শেষে পরিশিষ্ট)।

তাদের দোলায়িত করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উভয়ের দাম্পত্য জীবনের মূল বিশ্বাস আহত হয়নি। ফুলজানির মৃত পিতার দৈববাণীসম আশঙ্কা-উক্তি এবিয়ে সুখের হবে না এবং মাঝে মাঝে ফুলজানি কর্তৃক এই উক্তি শ্রুত হবার ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক হয়ত বা পাঠককে ফুলজানির ভবিষ্যৎ পরিণতির আভাস দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই অলৌকিক রীতি কার্যসাধনে সক্ষম হয়নি। বরং তাঁর শৈল্পিক অক্ষমতাই প্রকাশ করেছে।

'হরিশপুরের বোসেদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালার গুরুমশায় রামধন ভটাচার্যের ছাত্র পুরন্দরের বিবাহ উপলক্ষে গুরু একটা ভালো সিদে দিতে বল্লেন। ফুলকুমারী যেন শুনতে পায়, পিতা বলছেন, 'শাপ আছে, এবিয়ে সুখের হবে না।' ফুলের সখী কালীর ব্যবস্থানুযায়ী তালপুকুরে পুরন্দরের সঙ্গে ফুলকুমারীর দৃষ্টি বিনিমিত হল। পুরন্দর সেই নয়নে দেখল করুণা।

ফুলের বিধবা মা নিস্তারিণী স্বামীর কাষ্ঠপাদুকা পূজা করতেন। পুরন্দরের পিতা নায়েব মহেশ্বর ঘোষ 'পোসামুদে কিপ্পন মিনসে।' পুত্রের বিবাহেরই আনুষঙ্গিক খরচের বোঝা চাপায় নিস্তারিণীর উপর। শুভদৃষ্টির কালে ফুলের 'হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কেননা, সেই সরোবর তীরে মুমূর্ষাবস্থায় মৃত পিতার যে কণ্ঠ সেদিন শুনিয়াছিল, এমুহূর্তে যেন আবার তাহাই শুনিল। বিয়ের অল্প কিছুদিন পরে নায়েবের অন্যায় দাবিকে উপেক্ষা করায় নিস্তারিণীর সঙ্গে তার কলহ হল। তিনি মেয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠালেন না। পুরন্দর অত্যন্ত লজ্জা পেল। নায়েব পুরন্দরকে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাবার পরে কালীর চেষ্টায় ফুলএর সঙ্গে পুরন্দরের দেখা হল।

নিসিন্দা পরগনার কাছারী বিলাসপুরে ঘোষমশায় পুত্র পুরন্দরের ফারসী ও সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা করলেন। দুঃখীরামের কাছে পুরন্দরের পাগল হয়ে যাবার খবর শুনে জগদ্ধাত্রী স্বামী ও পুত্র সন্দর্শনে চললেন। কালী ফুলকে এই খবর দিলে ফুল যেন পিতার সেই গম্ভীর স্বর শুনল, 'এ বিয়ে সুখের হবে না।'

গৃহে ফেরার পথে নায়েবমশায় ডাকাতের আক্রমণে আহত হলেন। দইয়েহাটার বাজারে পুরন্দর মায়ের নৌকার সাক্ষাৎ পেল। মৃত্যুর পূর্বে ঘোষমশায় পুত্রকে বললেন, 'একমাত্র সুহৃদধর্ম একথা কখন ভুলো না।' জগদ্ধাত্রী সহমৃতা হলেন। জরাক্রান্ত হয়ে পুরন্দর নবদ্বীপে থাকাকালে নিস্তারিণী ফুলকুমারী ও মোক্ষদা এসে পৌঁছুল। ক্রমে সে আরোগ্যলাভ করল।

ফুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমশ প্রেমমধুর হয়ে উঠল। গৃহে ফিরে পুরন্দর বিষয়কর্মে শান্তি স্থাপন করল। নিস্তারিণী তীর্থযাত্রার পূর্বে স্বামীর সঞ্চিত ধনরত্ন পুরন্দর ও ফুলকে দিয়ে গেলেন।

বড়বাবুর চিঠিতে পিতার তহবিল তছরুপের কথা জেনে ফুলের নিষেধ সত্ত্বেও পুরন্দর পরগণায় চলে গেল। এই অবকাশে নবাবের কর্মচারী বজকুল, করীম ও দুঃখীরামের চক্রান্তে, চুড়িওয়ালী মতিবিবির কৌশলে ময়ূরপঙ্খী নৌকা দেখতে গিয়ে কালী ও ফুল নৌকায় বন্দী হল। কালী ফুলের ধর্ম রক্ষার প্রার্থনা জানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গায়। ফুল স্বামীর দর্শনমানসে রয়ে গেল নৌকায়। হতচেতন ফুলকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে নৌকা ভিড়ল। পুরন্দর স্বপ্ন দেখল, ফুল বলছে, তাকে দেখবার আশায় সে মরতে পারেনি।

যবন অন্তঃপুরে ফুল উপবাসে ক্ষীণ। দুঃখীরামকে নিয়ে পুরন্দর মুর্শিদাবাদে এল। অন্তঃপুরের হিন্দু দাসী হামেশার সঙ্গে দুঃখীরামের পরামর্শ অনুযায়ী, কার্তিকী পূর্ণিমার চতুর্দ্দশী রজনীতে একটি ঘনকৃষ্ণ বৃক্ষছায়াতলে পুরন্দরের সঙ্গে ফুলের সাক্ষাৎকালে, গুরগণ খাঁ তাদের ধরে ফেলল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পুরন্দরকে প্রাণদণ্ড দিলেন। মৃত্যুর পূর্বে পুরন্দর নবাবকে চোর বলে অভিযুক্ত করে গেল। স্বামীর দেওয়া বিষ গ্রহণে ফুল পুরন্দরের পদতলে লুটিয়ে পড়ল। সিরাজের চোখে জল এল। সিরাজ হিন্দুমতে এদের সৎকার করে চিতাভস্মের উপর এক সুরম্য উৎস নির্মাণ করে নিচে একটি ফারসী কবিতা খোদিত করলেন। তার মর্ম এইরূপ

'ফুলের এত ভালবাসা আগে যদি জানিতাম।
তাহলে কি তারে কভু বৃন্তচ্যুত করিতাম॥'

উপন্যাসটির ভাষায় বর্ণনায় ও ঘটনাসংস্থাপনায় লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সিরাজউদ্দৌলাকে মূলঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে লেখক কেবল ঐতিহাসিক বর্ণ দেবার চেষ্টা করেননি পরন্তু সিরাজ চরিত্রের নীচতা ও ঔদার্য পাশাপাশি চিত্রিত করেছেন। আঠারশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বঙ্গদেশের চিত্রটিও লেখক পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে তৎপর হয়েছেন। লেখকের পরিবেশ সচেতনতা শিল্পীজনোচিত। নায়েবের নির্দেশে প্রজাপীড়ন, জলদস্যুর উপদ্রব, সহমরণ প্রথা এবং নবাবী রাজত্বের বিশৃঙ্খলার চিত্র উপন্যাসের ঘটনাকালের পটভূমি রচনায় সহায়তা করেছে।

তৎকালীন জমিদারের দরবার গৃহের বর্ণনায় লেখক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

'দরবারগৃহে তাকিয়া-বেষ্টিত উচ্চ মসনদে জমিদার রামলোচন রায় ওরফে কনকপুরের বড়বাবু বসিয়াছেন। কুণ্ডলীকৃত আলবোলা, স্বর্ণমণ্ডিত শুণ্ঠাগ্র দাড়াইয়া আছে—তাহার সাগ্নিক শিরোদেশ হইতে স্নিগ্ধ কোমল সুরভি ধূম উদ্গীর্ণ হইতেছে। আমলাগণ নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া আছেন। রাইয়তেরা ভিতরে বাহিরে যেখানে স্থান পাইয়াছে, কেহ কৌতূহল নিবারণের জন্য কেহবা নিজের কাজের অনুরোধে ভিড় করিয়া দাড়াইয়া আছে। বাবুর উন্নত আসনের ঠিক নীচে, তাঁহারই মত অর্দ্ধবিকশিত নেত্রে মোসাহেবের দল বসিয়াছে, কাছে কাছে নর্তকীগণ ও অনতিদূরে তৈলোজ্জ্বল ললাট শিখাধারী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের দল।'

আঠারশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বঙ্গদেশের পটভূমিতে লেখক একটি সামাজিক কাহিনীর সঙ্গে ঐতিহাসিক চরিত্রের সংযুক্তি ঘটিয়ে উপন্যাসে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছেন। কিন্তু তা উপন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ফুলকুমারীর ভাগ্যের পরিণাম-আভাস দিতে গিয়ে লেখক যে অলৌকিক পন্থা অবলম্বন করেছেন সেটি বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। পুরন্দরের স্বপ্নপ্রসঙ্গ কষ্টকল্পিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনস্তাত্ত্বিক কারণজাত নয়। চরিত্রের পরিবর্তনসাধনে লেখক কোনও মনস্তাত্ত্বিক স্তর রচনা করেননি। নায়েবের চরিত্রের আকস্মিক পরিবর্তন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

এই উপন্যাসে লেখক চরিত্র-চিত্রণে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের নায়িকা ফুলকুমারীর চরিত্রটি স্নিগ্ধ মধুর। সততা, লজ্জাশীলতা, কর্তব্যবোধ ও স্বামীর প্রতি আনুগত্য তার চরিত্রকে বৈশিষ্ট্যদান করেছে। তার প্রণয়ভীরু মনটি লেখকের লেখনীতে উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে। ফুলের বয়স অনুপাতে তার বিবাহ চেতনা অকালপক্ক মনের পরিচয়। তার সখী কালী নিঃসংকোচে বিবস্ত্র হয়ে তালপুকুরের জলে সাঁতার কাটে। এটা হয়ত তার শিশুসুলভ চপলতা! ফুলকে কালীর সমবয়সী গণ্য করলে উপরের উক্তির যৌক্তিকতা পাওয়া যায়। ফুলজানির সতীত্ববোধ এবং স্বামীর প্রতি আনুগত্যের চরম উদাহরণ বিষপানে আত্মহত্যা। পুরন্দরের চরিত্রের সাময়িক দ্বন্দ্ব অনায়াসেই পিতার আজ্ঞানুসারী হয়ে নিবৃত্তির পথ খুঁজতে চেয়েছে। কিন্তু হৃদয়ের

আকর্ষণবোধকে, কর্তব্যবোধ আবৃত করায় তার মনে যে বেদনার তরঙ্গ উঠেছে, লেখক তাকে সহানুভূতির বর্ণক্ষেপে অনায়াসেই হৃদয়বেদ্য করে তুলেছেন। পিতার আজ্ঞানুবর্তী পুরন্দরের অসহায়কাতর মনটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। পিতার জীবিতাবস্থায় পিতার আদেশবাহী হয়ে যে কর্তব্যপ্রেরণা তাকে স্ত্রীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবোধ থেকে বঞ্চিত করেছিল, পিতার জীবনান্তে সেই কর্তব্যপ্রেরণাই স্ত্রীর অনুনয় ও আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে পিতৃঋণ শোধে গৃহত্যাগী করার কালে, তার জীবনে চরম সঙ্কটের অশনিপাত ঘটিয়েছে। তার সাময়িক অনুপস্থিতিকালে তার স্ত্রী হৃত হয়ে মুর্শিদাবাদে নবাব হারেমে প্রেরিত হয়েছে, এবং তাকে উদ্ধারকালে সিরাজের আদেশানুসারে সে চরম দণ্ড মাথায় পেতে নিয়েছে। পুরন্দর সত্যনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র। জমিদারের দরবার থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর [illegible] আশার বেদনা ও বিবেক যন্ত্রণার বিবরটি নবাবের হারেম থেকে গৃহে প্রত্যানয়নের পরে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকে হারাবার শঙ্কা [illegible] আশঙ্কাও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য সচেতনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। [illegible] পিতা মহেশ্বর ঘোষ দাতা ও ধ্রুব প্রকৃতির। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব থেকে তার চরিত্রের যে পরিবর্তন লক্ষিত হয় তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। [illegible] মা নিরাবিল ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী। মৃত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা সন্তানের প্রতি আনুগত্য এবং চরিত্রের দৃঢ়তা তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। সিরাজের পরস্ত্রী-লোলুপতার পাশে পুরন্দর ও [illegible] হিন্দুমতে সংস্কার ও চি[illegible] উপর সরমা [illegible] বশিতা প্রতিপাদিত করার মধ্য দিয়ে তার মধ্যে [illegible] মানসিকতার [illegible] চরিত্রের বিপরীতধর্মিতার পরিচায়ক।

ক্যালকাটা রিভিউ[৬] পত্রিকায় [illegible] বিস্তৃতভাবে সমালোচিত হয়েছিল। সেখানে সমালোচক বলেছেন, ফুলজানির গল্প মনে হয় ঐতিহাসিক নয়। এবং এটি একটি খুব পুরানো গল্প। বটতলার বিক্রেতারা গত পঞ্চাশ বছর ধরে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমানের (Muhammadan Grandee) অন্দর মহলের জন্য একটি সুন্দরী হিন্দু বালিকার অপহরণ কাহিনীর বিষয় নিয়ে ঐনামে একটি নিকৃষ্ট পদ্যে লেখা বই বিক্রি করছে। সেই গল্পকে ভিত্তি করেই বাবু শ্রীশচন্দ্র উচ্চ-নীচ, হিন্দু মুসলমান, প্রভু-ভৃত্য, শিক্ষক-ছাত্র, জমিদার

৬ Calcutta Review, No. CXCVIII—1894.

ও প্রজার অজস্র চরিত্র রচনা করেছেন। বাবু শ্রীশচন্দ্র, তৎকালীন হিন্দু সমাজের নরনারীর অবিকল চরিত্র সৃষ্টিতে পারগতা দেখিয়েছেন।...তিনি বাবু বঙ্কিম চন্দ্রের পাদমূলে বসেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং একদা বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন তাঁর হাতেই সঁপে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন।..আমরা আগ্রহের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক জীবন প্রত্যক্ষ করব এবং বাংলার অন্যতম বাস্তববাদী লেখক সঞ্জীবচন্দ্র অথবা তারকনাথ গাঙ্গুলীর স্থান গ্রহণ করবার আশা পোষণ করব*।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে ফুলজানির বিস্তৃত সমালোচনা করেছেন। গ্রন্থের শেষে সহসা অপহৃতা ফুলের সিরাজদৌলার অন্তঃপুরে প্রবেশ ও উদ্ধারকর্তা পুরন্দর ও ফুলের ঘাতক হস্তে মৃত্যুর কাহিনীর সঙ্গে গল্পের মূলধারার সংযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। 'প্রথম হইতে এমন কী সকল অনিবার্য কারণ একত্র হইয়াছিল যাহাতে গ্রন্থের এই বিচিত্র পরিণাম অবশ্য সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল'। ফুলকুমারীর চরিত্রের সঙ্গে সংযোগহীন এই কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ সরল সুন্দর সমগ্র কাব্যটির বিধ্বংসী বজ্ররূপে অভিহিত করেছেন। সিরাজ কর্তৃক ফুলজানি হরণের বিষয়টির পূর্বসূত্র পাই তারকনাথ বিশ্বাসের 'সুহাসিনী' (১২৮৯) উপন্যাসে। এই উপন্যাসে সিরাজ কর্তৃক সুহাসিনীহরণ, ফুলজানিহরণের পূর্বসূত্রবিশেষ।

শ্রীশচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস 'কৃতজ্ঞতা'[১]র বিষয়বস্তুর মূলে আছে বরেন্দ্রভূমের [illegible] গ্রামের জমিদার মৈত্রবংশের দুই তরফের বৈষয়িক বিবাদ এবং তারই পটভূমিতে মৃত প্রথমনাথের কন্যা সুরবালার প্রতি বরকন্দাজ অকালী সিংহের কর্তব্য ও প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতার কাহিনী। এই উপন্যাসের ঘটনাকাল 'নীলদর্পণ' প্রকাশের সময়। 'এই সময়ে নীলদর্পণ বাহির হওয়ায় দেশে একটা হৈচৈ পড়িয়াছিল' (ত্রয়স্ত্রিংশ, পৃ. ১০২)। নীলবিদ্রোহের সঙ্গে এই উপন্যাসের ঈষৎ সম্পর্ক রচনা করেছেন লেখক অমিতনাথের মাধ্যমে। উপন্যাসটি একটি সুখপাঠ্য পারিবারিক উপন্যাস। রবিনাথ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও চার বৎসরের পুত্র রেখে যখন মারা যান, তখন মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। প্রিভি কাউন্সিলে

*অনুবাদ লেখকের।

৭. ১৩০২ সাল, ইং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ, পৃ. ১১৯। মোট অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ। সুরুতে একটি শুদ্ধিপত্র আছে।

† বইএর অন্যান্য অংশে কুণ্ডলা বলে উল্লেখ করা আছে।

বড তরফের জয় হলে ছোট তরফ প্রমথনাথ ভগ্নহৃদয়ে মারা যান। কন্যা সুরবালা তখন বারো বছরের। ইতিপূর্বে সুরোর বাগদত্ত পাত্রের মৃত্যু হয়েছে। সামাজিক আইনে বিয়ে না হলেও সে বিধবা হল। প্রমথনাথের জমাদার অকালী সিং সুরোর রক্ষণাবেক্ষণে মন দিল। আর ভগীদাসী সুরোকে দেখাশোনার ভার নিল। কালেক্টর ডোনালড এলেন তদন্তে। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্-এর ব্যবস্থানুযায়ী ভাই দীনেন্দ্র ও সুরো মানুষ হতে লাগল। সাহেব সুরোকে শিক্ষিতা করে সৎপাত্রে বিবাহ দেবার আশায় মিস ভার্জিনিয়াকে নিযুক্ত করলেন। দীনেন্দ্র নাবালক বয়সেই বন্ধু চারুর সংসর্গে মদ ও বেশ্যাসক্ত হয়ে উঠল। তার স্ত্রীকেও ভার্জিনিয়া পড়াতে লাগল। অকালী সিংকে ডোনালড সাহেব পাঁচবছরের জন্য বিদায় দিলেন।

ডোনালড সাহেব অসিতনাথের সঙ্গে দীনেন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সুরোর সঙ্গে তার বিয়ের চেষ্টা করতে জানালেন। কুসুমের সহায়তায় অসিতের সঙ্গে সুরোর পরিচয় হল। সুরো অসিতের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় করল। কুসুম বিয়ের প্রস্তাব করতে, সুরো বড তরফের বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। মনের সঙ্গে যুঝতে না পেরে সে বিধবার বেশ ধারণ করল। মিসেস ডোনালডের অনুরোধে সে বেশ পরিবর্তন করে বিবাহে সম্মতি দিল। কিন্তু বিবাহের প্রস্তুতি পর্বে জীর্ণ অকালী সিংএর আগমনে তার মত পরিবর্তিত হল। জানাল, বিয়ে করবে না। অসিত কলকাতা চলে যাবার পর অকালী মারা গেল। সুরো বিধবা রইল।

এই উপন্যাসে দুটি বিপরীতধর্মী আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেছে দুজন। ডোনালড ও অকালী সিং। অন্যপূর্বা সুরবালা মৃত পিতার ধারণানুযায়ী নিজেকে বিধবাজ্ঞান করত। ডোনালড এই কিশোরীর ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে, তাকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে, তার বিবাহের পথ নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রভুভক্ত অকালী সিং প্রভুর ইচ্ছাকে ফলবতী করবার জন্য ডোনালডের বিরোধিতা করল। এবং সে জয়ী হল।

এই উপন্যাসের চারটি চরিত্র অবাঙ্গালী। তার মধ্যে ডোনালড ও অকালী উপন্যাসের প্রায় সারাটি অংশ জুড়ে আছেন। অকালী সিংএর সাময়িক অনুপস্থিতি পরোক্ষভাবে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেছে। এই ভোজপুরী মানুষটির কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, সত্যবাদিতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের

সুখদুঃখ মথিত স্বাক্ষর বহন করছে এই উপন্যাস। সুরবালার জীবনের এক দ্বন্দ্বক্ষত সংকটকালে অকালী সিংএর আবির্ভাব তাকে যন্ত্রণামুক্ত করে আদর্শের ধ্রুবপথ প্রদর্শন করল। তার অন্তিম প্রার্থনা, প্রভুর বংশে সুরবালাদিদি যেন কালি না দেয়। ডোনালড চরিত্রটি উপন্যাসের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রসারিত। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও সহানুভূতিশীলতা তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সুরবালার অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনে লেখক কৃতকার্য হয়েছেন। দেশাচারের বিধানের সঙ্গে প্রেম-তৃষিত হৃদয়ের দ্বন্দ্বে প্রথম বিষয়টি জয়ী হয়েছে। বৈধব্যের আচারের মরুবালুরাশিতে, হৃদয়জাত প্রেমধারা সমর্পিত হয়ে সত্তা হারিয়ে ফেলে, দেহের বন্ধনে প্রেম-তৃষিত মনের আর্তনাদ দেশাচারের বিধানে কিভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়, তার হৃদয়স্পর্শী আলেখ্য সুরবালা।

বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, ঘটনাসংযোজনা ও কাহিনী-গ্রন্থণে এই উপন্যাসে লেখকের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বর্তমান। ভাষা অনবদ্য। অবান্তর প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। রচনা-সংহতি লক্ষণীয়। কোন কোন স্থলে ইঙ্গিত বা সংকেতে একটি বিষয় পরিস্ফুট করার চেষ্টা আছে (যেমন, চারুর অধঃপতনের বিষয় পৃঃ ৬১)। 'কৃতজ্ঞতা' শ্রীশচন্দ্রের অনুশীলিত মনের পরিণত রচনা।

শ্রীশচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস 'বিশ্বনাথ'[৮] আগাগোড়া বিশে ডাকাতের কথায় পূর্ণ। বিশ্বনাথ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। গ্রন্থকারের নিবেদন অংশে লেখক এই উপন্যাস রচনার পূর্বকাহিনী বিবৃত করেছেন।

'খৃঃ ১৮৮৫ অব্দের শরৎকালে প্রথম রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া আমি নদীয়া জেলায় প্রেরিত হই। সেই সময়ে বিশ্বনাথের সংবাদ কিছু সংগ্রহ করিয়া-ছিলাম। 'বালক' নামে মাসিকপত্রে নদীয়া ভ্রমণ সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহাতে বিশ্বনাথের কথা ছিল। কিন্তু সে সামান্য মাত্র।'

'সাহিত্যে'[৯] এই উপন্যাস 'প্রতিশোধ' নামে ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গল্পাংশ স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন করে লেখক 'বিশ্বনাথ' নামে প্রকাশ করেন।

শ্রীশচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের পটভূমি অদূর অতীত। কল্পনা-শক্তির বলিষ্ঠতায় লেখক অতীতকে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করতে পেরেছেন। ভাষার

৮. প্রথম সংস্করণ ১৩০৩, ইং ১৮৯৬ খ্রীঃ।
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১২।
৯. ১৩০১—১৩০২ সাল।

মাধুর্য শ্রীশচন্দ্রের রচনার একটি প্রধান গুণ। চরিত্র-চিত্রণে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় বর্তমান। কিন্তু চরিত্রের পরিবর্তন সাধনে কোন মনস্তাত্ত্বিক স্তর পাওয়া যায় না। বর্ণনাশক্তির অনুপম স্বাক্ষর তাঁর উপন্যাসগুলির সম্পদ বিশেষ। নারীর সতীত্ববোধ ও সমাজনির্দেশিত প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধকে শ্রীশচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন। এদিক বিচারে তাঁর মানসিকতা বঙ্কিমচন্দ্রের সগোত্রীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে ঔপন্যাসিকরূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব স্মরণীয় ঘটনা। বঙ্কিম-উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথই উপন্যাস সাহিত্যে যুগান্তর এনেছেন। অবশ্য সে বিষয়ে আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে ঐতিহাসিকউপন্যাস রচনাকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' 'ভারতী' (১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১২৮৪) তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। করুণা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এর পরে রবীন্দ্রনাথ পর পর দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন, 'বউঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম এই দুটি উপন্যাসই সবশেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'বউঠাকুরাণীর হাট' রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনা করেছেন। কাজেই খুব স্বাভাবিকভাবেই সন্ধ্যাসঙ্গীত পর্বের মানসিকতাকে বউঠাকুরাণীর হাটে প্রতিফলিত হতে দেখি।

'বউঠাকুরাণীর হাট'[১] প্রকাশের পূর্বকাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাস প্রকাশিত। এগুলির মধ্যে 'রাজসিংহ'ই বঙ্কিমরচিত যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। বউঠাকুরাণীর হাটএর সমসাময়িক রচনা আনন্দমঠএর পটভূমি বাঙ্গালা দেশ হলেও বাঙ্গালার অকৃত্রিম রূপটি উপন্যাসে ধরা পড়েনি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বাংলা দেশ স্থান পেলেও বাঙালী অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশ ও বাঙালীকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করলেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার কারণ মনে হয়, সমকালীন ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রভাব এবং করুণার ব্যর্থতা। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী নিয়ে বাংলাদেশে উনিশ শতক থেকেই রচনার সূত্রপাত। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে

১ বউঠাকুরাণীর হাট, ১৮৮৩, 'ভারতী'তে (কার্তিক ১২৮৮ —আশ্বিন ১২৮৯) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

রামরাম বসু রচনা করেন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। তারও আগে ভারতচন্দ্র, মানসিংহের উপাখ্যানে প্রতাপাদিত্যের কাহিনী গ্রথিত করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরাণীর হাট' রচনার একযুগ পূর্বে প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ রচনা করেন 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং বউঠাকুরাণীর হাট রচনার পূর্ব পর্যন্ত প্রতাপের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'ই (১ম খণ্ড) প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই বঙ্গাধিপ পরাজয় (প্রথম খণ্ড)-ই বউঠাকুরাণীর হাট রচনার প্রেরণার উৎস।[২] এই কালে রবীন্দ্রনাথের মানসিক সত্তায় একটি অস্থিরতার কম্পন বর্তমান। শিল্পীসত্তা তখনও পূর্ণ অবয়ব লাভ করেনি।

তাই এই পর্বে উপন্যাস দুটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, এই উপন্যাসদ্বয়ে বঙ্কিম কালের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেননি। আলোচ্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই ছিল উপন্যাস রচনার আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমসাময়িককালে বলেছেন, 'বঙ্কিমবাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখেন তখন তিনি যথার্থ নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কেহ যদি প্রমাণ করে যে, কোনো একটি ক্ষমতাশালী লেখক অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য হই না। কিন্তু কেহ যদি বলে বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর বা বঙ্কিমবাবুর শেষবেলাকার লেখাগুলি অনুকরণ তবে সেকথা আমরা কানেই আনি না।'[৩] উক্তিটি এই পর্বের ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। বউঠাকুরাণীর হাট রচনাকালে রবীন্দ্রনাথও নিজেকে আবিষ্কার করতে পারেননি। হৃদয়-অরণ্য থেকে তখনও তার নিষ্ক্রমণ ঘটেনি। তাই, দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে অন্য কোন উপন্যাসের অনুকৃতির কথা কেউ প্রমাণ করলে যেমন আশ্চর্য বোধ করার কারণ নেই, তেমনি বউঠাকুরাণীর হাটএর ক্ষেত্রেও

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪২।

৩. বাউলের গান, সঙ্গীত সংগ্রহ। বাউলের গাথা, প্রথম খণ্ড, ভারতী ১২৯০ বৈশাখ। সমালোচনা (১২৯৪) পৃ. ১২২; রবীন্দ্ররচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ. ১৩১। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত। পৃ. ১৪৬।)

উক্ত কারণে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতে বাধা নেই। পরবর্তী মন্তব্যটিও রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবার মত।

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য মোগলদের বশ্যতা অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলে ঘোষণা করেন। তাঁর খুল্লতাত বসন্তরায় মোগলের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখতে চাইলে প্রতাপ বসন্তরায়ের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যার জন্য দুজন পাঠানকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বসন্তরায় স্বভাবগুণে ঘাতকদের জয় করে রক্ষা পান। পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা বিভা বসন্তরায়ের উপর অনুগত হবার ফলে রাজরোষে পতিত হয় এবং প্রতাপের বিরক্তির কারণ হয়। যৌবনে উদয়াদিত্য রুক্মিণী নামে এক দুষ্টা নারীকে ভালোবাসে। পরে রুক্মিণী উদয়ের স্ত্রী সুরমাকে বিষ প্রযোগ করে হত্যা করে। কন্যা বিভার সঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। রামচন্দ্রের এক ভাঁড়ের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতাপ রামচন্দ্রকে হত্যা কবার আদেশ জানান। উদয় রামচন্দ্রকে উদ্ধার করলে প্রতাপ পুত্রকে কারারুদ্ধ করে এবং বসন্তরাযের চেষ্টায় দগ্ধ কারাগার থেকে সে উদ্ধার পেযে দাদামশাযের আশ্রিত হয। প্রতাপ উদয়কে সৈন্য দিয়ে বন্দী করে এবং ঘাতকের সাহায্যে বসন্তরায়কে হত্যা করে। উদয় রাজ্যত্যাগের শপথ করে কাঁশীযাত্রার কালে ভগ্নী বিভাকে তার স্বামীর কাছে পৌছে দেবে স্থির করে। চন্দ্রদ্বীপের ঘাটে গিয়ে তাঁরা জানে যে রামচন্দ্র পুনরায় বিবাহ করেছেন। উদয়াদিত্য অশ্রুমতী ভগ্নীকে নিযে কাশীযাত্রা করে। 'চন্দ্রদ্বীপের যে হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার নাম রহিয়াছে 'বউঠাকুরাণীর হাট'।'

বঙ্গাধিপ পরাজয়এর চরিত্রগুলি এই উপন্যাসে নবরূপে আবির্ভূত হয়েছে। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের সরমা ও বউঠাকুরাণীর হাটের সুরমা এক ব্যক্তি নয়। বউঠাকুরাণীর হাটএ সুরমা প্রতাপের পুত্রবধূ কিন্তু বঙ্গাধিপ পরাজয়এ সরমা প্রতাপের কন্যা। বঙ্গাধিপে প্রতাপের যে কন্যার সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাহ হয় তার নাম সুমতি। সুমতি ও রামচন্দ্রের বিবাহপ্রসঙ্গ বঙ্গাধিপের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে। বউঠাকুরাণীতে সুমতির স্থলে প্রতাপের কন্যারূপে বিভাকে পাই। রুক্মিণীকে যেমন বঙ্গাধিপ পরাজয়ে দেখা যায় না, তেমনি বউঠাকুরাণীর হাটএ কচুরায অনুপস্থিত। বঙ্গাধিপের রমাইয়ের সঙ্গে এই উপন্যাসের রামমোহন মল্লের মিল লক্ষণীয়।

বউঠাকুরাণীর হাট রচনার কিছুকাল পূর্ব থেকেই বাংলা দেশে স্বদেশী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পরবর্তীকালে প্রতাপের চরিত্রে জাতীয় নেতার মহত্ত্ব আরোপ করার চেষ্টা চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপের মধ্যে তজ্জাতীয় কোন লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেননি। তৎকালে স্বদেশীয়ানার স্রোত ঠাকুরবাড়ির মানসপ্রাঙ্গণকে মুখর করে তুলেছিল। প্রতাপের চরিত্রে স্বদেশ-প্রেমমূলক কোন লক্ষণকে খুঁজে পেলে রবীন্দ্রনাথ যে তার সদ্ব্যবহার করতেন, একথা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে একসময়ে বাংলা দেশের আদর্শ বীর চরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।' (সূচনা, রবীন্দ্রবচনাবলী, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সং) ঐতিহাসিক তথ্য-পুষ্ট গতিমন্থর বঙ্গাধিপ পরাজয় এ ও প্রতাপের চরিত্রে কোথাও বঙ্গের আদর্শ বীরের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে দ্বিতীয় খণ্ডে, প্রতাপচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের দেশহিতৈষণার কথা স্পষ্ট করে না বললেও প্রতাপের উক্তিতে তার আভাস দিয়েছেন—'আগামীদিন লোকেরা সমস্ত অবগত না হইয়া আমাকে কলঙ্কির অবতাররূপে জানিবে।' পরবর্তীকালে হারাণচন্দ্র রক্ষিত 'বঙ্গের শেষ বীর' উপন্যাসে প্রতাপের স্বদেশপ্রেমিক রূপটিকেই আবিষ্কার করেছেন। বউ-ঠাকুরাণীর হাটে প্রতাপের হৃদয়হীনতা ও ক্রূরতা পুত্রকন্যার জীবনে ব্যর্থতার পরিণতি বহন করে এনেছে। বঙ্গাধিপে প্রতাপচন্দ্র ইতিহাসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে [illegible] করলেও সর্বস্বতা দান করেননি। বউঠাকুরাণীর হাটএ ইতিহাসের ঘটনাভূমিতে গার্হস্থ্যরস পরিবেশিত হয়েছে।

বউঠাকুরাণীর হাটএ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব পড়েছে। যে পারিবারিক পরিবেশে তাঁর জন্ম, সেই পারিবেশিক আবহাওয়া ছাড়াও তৎকালীন জীবনে যে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের বৃত্তে তিনি আবদ্ধ ছিলেন, তাঁদের চরিত্রেরও ছায়াপাত ঘটেছে এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথ

বউঠাকুরাণীর হাটএর ত্রুটি সম্পর্কে অর্ধশতাব্দী পরে বলেছেন, 'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।

'প্রাচীরঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গল্পরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউঠাকুরাণীর হাট গল্পে একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানব চরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্প বয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। আজও হয়ত এই গল্পটার দিকে ফিরে চাওয়া যেতে পারে। এ যেন অশিক্ষিত আঙ্গুলের আঁকা ছবি, সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়েনি তাতে। কিন্তু আর্টের খেলা ঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে। বুদ্ধির বাধাহীন পথে তার খেয়াল যা-তা কাণ্ড করতে বসে, তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কিছু কারিগরি বেরিয়ে পড়ে'। (সূচনা, রবীন্দ্র-রচনালী, তদেব) চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, সেটা যে পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি তার কারণ, প্রধান চরিত্রগুলি এক একটি অবিমিশ্র গুণের প্রতিভূ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ, পদকর্তা বসন্তরায় ও রাজা বসন্তরায়কে অভিন্ন ব্যক্তিরূপে কল্পনা করেছেন।[৪] ইতিহাসের বসন্তরায় ছিলেন বৈষয়িক বুদ্ধি-সচেতন। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট বসন্তরায়ের মধ্যে 'শ্রীকণ্ঠ সিংহের চরিত্র ও চিত্র' যে রূপ নিয়েছে একথা কবি নিজেই বলেছেন।[৫] আত্মভোলা, সঙ্গীতশিল্পী শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যার সঙ্গী ছিল একটি সেতার এবং কণ্ঠভরা গান, তাঁর পরিচয় পাই 'জীবনস্মৃতি'তে। বসন্তরায় যেন শ্রীকণ্ঠেরই প্রতিচ্ছবি। বৈষ্ণবসুলভ বিনয়

৪. 'কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একদা আমাদিগকে বলিযাছিলেন যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্তরায় কবি বসন্তরায় বলিয়া তিনি কোনো কোনো ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়াছেন।—কৈলাশচন্দ্র সিংহ, চণ্ডীদাস, বসন্তরায় ও বিদ্যাপতি, ভারতী ১৮৮৯, আশ্বিন, পৃ. ৩০৯। (রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৪৪)

৫. রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড, প. ১৪৪।

এবং হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রসন্নতা দিয়ে তিনি শত্রুকেও আপন করে নিয়েছেন। গানই তাঁর জীবনের সর্ববিধ সান্ত্বনার উৎস। উপন্যাসের মধ্যে বসন্তরায়ই পাঠকের অধিকতর সহানুভূতি অর্জন করে। উদয়াদিত্যের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীত পর্বের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। হতাশা নৈরাশ্য ও ক্রন্দনপবাযণতার স্বরই মূলত ধ্বনিত হয়েছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'। পূর্বেই বলা হইযেছে যে হৃদয-অরণ্য থেকে তখনো পর্যন্ত কবির নিষ্ক্রমণ ঘটেনি। জানলার ভেতর দিযে পাখিদের উড়তে দেখে কবি মনে আশা পোষণ করেন, তাঁর খাঁচা একদিন ভাঙ্গবে।[৬] তাঁর জীবনের তৎকালীন নৈরাশ্য ও বেদনার অভিমানাহত স্বর ধ্বনিত হযেছে অনুগ্রহ (১২৮৮ মাঘ) কবিতায়—

কেহ যেন মনে নাহি করে
মোরা কারো কৃপার প্রয়াসী।
না হয শুনো না মোর গান
ভালোবাসা ঢাকা রবে মনে।
অনুগ্রহ করে এই কোরো
অনুগ্রহ কোরো না এ জনে।

উদযাদিত্যের চিত্তাকাশ ও এমনি বন্ধন, নৈরাশ্য ও বেদনায় উতল। একদিকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে ব্যথতার গ্লানি। কারাগারে বন্দী উদয়াদিত্য জীবনকে ধিক্‌ৃত করেছে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উন্মন হযেছে সে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের সমকালীন জীবনের উপলব্ধির অভিপ্রকাশ। উদয়াদিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রতাপ থেকে পু্‌নাবী পযন্ত কেউই কোন আশা পোষণ করেনি।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ও তাঁর আত্মীয়-পরিজন সমস্ত আশা ত্যাগ করে তাকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিলেন। এটা ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে এক বেদনাদাযক অভিজ্ঞতা। স্বাভাবভীব ।াদর্শবাদী প্রজাদরদী উদয়াদিত্য তাই লেখকের সহানুভূতির আলোকে উজ্জ্বল। উদযাদিত্যের বিবাহিত জীবনেও বেদনার তরঙ্গ তুলেছিল রুক্মিণীর সঙ্গে তার সম্পর্ক। বিকৃত এই ভালোবাসাকে হলাহল জ্ঞান করে উদয়াদিত্য তাকে দূর করতে চেয়েছিল।

৬. জীবনস্মৃতি (ঘর ও বাহির)।

কারণ, 'জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা'। উদয়াদিত্যের তৎকালীন অন্তর্বেদনার স্বর যেন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর 'হলাহল' কবিতায়—

কোথায় প্রণয়ে মন যৌবনে ভরিয়া উঠে,
জগতের অধরেতে হাসির জোছনা ফুটে,
তা নয়, একি হল, একি এ জর্জর মন!
হাসিহীন দুঅধর, জ্যোতিহীন দুনয়ন।

জীবন সংগ্রামে পরাভূত উদয়াদিত্য ব্যর্থতার তীব্র বেদনা বুকে ধরে পিতৃ-সিংহাসন ত্যাগ করে যেন কর্মময় পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। একমাত্র দুঃখই যেন তার যাত্রার সহচর—

নিরালায় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়।
তুই দুঃখ তুই কাছে আয়।

(দুঃখের আবাহন, সন্ধ্যাসঙ্গীত)

রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনীদেবীর ছায়াপাত ঘটেছে বিভার চরিত্রে। বিভার সঙ্গে উদয়াদিত্যের সম্পর্ক স্নেহপ্রীতি ও নির্ভরশীলতার বন্ধনে আবদ্ধ। উদয়াদিত্যের কারাবাসকালে রামমোহনের আহ্বানকে উপেক্ষা করে স্বামিগৃহে না গিয়ে বিভা ভ্রাতার প্রতি কর্তব্যচেতনার পরিচয় রেখেছে। আবার তার জীবনের সংকটময় লগ্নে চিরকালের জন্য স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা বিভাকে উদয়াদিত্য তাঁর চলার পথে টেনে নিয়েছে। বিপন্নীক উদয়াদিত্যের জীবনে সর্ববিধ বিশ্বাসহীনতার মধ্যেও ভগ্নী বিভাই তার উপর অকৃপণ আস্থা স্থাপন করে তার সান্ত্বনার কারণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও সৌদামিনীদেবীর মধ্যে সম্পর্কের সুরটিও ঠিক এইরকম। 'উপহার' কবিতায় সৌদামিনীদেবীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

তব স্নেহ চারিপাশে কেবল নীরবে ভাসে
সৌরভের প্রায়—
নীরবে বিমল হাসি ঊষার কিরণ রাশি
প্রাণেরে জাগায়।

এই সম্পর্কের সুরটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে বিভা ও উদয়ের সম্পর্কের মধ্যে। মঙ্গলা বা রুক্মিণী উপন্যাসে কোন বৃহৎ প্রয়োজন সিদ্ধ করেনি। সুরমার মৃত্যুর

জন্য সে দায়ী। কর্তৃত্বপরায়ণা ও লালসাময়ী রুক্মিণী বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের হীরা ও কৃষ্ণকান্তের উইলএর রোহিণীর সমবায়ে যেন রচিত। তবে হীরার সঙ্গেই তার সাদৃশ্য বেশী। হীরাও কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। রুক্মিণীর সঙ্গে সীতারামের সম্পর্ক ও পরিণতি হীরা ও দেবেন্দ্রের অনুরূপ। তবে তার ভোগাকাঙ্ক্ষা ও লালসা অনেকটা রোহিণী জাতীয়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে রুক্মিণী রবীন্দ্র সাহিত্যের একমাত্র ভিলেন চরিত্র।[৭]

প্রতাপাদিত্য এই উপন্যাসে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীনরূপে চিত্রিত। তার চরিত্রের গতিবিধি মূলত পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। বসন্ত-রায়কে হত্যার পশ্চাতে পারিবারিক কারণের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণও বর্তমান। মোগলদের হাত থেকে নিজ রাজ্য সুরক্ষিত করার অভিপ্রায়ে একটি পরগণা কিংবা উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে পিতৃব্য বসন্তরায়ের কাছ থেকে চকশ্রী বা চকশিরি পরগণাটি প্রার্থনা করলে বসন্তরায় দিতে অস্বীকৃত হন। ফলে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হন। এই ক্রোধের সঙ্গে এক পারিবারিক কলহের সংযোগে বসন্তরায়ের উপর প্রতাপ প্রদত্ত মৃত্যুবাণ নেমে আসে। জামাতা রামচন্দ্রের ভাঁড় রামাইয়ের আচরণের ফল, রামচন্দ্রের প্রতি প্রতাপের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা। সতীশচন্দ্র মিত্র রামচন্দ্র-বিভার ঘটনার মধ্যে নিষ্ঠুরতার বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, 'গল্পটিকে জাঁকাল করিবার জন্য একরূপ কথিত আছে প্রতাপাদিত্যের লোকেরা নদীমধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ ফেলিয়া পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু রামমোহন মল্ল চৌষট্টি দাড়ের সেই প্রকাণ্ড নৌকা উহার উপর দিয়া টানিয়া পার করিয়া দিয়া চলেন। প্রতাপের লোকেরা যে কখন পথ বন্ধ করিবার সময় পাইল এবং কামানযুক্ত সুদীর্ঘ রণতরী মল্লবর কিরূপে টানিয়া পার করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার সাধ আমাদের নাই।'[৮] অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে প্রতাপকে এঁকেছেন তার সঙ্গে নিষ্ঠুরতার বিষয়টি তার চরিত্রের আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয় না। প্রতাপের রাজধানী যশোহরের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বউঠাকুরাণীর হাটে ভ্রান্তির উল্লেখ করে সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'ভৈরব তীরবর্তী আধুনিক যশোহর সহরকে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্বপ্রণীত 'বউঠাকুরাণীর

৭. ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)।

৮ সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড।

হাট’ নামক উপন্যাসে লিখিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্র ভৈরববক্ষ হইতে যে তোপধ্বনি করেন, তাহাতে প্রতাপের নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু ধূমঘাট হইতে ভৈরবের দূরত্ব অন্ততঃ ৫০।৬০ মাইল হইবে। গত ২৫ বৎসরে উপন্যাসখানির বহু সংস্করণ পার হইযাছে। কিন্তু দুঃখের বিষয এই সাধাবণ ভ্রমটি সংশোধিত হয নাই। ইহা অতীব ক্ষোভের বিযয। উক্ত উপন্যাসে ভৈরবস্থলে যমুনা বা ইছামতী হওয়া উচিত।’[৯]

রচনাকে একান্তভাবে ঐতিহাসিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না বেখে ববীন্দ্রনাথ কাহিনীকে শিল্পের প্রযোজনানুযাযী সাজিযেছেন। উপন্যাসে আছে বিভাকে রামচন্দ্র বায গ্রহণ না কবলে সে প্রত্যাখ্যাতা হযে কাশী চলে যায। কিন্তু ইতিহাসের মতে, মাতা কর্তৃক তিবস্কৃত হয রামচন্দ্র। শেষে মাতা নিজেই পুত্রবধূকে গৃহে নিযে যান। বিমলাব (বিভা) দুটি পুত্র হয। জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্তিনারাযণ পিতাব মৃত্যুব পব রাজা হন।

বউঠাকুবাণীব হাট বচনাকালে ববীন্দ্রমানস সংস্কাবেব ঊর্ধ্বে উঠতে পাবেনি। কাবণ তাঁর বিশবছরেব জীবন মানব-হৃদয-অরণ্যেব জটিলতার গভীরে প্রবেশ কবাব অবকাশ পাযনি। বৈচিত্র্যহীন চবিত্রগুলি জটিলতাবর্জিত সবল পথেই এগিযে গেছে। চবিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বেব অভাবেই সেগুলি সত্যই, ‘পুতুলেব ধর্ম ছাড়িযে উঠতে পাবেনি। হযত এই কাবণেই অতৃপ্ত কবি এই উপন্যাস রচনাব কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বছব পবে, এবই গল্পাংশ নিযে প্রাযশ্চিত্ত (১৯০৯) নাটক এবং আবও বিশবছব পবে নাটকটি সংশোধনান্তব পবিত্রাণ (১৯২৯) নাটক রচনা করেন বউঠাকুবাণীব হাট অবলম্বনে কেদাবনাথ চৌধুবী ‘বাজা বসন্ত-রায’ নামে যে নাটক বচনা কবেন তাব অভিনয জনপ্রশংসিত হয।

আর্টের খোলাঘরে ছেলেমানুষিবও যে একটা মূল্য আছে একথা যথার্থ প্রমাণিত হযেছে ‘সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য’ লেখাটিব মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিযেছে বলে এবং সেই কাবণেই ‘বউঠাকুবাণীব হাট’ বঙ্কিমের প্রশংসাধন্য হয়েছিল। ‘বঙ্কিম এই মত পোষণ কবেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতাব প্রভাব দেখা দিযেছে—এই বইকে তিনি নিন্দা কবেননি।’

বউঠাকুবাণীর হাট, দিদি সৌদামিনী দেবীকে উপহৃত।

৯. তদেব।

'রাজর্ষি'[১০] বউঠাকুরাণীর হাট এর চারবছর পরে প্রকাশিত। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত প্রেম ও হিংসার দ্বন্দ্বমূলক কাহিনী। প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হযেছে এই উপন্যাসে। রাজর্ষির মূলে ইতিহাস থাকলেও আদর্শবাদের দ্বন্দ্বই উপন্যাসটির বিষয়বস্তুতে প্রাধান্য লাভ করেছে। উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশ সর্বাংশে সত্য হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাস এই উপন্যাসে গৌণ হযে পড়েছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়েব ভাষায় 'ইতিহাসেব জনশূন্য প্রান্তরের উপর বাজর্ষির সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে।'

ত্রিপুবার অধিপতি গোবিন্দমাণিক্য মন্দিরে বলিদত্ত পশুর বক্তস্রোত দেখে ধর্মানুষ্ঠানে পশুবলি প্রথা নিষিদ্ধ কবলেন। প্রজারা অসন্তোষ প্রকাশ করল। মন্দিরের পুরোহিত বঘুপতি বাজাব এই কর্মেব বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন এবং ধর্মস্থানে রাজার হস্তক্ষেপ ববদাস্ত করতে না পেরে সর্বশক্তি প্রযোগ করে রাজার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালেন। বাজভ্রাতা নক্ষত্ররায রাজ্যলোভে রঘুপতির সঙ্গে যডযন্ত্রে লিপ্ত হয। বাজ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল। অবশেষে নক্ষত্ররায় বাংলাব সুবাদার সুজাব সহাযতায গোবিন্দমাণিক্যকে পবাজিত করে ত্রিপুরার সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতাব বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন না। ইতোমধ্যে বঘুপতিব পালিত পুত্র জযসিংহের মৃত্যু হলে বঘুপতির রোষ বৃদ্ধি পেল। গোবিন্দমা।।ক্য পালিযে গেলেন চটগ্রামে। সুজা শেষ পর্যন্ত আবংজীবের ভযে গোবিন্দমাণিক্যেব আশ্রয গ্রহণ করলেন। বঘুপতিও আত্মভ্রান্তি স্বীকাব কবে গোবিন্দ মাণিক্যের শবণ গ্রহণ কবলেন। গোবিন্দ মাণিক্য প্রজাদের ইচ্ছানুসাবে নিজ বাজ্যে প্রত্যাবর্তন কবলেন।

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিক তথ্য অবিকৃত রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন। স্টুয়ার্টকৃত বাংলার ইতিহাস, কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস, ত্রিপুরাধিপতি কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ত্রিপুরার ইতিহাসের তথ্য সমৃদ্ধপত্র[১১] (১২৯৩, জ্যৈষ্ঠ ১৮) প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ কাজে লাগিয়েছেন।

রাজর্ষি স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস। এই স্বপ্নেব বিববণ 'জীবনস্মৃতি'তে পাই।

১০. রাজর্ষি, ১৮৮৭। বালক (আষাঢ় মাঘ ১২৯২)এ ২৬ পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়। ১২৯৩ সালের আশ্বিনে ৪৪ পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় পৃ ২৫২।

১১. রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

সূচনায়ও কবি আভাস দিয়েছেন 'স্বপ্নে দেখলুম—একটা পাথরের মন্দির। ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কি ভয়! কি বেদনা! বাপকে সে বারবার করুণস্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন! বাপ কোনমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললুম গল্প পাওয়া গেল।' এই স্বপ্নের সঙ্গে ত্রিপুরার এক পুরাবৃত্তের কাহিনী-সংযোগে রাজর্ষির জন্ম।

ইতিহাসের বর্ণক্ষেপের মধ্যে মূলত গল্পের যে বক্তব্যটি প্রাধান্য পেয়েছে সেটি হল, 'প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ'। গ্রন্থের মধ্যে এই বিরোধকে পেছনে ফেলে ইতিহাসের স্রোত গল্পকে অবশ্য অনেক দূর পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এর কারণ, 'মাসিকপত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল।' (সূচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী সং) বস্তুত আদর্শের সংঘাত, হিংসা-অহিংসার দ্বন্দ্বের সূত্রে শেষ হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে, জয়-সিংহের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। তারপর ইতিহাসের অনুসরণে গল্পের বিস্তার।

রাজর্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-মানস অপরিণত। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে রবীনাথের বিদ্রোহী আত্মা এই উপন্যাসে উচ্ছ্বসিতভাবে অভিব্যক্ত। সাহিত্যের মাধ্যমে এর প্রকাশ প্রথম বলে কিছুটা আতিশয্যদুষ্ট। গোবিন্দ-মাণিক্য ও রঘুপতি এই উপন্যাসের মধ্যে দুটি বিপরীত শক্তির প্রতিভূ। হাসি ও তাতার হাত ধরে স্নানে আসার কালে, মন্দিরের শ্বেত প্রস্তর সোপানে বিগত রাত্রের একশত মহিষ বলির রক্তধারা দর্শনে হাসির কাতর প্রশ্ন রাজাকে বিচলিত করল। তার অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া, মন্দিরেতে জীববলি নিষিদ্ধ করে রাজাদেশ ঘোষণা। তারপর আচরিত সংস্কার ও প্রথার পক্ষে এবং রাজার আদেশের বিরুদ্ধে রঘুপতির দৃপ্ত প্রতিবাদ। উপন্যাসের শুরুতেই এই সংঘাতের সৃষ্টি এবং এর পরিণতি জয়সিংহের মৃত্যুতে। প্রথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিজাত আদর্শের যে বিরোধ তা রবীন্দ্রনাথের মুক্তি চেতনারই স্মারক। এর অঙ্কুর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এ। প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ জীবনচর্যা তথা ধর্মচর্যা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে পীড়িত করেছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ এর সন্ন্যাসী জগৎ-বিমুখ মন নিয়েই ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চেয়েছিল। বৈরাগ্য-

সাধনার মধ্য দিয়ে সে যে মুক্তিকে পেতে চেয়েছিল, তা যে বন্ধনেরই নামান্তর এই সত্য সে উপলব্ধি করেছিল রঘু-দুহিতার মৃত্যুর পর। প্রকৃতির প্রতিশোধই তাকে নবচৈতন্য দান করেছিল। রাজর্ষির মধ্যে সেই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামই ধ্বনিত হয়েছে, ভিন্ন শিল্পাঙ্গিক ও রচনা-কৌশলের মধ্য দিয়ে। রাজর্ষির নাট্যরূপ বিসর্জনে এই আদর্শের স্ফুরণ সুপরিণত ও সংহত। মন্দিরের যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোবিন্দমাণিক্যের মতি পরিবর্তন, সেই ঘটনাটি বিসর্জনে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত। অপর্ণার ছাগশিশু হত্যার চিহ্ন ও সন্তানস্নেহে পালিত ছাগশিশুর হত্যাজনিত ক্রন্দন, গোবিন্দমাণিক্যকে কেবল বিমূঢ় করে দেয়নি, তাঁর মনের গভীরে প্রশ্ন তুলেছিল,—'এত ব্যথা কেন, এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে'। বিসর্জনের শিল্প কল্পনা আরও পরিণত। রাজর্ষি বস্তুত সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে, রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক কাহিনীকে ব্যাপ্তি না দিয়ে, প্রাণাধিক সন্তান জয়সিংহের মৃত্যুর পর রঘুপতির মানসিক ভাবান্তরের স্তরগুলিকে একে একে অনাবৃত করে দিয়েছেন, গোবিন্দমাণিক্যের ঔদার্য ও ক্ষমাশীলতার পাশে সর্ব-সংস্কারমুক্ত রঘুপতির অপর্ণার উপর নির্ভরশীলতা, আদর্শের সংঘাতজনিত পরিণতিকে অকৃত্রিম শৈল্পিক সুষমা দান করেছে। রাজর্ষি, বিসর্জনের তুলনায়, নিম্নস্তরের রচনা হওয়ার কারণ, শিল্পরূপের ভিন্নতা ও রবীন্দ্র মানসের অপূর্ণতা বলেই মনে হয়।

উপন্যাসটিতে গল্পের খাতিরে ইতিহাসকে আনা হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের পর তাই গল্পের গতি ভিন্ন পথ ধরেছে। 'অল্প বয়সের ছেলেদেরও সম্মান রাখার দরকার আছে' এই বিবেচনায় কাহিনীর বৃদ্ধি। এই অংশে ইতিহাসের বতিকায় গল্পের পথ আলোকিত। গোবিন্দ-মাণিক্যের সঙ্গে ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের (ছত্রমাণিক্য) বিরোধে ভ্রাতার কাছে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ, প্রজাদের অহেতুক গালাগাল শিরোধার্য করে নিঃশব্দে চট্টগ্রামে প্রস্থান, দীর্ঘকাল ধরে কৃচ্ছ্রসাধনা, গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রকে মহত্ত্ব দান করেছে এবং সর্বোপরি গোবিন্দমাণিক্যকে রাজর্ষিতে উন্নীত করেছে। রাজা হয়েও ভোগনিবৃত্তি, ঔদার্য ও ক্ষমাগুণ, গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রকে অসাধারণত্ব দান করেছে। তার চরিত্রের পাশে তারই ভাই ছত্রমাণিক্য বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে। রঘুপতি কর্তৃক প্ররোচিত নক্ষত্ররায় রাজ্যলোভে

গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করার কথা চিন্তা করলে, গোবিন্দমাণিক্য রাজার যে আদর্শের কথা নক্ষত্ররায়কে জানান সে আদর্শে তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী। নক্ষত্ররায়কে গোবিন্দমাণিক্য বলেন, 'রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্রলোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্রলোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্রলোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো—এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটীরেই থাক আর প্রাসাদেই থাক। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়' (দশম পরিচ্ছেদ)। রাজাদর্শ সম্পর্কে গোবিন্দমাণিক্যের এই বিশ্বাস অটুট থাকতে দেখি উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত। ঘটনাচক্রে এই আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হবার পক্ষে বাধাপ্রাপ্ত হলেও অনুকূল পরিবেশে সার্থকতার চিহ্ন রেখেছে। রাজসিংহাসন ত্যাগ করে গোবিন্দমাণিক্য নেমে এসেছেন দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের মধ্যে। তাদের দুঃখকে আপন দুঃখ জ্ঞান করেছেন। চট্টগ্রামে বাসকালে রাজা হলেও সন্ন্যাসীর জীবনযাপনকালে ত্যাগ সেবা প্রেম ও ক্ষমা দিয়ে গোবিন্দমাণিক্য শত্রুচিত্ত জয় করেছেন। সুজা ও রঘুপতি তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। গোবিন্দমাণিক্যের রাজাদর্শ কেবলমাত্র মৌখিক কথার স্তোকে পরিণত হয়নি, নিজের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে তিনি তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই তিনি রাজর্ষি। সমকালে রাজর্ষির সমালোচনা প্রসঙ্গে রাজর্ষির চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র বসু বলেছেন, 'রাজর্ষির চরিত্র তিনি কোনখানে আঁকিতে পারিলেন না। না সিংহাসন ত্যাগের পূর্বে, না তাহা পুনগ্রহণের পর। সুতরাং রাজর্ষির চিত্র সম্যকভাবে অসম্পূর্ণ রহিল। আমরা এ গ্রন্থে একজন সামান্য সাধু লোকের চরিত্র চাই না। রাজর্ষির চরিত্র চাই।'[১২] পরবর্তীকালে বিভিন্ন রচনায় রবীন্দ্রনাথের রাজা চরিত্রের মধ্যে যে আদর্শের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তার সূত্রপাত গোবিন্দমাণিক্যে। তাছাড়া 'গোরা'র পরেশবাবু, 'ঘরেবাইরে'র নিখিলেশ প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে ব্যক্তি গোবিন্দমাণিক্যের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। রঘুপতি এই উপন্যাসে বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিভূ। রঘুপতির সঙ্গে রাজার দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত নয়, আদর্শগত। রঘুপতি এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাজার নেই। তাই সমগ্র ধর্মজীবী মানুষের হয়ে

১২. কল্পনা, পঞ্চম বৎসর, ১২৯১-৯২, পৃ. ১৩০।

রঘুপতি ধর্মরক্ষায় ব্রতী হন। তাঁর সঙ্কল্প ও মানসিক শক্তি তাঁর চরিত্রের ঐশ্বর্য। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শঠতা, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে তিনি পরাঙ্মুখ নন। এই উদ্দেশ্যসাধনের পশ্চাৎবর্তী কারণ, আচারসর্বস্ব ধর্মজীবী মানুষের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই কারণেই রঘুপতি ভিলেন নন। রঘুপতির প্রস্তর-কঠিন হৃদয়ের গভীরে ভালোবাসার যে ধারাটি আবৃত হয়েছিল, সেটি একান্তভাবেই জয়সিংহের জন্য সঞ্চিত। তাঁর চরিত্রের এটাই দুর্বলতার উৎস। ছাগহত্যার স্থলে মানুষহত্যার কথা ভাবলেও, রঘুপতি জয়সিংহের মৃত্যুতে কঠোরতম রূপ গ্রহণ করেছেন। রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের দম্ভকে অসহ্য জ্ঞান করে তার তীব্র বিরোধিতা করলেও আত্মস্বার্থের ঊর্ধ্বে নিজেকে তিনি স্থাপন করেছেন। স্নেহের একমাত্র আধার জয়সিংহকে হারিয়ে সঞ্চিত তেজোরাশি প্রচণ্ড বিক্ষোভে উদ্‌গীরিত হয়েছে গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে। তারপর ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যখন নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, তখন তিনি গোবিন্দমাণিক্যের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন নতি স্বীকার করতে। রঘুপতির এই পরিণতি তার চরিত্রে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতির সৃষ্টি করলেও উপন্যাসের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। বিল্বন আদর্শের বর্ণে গড়া একটি মহৎ চরিত্র। বিল্বন কর্মযোগী, তার আদর্শ দেশসেবা ও মানবসেবা। গোবিন্দমাণিক্যকে সে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছে শুধু রাজ্যের ও প্রজাদের কল্যাণের জন্য। বিল্বন মানবপ্রেমিক। সে মানুষের মধ্যে বিভেদের সম্পর্ক খুঁজে পায় না। সে বলে, 'আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত। ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত।' (একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ) রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবচেতনার বীজসূত্র বিল্বন। নোয়াখালির নিজামতপুরে বাসকালে মড়কের সময়ে শত্রু-মিত্র, জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে বিল্বনের সেবাকর্ম তার চরিত্রের সত্যকার মানবিক পরিচয়। বিল্বন রবীন্দ্রসাহিত্যে বারবার ফিরে এসেছে। প্রায়শ্চিত্তের ধনঞ্জয় বৈরাগী, অচলায়তনের গুরু, শারদোৎসবে-র রাজা, রাজার ঠাকুরদা প্রভৃতি তার উদাহরণ। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরাম স্বামী, 'চন্দ্রশেখর'-এর রামানন্দ স্বামী প্রভৃতির মধ্যে বিল্বনের পূর্বাভাষ লক্ষ করেছেন।[১৩] ইতিপূর্বে প্রচার (১২৯১-৯২)-এ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত

১৩. রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৮।

হয়। 'কৃষ্ণচরিত্রে বাঙ্কম কৃষ্ণকে যেরূপভাবে আদর্শ মানব সৃষ্টি করিয়াছিলেন উপন্যাসের মধ্যে সেইরূপ আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিল্বনের চরিত্র ও সৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারেন!'[১৪] জয়সিংহ সত্যকারাগারে বদ্ধ মুক্তিকামী ব্যর্থপ্রাণ। আত্মপ্রাণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সে দ্বন্দ্বমুক্ত হয়েছে। সন্তানহীন নিঃস্ব রঘুপতি প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়েছেন। তাঁর রোষবহ্নি রাজার বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়ায় পূর্ব-সঞ্চিত ক্রোধ দ্বিগুণিত হয়েছে। জয়সিংহ এই উপন্যাসের আদর্শ-সংঘাতের বলি।

'মালিনী'র ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের সঙ্গে রঘুপতি ও জয়সিংহের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলেও ক্ষেমঙ্কর রঘুপতি অপেক্ষা কঠিনতর ধাতু দ্বারা গঠিত। ক্ষেমঙ্করের মধ্যে আত্মানুশোচনার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। রঘুপতি চরিত্রের জটিলতাও ক্ষেমঙ্করের মধ্যে অনুপস্থিত। চারিত্রিক বলিষ্ঠতায় ক্ষেমঙ্কর রঘুপতি অপেক্ষা উন্নততর। তার প্রতিজ্ঞা পালনের পন্থায় শঠতা, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার কোনও স্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। সুপ্রিয়ের কথায়, 'বাল্যকাল হতে দৃঢ় সে অটলচিত্ত'—কথাটি ক্ষেমঙ্কর সম্পর্কে প্রথম ও শেষ কথা। সুপ্রিয় মালিনীতে আরও এক ধাপ অগ্রসর। তবুও সুপ্রিয় ও জয়সিংহের মধ্যে সাদৃশ্য অধিকতর।

রবীন্দ্রনাথ তৎকালে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে এই উপন্যাসে কাজে লাগিয়েছেন। চট্টগ্রামে, সুজা গোবিন্দমাণিক্যের আশ্রিত থাকা কালে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে গোবিন্দমাণিক্যকে তাঁর বহুমূল্য তরবারি উপহার দেন। সুজার মৃত্যুর পর 'সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি তরবারির বিনিময়ে বহুতর অর্থ দ্বারা কুমিল্লা নগরীতে একটি উৎকৃষ্ট মসজিদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।' শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহের ত্রিপুরার ইতিহাস অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ এই তথ্য গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশ করেন। কিন্তু মহিমচন্দ্র ঠাকুর কুমিল্লার সুজা মসজিদ প্রবন্ধে জানান যে, সুজা প্রদত্ত হীরক অঙ্গুরী বিক্রয় করে সেই অর্থ দ্বারা গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লার গোমতী তীরে মসজিদ নির্মাণ করে দেন।[১৫]

হীরক অঙ্গুরী অথবা তরবারি যার বিনিময়েই হোক না কেন কুমিল্লার

১৪. তদেব।

১৫. তদেব, পাদটীকা, পৃ. ১৯৬।

সুজা মসজিদের নির্মাতা যে গোবিন্দমাণিক্য এ বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক সংশয় নেই।

'কল্পনা' পত্রিকায় রাজর্ষি সমালোচনা প্রসঙ্গে দীর্ঘ সমালোচনায় সমালোচক পূর্ণচন্দ্র বসু গ্রন্থটি আদৌ রসোত্তীর্ণ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন।[১৬]

রাজর্ষি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নব সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির কোন এক বন্ধুর অযত্ন করক্ষেপে পত্রটি হারিয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের উৎসাহবাণী বিস্মৃত হননি।[১৭]

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮১৬—১৯৪০)

সাংবাদিকরূপে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এককালে পরিচয় থাকলেও ঔপন্যাসিক রূপে তিনি তদধিক পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু নগেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কাল কেটেছে বাংলা দেশের বাইরে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদনার কাজে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে করাচি থেকে প্রকাশিত 'ফিনিক্স' ইংরাজী সাপ্তাহিক, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'লাহোর ট্রিবিউন', ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ইণ্ডিয়ান পিপল', ১৩০৬ (১৯০০ খ্রী.) সাল থেকে 'প্রদীপ', ১৩০৭ সালে 'প্রভাত' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদকরূপে তিনি যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিকতার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যসাধনায় লিপ্ত ছিলেন নগেন্দ্রনাথ। তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটি একটি গীতিকাব্য 'স্বপনসঙ্গীত' (১৮৮২)। নগেন্দ্রনাথ উপন্যাসরচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি।

নগেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'পর্বতবাসিনী'[১৮] তারাবাই নাম্নী একটি মারাঠা বালিকার সাহস, শক্তি, প্রণয় ও মৃত্যুর কাহিনী। তারাবাইয়ের ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা, দৈহিক শক্তি ও সাহসিকতা এবং চরিত্রের সংযম ও দৃঢ়তা তার চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। পঞ্চদশী তারা পুরুষের বেশে থাকে। শম্ভুজী তাকে প্রণয় নিবেদন করলে সে প্রত্যাখ্যান করে। শম্ভুজী বিবাহের প্রস্তাব করলে, তারা বলের পরীক্ষায় শম্ভুজীকে হারিয়ে দেয়।

১৬. কল্পনা, পঞ্চম বৎসর, ১২৯১-৯২, পৃ ১২১-১৩২।

১৭. রাজর্ষি (সূচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সং)

১৮. পর্বতবাসিনী, ১৮৮৩, পৃ ১৩৯, দ্বি. সং ১৯০১।

তারা শম্ভুকে জানায়, 'তুমি যদি আমায় ভালবাস আমি তোমাকে ভাই বলিয়া জানিব'।

শম্ভুজী তারার পিতা রঘুজীর প্রিয়পাত্র হয়ে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সচেষ্ট হল। ব্যায়াম ক্রীড়ার প্রাঙ্গণে পুরুষের বেশধারী তারার সঙ্গে গোকুলজীর সাক্ষাৎ হলে তারার প্রেমতৃষিত নারীমনটি অনাবৃত হয়ে পড়ে। 'এতদিনে তারা বুঝিল সে গর্বিত প্রকৃতির কঠিন-হৃদয়া বীর নারী নহে, অবশচিত্ত সামান্য মানবীমাত্র।' গোকুলজীর সঙ্গে রঘুজীর অনর্থ কলহে তারা দুঃখ প্রকাশ করলে, রঘুজী তারাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করল। শম্ভুজীকে বিবাহ না করার মত জ্ঞাপনে, তারা পিতা রঘুজী কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিতা ও পর্বতে নির্বাসিতা হল। পর্বতে এসে তারা যেন মুক্তি পেল। গোকুলজীর স্মৃতি তারাকে পর্বতবাসের প্রেরণা দিল। দুমাস পরে বাড়ী ফিরে সে পুরোনো ভৃত্য 'মহাদেবকে রক্ষা করল শম্ভুজীর হাত থেকে এবং শম্ভুজীকে কুঠারাঘাত করে তার অন্যায়ের শাস্তি দিল। পিতাকে সে রঘুজী বলে সম্বোধন করল। তারপর খামারে আগুন লাগিয়ে সে আত্মরক্ষার পথ মুক্ত করে 'আবার যে পর্বতবাসিনী, সেই পর্বতবাসিনী হইল।'

গোকুলজীর এক অচেতন সঙ্গিনীকে আশ্রয় দিয়ে তারা তার সম্পর্কে ঈর্ষাবোধ করে। গোকুল সঙ্গিনী গৌরীকে জোর করে তারার কাছ থেকে নিয়ে যায়। পিতার মৃত্যুর পর গোকুলজী কর্তৃক লোকসমক্ষে তারা অপমানিতা হলে, শম্ভুজী তাকে উত্যক্ত করে গোকুলজীকে হত্যার আদেশ আদায় করে নেয়। পরমুহূর্তে তারা ভুল বুঝতে পেরে শম্ভুজীকে ফিরিয়ে আনতে যায়। গোকুলজীকে উদ্ধারের জন্য তারা দড়ি দিয়ে দেহ বেঁধে পর্বত-কন্দরে ঝাঁপ দেয়। তাকে উদ্ধার করে।

গৌরীকে কেন্দ্র করে তারা ও গোকুলজীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়। গোকুলজী তারাকে জানায়, গৌরী তার বোন, পিতার অবিবাহিতা পত্নীর কন্যা। তারার সঙ্গে গোকুলজীর বিয়ে হয়। তারা স্বপ্ন দেখল, পাষাণ পুরুষ ও পাষাণ কন্যারা তারাকে আহ্বান করে নক্ষত্রলোকে অন্তর্হিত হল। এক দুর্যোগের কালে গিরিশৃঙ্গে এক কৃষ্ণকায় মূর্তি দেখে তার পদস্খলন হলে, 'যে মৃত্যুমুখ হইতে তারা গোকুলজীকে রক্ষা করিয়া ছিল, স্বয়ং সেই মুখে পতিত হইল।'

তারাবাই উপন্যাসটির কেন্দ্রমণি। তাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য চরিত্রের আবর্তন ও কাহিনীর গ্রন্থন। তারার প্রণয়-বিশ্বাস, প্রলোভনের ধার ধারে না। তারার তীব্র আত্ম-সচেতনতা ও ব্যক্তিত্ববোধ তার চরিত্রের প্রধান উল্লেখ-যোগ্য বিষয়। তার অসীম শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাকে অসাধারণের স্তরে উন্নীত করেছে। গৌরীকে কেন্দ্র করে তারার ঈর্ষা ও কৌতূহল, গোকুলজীর প্রতি অধিকার স্থাপনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। আত্মসম্মান ও প্রেমের দ্বন্দ্বে তারার প্রেমই জয়ী হয়েছে। তারার বিপরীতে লেখক এই ক্ষুদ্র চরিত্রটি অঙ্কন করে তারার চরিত্রকে সুপরিস্ফুট করতে যেমন প্রয়াসী হয়েছেন, তেমনি অনায়াসে গৌরীর প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন। গৌরী পিতার জারজ সন্তান। তার আচার-আচরণ ও উক্তির মধ্যে একটা স্নেহকাতর রূপ ও অপার সারল্য সহজেই চোখে পড়ে। গৌরীর চরিত্রের সংযুক্তির ফলে তারার চরিত্রের ঈর্ষাকাতর দিকটি যেমন পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি তারা ও গোকুলজীর সম্পর্কের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি করে লেখক কাহিনীতে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। গৌরীর জন্য কাহিনী-বর্ণনায় লেখকের সহানুভূতিশীল মানবিক মনের পরিচয় মেলে। বিবাহ-বন্ধনের বাইরে সৃষ্ট সন্তানও যে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার অধিকার রাখে গোকুলজী ও তার মায়ের আচরণের মধ্য দিয়ে সেই মতের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। অবশ্য এ-বিষয় সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে[১৯]।

শম্ভুজী ও গোকুলজী উভয়েই তারার পাণিপ্রার্থী। কিন্তু গোকুলজী অপেক্ষা শম্ভুজীর তারার প্রতি আকর্ষণ অধিকতর। রঘুজীর সংস্পর্শে এসে তার চরিত্রে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেলেও তারার প্রতি তার প্রণয় কোন কারণেই হেয় করেনি। প্রেমবঞ্চিত শম্ভুজী শেষ পর্যন্ত দানপত্র ছিঁড়ে ফেলে, পিতার সম্পত্তিতে তারাকে পূর্ণ অধিকার দিয়ে ব্যর্থতার বেদনায় দেশান্তরী হয়েছে। গোকুলজীর চরিত্রের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় ভগ্নীর প্রতি ভালবাসা। রঘুজী একটি নিষ্ঠুর অনুদার পিতার প্রতিমূর্তি।

লেখক উপন্যাসটিতে প্রেম ও প্রতিহিংসার চিত্র পাশাপাশি তুলে ধরেছেন।

১৯. অবৈধ সন্তানকে কেন্দ্র করে আলোচ্যকালে আরও কয়েকজন লেখকের উপন্যাস পাই। (১) রাধানাথ মিত্র, তারাতীর্থ (১৮৮৯); (২) সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ভিখারিণী (১৮৯১)।

উপন্যাসটিতে আকস্মিকতা ও অবাস্তবতার স্থান দুর্লক্ষ্য নয়। তারার প্রেতাত্মা-দর্শন ('আভাস'), পাষাণপুরুষের সাক্ষাৎলাভ অপ্রাকৃত ঘটনাবিশেষ।

উপন্যাসের সমাপ্তি আকস্মিক ও অবাস্তব কল্পনাজাত। তারার স্বপ্নদৃশ্যের মধ্য দিয়ে অলৌকিকতা সমর্থিত হয়েছে (নবম পরিচ্ছেদ)। এই স্বপ্ন উপন্যাসের পরিণতির ইঙ্গিতবাহী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্বপ্নের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দুরূহ নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে চমক দেবার প্রয়াসই বেশী। একবিংশ পরিচ্ছেদে তারার স্বপ্ন 'কপালকুণ্ডলা'র স্বপ্নকে মনে পড়িয়ে দেয়। তারার পর্বতবাস রোমান্টিক কল্পনার উদাহরণ। উপন্যাসটিতে এ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়াচ আছে। 'বামাবোধিনী'[২০] পত্রিকায় পর্বতবাসিনী প্রশংসিত হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'অমরসিংহ'[২১] সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস। সিপাহী বিদ্রোহকে লেখক সিপাহী যুদ্ধ না বলার যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। সিপাহীদের নীচতা ও পাশবিকতার কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন ' সিপাহী বিদ্রোহের মূলে স্বদেশানুরাগ বা অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য দেখা যায় না। সিপাহীরা ছিল পিশাচ যাহারা সিপাহীদের সহিত যোগ দিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা অল্প, তাহারা অন্য উপায় না দেখিয়া বা দুরাশার প্রলোভনে না ভুলিয়া বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দেয়। কোটি কোটি ভারতবাসী ইংরাজের জয় কামনা করিত'। লেখক আরও বলেছেন, শিখরা ইংরাজপক্ষ না নিলে এত সহজে বিদ্রোহ নির্বাপিত হত না। সুতরাং 'এরূপ যুদ্ধকে বিদ্রোহ নামে অভিহিত করিতে হয়।' সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখকের এই অভিমতের আলোকেই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু রচিত। এই উপন্যাসে সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে কুমারসিংহকে কেন্দ্র করে যে কাহিনীজাল বিস্তৃত হয়েছে, সিপাহী বিদ্রোহের অংশগ্রহণকারী সিপাহীদের সঙ্গে তার সংস্রব স্বার্থ-প্রণোদিত। ইংরাজ, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় হওয়ায় এবং বঞ্চনার চেষ্টা করায় বিদ্রোহকালে ইংরাজদের বিরোধিতা করে কুমারসিংহ প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করে নিয়েছেন। সিপাহী-বিদ্রোহে ইংরাজ ও সিপাহী পক্ষের কয়েকটি খণ্ড চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। ইংরাজ সৈনিক ও

২০. বামাবোধিনী, ফাল্গুন ১২৯০, মার্চ ১৮৮৪, পৃ. ৩৫০।

২১. অমরসিংহ, ১৮৮৯।

সিপাহীদের নারী-লোলুপতার কদর্য চিত্র লেখক পাশাপাশি চিত্রিত করেছেন। ইংরাজ নারী ও শিশুদের উপর সিপাহীদের অত্যাচার, ইংরাজ সৈন্যদের অত্যাচারকে অতিক্রম করেছে। এই ধরনের সিপাহীরা যে দেশহিতব্রতে ব্রতী হতে পারে না সে সম্পর্কে লেখক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন — 'সিপাহী বিদ্রোহের সিপাহীরা নবপিশাচস্বরূপ, স্বদেশোদ্ধার স্বরূপ মহাব্রত এরূপ নৃশংসেরা সাধন করিতে পারে না' (ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ)। সিপাহী-বিদ্রোহের ঘটনার স্রোতে ভাসমান কুমারসিংহ ও ভ্রাতা অমরসিংহের পারিবারিক জীবনের আশা-নৈরাশ্য, সুখ দুঃখ, আলো-ছায়ার বিচিত্র চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসটির পরিবেশ সৃষ্টিতে ঐতিহাসিকতা বহুলাংশে বঞ্চিত হয়েছে।

জগদীশপুরে কুমারসিংহের নিবাস হলেও অধিকাংশ সময় আরায় থাকতেন তিনি। বোর্ড অফ রেভিনিউয়ের আকস্মিক আচরণে 'কুমারসিংহের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল।' কুমারসিংহ ইংরাজদের প্রতি অবিশ্বাসী শুনে দিল্লীর বাদশাহের পরওয়ানা নিয়ে পাটনা থেকে আবার গুপ্তচর এসে কুমারসিংহকে যুদ্ধে রাজী করিয়ে গেল। গৃহত্যাগী ভ্রাতা অমরসিংহকে ফুলশাহ জানালেন যুদ্ধবার্তা। বাঁশুলিয়াবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, তিনি অমরসিংহকে গৃহধর্ম পালনে আদেশ করলেন এবং ভাইকে যুদ্ধে সহায়তা করতে বললেন সাঁড়ে না নেবার সময়ে স্ত্রী রাণীর সঙ্গে অমরসিংহের নব-পরিচয়ের কালে উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয় প্রকাশ পেল।

কুমারসিংহের নেতৃত্বে রাজপুতরা অসি কোষমুক্ত করে প্রতিজ্ঞা করল — 'এই অসি দ্বারা ইংরাজের রক্ত প্রবাহিত করিব।' পাটনার কমিশনার টেলর চিন্তিত হলেন। বিদ্রোহ শুরু হল। কুমারসিংহ শোননদ অতিক্রান্ত সিপাহীদের বরণ করলেন। ক্যাপ্টেন ডনবারের মৃত্যু হল। আরার চার ক্রোশ দূরে একজন সিপাহীর আস্ফালন 'আমাদের তরবারি ভগ্ন হইয়া গেল।' দারোগা রামশরণ আয়ারকে সাহায্য করতে চাইল। জানাল, অশ্বারোহী অমরসিংহ। আরা ইংরাজরা অধিকার করল।

এদিকে রাণী ও লছমীকে একটি গৃহে বন্দী করে সুরামত্ত রামশরণ রাণীকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলে রাণী ছুরি দিয়ে তাকে বধ করবে জানাল। এই সময়ে ফুলশাহ তাদের উদ্ধার করলেন। ফুলশাহের আজ্ঞায়

কুমারসিংহ বধূদ্বয়কে গৃহে বরণ করলেন। রাণী অমরসিংহকে সব ঘটনা বললেন। জগদীশপুরের দুর্গ ইংরাজ ধূলিসাৎ করল। দুটি গোয়ার হাত থেকে রামশরণের স্ত্রীকে ফুলশাহ রক্ষা করলেন। একটি অবিবাহিতা ইংরাজ তরুণীকে সিপাহীদের নিগ্রহের হাত থেকে অমরসিংহ রক্ষা করে আহত হলেন। ইংরাজ রমণী লরাকে বাঁশুলিয়াবাবা অমরসিংহের সেবায় কাজে নিযুক্ত করলে, উভয়ের পরিচয় ক্রমে গাঢ় হল। কুমারসিংহ আজমগড়ের পথে যুদ্ধে ইংরাজদের বারবার পরাজিত করলেন।

লরাকে সঙ্গে নিয়ে অমরসিংহ ফিরে এলেন রাণীর কাছে। লরা চলে গেল আরায়। ইংরাজের গুলিতে আজমগড়ে নদী পার হবার কালে কুমারসিংহের একটি হাত গেল। রামশরণের সহায়তায় অমরসিংহ ইংরাজের বন্দী হয়ে আরায় এলেন। অমরসিংহকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আনা হলে, রাত্রে লরা কৌশলে তাকে মুক্ত করে দিল। কুমারের আদেশে অমরসিংহ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে, যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতির মৃত্যু হল এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র রাজপুতের হস্তগত হল। কুমারসিংহ মারা গেলেন। রামশরণকে কৌশলে ফাঁসির হাত থেকে ফুলশাহ রক্ষা করলেন। কুমারসিংহের মৃত্যুর পর রাজপুতরা হতোদ্যম হয়ে সংখ্যায় কমে এল। বাঁশুলিয়াবাবা অমরসিংহকে নেপালে যেতে বললেন। যাত্রাপথে রামশরণ কর্তৃক অমরসিংহের প্রতি নিক্ষিপ্ত গুলি লছমী বুকে ধারণ করে মৃত্যু বরণ করল।

'অমরসিংহ' সুখপাঠ্য। চরিত্রচিত্রণে, ঘটনাসংস্থাপনে এবং বর্ণনার চারুত্বে উপন্যাসটি স্বাদু হয়ে উঠেছে। কুমারসিংহকে কেন্দ্র করেই কাহিনীজাল বিস্তৃত হয়েছে। বৃদ্ধ কুমারসিংহের আত্মসম্মানবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা ও সাহসিকতার সাক্ষ্য বহন করে এই উপন্যাস। ইংরাজ কর্তৃক প্রবঞ্চিত কুমারসিংহ প্রতিজ্ঞা করলেন,—'গঙ্গামুখ হইয়া প্রচণ্ড সূর্যদেব সাক্ষী, শপথ করিতেছি, এই অসি দ্বারা ইংরাজের রক্ত প্রবাহিত করিব।' কুমারসিংহ শেষ পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন এবং রাজপুতদের নেতৃত্ব দিয়ে এবং ভ্রাতা অমরসিংহকে স্থলাভিষিক্ত করে মৃত্যু বরণ করেছেন। অমরসিংহই এই উপন্যাসের নায়ক। সন্ন্যাসীর আবরণ মুক্ত করে অমরসিংহ যেন নতুনরূপে আবির্ভূত হলেন। কর্তব্যপরায়ণ যোদ্ধা ও প্রেমপরায়ণ স্বামীরূপে অমরসিংহ, এই উপন্যাসে একটি উজ্জ্বল স্থান গ্রহণ

করেছেন। প্রেমকাতর মন তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করেনি কিংবা, তাঁর প্রতি লরার প্রেমাকাঙ্ক্ষার কথা জ্ঞাত হয়েও তিনি তার বিন্দুমাত্র সুযোগ গ্রহণ করেননি। বরং লরার ইচ্ছানুসারে স্ত্রী রাণীর সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে লরাকে আপন আত্মীয়রূপে গণ্য করেছেন। ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তিনি ইংরাজ-দুহিতাকে সিপাহীদের নিগ্রহ থেকে রক্ষা করে নারীর প্রতি চরম সম্মান প্রদর্শন করেছেন। লরাও অমরসিংহকে বিপদ থেকে রক্ষা করে তার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও প্রত্যুপকারের চরম স্বাক্ষর রেখেছে। রামশরণ শঠতা, প্রবঞ্চনা ও কৃতঘ্নতার একটি উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। সে চরিত্রহীন, সুবিধাবাদী। ফুলশাহ তার স্ত্রীকে গোরাদের হাত থেকে রক্ষা করলেও অকৃতজ্ঞ রামশরণ ফুলশাহকে গুপ্তচর বলে ইংরাজদের কাছে ধরিয়ে দিয়েছে। এই উপন্যাসের দুটি নারী-চরিত্র রাণী এবং লছ্‌মী, সুন্দর। রাণীর গভীর ভালবাসাই অমরসিংহের বীরত্বের উৎস। জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার দিনে রাণীর অকৃপণ ভালবাসা অমরসিংহকে নৈরাশ্য ও হতাশার হাত থেকে রক্ষা করেছে। এরই পাশে বিধবা লছ্‌মীর চরিত্রটি আশা-আকাঙ্ক্ষাবিরহিত হয়েও উজ্জ্বল। স্বামীর জন্য রাণীর সাময়িক প্রতীক্ষা ও লছ্‌মীর চিরদিনের প্রতীক্ষার সুর তার গানে বেজে ওঠে 'সইয়া ঘরনা আয়ে বরস গয়ে অদরা' -ইত্যাদি। লরা যখন কখন বিবাহ করবে না জানায়, তখন লছ্‌মীর আকাঙ্ক্ষাহীন জীবনে শূন্যতার দিকটি তার ভাবনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে,—'লছ্‌মী ভাবিতে লাগিল, বাল-বৈধব্যের অপেক্ষা চির-কৌমার্য্য কি অধিক দুঃখের?' (দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ) লছ্‌মীর জীবনের বেদনাময় অনুভূতির একটি মর্মস্পর্শী চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন তার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে,—'লছ্‌মী আর একদিকে দাঁড়াইয়া ছিল।.... সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষে বিহঙ্গ-দম্পতি বসিয়াছিল, পশ্চাতে মানবদম্পতি পরস্পরের মুখ দেখিয়া সমুদয় জগৎ বিস্মৃত হইতেছিল। সায়াহ্নের আলোক ক্রমে মলিন হইয়া আসিতেছে। সেই হর্ষকোলাহলপূর্ণ, প্রণয়পূর্ণ সংসারে লছ্‌মীর থাকিয়া কি কাজ? এত লোক মরে, সে মরিল না কেন?' (এক-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ) পিয়ারী স্বামী-নির্যাতিতা হয়েও সাধ্বী রমণী। বাঁউলিয়াবাবা ও ফুলশাহ এই উপন্যাসের অপর দুই বিশিষ্ট চরিত্র। কুমারসিংহ ও অমরসিংহের কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এই দুই সাধুর দ্বারা। ফুলশাহের চরিত্রে অলৌকিকতার স্পর্শ বিদ্যমান।

মানুষের কল্যাণে, শত্রুমিত্র ভেদে, এই দুটি চরিত্র সহজেই আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছে।

সিপাহী-বিদ্রোহকে লেখক সমর্থন করেননি। সিপাহীদের আচার-আচরণের সঙ্গে কুমারসিংহ ও অমরসিংহের আচার-আচরণের সুস্পষ্ট পার্থক্যের রেখাও লেখক টেনেছেন। ইংরাজদের জয়ের কারণ নির্ণয় করে লেখক বলেছেন,—'সিপাহী-বিদ্রোহে ইংরাজদের জয় হইবার প্রধান কারণ—বিদ্রোহী নেতাগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের সহায়তা করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন নাই' (চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)। তাই আজমগড়ে ইংরাজ সৈন্য সমবেত হলে কুমারসিংহকে সাহায্য করবার জন্যে সিপাহীরা কেউ এগিয়ে আসেনি।

নগেন্দ্রনাথের মত আলোচ্যকালে সিপাহীযুদ্ধকে অবলম্বন করে কয়েকজন লেখক উপন্যাস রচনা করেছেন।[২২] এঁদের কেউই সিপাহী-বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি। রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস' (প্র-খ ১৮৭৬) এদের উপাদানের প্রধান উৎস ছিল।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পরবর্তী উপন্যাসের নাম 'লীলা'[২৩]। লীলা পারিবারিক উপন্যাস। একটি ভাগ্য-বিড়ম্বিত অসহায় বিধবা যুবতীর অশ্রুসজল ইতিবৃত্ত। লেখক তার জীবনের বেদনা ও ব্যর্থতা এবং অকালমৃত্যুর জন্য পাঠকের সহানুভূতি আদায় করেছেন।

কিরণের বিয়ের পর তার তের বছর বয়সের সময়ে, তার সঙ্গিনী হয়ে এল, সতের বছরের বিধবা লীলা। চৌদ্দ বছরে সে বিধবা হয়। শ্বশুরবাড়িতে আগে ছিল লক্ষ্মী, বিধবা হবার পর হল অলক্ষ্মী। তার মা আনলেন তাকে। মায়ের মৃত্যুর পর তার স্থান হল গ্রামসম্পর্কের মাসী লীলার মায়ের কাছে। এহেন লীলার জীবনকথা বলে, লেখক পাঠকের সহানুভূতি প্রার্থনা করে লীলার মুখের দিকে চেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল মুছতে বলেছেন (দশম

২২. (ক) গোবিন্দচন্দ্র রায়, চিত্তবিনোদিনী, ১৮৫৭, দ্বি. সং. ১৮৮৪। (খ) কালীপ্রসন্ন দত্ত বিজয়া, ১২৯১, (উপন্যাসের নায়ক তান্তিয়া তোপী)। (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রা, ১৮৮৭। (ঘ) সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর, ১৮৮৮। (ঙ) বরদাকান্ত সেনগুপ্ত, হেমপ্রভা, ১৮৯৪। লেখক তান্তিয়া তোপী ও তার ভাইকে শহীদের মর্যাদা দিয়েছেন। (চ) প্রসন্নময়ী দেবী, অশোকা ১৯৮৬।

২৩. লীলা, ১৮৯২, পৃ. ২৪৩, দ্বি. সং. ১৩০৬; ভারতী (১২৯০-৯১) তে অংশত প্রকাশিত।

পরিচ্ছেদ)। কিরণের নিত্যসঙ্গিনী হিসাবে, তার বিবাহিত জীবনের মিলন-বিরহ ও জীবনযাত্রার নীরব সাক্ষী হয়ে লীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। একাকীত্বের বেদনায় মথিত হৃদয়, তার মনের দুয়ারে নিষ্ফল মাথা কুটে আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিজনিত মনোবেদনায় নীরবে চোখের জল মুছেছে। নারীর মধ্যে মাতৃত্বের যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা তা হতাশ্বাসের মধ্য দিয়ে লীলা নিবৃত্ত করেছে। তার নিঃস্ব অবলম্বনহীন জীবনে একটি সন্তানকামনা, ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে অন্তর্হিত হয়েছে। জ্যোৎস্নারাতে মুক্ত জানালার মধ্য দিয়ে গড়িয়ে-পড়া জ্যোৎস্নাধারায় গোপালের নিদ্রিত মুখ দেখে সে ভাবে, 'আমার যদি একটি সন্তান থাকিত, তা হলে তাহার মুখ দেখিয়া সুখে থাকিতাম' (ষোড়শ পরিচ্ছেদ)।

কিরণের ছেলে হবার পর লীলা তাকে দখল করে বসল। তার নাম রাখল প্রফুল্ল। কিরণের স্বামী সুরেশের প্রতি লীলার নীরব ভালবাসা প্রকাশ পায়। তারপর কিরণের একটি সহজ ঠাট্টা ('দিদি, তুমি যদি এ বাড়ির গিন্নী হতে ত ঘরদোর বেশ পরিষ্কার থাকত' (ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ), লীলার লজ্জাকাতর হৃদয়টি স্পষ্ট করে তোলে। যেন অনধিকার চর্চা করেছে সে। সুরেশের দেওয়া বই পড়ে লীলা মনোবেদনা উপশম করতে চায়। কিন্তু লীলার চিন্তার মধ্যে তার একাকীত্বই ধরা পড়ে।

কিরণের মা মারা গেলে বাবা গোবিন্দপ্রসাদবাবু তের বছরের আনন্দময়ীকে বিয়ে করে আনলে লীলার হতাশাক্রান্ত জীবনের গতি অকালে পরিণামের পথে এগিয়ে আসে। নতুন গৃহিণীর দুর্ব্যবহারে মানসিক কষ্টে লীলা অস্থিচর্মসার হয়ে পড়ে। দুর্গাপূজার সময়ে মধ্যরাত্রে দেবীর সম্মুখে লীলার নিঃশব্দ ক্রন্দন যেন তার জীবনের শূন্যতার বিষণ্ণ ধারারূপে প্রকাশ পায়। তারপর আনন্দময়ী ও বিন্দুবাসিনীর উক্তিতে লীলা ও সুরেশের মধ্যে কল্পিত অবৈধসম্পর্কজনিত সন্দেহ লীলার অকালমৃত্যুর কারণ হল।

লীলার জীবনের নৈরাশ্য ব্যথা ও অসহায়তাকে লেখক নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। লীলার বৈধব্যজনিত অসহায়তা ও অনিচ্ছাকৃত পরমুখাপেক্ষিতা তার সমগ্র আচরণের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে অভিব্যক্ত। লেখকের সহানুভূতির নির্যাসসিক্ত চরিত্রটি অনায়াসেই পাঠকের সহানুভূতি ও অনুকম্পালাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিরণ, সরল।

হানুভূতিশীলতা তার চরিত্রের অপর গুণ। স্নেহময়ী কিরণের পাশে, রাগী, দমাকী অর্থবিত্ত অহঙ্কার ও অলঙ্কারসর্বস্ব মনোমোহিনীর চরিত্রটি কিরণের চরিত্রকে স্পষ্টতর করে তুলেছে। ঠিক তেমনি দেখা যায় মনোমোহিনীর স্বামী গণেশের ক্ষেত্রে। কবিস্বভাবসম্পন্ন সুরেশের বন্ধু শিক্ষাভিমানী গণেশকে সুরেশের বিপরীত চরিত্ররূপে চিত্রিত করে, লেখক সুরেশের অমায়িকতা ও সহৃদয়তাকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন। বৃদ্ধের তরুণী ভাষারূপে ছলনাময়ী আনন্দময়ীর চরিত্র স্বাভাবিকতাপূর্ণ। লীলা তার ক্রীড়নক। 'পাখা ছিঁড়িবার আগে প্রজাপতিটা যদি হাত হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে ছেলেরা যেমন নিরাশ হয়, লীলা কিরণের সহিত চলিয়া গেলে পর আনন্দময়ীর মনের অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইল' (চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ)। আনন্দময়ীর মা সম্পর্কে লেখকের উক্তি—'আনন্দময়ীর মাকে যে ভালচক্ষে দেখিত, সেই বলিত, মাটির মানুষ, যে মন্দ চক্ষে দেখিত, সে বলিত, যেন ভিজে বেরালটি' (পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ) তার চরিত্রজ্ঞাপক। আনন্দময়ীর মায়ের সঙ্গে 'স্বর্ণলতা'র গদাধর-জননীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। ঠাকুরমার চরিত্রটি স্নেহে ও অনুকম্পায় অনবদ্য। কিরণ লীলাকে নিয়ে চলে যাবার কালে ঠাকুরমার চোখে জল এল। 'গাড়ী চলিয়া গেল। গাড়ীর সঙ্গে যেন ঠাকুরমার প্রাণের খানিকটা চলিয়া গেল।' অনাথিনী লীলার প্রতি ঠাকুরমার গভীর স্নেহ, ত্রয়োদশবর্ষীয়া ঈর্ষাকাতর আনন্দময়ীর হৃদয়ের অমানবিক স্তরগুলিকে যেন উন্মুক্ত করে দেয়।

এই উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ভাষা এবং রচনাভঙ্গী উন্নতস্তরের। ঘটনার পারম্পর্যও রক্ষিত হয়েছে এই উপন্যাসে। তবে অতিকথন ও বর্ণনার আধিক্য অনেক সময় গল্পরস বিঘ্নিত করেছে। তা সত্ত্বেও গল্পের পরিণতি জানবার পক্ষে লেখক পাঠকের কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখতে পেরেছেন। পরিচ্ছেদের নিচে শিরোনাম এবং পাঠককে আহ্বান প্রভৃতি রীতি বঙ্কিমী। মেয়েদের রূপবর্ণনায় অবকাশকে লেখক সদ্ব্যবহার করেছেন। লীলা হৃদয়তাপে দগ্ধ, পরমুখাপেক্ষী অসহায়া, একটি বিধবা যুবতীর অশ্রুসজল জীবনালেখ্য।

'তমস্বিনী'[২৪] নগেন্দ্রনাথের চতুর্থ উপন্যাস। উপন্যাসটি 'প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনকে বহুবর্ষব্যাপী সাহিত্যপ্রীতির চিহ্নস্বরূপ উপহৃত'।

২৪. তমস্বিনী, ১৯০০, পৃ. ২৩৭।

এই উপন্যাসে লেখক পরিবেশ, কুসংসর্গ ও লালসাজনিত কয়েকটি চরিত্রের স্খলন ও তজ্জনিত কুফল দেখিয়েছেন। এইসব চরিত্রের ক্ষেত্রে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মানুশোচনার মধ্য দিয়ে আত্মশোধন ও মানসিক প্রায়শ্চিত্ত ঘটান হয়েছে। অবৈধ যৌনজীবন যাপন যে ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অহিতকর এবং অশান্তিকর এই কথা স্পষ্টীকৃত করার চেষ্টা আছে এই উপন্যাসে। বাংলা ভাষায় যৌন সমস্যাকে কেন্দ্র করে লিখিত উপন্যাসের মধ্যে এইটিই প্রথম। এদিক বিচারে নগেন্দ্রনাথ একটি আধুনিক জটিল সমস্যার প্রতি অঙ্গুলি হেলন করেছেন। সৎপথে থেকে, মানুষের অবৈধ যৌনাবেগকে দমন করে, ধর্মাচরণের ভিত্তিতে জীবনযাপনের মধ্যে সত্যিকার সার্থকতার পথ যে নিহিত, সেই সত্যে বিশ্বাসী লেখক।

মুক্তকেশীর সঙ্গে চারুবালার বন্ধুত্ব। স্বর্ণময়ী চারুর পিসতুত বোন। পিতৃহীনা স্বর্ণ, মামা প্যারীমাধবের বাড়ি থাকে। বারো বছরের স্বর্ণের বিবাহে অনিচ্ছা। মুক্তকেশীর স্বামী শ্যামাচরণ একটু সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। চারু ও তার স্বামী রজনীকান্ত উভয়েই লাজুক প্রকৃতির। 'রাত্রে প্রদীপ নিভাইয়া না শুইলে, দুইজনের লজ্জা করিত, একটু বেশী চোখাচোখি হইলে চক্ষু নত করিত।' স্বর্ণের সঙ্গে হেমন্তকুমারের বিয়েতে স্বর্ণের মায়ের ইচ্ছা থাকলেও হেমন্ত বড়মানুষের ছেলে না বলে তার মামা ও মামীর আপত্তি ছিল। 'স্বর্ণময়ীর বাল্যজীবনে — গতপ্রায় কৈশোরের পথে হেমন্তকুমারের ছায়া পতিত হইয়াছিল।' 'কোন্নগরে বাগান ঘেরা পুকুরপাড়ে স্বর্ণ ও হেমন্ত বিচ্ছেদকাতর হৃদয়ে একে অপরের সম্মুখীন হলে বিনা বাক্যব্যয়ে উভয়ের অধর মিলিত হইল। ...স্বর্ণময়ী যখন উঠিল তখন তাহার বাল্যকাল অতীত হইয়াছে। একটিমাত্র চুম্বনে তাহার শৈশব লুপ্ত হইল।'

প্যারীমাধবের গৃহে অনেক বিধবার মধ্যে পিসী ও শ্যামা উল্লেখযোগ্য। শ্যামা, তরুণী সুন্দরী। 'যুবতীদের রঙ্গরসের কথায় ইহার যেমন মন, গঙ্গাস্নানে বা ঠাকুরদেবতার কথায় তেমন মন ছিল না।' মুক্তর প্রণয়কথা শুনে শ্যামার শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠত, চোখে জল আসত, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বইত। একদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রজনীকান্ত বন্ধু রমানাথের রক্ষিতা আতরের বাড়ি এসে ঘামতে লাগল। আতর তাকে আসতে অনুরোধ করলে 'সে চোরের মত কহিল, এপথে আমি আসি না।' স্বর্ণের বিবাহের পূর্বে মনে পড়ল 'মল্লিকা

কুসুমতুল্য মৃদুস্পর্শ চুম্বনের' কথা। বিবাহোত্তর কালে হেমন্তর সঙ্গে স্বর্ণময়ীর আগের মত কথাবার্তা হত। 'স্বর্ণময়ী ও হেমন্তকুমার ভাসিয়া কোথায় যাইতেছিল, কে জানে?' মুক্তর ভাই পনের বছর বয়স্ক বৈকুণ্ঠের উপর শ্যামার আকর্ষণ জন্মাল। বৈকুণ্ঠ আদর-আব্দার করে শ্যামার গায়ে এসে পড়লে 'এক এক বার শ্যামার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিত'।

গোবিন্দচন্দ্র একটু-আধটু মদ খেয়ে আমোদ-আহ্লাদ করলে স্ত্রী সুকুমারী গ্রাহ্য করতেন না। স্বর্ণময়ীর স্বামী কান্তিচন্দ্র হেমন্তের সঙ্গে তার স্ত্রীর মেলামেশা সন্দেহের চোখে দেখত। স্বর্ণ মিথ্যাকথা বলত। শ্যামা বৈকুণ্ঠের সঙ্গে গান গাইত। একদিন কৌতূহলী শ্যামাচরণ একটি দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হলেন। 'শ্যামা শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। বৈকুণ্ঠ শয্যায় উপবেশন করিয়া শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া গান করিতেছিল। শ্যামার চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, কখন বৈকুণ্ঠের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল, কখন অন্য দিকে চাহিতেছিল।' শ্যামাচরণ মুক্তকে সব কথা আভাসে জানালে বৈকুণ্ঠকে দেশে পাঠানো ঠিক হল।

রজনীকান্ত আতরের সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। রাত্রে রজনীকান্ত বিছানা ছেড়ে রোজ উঠে যায়। চারু মর্মাহত হয়। পিতা দীনবন্ধু ক্রুদ্ধ হন। শ্যামার পরিবর্তন শুরু হল। চারুবালার মা তাকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন। কিন্তু, 'চারুবালার যাহা কর্তব্য সে তাহাই করিল। পিত্রালয়ে গেল না।' একদিন রাত্রে স্বর্ণময়ী সন্দিগ্ধ কান্তিচন্দ্রের লাথি খেল। পত্রে হেমন্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাত্রে সবত্যাগিনী হয়ে বাগানে দেখা করল তার সঙ্গে। সে ডুবে মরতে চাইলে হেমন্ত তাকে বুকে টেনে নিল। স্বর্ণ মামার বাড়ি চলে এলে প্যারীমাধব স্বর্ণ ও তার মাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। একদিন রাত্রে গোবিন্দচন্দ্রের বন্ধুরা মদ্যপানে অচৈতন্য গোবিন্দ এবং একটি বেশ্যাকে ধরাধরি করে গোবিন্দচন্দ্রের বৈঠকখানায় রেখে এলে, পরদিন সকালে স্ত্রী সুকুমারী দেখলেন, 'উভয়ের বেশবাস স্খলিত, সুরাপানে মুখ লোহিতবর্ণ, মুখের উপর মাছি উড়িতেছে।' তারপর লজ্জায় ও আত্মানুশোচনায় জর্জরিত 'গোবিন্দচন্দ্র ছুটি লইয়া সস্ত্রীক তীর্থপর্যটনে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় তাঁহারা আর ফিরিলেন না।' রজনীকান্ত আতরকে যথাসর্বস্ব দান করে রিক্ত হয়ে আতরের কাছে এলে সে প্রত্যাখ্যাত হল। অবশেষে একদিন আতরকে সে হত্যা করল। রজনী কারাগারে 'আসন্ন মৃত্যু অপেক্ষা লজ্জা ঘৃণার

অপমানের যন্ত্রণা সহস্রগুণে অধিক বোধ করল। রজনীকান্তের ফাঁসি হল। হেমন্ত স্বর্ণময়ীকে নিয়ে বাড়িতে থাকাকালে, তার নির্বাসিত জীবনের জন্য দায়ী করল স্বর্ণকে। স্বর্ণ জলে ডুবে আত্মহত্যা করল।

যৌনাকাঙ্ক্ষা ও তার পরিণামকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটিতে কয়েকটি অবৈধ প্রণয়কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে।

(১) বিবাহিতা স্বর্ণ ও হেমন্তকুমার।

(২) বিধবা শ্যামা ও কিশোর বৈকণ্ঠ

(৩) বিবাহিত রজনীকান্ত ও গণিকা আতর।

(৪) নিঃসন্তানগৃহী গোবিন্দচন্দ্র ও বাঈজী

মোটামুটি একটি সাধারণ সূত্রে, ক্ষুদ্র বৃহৎ এই কয়টি কাহিনীকে যুক্ত করে উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে লেখক উপন্যাসটিতে নগ্ন বাস্তবতার প্রবর্তন করতে চেয়েছেন।

নগেন্দ্রনাথের তমস্বিনী 'বাংলা ভাষায় বাস্তব সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম প্রয়াস বলিতে পারা যায়।'[২৫] কিন্তু লেখক নগ্ন বাস্তবতার উপর আবরণ টেনে তার বক্তব্যকে সংকুচিত ও লজ্জিত করেছেন। নগেন্দ্রনাথের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেনকে একটি পত্রে (১২ই আশ্বিন ১৩০৬) তমস্বিনী সম্পর্কে ব্যক্তিগত মত জ্ঞাপন করে বলেছেন,– 'নগেন্দ্র গুপ্তর তমস্বিনী পড়ে দেখলুম ঠিক হয়নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গালা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত realism এর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে নেমে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এরকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভালো, স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আরো নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্বক সব কথা বলতে পারেননি, সেইজন্য তার self conscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটাকে লজ্জিত করে তুলেছে নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনাবিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নিঃসংকোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি করেছেন। এসব জিনিস তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন, অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্যে সব

২৫. প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯।

কথা ভালো করে প্রকাশ করতে পারেননি'।[২৬] গ্রন্থটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ এবং যথার্থ। তমস্বিনীর বাস্তবতা দ্বিধাগ্রস্ত। নগেন্দ্রনাথ একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের চরিত্র-দর্শন করেছেন। কিন্তু তাঁর সাধ্য, সাধকে অতিক্রম করতে পারেনি। তমস্বিনীর কাহিনী-বিন্যাসে শৈথিল্য স্পষ্ট। কাহিনীগুলি যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। এগুলির যোগসূত্র দুর্বল হওয়ায় প্লট সংহতিহীন। একদিকে নগ্ন বাস্তবচিত্র অঙ্কনে আড়ষ্টতা, অন্যদিকে প্লটের সংহতিহীনতা বইটির লক্ষণীয় ত্রুটি। পদস্খলিত চরিত্রগুলির পরিণাম ও একমুখী,—আত্মানুশোচনা, আত্মশোধন কিংবা মৃত্যু। যেমন, স্বর্ণ ও রজনীকান্তের মৃত্যু। হেমন্ত, শ্যামা ও গোবিন্দচন্দ্রের অনুশোচনাজনিত পরিবর্তন।

এই উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ কয়েকটি নারী-চরিত্রকে আদর্শ হিসাবে চিত্রিত করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে সুকুমারী, মুক্তকেশী ও চারুবালা। গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী সুকুমারী। স্বামীর প্রতি তার প্রেম ও সহিষ্ণুতা অশেষ। পতিত স্বামীকে সহজেই তিনি ক্ষমা করে নিতে পেরেছেন। এবং অভিমানের দূরত্ব রচনা না করে অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে, স্বামীর পতনজনিত কুণ্ঠার অপনোদন করে আত্মশুদ্ধির পথ মুক্ত করে দিয়েছেন। শ্যামাচরণের স্ত্রী মুক্তকেশী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। কিন্তু স্বামীর প্রতি তার ভক্তি অচলা। স্বামী তাকে সন্দেহের চোখে দেখলেও সে স্বামিগতপ্রাণা। আতরের মৃত্যু ও স্বর্ণময়ীর গৃহত্যাগ, তার চরিত্রে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, স্বামীর প্রতি আকর্ষণ তীব্রতর হয়। স্বামীর পা ধরে সে বলে, 'যেন তোমার চরণে আমার ভক্তি দৃঢ় হয়।' রজনীকান্তের স্ত্রী চারুবালা স্বামীকে নিষ্ঠার সঙ্গে ভালবেসেও স্বামীর কাছ থেকে পেল কঠিন আঘাত। আঘাতজনিত এই অভিমানবোধই তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ। এইখানে কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমরের সঙ্গে তার চারিত্রিক সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই অভিমানবোধের সঙ্গে মিশেছে তার আত্মসম্মান বোধ। রজনীকান্তের বেশ্যাগৃহে গমনের সংবাদে সে তৎক্ষণাৎ বিছানা ত্যাগ করে সর্পিণীর মত উঠে দাঁড়ায়। প্রতিরাত্রি স্বামী তাকে ত্যাগ করে যাবার কালে স্বামীর প্রতিটি পদশব্দ যেন তার হৃদয়ে বাজে ('যে চরণযুগল চারুবালা বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছিল। সেই চরণতলে হৃদয় মর্দিত

২৬. বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১৩৫০ বৈশাখ।

হইতেছে')। স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণেও চারু প্রেমময়ী। স্নেহে, ধৈর্যে ও সতীত্বে সে যেন আদর্শ প্রতিমা।

বিধবা শ্যামা লাস্যময়ীরূপে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীকালে তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। রজনীকান্তের চারিত্রিক পতনের পশ্চাতে কোন মনস্তাত্ত্বিক ধাপ রচিত হয়নি। হেমন্তকুমার ও স্বর্ণের অসামাজিক জীবন-যাপনের কাহিনী এবং সমাজ-বিচ্ছিন্ন হেমন্তের বিতৃষ্ণা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রসাদপুরে বাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। নগেন্দ্র-নাথের এই পরীক্ষামূলক উপন্যাসটিতে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসে যৌনসম্পর্কিত বিষয়ের অবতারণায় তাঁর প্রচেষ্টা প্রথম বলে স্বীকৃতি পাবে।[২৭]

বঙ্কিম-সমকালে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত উপন্যাসরচনায় সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনীবিন্যাসের ক্ষেত্রে তার উপন্যাসে একটি গতিশীল ধারা লক্ষ করা যায়। যার ফলে রচনারীতি পাঠকের গ্রহণক্ষমতার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। কাহিনীর মধ্যে কৌতূহল ও নাটকীয় চমক সৃষ্টি করে তিনি তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। গল্পবলার কৌশলটি তিনি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। বিষয়নির্বাচনেও নগেন্দ্রনাথ স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তার উপন্যাসগুলি সুখপাঠ্য। তবে গঠনরীতি ও প্রয়োগ-কৌশলের ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিম-প্রভাব সর্বাংশে এড়াতে পারেন নি। পর্যবেক্ষণক্ষমতা, বাস্তব দৃষ্টি বোধ এবং সহানুভূতিশীলতা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিক ও সজীব করে তুলেছে। ব্যর্থতা সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে উন্মুক্ত 'realism' এর অবতারণা করে নগেন্দ্রনাথ এই ধারার পথিকৃৎ-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

২৭. **অন্যান্য উপন্যাস—**

জয়ন্তী, ১৯২৯, আরাতামা, ১৯৩০ ; ব্রজনাথের বিবাহ, ১৯৩১।

।। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত

সমালোচক, সাংবাদিক এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে হারাণচন্দ্র রক্ষিত একদা বঙ্গসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। 'কর্ণধার' পত্রিকার সম্পাদকরূপে পত্রিকাটিকে একটি সুন্দর সাহিত্য ও সমালোচনামূলক পত্রিকায় পরিণত করে তিনি সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন।

সেক্সপীয়রের অনুবাদ করে তিনি যশের অধিকারী হন। তাছাড়া 'বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম' (১৮৯৯, তৃ. সং. ১৯১০), 'ভিকটোরীয় যুগে বাংলা সাহিত্য' (১৯১১), 'সাহিত্য সাধনা' (১৯০১) প্রভৃতি সমালোচনা-গ্রন্থ তৎকালীন সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সংযোজন। হারাণচন্দ্র সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয়বিধ উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রচনার প্রেরণা, তাঁর স্বদেশ-চেতনা। একদাখ্যাত হারাণচন্দ্র ও তাঁর রচনাবলী আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্তপ্রায়।

হারাণচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুলালী'[১] একটি সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-পত্রে লেখক লিখেছেন, 'যাহা তাঁহাদিগের নিকট শিখিয়াছি তাহাই আজ তাঁহাদিগকে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি লেখকের ঋণ-স্বীকৃতির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। লেখক উপন্যাসটিতে ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়ের কাহিনী বিবৃত করেছেন।

বাসন্তীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রাজাবাহাদুর উপাধিধারী। কুচক্রী, কুৎসিত, কুব্জ, ত্রিবক্র, নরেন্দ্রনারায়ণের ভাঁড়। ত্রিবক্র জনসাধারণ কর্তৃক অবজ্ঞেয়। তাই তার মনে প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রবল। ত্রিবক্র আপন চাতুর্যে শেষপর্যন্ত নরেন্দ্রনারায়ণের একান্ত সচিব হয়। ত্রিবক্রের সান্নিধ্যে ও মন্ত্রণায় নরেন্দ্রনারায়ণ একটি কামোন্মত্ত পশুতে পরিণত হল।

পারিবারিক জীবনে ত্রিবক্র কন্যা দুলালীর স্নেহশীল পিতা। স্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও কন্যাকে বিবাহ দেয় না, কন্যা পর হয়ে যাবে বলে। এদিকে প্রতিদিনই একটি নারীকে নরেন্দ্রের ভোগে ত্রিবক্র সমর্পণ করে। তা না হলে নরেন্দ্র অন্ন

১. দুলালী, সন ১২৯৯ সাল (১৮৯৩), পৃ. ১০৬।

মানুষে পরিণত হয়। ত্রিবক্রের স্ত্রী কমলার মৃত্যুর পর পঞ্চদশী দুলালীকে একটি পরিচারিকার অধীনে জমিদারের সীতারামপুরের বাগানবাড়িতে সে রেখে আসে। ইতিমধ্যে ত্রিবক্র নরেন্দ্রের গুরু তান্ত্রিক রুদ্রনারায়ণের কন্যা প্রভাবতীকে নরেন্দ্রের কামাহুতিতে সমর্পণ করে। রুদ্রনারায়ণ ত্রিবক্র ও নরেন্দ্রকে অভিশাপ দেয়।

মাধব ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিরাজমোহিনীকে নরেন্দ্রের ভোগে উৎসর্গ করবে বলে ত্রিবক্র আশ্বাস দেন। ঘটনাকালে একটি অঘটন ঘটে। যে মন্দির থেকে বিরাজমোহিনীকে লুন্ঠন করার কথা, সেই মন্দির থেকে ভুলক্রমে ত্রিবক্রের অনুচরবর্গ দুলালীকে ধরে এনে নরেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করে। ত্রিবক্র সীতারামপুরে এসে এই খবর পেয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নরেন্দ্রের কাছে যায়। নরেন্দ্রের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে দুলালী পিতৃপরিচয় দিয়েও রক্ষা পায় না। প্রবল গর্জনে ত্রিবক্র নরেন্দ্রের ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রতিশোধস্পৃহায় কোষমুক্ত অসি দিয়ে নরেন্দ্রকে আঘাত করতে গিয়ে অন্ধকার কক্ষে কন্যা দুলালীর শিরশ্ছেদন করে। ত্রিবক্রের আর্তনাদের মধ্য দিয়েই গ্রন্থের সমাপ্তি।

ত্রিবক্র উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র। দুলালী নামকরণের মূলে ত্রিবক্রের দ্বৈতসত্তার সম্পর্ক জড়িত। উৎকট স্নেহজনিত স্বার্থের বশে সে কন্যাকে অনূঢ়া রেখে শেষে কন্যার সতীত্বহানি ও অকালমৃত্যুর কারণ হয়। তার চরিত্রে নির্মমতা ও মমতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। পিতা হিসাবে সে যেমন স্নেহশীল, তেমনি অপরদিকে অন্যের ক্ষেত্রে প্রতিশোধস্পৃহ নির্মম। ত্রিবক্রের মধ্যে মানবিক গুণের অপর পরিচয় পাই, পত্নীবিরহে তার অনুশোচনাজনিত আত্মচিন্তার মধ্যে (বিংশ পরিচ্ছেদ)। তার পাপ সম্পর্কে সে সচেতন। পত্নীর মৃত্যুর জন্য সে মানুষকে শত্রু বলে মনে করল। তাই তার সিদ্ধান্ত, 'যে কয়দিন পৃথিবীতে থাকিব, প্রাণ ভরিয়া লোকের সঙ্গে শত্রুতা করিব' (পৃঃ ৬৫)। দুলালীর ভূমিকা ক্ষুদ্র হলেও সে উপন্যাসের চরম প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। তার মৃত্যুই সেই সিদ্ধি। উপন্যাসটি চরিত্রপ্রধান। ত্রিবক্রই উপন্যাসটির মেরুদণ্ড।

উপন্যাসটির পরিণতি যেন দৈব-নিয়ন্ত্রিত। লেখক অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। অলৌকিক ঘটনার সংযোজন বঙ্কিম-অনুসৃত। ব্রহ্ম অভিশাপের পরিণাম

দেখান হয়েছে এই উপন্যাসে। ত্রিবক্রের প্রতি রুদ্রনারায়ণের অভিশাপ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ঘটনাসংস্থাপনে লেখক সচেতন থেকেছেন। চন্দ্রনাথ বসু ত্রিবক্রকে 'উৎকৃষ্ট নাটকের উপযোগী চরিত্র' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২] 'অনুসন্ধান'[৩]এ দ্বিতীয় সংস্করণ সমালোচনা প্রসঙ্গে দুলালীর সৌন্দর্য-বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

লেখকের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'বঙ্গের শেষ বীর'[৪] প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। প্রতাপাদিত্যের স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠন পরিকল্পনার বিষয়ই মুখ্য বিষয়। বঙ্গের শেষ বীর রচনার পূর্বে প্রতাপকে অবলম্বন করে যে দুখানি উপন্যাস রচিত হয়েছে (প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয় এবং রবীন্দ্রনাথের বউ ঠাকুরাণীর হাট), সেই দুখানি উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। হারাণচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে প্রতাপকে স্বদেশপ্রেমিক ও বীররূপে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসটি অনেকটা জীবনীমূলক। বাঙ্গালী সহজে ইতিহাস পড়তে চায় না বলেই লেখকের এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের অবতারণা (ভূমিকা)। ইতিহাস ও উপন্যাসের পার্থক্য নিরূপণ করে লেখক বলেছেন, 'উপন্যাসের যথাসাধ্য পরিপুষ্টির জন্য আমাকে অনেক স্থলে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে কিন্তু এই কল্পনা কোথাও সত্যের সীমা অতিক্রম করে নাই। খুব বড একটা আদর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, যতটা ইতিহাসের 'গণ্ডী'র বাহিরে যাওয়া অনিবার্য হয়, আমি ততটা গিয়াছি মাত্র। তবে ইহা নিশ্চয় যে, উপন্যাস, উপন্যাস—ইতিহাস নহে' (ভূমিকা)। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের এই ধারণার পরিচয় পাই এই উপন্যাসে কল্পিত কাহিনীর সংযোজনে।

গ্রন্থরচনার কাল থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ' বছরের আগেকার ঘটনা। তখন মোগলরাজত্বের অভ্যুদয়কাল। 'রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় এখন পরকালচিন্তায় বিভোর।

'প্রতাপের জন্মকাল ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ। প্রতাপাদিত্য, বিক্রমাদিত্য রায়ের একমাত্র পুত্র গৌড়েশ্বর সুলেমান ও দাউদের চরিত্রই প্রতাপের বাল্যশিক্ষার

২. গ্রন্থের নামপত্রের পর সংযোজিত পত্র, ২৫এ মাঘ, ১২৯৯।

৩. অনুসন্ধান, ২৪এ ভাদ্র, ১৩০৪, পৃ. ২০৪।

৪. বঙ্গের শেষ বীর, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩০৪, ইং ১৮৯৭, পৃ. ২৯৬। চঃ স. ১২১৭।

প্রধান উপকরণ হয়।'...বিক্রমাদিত্য বসন্তরায়কে জানান যে প্রতাপ স্বাধীন ভূপতি হয়ে পিতৃহন্তা হবে। প্রতাপের স্ত্রী পদ্মিনী প্রতাপকে বলেন যে, তিনি স্বপ্নে জেনেছেন, প্রতাপ স্বাধীন নৃপতি হবেন। প্রতাপ বসন্তরায়কে জানান যে, 'মোগল বাদশাহের অনুগ্রহে ক্ষুদ্র যশোহরটুকুর প্রভুত্ব করিয়া সন্তুষ্ট থাকা আমার ধাতে সহিবে না।'

বিক্রমাদিত্যের কথামত প্রতাপ আগ্রায় গেলেন। সঙ্গে গেলেন প্রাণোপম বন্ধু শঙ্কর ও সূর্যকান্ত। আগ্রাযাত্রাকালে হিন্দুর অধঃপতনের চিন্তা প্রতাপকে বিমূঢ় করে তোলে। আগ্রায় তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে আকবরের চরিত্র অধ্যয়ন করেন। সূর্যকান্ত আরবী-পারসী শেখার জন্য আগ্রার তোরাব আলির শিষ্যত্ব নেয়। তোরাব আলির বাড়ির পালিতা মেয়ে ফুলজানিকে কেন্দ্র এবং সূর্যকান্তকে উপলক্ষ করে 'তোরাবের হৃদয়ে দারুণ হিংসার আগুন জলিতে আরম্ভ করিল।' সূর্যকান্ত ও ফুলজানির মধ্যে প্রণয় গভীরতর হল। ফুলজানির কাছ থেকে সূর্যকান্ত জানল, তোরাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক 'হিন্দুর সহিত মুসলমানের সম্পর্ক।'

সম্রাটের 'ফরমানে' প্রতাপ যশোহর রাজ্যে অভিষিক্ত হলেন এবং তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার পেলেন। আর রাজ্যরক্ষার জন্য প্রতাপের অনুরোধক্রমে সম্রাট তাঁকে 'দ্বাবিংশতি সহস্র' সৈন্য দিলেন। 'এতদিনে প্রতাপের জীবনযজ্ঞের মহা আযোজন অনুষ্ঠিত হইল।' প্রতাপ যশোহরে এলেন।

প্রতাপ উড়িষ্যাকে আপন অধীনে আনলেন। 'বাঙ্গালীর স্বাধীনতাস্পৃহা আবার বলবতী হইল'। বাগ্মী শঙ্কর ঘুরে বাংলার প্রত্যেক স্থান ভ্রমণ করে সকলকে স্বাধীনতারক্ষার জন্য মাতিয়ে তুললেন। আর, 'সূর্যকান্ত বঙ্গের দুঃস্থ অধিবাসীবর্গকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিলেন'।

রাজ্যাভিষেকের দিন প্রতাপ সকলকে প্রার্থিত বস্তু দান করলেন। 'সেই দিন হইতে বঙ্গদেশ স্বাধীন হইল। সেই দিন হইতে প্রতাপাদিত্যের নামে মুদ্রাদিরও প্রচলন হইল।'

ফুলজানির সঙ্গে সূর্যকান্তের হঠাৎ সাক্ষাৎ হল। সূর্যকুমার ফুলজানির মধ্যে 'মোগল অত্যাচারে প্রপীড়িতা দুঃখিনী বঙ্গভূমিকে' প্রত্যক্ষ করে। ফুলজানির মনে স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সূর্যকান্তের প্রেমের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কিন্তু স্বদেশপ্রেম তথা হিন্দুপ্রেম তার মনে প্রাধান্য বিস্তার করে।

প্রতাপ চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহ দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জামাতার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তার ছিন্নমুণ্ডের দাবি করলে উদয়াদিত্য ও বসন্তরায়ের সাহায্যে রামচন্দ্র পালিয়ে রক্ষা পান।

বসন্তরায়ের পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ঘটনাচক্রে প্রতাপ বসন্তরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দকে ও বসন্তরায়কে হত্যা করেন। বসন্তের স্ত্রী কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব ওরফে কচুরায়কে নিয়ে কচুবনে পলায়ন করেন। পরে তিনি সহমৃতা হন। রাঘব প্রতাপের কাছে থাকে। বসন্তরায়ের কর্মচারী রূপরামের আবেদনে হিজলীর অধিপতি ঈশা খাঁ রাঘবকে উদ্ধার করেন। প্রতাপ ঈশা খাঁকে যুদ্ধে পরাভূত করে হত্যা করলেন। তারপর পর্তুগীজ জলদস্যু দমন করলেন।

রাজমহলের মোগল শাসনকর্তা শের খাঁ শঙ্কর এবং এক তরুণবয়স্ক কুমারকে কারারুদ্ধ করলেন। কুমার ছদ্মবেশী ফুলজানি। কৌশলে উভয়ে কারামুক্ত হল। প্রতাপ শের খাঁর গতিরোধ করে সপ্তগ্রাম ও রাজমহল অধিকার করলেন। সেলিম বাদশাহ হলে, সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধকালে কচুরায় ও রূপরাম তাঁকে সহায়তা করল। প্রতাপ মন্দিরে এসে মাতৃমূর্তি দর্শনে চমকে উঠলেন। বিমানে দৈববাণী হল 'ভারতের হিন্দুশক্তি ও আর্য সভ্যতার পুনরুদ্দীপন করিতে সুদূর শ্বেত দ্বীপ হইতে শ্বেতকায় ও সুসভ্য একদল জীবিত জাতি শীঘ্রই এখানে আগমন করিবেন। তাঁহারাই ভারতের ভাবী সম্রাট।'

যুদ্ধে ফুলজানি গোলার হাত থেকে সূর্যকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করল। আহত সূর্যকে তোরাব হত্যা করল। মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপ পরাস্ত হলেন।

'সন্ধ্যা আগমনের সহিত ক্রমে কালরাত্রি ঘনাইয়া আসিল। সে রাত্রি আর পোহাইল না। বঙ্গের শেষ বীরের জীবন-সন্ধ্যার সহিত তাহা চির আঁধারে পর্যবেসিত হইল!' মানসিংহ তাদের বন্দী করে শিবিরে নিয়ে গেলেন।

বঙ্গের স্বাধীনতা-সংগ্রামের তথা হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পুরোধারূপে মোগলের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতাপকে, লেখক স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর সৈনিকের সম্মান দান করে, তার চরিত্রকে মহত্ত্বের আবরণমণ্ডিত করেছেন। প্রতাপই উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই চরিত্রপ্রধান উপন্যাসটিতে বৈচিত্র্যসাধন

প্রয়াসে একটি কল্পিত উপকাহিনী (সূর্যকান্ত-ফুলজানি) সংযোজিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে হিন্দু অতীতকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন বা যে হিন্দু অতীতের জয়গান করেছেন মনে হয় সেই চিন্তাসূত্রেই হিন্দুত্ববোধ লেখককে এই উপন্যাসরচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। বাঙ্গালীর বাহুবল এবং হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম (১৮৮৭ খৃ সং ১৮৯৪)এর সূচনা। এই হিন্দুত্ববোধ ও বাঙ্গালীর শক্তি প্রদর্শনের সূত্রেই লেখক প্রতাপাদিত্যের চরিত্র রচনায় ব্রতী হয়েছেন

প্রতাপের চরিত্রের তেজস্বিতা আত্মসম্মানবোধ স্বাজাত্যবোধ, সততা ও ধর্মানুরক্তির বিষয় লেখক বিশেষ যত্নের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। দাম্পত্য জীবনেও প্রতাপের সঙ্গে তার স্ত্রী পদ্মিনীর সম্পর্ক স্নিগ্ধ-মধুর। রামচন্দ্রকে হত্যার আদেশের প্রসঙ্গ পূর্ববর্তী গ্রন্থত্রটিতেও পাওয়া যায়। প্রতাপের কন্যার নাম বিন্দুমতী পাই। বঙ্গাধিপ পরাজয় এর সুমতি এবং 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' এর বিভা এখানে বিন্দুমতী বঙ্গাধিপ পরাজয় এর সূর্যকুমার এই উপন্যাসে সূর্যকান্ত সূর্যকান্তকে একদিকে প্রতাপের বন্ধুরূপে অপরদিকে দেশপ্রেমিকরূপে পাই। ব্যক্তিগত প্রণয় অপেক্ষা দেশপ্রেমকেই সে প্রাধান্য দিয়েছে। ফুলজানির মধ্যেও এই জাতীয় স্বার্থত্যাগের বিষয় পাওয়া যায় সূর্যকান্তের প্রেম অপেক্ষা স্বদেশপ্রেমকেই সে গ্রহণ করে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আপন ভূমিকা নিয়েছে। তরুণ কুমারের বেশে তার কারাবরণ ও মুক্তির ঘটনাটি অস্বাভাবিক কল্পনা প্রসূত।

চণ্ডীচরণ সেনের গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সতী স্ত্রীর একবার নানক ও আর একবার রামকৃষ্ণ নামে বালকের সজ্জায় শ্বশুর ও স্বামীর উদ্ধারের পরিকল্পনাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সূর্যকুমার ও ফুলজানি কাহিনী কাল্পনিক উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে দেশপ্রেম প্রাধান্য পেয়েছে। প্রত্যক্ষ পর স্বদেশানুরাগ ও স্বাধীনতাস্পৃহার বিষয়টিকে, সূর্যকুমার ও ফুলজানি কাহিনী গুরুত্বদান করেছে। ইংরাজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ ঘটেছে দৈববাণীতে (দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ পৃ ১৮৭)। উপন্যাসটির গঠন প্রণালী বঙ্কিম অনুসৃত। গ্রন্থের মধ্যে নাটকের রীতিতে সংযোজিত সংলাপও বঙ্কিম-রীতিকল্প।

'অনুসন্ধান'[৫] পত্রিকায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কৃত 'বঙ্গের শেষ বীর'-এর বিস্তৃত সমালোচনা পাওয়া যায়। সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'অধিকতর দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই প্রতাপকে কাপুরুষ দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু পাঠক! হারাণচন্দ্রের 'বঙ্গের শেষবীর' পাঠ করুন—প্রতাপের প্রতাপ, বীরদর্প, শূরকীর্তির অশেষ পরিচয় পাইবেন। প্রতিপদেই আপনি পুলকিত হইবেন।

'উপন্যাসের ভাব-সৌন্দর্য, বর্ণনা-পারিপাট্য প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের উপযুক্ত!'

'মন্ত্রের সাধন'[৬] রাণা প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতাচেতনা অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। টডের রাজস্থান গ্রন্থ অবলম্বনে এই উপন্যাসের কাহিনী গ্রথিত। ইতিহাস অবলম্বনে রচিত হলেও উপন্যাসের গুণ এই গ্রন্থে বর্তমান। লেখক বলেছেন, 'মন্ত্রের সাধন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' হইলেও ইতিহাস নহে। কল্পনা ও বাস্তব দুয়ে মিশিয়া যে চিত্র, তাহাই কাব্য। 'মন্ত্রের সাধন' সেই কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয়' (ভূমিকা)।

মন্ত্রের সাধনের মূলেও স্বাধীনতা-প্রীতি ও দেশাত্মবোধের প্রেরণা বর্তমান। সেজন্য, বঙ্গের শেষবীরএর মত এই উপন্যাসটিও জনপ্রিয় হয়েছিল। স্বদেশ-চেতনা ও জাতীয়তাবোধ আলোচ্যকালের একটি বিশেষ লক্ষণ। বঙ্গের শেষ বীর ও মন্ত্রের সাধন-এ এই লক্ষণ ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট। বঙ্গের প্রতাপাদিত্য ও রাজস্থানের প্রতাপসিংহের কাহিনী সেই-কালে স্বদেশ-চেতনার ভাবপ্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। হারাণচন্দ্রেব স্বাদেশিক বোধ ইতিহাসের এই দুই বীরপুরুষের কাহিনীগ্রন্থনের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে দেশপ্রেমসঞ্চারে প্রয়াসী হয়েছে।

'জ্যোতির্ময়ী'[৭] উপন্যাসটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নূরজাহানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মেহেরুলনেসার জন্ম থেকে শুরু করে 'নূরজাহান' হওয়ার কাল পর্যন্ত তার জীবনকাহিনীই মূলত উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। 'জ্যোতির্ময়ী সেই জগদ্বিখ্যাতা সুন্দরী রূপসী রাজ্ঞী নূরজাহানের নামান্তর। ইংরেজী "Romance

৫. অনুসন্ধান, ১৫ কার্তিক, ১৩০৪, পৃ. ৩০৩।

৬. মন্ত্রের সাধন (ঐতিহাসিক উপন্যাস), ১৩০৫, ইং ১৮৯৮, তৃ. স- ১৯২২।

৭. জ্যোতির্ময়ী (ঐতিহাসিক উপন্যাস), ১৩০৭, ইং ১৯০০ পৃ., ৩৫০।

of India" গ্রন্থে "The Light of the World"-এ যে একটি ঐতিহাসিক চিত্র আছে এই গ্রন্থ প্রধানত সেই চিত্র অবলম্বনে লিখিত। চিত্রটি যতদূর সাধ্য দেশী ছাঁচে, দেশী বর্ণে, দেশী ভাবে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এখন Nature + Art = কাব্যচিত্র পাঠক অনুগ্রহপূর্বক এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া গ্রন্থ পাঠ করিলে বাধিত হইব।' (ভূমিকা)

পারস্যের তেহরান নগরের ঘিয়াস বেগ ও তার স্ত্রী আমিনার মরুপথ-যাত্রার চিত্র দিয়ে গ্রন্থ শুরু। মরুপথে অশেষ কষ্টের মধ্যে আমিনার একটি কন্যা-সন্তান হয়। অল্পকাল পরে আমিনা মারা যায়। ঘিয়াস কন্যাসহ লাহোর পৌছান।

আকবর আশ্রয় দিলেন ঘিয়াসকে। কন্যা মেহেরলনেসা হল অপূর্ব সুন্দরী। ভোগবিলাস আমোদ-আহ্লাদে ঘিয়াস মেহেরলকে বড করলেন। মেহেরলকে সংস্কৃতকাব্য ও বৈষ্ণবগীত শিক্ষা দেয় সুরনাথ শর্মা। সে মেহেরলকে প্রেমনিবেদন করলে মেহেরল স্বীকৃতিস্বরূপ নিজের অঙ্গুরী গুরুদেবের আঙুলে পরিয়ে দিল। যুবক আগ্রাত্যাগ করে দেশে ফিরল।

সেলিম, নৌকা-বিহাররত অনেক নারীর মধ্যে মেহেরলকে দেখে অনুচর পাঠিয়ে তার পরিচয় নিলেন। আমিনার স্মরণ-সভায় মেহেরের সঙ্গে সেলিমের পরিচয় হলে সেলিম ঘিয়াসের কাছে মেহেরকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানাল। সেলিম, পিতা আকবরকে তার অভিপ্রায় জানালে আকবর পুত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। শের আফগানের সঙ্গে প্রণয়াসক্তা মেহেরলনেসার বিবাহ দিলেন আকবর।

আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম অধীশ্বর হলেন। তার চেষ্টা হল শের আফগানকে হত্যা করা। দিল্লীতে শেরকে ডেকে এনে তাকে হত্যার সর্ববিধ কৌশলে ব্যর্থ হয়ে, অবশেষে বঙ্গের শাসনকর্তা কুতুবকে গোপনে আদেশ দিলেন শের আফগানকে হত্যা করতে। চল্লিশজন ঘাতক নিযুক্ত হল। কিন্তু হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হল এবং ঘাতকদের মধ্যে একজন যিনি শেরএর প্রাণরক্ষায় ব্রতী হলেন, তিনি সুরনাথ শর্মা। সুরনাথ জানাল, সেলিম মেহেরলকে ভোলেনি, তাই এই হত্যা-চেষ্টা। কুতুবের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হল। শের আফগান নিহত হলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ মেহেরকে নিয়ে আসা হল দিল্লীতে।

কিছুদিন মেহেরকে বিচ্ছিন্ন রেখে, অবশেষে সেলিম তাকে গভীর প্রণয় নিবেদন করলেন। বিবাহান্তে মেহেরলের নাম হল 'নূরজাহান বা আদর্শ সুন্দরী জ্যোতির্ময়ী'। নূরজাহান ক্রমে ভারতের অধিশ্বরী হলেন। ভারতীয় মুদ্রায় নূরজাহানের নাম অঙ্কিত করে সেলিম মেহেরলনেসার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করলেন।

তিনটি খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসটির প্রতিটি খণ্ডে নামকরণের মধ্য দিয়ে কাহিনীর আভাস দান করা হয়েছে। মেহেরলনেসার কাহিনীভিত্তিক এই উপন্যাসে তার জীবনের স্তরপরম্পরার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। বর্ণনার আধিক্য গল্পরসকে ব্যাহত করেছে। প্রথম খণ্ডে, দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত মরুভূমির ঘটনা ও বর্ণনা ক্লান্তিকর। মেহেরলনেসার সঙ্গে সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ ও পদাবলী-সঙ্গীতজ্ঞ বাঙ্গালী স্মরনাথ শর্মার শিষ্যা ও গুরুর সম্পর্ক কষ্টকল্পিত। শের-আফগানকে হত্যার অন্যতম ঘাতকরূপে স্মরনাথের আবির্ভাব চমকপ্রদ হলেও অস্বাভাবিক। ঘাতকের ছদ্মবেশে শের আফগানের রক্ষাকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং প্রণয়িনীর স্বামী শের আফগানের প্রতি কর্তব্য সম্পন্ন করে সে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে জীবন-যন্ত্রণার নিবৃত্তি ঘটল। তার চরিত্রে পূর্বাপর পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। আদর্শবাদী প্রেমিকরূপে তাকে চিত্রিত করতে গিয়ে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন।

গ্রন্থটিতে সংযোজিত গানগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্গত। স্মরনাথ ও মেহেরলের সঙ্গীতচর্চার সূত্রে এগুলি সংযোজিত হলেও পারস্য-দুহিতা মেহেরল এবং মোগল কামিনীদের কণ্ঠে গানগুলি একেবারেই বিসদৃশ মনে হয়। বৈষ্ণবগীতির অজস্রতা গ্রন্থের ঐতিহাসিক পরিবেশকে লঘু করেছে। শের আফগানের বীরত্বের পরিচয় সেলিমের চরিত্রের নীচতাকে গভীরতর করে তুলেছে। শেরএর মৃত্যুর পর পিঞ্জরাবদ্ধ মেহেরের দিল্লীযাত্রা বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রতাপের কৃতকর্মের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শের আফগানের প্রতি মেহেরলের প্রণয় ও গভীর বিশ্বাস, তার জীবনের এক সঙ্কট লগ্নে দ্বিধান্বিত মনের গভীরে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস পোষণের (পাপিনী হই আর যাহা হই, আমি স্বামীর নিকট অবিশ্বাসিনী হইব না) এর দিক যেমন দেখি, তেমনি সেলিম কর্তৃক অবরুদ্ধ থাকাকালে মোগল সাম্রাজ্যের রীতিনীতি আচার-পদ্ধতি শিক্ষার বিষয়টি তার চরিত্রের অপর একটি

আকাঙ্ক্ষার দিক পরিস্ফুট করে। এর কারণ, 'ভারত সাম্রাজ্য আমার করতলগত হইবে' এবং 'প্রেমে স্বামি-হন্তাকে নির্মল অনুতাপ শিখাইব'। (পৃঃ ৩৩৮-৩৯)

সেলিম এই উপন্যাসে কামুক ও হিংসাপরায়ণ রূপে চিত্রিত। ভারতের অধীশ্বররূপে তার পরিচয় এখানে অনুপস্থিত। তার ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনার প্রসঙ্গই মূলত এখানে উত্থাপিত হয়েছে, ইতিহাসের বর্ণোজ্জ্বল প্রেক্ষাপট এখানে প্রায় অনুপস্থিত। কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র এবং শের আফগানের হত্যা অন্তে মেহেরের সঙ্গে সেলিমের বিবাহের বিষয় এই গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা রক্ষা করেছে।

হারাণচন্দ্র ইতিহাস থেকে সরে এসে যখনই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তখনই তাঁর শিল্প প্রতিভার দীনতা প্রকট হয়ে উঠেছে। যে কল্পনার প্রয়োগে ইতিহাসের ছিন্ন বৃন্তের সংযোজন করা যায় এবং কল্পিত ঘটনা ও চরিত্রের উপরে ঐতিহাসিক বর্ণক্ষেপ করা যায়, সেই জাতীয় সৃজনী কল্পনার অভাব হারাণচন্দ্রকে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের সার্থক পদ থেকে বিচ্যুত করেছে।[৮]

রাধানাথ মিত্র

বঙ্কিম-সমকালীন ঔপন্যাসিক রাধানাথ মিত্রের নাম বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত। উপন্যাসরচনায় রাধানাথ মিত্রের স্থায়ী অবদান না থাকলেও তাঁর রচনায় বিষয়নির্বাচনে বৈচিত্র্যের স্পর্শ আছে।

রাধানাথ মিত্রের প্রথম উপন্যাস তারাতীর্থ'[৯] অবৈধ সন্তান-সমস্যা অবলম্বনে রচিত। লেখক অবৈধ সন্তানের সামাজিক স্থান নির্ণয় করতে সচেষ্ট হয়েছেন এই উপন্যাসে। একটি ভাগ্যাহত অবৈধ মেয়ের মর্মান্তিক পরিণতি এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

স্বর্ণপুরের মন্ত্রী চন্দ্রশেখর ও রাজকন্যার প্রাক-বিবাহজাত কন্যা-সন্তান

৮. হারাণচন্দ্রের অন্যান্য রচনা :

একটি চিত্র, ১৮৯৩; দুই ভাই (পারিবারিক গল্প), ১৮৯৩; চিত্রা ও গৌরী (পারিবারিক চিত্র), ১৯০০; রাণী ভবানী ১৯৩৩, তৃ. সং. ১৯১৭; কামিনী ও কাঞ্চন ১৯৩৬; প্রেম ও শান্তি ১৯০৮।

৯ তারাতীর্থ, ১৮৮৯, পৃ, ৩২৮।

তারা। অবৈধ কন্যার জন্মজনিত কুৎসার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য চন্দ্রশেখর মেয়েটিকে তার মায়ের কাছে রেখে আসে এবং নিজে সংসার-বিবাগী হয়। দুর্ঘটনাক্রমে চন্দ্রশেখরের মা মারা যান। তারা একটি দরিদ্র রমণী কর্তৃক প্রতিপালিত হতে থাকে। দুর্ভাগক্রমে এই রমণীটিও মারা যান। এই রমণীর কাছে সে সীবনকার্যে শিক্ষা পায়। তারার জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। তারা কয়েকটি কুলোকের হাতে পড়ে। লোকগুলি তারাকে কাঞ্চনপুরে নিয়ে যায়। সুযোগ বুঝে তারা তাদের দুষ্ট সঙ্গ ত্যাগ করে। একজন ধর্মপ্রাণ দোকানী তাকে আশ্রয় দেয়।

তারার মা অর্থাৎ, সুবর্ণপুরের রাজকুমারীর বিবাহ হয় কাঞ্চনপুরের রাজার সঙ্গে। তারার অনবদ্য সূচীকর্মের প্রতি রাণী আকৃষ্ট হয়ে তাকে আনার জন্য লোক পাঠায় এবং তারার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। রাণীর সতীন-পুত্রের চক্রান্তে তারা অপহৃত হয় এবং একটি পতিতার কবলে গিয়ে পড়ে। এই ঘটনার ফলে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তারাকে উদ্ধার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। শেষে এক সন্ন্যাসীর সাহায্যে পতিতার গৃহ বেষ্টিত হয়। সন্ন্যাসী তারার পিতা। দরজা ভেঙ্গে তারাকে উদ্ধার করার সময়ে সে আহত হয় এবং তার মৃত্যু ঘটে। পিতার অনুরোধক্রমে তারার স্মৃতি-রক্ষার্থে একটি মন্দির তার নামে উৎসর্গ করা হয়। নাম হয় তারাতীর্থ। মন্দিরে তারার প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়।

তারার জীবনের অনিশ্চিত অবস্থা, তার জীবন-পরিণতির ইঙ্গিতবাহী। রাজমন্ত্রীর গৃহত্যাগের পশ্চাতে আত্মগোপনের প্রয়াস অপেক্ষা আত্মস্খলনজনিত মানসিক প্রতিক্রিয়াই দায়ী বলে মনে করা চলে। লেখক এ বিষয়ে চন্দ্র-শেখরের মানসিক ভাবনার কোন ধাপ রচনা করেননি। কাহিনীভাগে বৈচিত্র্যের স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। অবৈধ সন্তানের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লেখক কোন প্রগতিবাদী মনের পরিচয় দেননি। তবে অপরিমেয় সহানুভূতির বেষ্টনীতে তাকে মানুষের কৃপার পাত্র রূপে চিত্রিত করেছেন। উনিশ শতকের সামাজিক জীবনের এই সমস্যার একটি অনিশ্চিত পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন লেখক। তারার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে মৃত্যুই তার জীবনের অনিবার্য পরিণতি বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। অবৈধ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও চরিত্রগুণে সে যে মানুষের প্রাপ্য চরমতম সম্মান লাভ

করতে পারে, এই সত্যে বিশ্বাসী লেখক। পরিবেশ যে মানুষের চরিত্র-গঠনের প্রধানতম সহায়ক এই সত্যও উপন্যাসটিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তারাতীর্থ একটি অ-সাধারণ বিষয় নিয়ে রচিত বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস। লেখকের সহানুভূতির আলোকে স্নাত একটি ভাগ্য-বিড়ম্বিত অবৈধ কন্যার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-কাহিনী।

রাধানাথ মিত্রের পরবর্তী উপন্যাস 'ঘরের ছবি'[১০] একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসার-চিত্র। ব্রজেশ্বর রায় ও তার পুত্র রামকান্তের জীবনকাহিনী বিশেষ। স্বামী ও সংসারের প্রতি নারীর আনুগত্য ও আকর্ষণজনিত কর্তব্যপরায়ণতার বিষয় উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। রামকান্তের অনুরাগিনী নিষ্ঠাবতী স্ত্রী সাধনার মৃত্যুর পর কাহিনীর সমাপ্তি। রচনাটিতে শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর পাই না। তবে লেখক বেশ নিষ্ঠাপূর্ণভাবে কাহিনীটি পরিবেশন করেছেন। তৎসত্ত্বেও গল্পের আকর্ষণীশক্তি কম।

'অনুসন্ধান'[১১]-এ 'ঘরের ছবি'র সমালোচনায় গ্রন্থটি সমাদৃত হয়েছে। রাধানাথ মিত্রের 'বিশালাক্ষী'[১২] একটি নীতি কাহিনী জাতীয় কাল্পনিক আখ্যায়িকা বিশেষ। উপন্যাস নামে চিহ্নিত হলেও বাস্তবতার দীনতা গ্রন্থটিকে উপন্যাসের মর্যাদা দান করেনি। অলৌকিকতা ও অতি কল্পনাই এজন্য দায়ী। স্ত্রীর সততার ফলে, এক রাজপুত্রের বারবনিতার হাত থেকে স্বাভাবিক ও সংযত জীবনের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী 'বিশালাক্ষী'।

উপন্যাসটিতে দেবদূতের একটি ভূমিকা আছে। রাজপুত্র নীরেন্দ্রনাথ বারবনিতা বিশালাক্ষীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। মন্ত্রীকন্যা হেমপ্রভার সঙ্গে বিবাহ হয় তার। কিন্তু কুহকিনীর জন্য স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে অনিচ্ছুক হল নীরেন্দ্রনাথ। গোপনারীদের সঙ্গে হেমপ্রভা স্বামীকে দেখবার আশায় বিশালাক্ষীর বাড়ি যায়। শেষে স্বামী নীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মিলন হয়। নীরেন্দ্রনাথের আত্মানুশোচনা দেখা দেয়। হেমপ্রভা ও নীরেন্দ্রনাথ সুখে দিন যাপন করতে থাকে।

দেবদূত কর্তৃক রাজমন্ত্রীকে নদী পার করানো, সাধুপ্রদত্ত আম্রভক্ষণে রাজার

১০. ঘরের ছবি, ১৮৯৭, পৃ. ১৭৪।

১১. অনুসন্ধান, ২৪ ভাদ্র, ১৩০৪, পৃ. ২০৫।

১২. বিশালাক্ষী' (উপন্যাস) ১৩০৬ (১৮৯৯), পৃ. ৭৮।

পুত্রলাভ প্রভৃতি বিষয় অলৌকিকতার উদাহরণ। গোয়ালিনীদের কয়েকটি গান আছে উপন্যাসটিতে (পৃ. ৫৪, ৬৭)। বিশালাক্ষী বৈচিত্র্যহীন রচনা।

লালকুঠী[১৩] নারীর প্রাক্-বিবাহ প্রণয়জাত সন্তানসহ প্রণয়ীর সঙ্গে পুন মিলনের কাহিনী। দুজন যুবকের অভিজ্ঞতার সূত্রে কাহিনী জড়িত।

দুই বন্ধু যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত দেশভ্রমণের জন্য মধুপুর যাবার পথে শ্রীনগরে এল। সেখানে মনোরমার রূপলাবণ্যের কথা শুনে তারা থেকে গেল। একদিন ধরণীকান্ত দুটি যুবকের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধে একজনকে সাহায্য করে, একটি উষ্ণীষ পেল। পথে প্রাপ্ত একটি পোটলার মধ্যে একটি শিশুকে নিয়ে সে বাড়ি ফিরল। যতীন্দ্রের সঙ্গে মনোরমার সাক্ষাৎ হল। ধরণীর সঙ্গেও আলাপ হল শিশুটিকে মনোরমা স্তন্যপান করাল। তারপর আত্মকথা প্রসঙ্গে মধুপুরের রাজকুমারের সঙ্গে তার প্রণয়, গর্ভ ও গর্ভমোচনের কথা বলল। দাসীর রক্ষণাবেক্ষণে বন্ধুদ্বয় তাকে গৃহে রাখল।

মনোরমার ভাই নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হলে, নরেন্দ্রনাথ ও ধরণীকান্ত মধুপুরে গেল। পূর্বকথামত যতীন্দ্র ছদ্মবেশে তাদের অনুগামী হল। বাড়ির বৃদ্ধা দাসীর কথায় মনোরমা পুত্রসহ গৃহত্যাগ করল। মধুপুরের পথে ধরণীকান্তের সঙ্গে মধুপুররাজ ধীরেন্দ্রসিংহের সাক্ষাতে সব খবর জানা গেল। ধীরেন্দ্র প্রিয়তমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ধীরেন্দ্রের সদ্ভাব স্থাপিত হল। পুত্র ও প্রণয়িনীকে দেখবার জন্য ধরণীকান্তসহ বীরেন্দ্রনাথ শ্রীনগর যাত্রা করল। ঘটনাচক্রে রাজগুরু-গৃহে বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মনোরমার মিলন হল। বীরেন্দ্র পত্নী ও পুত্রকে নিয়ে দেশে ফিরল। এই মিলন উপলক্ষে গুরুদেব আচার্যের গৃহের নাম হল 'লালকুঠী'। বীরেন্দ্রের ব্যয়ে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল সেখানে। দুই কন্যা ও এক পুত্র নিয়ে মনোরমা ও বীরেন্দ্র সুখে জীবন যাপন করতে লাগল। দুই বন্ধু দেশে ফিরে গেল।

নারীর রূপ দর্শনের জন্য দুই বন্ধুর যাত্রা স্থগিত, বন্ধুযুগলের চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দেয়। অথচ তাদের চরিত্রে সততার পরিচয়ই বিশেষভাবে চিত্রিত হতে দেখি। এদের চরিত্রে সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষণীয়। মূল কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রদ্বয়ের সংযুক্তির প্রয়োজনে সুন্দরী-দর্শনের জন্য শ্রীনগরে

১৩. লালকুঠী, উপন্যাস (নূতন সংস্করণ), ১৩০৭ (১৯০০), পৃ. ৯৮।

তাদের অবস্থিতি জাতীয় শিল্পকৌশল দুর্বলতার পরিচায়ক। গল্পটি বৈচিত্র্যহীন। প্রাক-বিবাহ প্রণয়জাত সন্তান ও তার মাকে কেন্দ্র করে গল্পের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার প্রচুর অবকাশ থাকা সত্ত্বেও লেখকের প্রতিভার দীনতা তাকে ব্যবহার করতে পারেনি।

সংস্কৃতঘেঁষা ভাষা উপন্যাসটির কাহিনীর অগ্রসরণের অন্তরায়। রাধানাথের সব উপন্যাসেই রাজার চরিত্র পাই। এই রাজা প্রতিপত্তিশালী জমিদার বিশেষ। উপন্যাসটিতে লৌকিক বিবাহের কোন প্রসঙ্গ না থাকা সত্ত্বেও নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনের পর স্বামী ও স্ত্রী রূপে উভয়ের পরিচিতি বিস্ময় সৃষ্টি করে। নায়ক-নায়িকার সাময়িক বিচ্ছেদের কারণ রূপে লোকলজ্জাই প্রধানত দায়ী। গৌণত পারিবারিক কলহ। আচার্যের আশীর্বাদই উভয়ের বিবাহের মন্ত্র বলে মনে করা যেতে পারে। এই জাতীয় পরিকল্পনা আদর্শসম্ভূত। তৎসত্ত্বেও উপন্যাসটির গঠন-পরিকল্পনায় লেখকের সচেতনতার পরিচয় পাই। কুমারী মাতা ও তার অবৈধ সন্তানের প্রতি লেখকের সহানুভূতির বিষয়, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুসুমকুমারী দেবী

কুসুমকুমারী বরিশালের অন্তর্গত লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরীর পত্নী, কবি দেবকুমার রায়চৌধুরীর জননী। কুসুমকুমারীর সাহিত্যসাধনার পশ্চাতে ছিল স্বামীর অনুপ্রেরণা। অবসরকালে মাতৃভাষার সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রেখে কুসুমকুমারী কবিতা, উপন্যাস ও সন্দর্ভ এই তিন শ্রেণীর রচনার ক্ষেত্রে দান রেখে গেছেন। কোন উপন্যাসেই তিনি নিজের নামে প্রকাশ করেননি। কুসুমকুমারীর উপন্যাসে নারী চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। এবং নারী হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। কুসুমকুমারীর উপন্যাসে ব্রাহ্ম-প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে রস-রসের হানি ঘটিয়েছে।

কুসুমকুমারীর প্রথম উপন্যাস 'স্নেহলতা'[১৪] কৌলীন্য-প্রথার ভয়ংকর পরিণাম প্রদর্শিত হয়েছে। কৌলীন্যের যূপকাষ্ঠে স্নেহলতা নাম্নী এক বালিকার

১৪. স্নেহলতা, ১২৯৬ (১৮৯০) পৃ. ১৯২। (কোন মহিলা কর্তৃক প্রণীত)

জীবনবিনাশের কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। ব্রাহ্ম অমৃতলাল প্রণয়ী হওয়া সত্ত্বেও পিতার চক্রান্তে এক অশীতিপর বহু-বিবাহিত বৃদ্ধের সঙ্গে স্নেহলতার বিবাহ হয়, কেবলমাত্র কুলধর্ম অথবা সংস্কার রক্ষা করার জন্য। অমৃতলালের প্রণয়মগ্ন বালিকা শেষ পর্যন্ত অমৃতলালের প্রতি শেষ প্রণয় নিবেদন করে মৃত্যু বরণ করল। কন্যার মৃত্যুর পর পিতা যদুনাথ কৃতকর্মের অনুশোচনায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরে সাধুসঙ্গলাভেচ্ছায় গৃহত্যাগী হলেন। অমৃতলাল স্নেহলতার শোকে সন্ন্যাসী হয়ে দেশান্তরী হল।

কৌলীন্য-প্রথা আমাদের সমাজ-জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নারী-মনে কতখানি যন্ত্রণার তরঙ্গ তোলে এবং সর্বোপরি তারই ফলস্বরূপ অসহায় নারী ইহলোকের সব আশা ও আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কিভাবে অকালে মৃত্যু বরণ করে, তারই বেদনাকর চিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে। এই কুপ্রথার হাত থেকে রেহাই পাবার উপায়স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ তুলে ধরেছেন লেখিকা। সুশীলচন্দ্র ও মোহিনীর প্রণয় ও বিবাহ এই গ্রন্থের পার্শ্বকাহিনী। মোহিনী অমৃতলালের বোন। সুশীলচন্দ্র স্নেহলতার মাসতুতো ভাই। অমৃতলালের মধ্যস্থতায় এই বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। অথচ অমৃতলাল-স্নেহলতার বিবাহ হল পণ্ড। এই বৈপরীত্য প্রদর্শনের জন্যই মনে হয় পার্শ্বকাহিনীর সংযুক্তি

লেখিকা এই উপন্যাসে 'কৌলীন্য প্রথা জনিত কয়েকটি চিত্র তুলে ধরেছেন। এগুলি কখনও হাস্যকর, কখনও বা বেদনাদিগ্ধ।

(১) স্নেহের খুল্লতাত-পুত্র নিরুপম একটি বিয়ে করেছে। কিন্তু 'বাবা ও জ্যেঠামশায় বলিয়াছেন আর দুইটি করিতেই হইবে নতুবা তাঁহাদের মেয়ের বিয়ে হইবে না।' (পৃঃ ৭৩)

(২) 'বাইশ বছরে ছয়টা বিয়ে বেশি হইল? আমার কর্তা নব্বই বৎসর বয়সে একশ'র বেশি বিয়ে করিয়াছিলেন। কুলীনের শিরোমণি– অমন কুল কি আর আছে?' (পৃঃ ৭৮)

(৩) বহু-বিবাহ প্রথার ফলে তৎকালীন কুলীন-পত্নীদের মধ্যে স্বামিসঙ্গ লাভের আশায় নানা উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বিত হত। এগুলির মধ্যে, ওষুধপ্রয়োগের ফলে অনেক সময় স্বামী পাগল হয়ে যেত এবং পরিণামে স্ত্রীর জীবন দুঃখের আবর্তে পড়ে আরও কষ্টকর হয়ে পড়ত। এই ধরনের একটি চিত্র পাই, এই উপন্যাসে। মাতঙ্গি তার বরের ভালবাসা পেতে গিয়ে ওষুধ

খাইয়ে তাকে পাগল করেছে। 'কেহ বলিল মাতঙ্গির স্বামীর বিয়ে কয়টা? বিয়ে আর বেশি কি, এই বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স, মাত্র ছয়টা বৈ ত নয়?' (পৃ. ৭৭)

কৌলীন্য-প্রথা ও বহুবিবাহের প্রচলনের ফলে সমাজের অভ্যন্তরে যে পাপ-প্রবাহ বয়ে চলেছে তার চিত্রও লেখিকা তুলে ধরেছেন। ভ্রূণহত্যা যেন সমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। বশীকরণ ওষুধ প্রয়োগ করে স্বামীর মৃত্যু-জনিত বহুনারীর অকালবৈধব্য বরণ যৌন দুর্নীতির অন্যতম কারণ। কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে সপত্নীদের মধ্যে চুলোচুলি পারিবারিক জীবনের অশান্তির কারণ। (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)

উপন্যাসটিতে ব্রাহ্ম প্রভাব ও প্রচার লক্ষ্য করা যায়। হীরালাল ও তার স্ত্রী উষার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের সারসত্য আলোচিত হয়েছে। ব্রাহ্মধর্মের জনপ্রিয়তা ও গতিশীলতা, পতিত সমাজ ও পতিত মানুষ উদ্ধারে নিশ্চিত ভূমিকা, ব্রাহ্মধর্মের সর্বজনীনতার বিষয় প্রভৃতি সবিস্তারে হীরালাল কর্তৃক আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া নাস্তিকতার প্রাধান্যবোধ ও ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিষয়ও হীরালালের বক্তব্যে স্থান পেয়েছে (সপ্তম পরিচ্ছেদ)।

স্নেহলতার বিবাহের পূর্বে নিরুপম স্নেহের আচরণে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অশীতিবর্ষীয় স্থবির বৃদ্ধকে স্নেহের কর প্রার্থনা করতে দেখা, তার পক্ষে প্রায় অসম্ভবপ্রায় দৃশ্য। এক্ষেত্রে তার মতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় ব্রাহ্মদের শরণ গ্রহণ। তাই তার যুক্তি—"আমি যে তোমায় বলিয়াছিলাম এখানে একঘর ব্রাহ্ম আছেন। তাঁহারা অতি পবিত্র লোক। আমি তাঁহাদের কাহারও বাটিতে তোমায় রাখিয়া আসি চল" (পৃ. ১৪৭)।

নিরুপমের এই উক্তির মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের জনপ্রিয়তা ও ব্রাহ্মদের প্রতি একশ্রেণীর অব্রাহ্ম মানুষের আস্থাবোধ ব্যক্ত হতে দেখা যায়।

চরিত্র-চিত্রণে লেখিকার আবেগধর্মিতা প্রকাশ পায়। স্নেহলতার অসহায়তা পাঠকের সহানুভূতি অর্জন করে। অন্য পুরুষে নিবেদিত একটি কচি মনের কৌলীন্য-প্রথার চাপে অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মধ্যে যে যন্ত্রণা তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে স্নেহলতার চরিত্রে। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব-প্রণয়ীর প্রতি তার আস্থা ও অনুক্ত আকর্ষণ, সতীত্ববোধের ঊর্ধ্বে ঘোষিত নারীত্বের জয়ধ্বনি। স্নেহলতার মায়ের চরিত্রেও অসহায়তার দিক পরিস্ফুট।

কন্যার প্রণয়াদর্শে বিশ্বাসিনী হওয়া সত্ত্বেও বহু-বিবাহিত কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কন্যার বিবাহদান চরিত্রটিকে যন্ত্রণাকাতর করে তুলেছে। 'নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে' মেনকার (শাক্তপদাবলী, ক-বি-সং) এই উক্তি স্নেহের মায়ের চরিত্রে প্রযোজ্য। স্নেহলতার প্রণয়ী অমৃতলাল এই উপন্যাসে নায়ক রূপে চিত্রিত। ব্রাহ্ম আদর্শে বিশ্বাসী অমৃতলালের প্রণয় নিষ্ঠা অকৃত্রিম হলেও প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তার প্রণয়কে পরিণামমুখী করে তোলার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। অসহায় অমৃতলালকে লেখিকা কৃপার ও অনুকম্পার পাত্র রূপে চিত্রিত করেছেন। নিরুপমও তদ্রূপ। কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধবাদীরাও যেন অসহায়ভাবে এই প্রথার শক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

গ্রন্থটিতে অলৌকিকতা ও আকস্মিকতার উদাহরণ পাই। স্নেহলতা প্রকৃতির কোলে মায়ের কাছ থেকে আশ্বাসবাণী প্রার্থনা করলে, 'মা বিশ্বসংসার কাঁপাইয়া আশীষ করিলেন 'নিষ্কামী হও' (পৃ. ১৩০)। সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে মোহিনীর সাক্ষাৎকার আকস্মিক। রাত্রিকালে অরণ্যপথে অশ্বারোহণ করে নগরে যাবার সময়ে যুবক দেখলেন, 'এক ভীষণাকার সন্ন্যাসী-বেশধারী একটি মনুষ্য ভয়বিহ্বলা সুন্দরী বালিকার কেশাকর্ষণপূর্বক লইয়া যাইতেছে' (পৃ. ২৫)। বালিকার চিৎকারে সুশীলচন্দ্র আকৃষ্ট হয়ে তাকে উদ্ধার করলেন। বালিকা মোহিনীর এই উদ্ধার-প্রসঙ্গ স্বর্ণকুমারীর 'ছিন্নমুকুল'-এর হিরণকুমার কর্তৃক আকস্মিকভাবে কনককে উদ্ধার ও প্রণয়ের প্রসঙ্গের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিন্ধ্যপর্বত-অঞ্চলে, মৃজাপুরে সুশীলচন্দ্রের আবির্ভাবের পশ্চাতে যে কারণ বিবৃত হয়েছে (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) তা যেমনি দুর্বল তেমনি কষ্টকল্পিত। মৃজাপুরে একটি অট্টালিকার কক্ষে দুই যুবকের কথোপকথনের মধ্যে আকস্মিকভাবে যোগীর আবির্ভাব ও বিন্ধ্যগিরির আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার পশ্চাতে, কোন উদ্দেশ্য থাকলেও এ জাতীয় ঘটনাসংস্থাপন দুর্বল-সাধ্য। যোগী-যোগিনীর কাহিনী সংযুক্তির প্রয়োজনীয়তা এই গ্রন্থে নেই। প্লটের গ্রন্থন-শৈথিল্য অস্বীকার করা

লেখিকা বঙ্কিমের প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি। পরিচ্ছেদের শিরোনাম পাঠককে আহ্বান, স্বপ্নকাহিনীর সাহায্যে চরিত্রের পরিণতির ইঙ্গিতদান প্রভৃতি রীতি বঙ্কিম-অনুসৃত। উপন্যাসটির শেষ পরিচ্ছেদে স্নেহলতার মৃত্যুর

পর লেখিকার মন্তব্য ('যাও স্বাধ্বী[১] জরা-মৃত্যু-দুঃখ-ক্লেশরহিত শান্তিময় স্থানে, অমৃতময়ীর কোলে নির্বিঘ্নে পরম সুখে বাস কর গিয়া। সেখানে লোকবিশেষের প্রভুত্ব নাই। সেখানে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, কুটিলতা, জঘন্য ঘৃণিত প্রথা প্রভৃতি কিছুই নাই।' ইত্যাদি) চন্দ্রশেখর-এ প্রতাপের মৃত্যুর পর রামানন্দ স্বামীর উক্তির অনুরূপ।

কুসুমকুমারী স্নেহলতায় কৌলীন্য-প্রথার এক মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেছেন। স্নেহলতা বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ''স্নেহলতা'-পাঠে বিদ্যাসাগরমহাশয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, 'সমাজচরিত্র জানিবার পক্ষে ইহা একখানি সুন্দর গ্রন্থ। স্বাধীন রাজ্য হইলে ইহার পঞ্চবিংশতি সংস্করণ হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।'[২]

কুসুমকুমারীর পরবর্তী গ্রন্থ 'প্রেমলতা'র'[৩] বিষয়বস্তুতে ধর্ম প্রাধান্য পেয়েছে। ভগবৎ-সাধনা যে মানুষকে সকল অশান্তি থেকে রক্ষা করতে এবং মানুষের জীবনে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে পারে এই কথাই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা আছে এই উপন্যাসে। তারই পাশে বিধবা-প্রণয়-পরিণামের এক ধর্ম-সম্মত চিত্রও তুলে ধরেছেন লেখিকা।

প্রেমলতা বহুবাজারের রায়পরিবারের সেজবৌ। বড়বাবু গোপালচন্দ্র প্রথম পত্নীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে বিয়ে করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র পাঁচ বৎসর বয়স্ক সুকুমার। মেজবাবু ভূপালচন্দ্র বৈষয়িক, সেজবাবু নরেন্দ্রকুমার মদ্যপায়ী ও চরিত্রহীন। ছোট সুরেন্দ্রনাথ অবিবাহিত। সেজ বৌয়ের একমাত্র সন্তান ছ'মাসবয়স্ক প্রমোদকুমার। প্রেমলতার জীবনের অশান্তির উৎস তার স্বামী।

বিধবা কণক বড়বৌ কামিনীদেবীর পালিতা। কুলীনকন্যা কণকের পাঁচবছর বয়সে বয়স্ক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। তারপর, মায়ের মৃত্যু ও স্বামীর মৃত্যু ঘটে। সুরেন্দ্রনাথ কণকের প্রতি আকৃষ্ট। মেজ বৌ কণকের জন্য পাত্রীর সন্ধান করতে থাকে। একদিন কণক মনের দুঃখে গৃহত্যাগিনী হয়। সেজ বৌয়ের ঝি মোক্ষদা তাকে আশ্রয় দেয়। প্রেমলতা স্বামীকে সংসারমুখী করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

১. সাধ্বী হবে।

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে নারী, পৃ ১৮।

৩. 'স্নেহলতা' রচয়িত্রী প্রণীত, প্রেমলতা. ১২৯৯ (১৮৯২) পৃ ২৬৮, তৃ-সং ১৩১০, পৃ ৩৪৮।

পুত্র প্রমোদকুমার মারা গেলে দুঃখিনী প্রেমলতা একদিন গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করে। তারপর সে হরিপ্রেমে মত্ত হয়।

নরেন্দ্রকুমার হেমলতার আচরণে বিস্মিত হয়। বড়বৌ শয্যা গ্রহণ করে। মেজ বৌ মোক্ষদার সাহায্যে সোনাগাছির একটি গৃহে কণককে এক যুবকের পাশে শায়িত দেখিয়ে কণকের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করে। ফলে মেজবৌদির নির্দেশে মোক্ষদা নির্বাচিত প্লীহারোগগ্রস্ত একটি কুৎসিত মেয়েকে সুরেন্দ্রনাথ বিয়ে করে। বিয়ের এক বছর পরেই স্ত্রী মারা যায়। স্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মেজবাবু, সেজবাবু ও বড়বাবুর সম্পত্তির অংশ নিজের নামে লিখিয়ে নিলে সংসারে মেজবৌয়ের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বড়বৌয়ের দৈন্য দেখা দেয়।

মেজবৌয়ের নির্দেশে কণক মোক্ষদার কাছে থাকে। শেষে মোক্ষদার বোনপো গদাধরের সাহায্যে বড়বৌয়ের সঙ্গে তার মিলন হয়।

হাওড়ার গঙ্গাতীরে এক বৃদ্ধার গৃহে প্রেমলতা ঈশ্বর-আরাধনায় দিন কাটায়। বৃদ্ধা শশীমুখী পূর্বে বেশ্যা ছিল। প্রেমলতার নির্দেশে বৃদ্ধা তাকে গৈরিকবসনে সাজিয়ে দেয়। প্রেমপাগলিনী প্রেমলতা মাতৃনামের গান করতে করতে একদিন রাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। তার প্রণয়প্রার্থী বিপিন তাকে অসহায় পেয়ে হাত ধরলে প্রেমলতা গঙ্গায় ডুব দেয়।

সুরেন্দ্রনাথ মেজভাই ভূপালকে সংসারে যার যা প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে বললে অশান্তির আগুন জ্বলে। সুরেন্দ্রনাথ, কণককে প্রণয় জানায়। কণক বিদ্যাসাগরের মতানুযায়ী বিধবা-বিবাহে রাজী হয় না। দেহসম্পর্কের ঊর্ধ্বে তারা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ হয়।

প্রেমলতাকে কয়েকজন নাবিক উদ্ধার করে। তারপর এক যোগীবরের সঙ্গে সাধনমানসে সে পর্বতে চলে যায়। যথাকালে গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে 'দিবা এক প্রহরের সময় শুভযোগে শুভক্ষণে দেবী সংসারবিজয়ী হরিনাম করিতে করিতে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ' করে।

জোড়াসাঁকোর একটি বেশ্যাপল্লীতে প্রেমলতা প্রেমভিক্ষা করতে এসে 'মোহন-মন্ত্রে সকলকে মুগ্ধ করিয়া' গেল। তারপর ভিখারিণী বহুবাজারের রায়বাড়িতে প্রবেশ করে। মেজবৌয়ের একমাত্র সন্তান হেমলতা ছ'মাস হল মারা গেছে। প্রেমলতার ব্যক্তিত্বে মেজবৌ প্রভাবিত হল। দেবী মেজবৌয়ের সব দোষত্রুটি শুধরে দেন।

বারোবছর পরে রায়পরিবারে শান্তি ফিরে আসে। 'আজ তৃতীয় প্রহরের সময় ভাইয়ে ভাইয়ে একসঙ্গে জায়ে জায়ে একসঙ্গে মহানন্দে পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিলেন।' নির্ধারিত দিনে দেবী এলে, কামিনী তাকে চিনতে পারে। দেবী জানায়, 'কণক ভবানিপুরে দিদির বাড়িতে অনাথ শিশুদের জননী হয়ে তাদের প্রতিপালনে নিযুক্ত হক'।

জোড়াসাঁকোর বারবনিতারা নরেন্দ্রনাথের রক্ষিতা গোলাপের বৈরাগ্য দেখে দেবীর শরণাপন্ন হয়েছে। শতাধিক সন্ন্যাসীকে 'নিষ্কামী' হও বলে দেবী আশীর্বাদ করে। দেবীর নির্দেশে সুরেন্দ্রনাথ পীড়িতের সেবা ও দীন-দুঃখীর দুঃখ-মোচনে নিজেকে নিযুক্ত রাখে। নরেন্দ্রকুমারের অনুশোচনা দেখা দেয়। দেবী তাকে চিরদিন 'হরিদাস হতে বলে।

কামিনীদেবী পুত্রের বিবাহ দিয়ে স্বামীকে নিয়ে হিমালয়শিখরে সাধনায় দিন কাটান। কণক অনাথ শিশুদের পালন করে। শশীমুখীর আশ্রয়ে পতিতা নারীরা হরিনামে পাপদগ্ধ প্রাণ শীতল করে। দেবীর সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় শ্রীহরির মহিমা দেশদেশান্তরে ঘোষণা করে—'হরি হে! তোমার জয়-জয়াকার হউক'।

লেখিকা উপন্যাসটিকে অনেকটা ধর্মশিক্ষামূলক করে তুলেছেন। মানুষের পারিবারিক জীবনে যখন অশান্তির বিষবাষ্প ধূমায়িত হয়ে ওঠে তখন শ্রীহরিই পারেন মানুষকে সেই অসহ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে। বিধবা-প্রণয় ও বিবাহ-প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে স্বতন্ত্র ধারায় চিত্রিত। সুরেন্দ্রনাথ ও কণকের প্রণয়, সংযম ও সত্যের মন্ত্রে দীক্ষিত। সামাজিক বিবাহবন্ধনে তারা মিলিত না হলেও আধ্যাত্মিক বিবাহবন্ধনে তারা আবদ্ধ।

লেখিকার ভাবপ্রবণতার আধিক্য লক্ষ্য করি উপন্যাসটিতে। যার ফলে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে উপন্যাসটির বাস্তবধর্মিতা বজায় থাকেনি। বিষয়ান্তরালে উদ্দেশ্য এই উপন্যাসে প্রাধান্য পাওয়ায় বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। একটি যৌথ-পরিবারকে কেন্দ্র করে গল্প যখন দানা বাঁধতে শুরু করেছে, সেই সময়ে প্রেমলতার সর্বব্যাপী ভূমিকা উপন্যাসটির গল্পরসে এক বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কাহিনীকে এক ধর্মসম্মত সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে। এদিক থেকে উপন্যাসটি সুপরিকল্পিত।

স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসটিতে নারীর চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটিতে নারীমনের বিচিত্র রশ্মিপাত করা হয়েছে। মূল চরিত্র প্রেমলতা

অনেকাংশে অপ্রাকৃত। স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা হয়ে সন্তানের মৃত্যুর পর তার মানসিক রূপান্তরের কারণটি সঙ্গত। পারিবারিক প্রতিকূলতাও তাকে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। প্রেমলতার সিদ্ধিলাভান্তে হরিমন্ত্রে মানুষকে দীক্ষাদান, তার প্রভাবে রায়পরিবারে শান্তিস্থাপন, পতিতাদের মুক্তি ও ধর্মজীবনযাপন, স্বামীর হরিভক্তি ও পাপসঙ্গ ত্যাগ, মেজবৌয়ের কৃতকর্ম-জনিত প্রায়শ্চিত্ত, কণক ও সুরেন্দ্রের সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয় প্রেমলতার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য উদাহরণও নিদর্শন। এসবের প্রেরণার মূলে লেখিকার ধর্মভাব বর্তমান। প্রেমলতার দীর্ঘস্থায়ী চিন্তাও স্বগতোক্তি ও সুযোগমত লেখিকার মন্তব্য, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির সহায়তা করলেও একদিকে চরিত্রটিকে যেমন ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, অন্যদিকে গল্পের গতিপ্রবাহে এনেছে মন্থরতা। নারীর শক্তিই এই উপন্যাসে জয়ী হয়েছে। প্রেমলতা, কামিনী, মেজবৌ, কণক সকলের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

বড়বাবুর সঙ্গে থাকমণির অবৈধ সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে তার মানসিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে তুলেছে বড়বৌ কামিনীর ব্যক্তিত্ব ও মনোবেদনা। মেজবৌ-এর সংসারে কর্তৃত্বলাভ, কণকের ইচ্ছানুযায়ী লৌকিক বিবাহ স্থগিত প্রভৃতি বিষয় অন্যান্য উদাহরণ।

এই উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রের উপর আদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে, বড়বৌ কামিনীর চরিত্র আদর্শবাদের হাওয়ায় বিশেষ আন্দোলিত হয়নি। রক্তেমাংসে গড়া স্নেহশীলা পরদুঃখকাতরা নারীরূপে তাকে চিনে নিতে বেগ পেতে হয় না। চরিত্রটি মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ। মেজবৌ-এর দেবীর প্রভাবজাত মানসিক রূপান্তর আকস্মিক।

এই গ্রন্থের ভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম। দেবীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর কথোপকথনের ভাষা কাব্যসুলভ। সর্বনামকে হ্রস্ব করে এবং স্থানে স্থানে ক্রিয়াকে পূর্বে বসিয়ে সংলাপের ভাষাকে কোন কোন স্থানে কাব্যধর্মী করে তোলা হয়েছে। তাছাড়া ভাষায় সাধুচলিতের কখনো কখনো মিশ্রণ উল্লেখ-যোগ্য ত্রুটি।

'সেই সগভীর গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া গম্ভীর অথচ মমতাময় স্বরে প্রত্যুত্তর হইল—'মা! ধ্যানেতে জেনেছি সকল। তুমি বিনা কে তারিবে পীড়িত দুর্জনে। নির্ভয়েতে চলে যাও সংসারের মাঝে'।'

'আশীর্বাদ কর গুরো। প্রণমি তোমারে।
'সংসারবিজয়ী হও শ্রীহরির নামে।
'বল পিতঃ কবে আবার দেখব ও পদ?
'অর্ধযুগ পরে জাহ্নবীর তীরে, বাসন্তী পূর্ণিমাদিনে।'
(৩য় খণ্ড। ৭ম পরিচ্ছেদ)

কেবল গুরু-শিষ্যার কথোপকথনকালে নয়, দেবীর সঙ্গে কথা বলার সময়েও এই জাতীয় কৃত্রিম ভাষায় সংলাপ যুক্ত হয়েছে।

এই গ্রন্থে ষোলখানি গান আছে। সবগুলি প্রেমলতার কণ্ঠে প্রযুক্ত। উপন্যাসের মধ্যে গানের সমাবেশ করে স্বর্ণকুমারী যেভাবে উপন্যাসের প্রয়োজন ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছেন, কুসুমকুমারীর পক্ষে সর্বাংশে সেরূপ সম্ভব হয় নি। গানের বাহুল্য ও যথেচ্ছ প্রয়োগ-শিল্পকে বিঘ্নিত করেছে। এই উপন্যাসের অধিকাংশ গানগুলি 'সুকবি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায় কর্তৃক রচিত' (বিজ্ঞাপন)। প্রেমলতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—'আমার বিবেচনায় গ্রন্থখানি যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার ত্রুটি হয় নাই। প্রত্যেক পরিবারের এক এক খানা প্রেমলতা থাকা বাঞ্ছনীয়।'[৪]

হরিগুণগান, হরিমাহাত্ম্য প্রচার ও হরিপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের মধ্যে আছে জীবনের পরম শান্তি, চরম সার্থকতা। এই উপন্যাসের এটাই মূল বক্তব্য। লেখিকার হরিবিলাসিনী মানসপ্রকৃতির ভাবোন্মাদে উপন্যাসটি আপ্লুত।[৫]

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

বটতলার একজন প্রধান ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাসরচনায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। সুরেন্দ্রমোহন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকারী লেখক ছিলেন তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে নীতির প্রাধান্য লক্ষ্য করি। লোকচরিত্র সম্পর্কে শিক্ষাদান করা ছিল তাঁর উপন্যাস-

৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ-সাহিত্যে নারী, পৃ ১৮।

৫. কুসুমকুমারী দেবীর অন্যান্য উপন্যাস—শান্তিলতা ১৯০২, পৃ ২৫৭, লুৎফ উন্নিসা (ঐতিহাসিক উপন্যাস), ১৯০৫, পৃ ২০৩।

রচনার উদ্দেশ্য। ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হবার বিষয় বলে লেখক মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকারী ঔপন্যাসিক রূপে তাঁর সত্যকার পরিচয়। প্রখর হিন্দুত্ববোধ সুরেন্দ্রমোহনের উপন্যাসরচনার প্রেরণা। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে হিন্দুনারীর আদর্শ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। সুরেন্দ্রমোহন প্রায় পৌনে শতখানি উপন্যাস রচনা করেছেন।

সুরেন্দ্রমোহনের প্রথম উপন্যাস 'সুরেন্দ্র-প্রতিভা',[৬] স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা একটি সতীনারীর স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের কাহিনী। উপন্যাসটির ঐতিহাসিক কালের নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায় না। এইটুকু জানা যায় যে, ভারতে তখন মোগলদের শাসনকাল এবং বাংলাদেশে নবাবী রাজত্ব। উপন্যাসটির মূল বক্তব্য 'সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাহারা ধর্ম রক্ষা করে, ধর্ম তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন' এই সত্য প্রতিপন্ন করা।

বেলপুকুরের মৃত জমিদারের কন্যা প্রতিভাসুন্দরী। প্রতিভাকে নবাব প্রমোদ-সঙ্গিনীরূপে পেতে চায়, দেওয়ান এই খবর দিলে, মা মন্দাকিনী দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেন যে, দিল্লীর সম্রাটের কাছে এর বিহিত প্রার্থনা করে নালিশ জানান হবে এবং ইতিমধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করে মা কালীর নাম করে মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে।

সপ্তদশী ধার্মিকা প্রতিভার সঙ্গে নিশীথনাথের প্রণয় হয়। পুরোহিত স্বপ্নে দেখেন যে, মুসলমানরা গ্রামের ধনরত্ন মানমর্যাদা কুলমানধর্ম অপহরণ করবে। সভা করে স্থির করা হয় মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে দাড়াতে হবে। 'হিন্দুগণই হিন্দুর বল'। দেশাত্মবোধক গান গেয়ে নিশীথনাথ সদলবলে সভায় যোগদান করে।

নিশীথনাথ সীতানাথপুরের জমিদার রমোহন ঘোষালের পুত্র। নিশীথনাথের নেতৃত্বে সেযাত্রায় মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়। মন্দাকিনীর মৃত্যু হয়। তাঁর ইচ্ছানুসারে নিশীথনাথের সঙ্গে প্রতিভার বিবাহ হয়। কিন্তু প্রতিভা মুসলমান-অপহৃতা এই অপবাদ দিয়ে সামাজিকেরা নিশীথনাথের বিবাহ উপলক্ষে আয়োজিত বৌভাত বর্জন করে। পিতার আদেশে নিশীথনাথ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। একটি বর্ষিয়সী ঝিকে সঙ্গে করে প্রতিভা গৃহত্যাগ করে। দূরসম্পর্কের ক্ষান্তমাসীর আশ্রয়ে থাকাকালে দুষ্ট কৃষ্ণদাসের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে স্বামীর নাম করে সে নদীতে ঝাঁপ দেয়।

৬. সুরেন্দ্র-প্রতিভা, ১৮৮৭, পৃ ৮৮।

চার বছর পরে প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ওসমান নামে এক পরিচারিকার ছদ্মবেশে সে পাঠকবর্গের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। এক ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণসভায় হরমোহন ও নিশীথনাথকে নিমন্ত্রিত রূপে দেখা যায়। হৃতসর্বস্ব হরমোহন পুত্রের চাকুরির জন্য মনিবঠাকুরাণীর কাছে আবেদন জানালে নিশীথনাথ সাড়ে তিন টাকা বেতনে পাবচাথকের কাজ পেল। এই মনিব-ঠাকুরাণীই প্রতিভা। তারপর একটি আংটির সূত্র ধরে নিশীথনাথের সঙ্গে প্রতিভার পুনর্মিলন ঘটল। প্রতিভার সখি, রাজা রঘুরামের কন্যা। কপোতাক্ষ নদীতে ঝাঁপ দেবার পরে জ্ঞান হলে প্রতিভা কুঞ্জমোহিনীকে তার শুশ্রূষায় নিমগ্না দেখে। রাজামশায় সব শুনে প্রতিভার পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেন এবং দিল্লী গিয়ে সম্রাটের কাছে আবেদন জানান। নিশীথ প্রতিভার সম্পত্তি লাভ করে। তার পর তারা বাড়ি ফিরে আসে। নিশীথের কাছে প্রতিভা হয়—সুরেন্দ্র-প্রতিভা।

উপন্যাসটির বিষয়বস্তু ও গঠনধারা বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীর প্রভাব-পুষ্ট। নায়ক নিশীথনাথ ব্রজেশ্বরের অনুকৃতি। একদিকে পিতার প্রতি কর্তব্য-বোধ, অন্যদিকে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণজনিত দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত পিতার প্রতি তার কর্তব্যবোধই জয়ী হয়েছে। নিশীথনাথের পিতৃভক্তি ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির অনুরূপ। নিশীথনাথের সঙ্গে প্রতিভার পুনর্মিলনের ঘটনাও অনেকটা ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লর পুনর্মিলনের ঘটনার মত। নিশীথনাথের পিতা হরমোহন, হরবল্লভের ছাঁচে গড়া। সমাজভয়ে পুত্রের বিবাহে বৌভাতের অনুষ্ঠান করতে না পারা এবং জন-অপবাদের স্বীকৃতির ফলে পুত্রবধূকে পরিত্যাগের ঘটনা, দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্লর বিবাহ উপলক্ষে প্রতিবেশীদের কোন্দল, পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভের বেহানের প্রতিবেশীগণ কর্তৃক প্রফুল্লর মাকে মিথ্যা কলঙ্কদান, নিমন্ত্রণ রক্ষা না করা এবং সেই হেতু হরবল্লভের পুত্রবধূত্যাগের ঘটনার সাদৃশ্যবাহী। নিশীথনাথের ও হরমোহনের পরিণতিও, দেবী চৌধুরাণীর ব্রজেশ্বর ও হরবল্লভের মত। নিশীথনাথের সঙ্গে প্রতিভার পুনর্মিলনের সূত্র একটি আংটি। অনুরূপ একটি আংটিই ব্রজেশ্বরের সঙ্গে দেবী চৌধুরাণী-বেশী প্রফুল্লর পুনর্মিলন ত্বরান্বিত করেছিল। দেবী চৌধুরাণীতে মধ্যস্থতা করেছিল সাগর, এই উপন্যাসে কুঞ্জ-মোহিনী। প্রতিভা ছদ্মবেশী পরিচারিকা ওসমান, প্রফুল্ল, দেবী চৌধুরাণী। এই উপন্যাসের উপসংহারে প্রতিভার স্তুতি, দেবী চৌধুরাণীর শেষে প্রফুল্লর

স্তুতির অনুরূপ। গ্রন্থটির কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষ্ণকান্তের উইলের অনুসরণ লক্ষ্য করি। যথা, প্রতিভার উক্তি,—'আবার একদিন দেখা হইবে।·· তুমি আমারই, তুমি আর কাহারও নহ' (পৃ. ৫০), ভ্রমরের অনুরূপ উক্তির ('কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে··· · তুমি যাও আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই—রোহিণীর নও।'—কৃষ্ণকান্তের উইল, প্র-খ, ত্রিংশ পরিচ্ছেদ) মত। হরমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহের আয়োজন ও খরচের হিসাব কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধের আয়োজন ও ব্যয়ের পরিমাণের কথা নিশ্চিতভাবে মনে করিয়ে দেয়।

সুরেন্দ্রমোহন এই উপন্যাসে রচনারীতি, চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাসংস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন মৌলিকতার পরিচয় দেন নি। তিনি নির্বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুকরণ করে তাঁর প্রতিভার দীনতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সুরেন্দ্রমোহনের 'তাপসী কণ্ঠহার'[৭] নারীর প্রণয়নিষ্ঠা ও সপত্নীসহ সংসার করার যৌক্তিকতার বিষয় নিয়ে লিখিত। উপন্যাসটি অনেকটা শিক্ষামূলক। 'রচয়িতার নিবেদন'-এ লেখক বলেছেন, 'মনুষ্য-হৃদয়ের সুরুচি ও সৌন্দর্য প্রস্ফুট করিয়া দেখানই উপন্যাসের কার্য। চিত্তের নির্বিবাদ স্ফূর্তিই সৌন্দর্যানুভূতি। এই মানসিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ বস্তুই সুন্দর তাহা উপন্যাসে হয়। এইজন্যই বুঝি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই উপন্যাস পড়িতে ইচ্ছুক, এইজন্যই বুঝি প্রাচীন ঋষিগণ কি ধর্মতত্ত্ব, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি সমস্তই উপন্যাসাকারে লিখিয়া গিয়াছেন। বুঝি এইজন্যই বঙ্গের প্রধান লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত তত্ত্বই উপন্যাসে লিখেন'। লেখকের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতনতাই তাঁর উপন্যাসকে শিক্ষাপ্রদ করে তুলেছে।

গল্পের নায়িকা শতদল সদরপুরের জমিদার হরকান্ত রায়ের কন্যা। কিশোরী বয়সে সে হরকান্ত পালিত নরেন্দ্রের প্রেমে পড়ে। পরে নরেন্দ্রই হয়ে ওঠে তার জীবনের আরাধ্য পুরুষ। পিতার ষড়যন্ত্রে নির্বাসিত নরেন্দ্র তার উদ্ধারকর্তা হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বসন্তকে ঘটনাচক্রে বিয়ে করে। কিন্তু শতদলের হৃদয় ও ধ্যান থেকে নরেন্দ্র অপসৃত হয় না। বরং গৌরবদীপ্তিতে স্বামীরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার মানস-আকাশে। তার বাবা গোপনে অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, শতদল জানতে পেরে, সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে রাত্রে গৃহত্যাগ করে কিন্তু বেপথু হয় না। ঘটনাচক্রে সে এক ব্রহ্মচারিণী

৭ তাপসী কণ্ঠহার, ১৮৮৮ পৃ ১২৬ : তৃ-সং, ১২৯৫।

নারীর আশ্রয়ে গিয়ে পড়ে। এদিকে এক সন্ন্যাসীর প্রভাবে পরিবর্তিত পিতৃমন কন্যাকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে ওঠে। অবশেষে কন্যার সঙ্গে পিতার পুনর্মিলন হয়। এবং শতদলের সঙ্গে নরেন্দ্রের বিবাহ দিয়ে অনুতপ্ত পিতৃমন শান্ত হয়। বসন্ত সতীন শতদলকে সুনজরে দেখে না। সে ওষুধ প্রয়োগ করে স্বামীকে বশ করতে যায়। শেষে শতদলের কাছে মহাভারতের একটি গল্প শুনে নিরস্ত হয়। ক্রমে উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বসন্তের শিশুপুত্রকে শতদল নিজপুত্ররূপে গড়ে তোলে। শতদলের আবির্ভাবে মালতী-নগরে নরেন্দ্রের গৃহ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

স্বামীই স্ত্রীর সর্বস্ব, এ নীতিটি প্রতিষ্ঠা করার আত্যন্ত প্রয়াস দেখি এই উপন্যাসে। নারীর জীবনে পুরুষ একবারই আসে এবং সে আসে স্বামী রূপে। কুমারীর প্রথম প্রণয়ীও তাই তার কাছে স্বামী-রূপে ধরা দেয়। এবং সাধ্বী নারীর ধ্যান জ্ঞান রূপে সেই প্রণয়ী পুরুষ কুমারীর জীবনকে স্বামিত্বের আলোকদানে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই উপন্যাসের নায়িকা শতদলের মধ্য দিয়ে লেখক নারী-হৃদয়ের এই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।[৮]

উপন্যাসটির ঘটনাসংস্থান স্থপরিকল্পিত নয়। ব্রহ্মপুত্রের মাঝে একটি দ্বীপে নরেন্দ্র নির্বাসন, হরিশচন্দ্র কর্তৃক উদ্ধার, চারু ও মনোরমার মাধ্যমে শতদল কর্তৃক বসন্তের সংবাদ জ্ঞাত হওয়া প্রভৃতি ঘটনা, হালকাভাবে যোজিত হয়েছে। বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে শতদলের বিবাহের ফলে সপত্নী-সহ সংসারনির্বাহের বিড়ম্বনা এবং শতদলের চারিত্রিক ঔদার্য ও সঠিক পদক্ষেপে সংসার-জীবনে শান্তি স্থাপন, শতদলের চারিত্রিক গুণ ও প্রেম-নিষ্ঠার পরিণতি প্রদর্শনের অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক প্রয়াস। চরিত্র-প্রধান উপন্যাস হলেও লেখক গল্পের স্রোতে চরিত্রকে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

বসন্ত এই উপন্যাসের নায়ক হলেও লেখক তাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনার দাস রূপে চিত্রিত করেছেন। তার প্রেম বসন্ত ও শতদল উভয়ের কাছেই

৮. নারীর এইজাতীয় প্রণয়-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে সমকালীন আরও তিনজন গৌণ ঔপন্যাসিকের রচনায়। (ক) কুসুমকুমারী দেবী, প্রেমলতা (১৮৯২), কণকচরিত্র। (খ) শরৎকুমারী (১৩৯১) শরৎচরিত্র। (গ) মহামায়া; সতীত্বসরোজ (১২৯৩), চারুকমলচরিত্র। প্রথম দুটি চরিত্র বিধবা এবং প্রণয় বৈধব্যকালীন। শেষেরটি কুমারী।

সমান মাত্রায় স্ফুরিত। শতদল লেখকের ভাবাবেগসম্ভূত আদর্শমত্ত চরিত্র। সে হিন্দু সতীনারীর আদর্শ। কর্তব্যনিষ্ঠ স্নেহশীল ভ্রাতা হিসাবে বৈকুণ্ঠচরিত্রটি উজ্জ্বল। ব্রহ্মচারিণী মূর্তিমতী নীতিগ্রন্থ। হরকান্ত অনেকটা স্বাভাবিক হতে পারত কিন্তু শেষের দিকে সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে তার চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। প্রেমনিষ্ঠার বলে তাপসী শতদল তার কণ্ঠহার নরেন্দ্রকে লাভ করেছে। তাই, গ্রন্থের নাম তাপসী কণ্ঠহার।

হিন্দুধর্মের প্রতি জাগ্রত আস্থাবোধ নিয়ে লেখক এই উপন্যাস রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পরীতি এই উপন্যাসে অনুসৃত হয়েছে। পরিচ্ছেদের শিরোনাম, পাঠককে আহ্বান, সন্ন্যাসীর ভূমিকা প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। এই উপন্যাসে সম্মোহন-শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী বঙ্কিমের উপন্যাসের পরিচিত সন্ন্যাসীদেরই একজন। বসন্তের স্বামীকে বশের চেষ্টা, কপালকুণ্ডলার শ্যামাসুন্দরীর অনুরূপ প্রচেষ্টার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

সুরেন্দ্রমোহনের 'শক্তিসাধনা'[৯] উপন্যাসে সিরাজউদ্দৌলার প্রসঙ্গ টেনে এনে কাহিনীতে ঐতিহাসিক বর্ণদানের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যদিও ঐতিহাসিক ঘটনাটি ভিত্তিহীন। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে বিবাহদানের উদ্দেশ্যে এক কাজী একটি সুন্দরী মেয়েকে অপহরণ করে। এই বিবাহে মেয়েটির বাবার মত ছিল। কিন্তু খুড়া সতীশ, মেয়েটির প্রণয়ী ভুবন এবং মেয়েটির বান্ধবীরা মিলে কৌশলে তাকে কাজির বাড়ি থেকে উদ্ধার করল। কিছুকালের মধ্যেই সতীশ উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করল। কিন্তু কাজির এক উপপত্নী রৌশিনারার প্রতি আকৃষ্ট হল। এবং ভুবনকে বাধ্য করল রৌশিনারার সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করতে। হিন্দু প্রজারা ক্ষেপে গিয়ে সতীশকে হত্যা করল। ভুবন স্ত্রীর অধিকারবলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করল। ধার্মিক ভুবন একজন সন্ন্যাসীর শিষ্য হল। পরে সে শক্তির উপাসক হল।

গল্পটি বিশেষত্বহীন। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে বৈরিতার কথা উপন্যাসটিতে উত্থাপিত। লেখকের ধর্মচেতনার বাহনরূপে ভুবন চিত্রিত। সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রের প্রতি ভিত্তিহীন কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে। এ সব-কিছুর মূলে দেখি লেখকের সংকীর্ণ হিন্দুত্ববোধ। চরিত্রচিত্রণে পক্ষপাতদুষ্ট মনের পরিচয় পাই।

৯. শক্তি সাধনা, ১৮৮৯, পৃ ১৬৪।

'কণকপ্রতিমা'[১০] বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল-এর অনুকরণে রচিত। চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাবিন্যাস, বর্ণনা ও সংলাপের ক্ষেত্রে উপন্যাসটিতে কৃষ্ণকান্তের উইল-এর অনুকৃতি লক্ষ্য করি। বিজ্ঞাপন-এ লেখক বলেছেন, 'কেমন করিয়া সাধুহৃদয়ও কুপথে গিয়া পড়ে, কেমন করিয়া লোক সান্ধ্য-মল্লিকার মধুর সৌরভ ত্যজিয়া কিংশুকে প্রাণ ঢালে, তাহা ইহাতে স্পষ্ট দেখান হইয়াছে এবং পাপের পরিণাম কুলত্যাগিনী পাপময়ী রমণীর ভীষণ পরিণাম ও ভয়াল মৃত্যুর ছবি চিত্রিত হইয়াছে। যে যাহারে চায়, তার সহিত আত্মার মিলন, আত্মায় আত্মায় প্রতিঘাত, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ, অসতীর জীবন ও সতীর জীবন, সুখদুঃখ প্রেম বিরহ, সান্ধ্যগগনের বিমল ছবি, নিদাঘ দাবদাহের বিকট ছবি, প্রভাত সমীরণের মধুর ভাব ইহাতে সবই আছে'। বিজ্ঞাপনে চটক থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঋণের বিন্দুমাত্র স্বীকৃতি নেই। যদিও 'কণকপ্রতিমা' কৃষ্ণকান্তের উইল-এর অমার্জিত অনুকরণ।

আড়ংঘাটা স্টেশনে ট্রেন-দুর্ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ রক্ষা পেল। তার খবর না পেয়ে তার মা ও স্ত্রী চিন্তিত হলেন। কিছুদিন পরে পত্রযোগে দেবেন্দ্র স্ত্রীকে জানাল, ট্রেন-দুর্ঘটনায় আহত এক বালিকা তার পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাকে নিয়ে সে কি করবে স্থির করতে পারছে না। স্ত্রী কুসুমের কথামত দেবেন্দ্র মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি এল।

কুসুম জানল মেয়েটির নাম বসুমতী। বাড়ি বিজয়পুর থেকে এক ক্রোশ দূরে কেশবপুরে। তাকে পিত্রালয়ে পাঠালে, তার স্বামী তাকে ত্যাগ করে। বসুমতী দেবেন্দ্রকে প্রণয় জানায় এবং তাকে নিয়ে দেশান্তরী হবার বাসনা জানায়। বসুমতীর উপর দেবেন্দ্রের দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং তাকে নিয়ে পলায়ন করে। নিকটস্থ একটি গ্রামে সে বসুমতীকে এক গৃহস্বামিনীর কাছে রেখে দেয়। দেবেন্দ্র মনে মনে কুসুমের সঙ্গে বসুমতীর তুলনা করে বসুমতীকে তার যোগ্য বলে মনে করে। সে কুসুমকে ত্যাগ করবে জানালে কুসুম কেঁদে সারা হয়।

দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে দারোগা, চুরির দায়ে কুসুমকে থানায় এনে বিবস্ত্র করে অত্যাচারে উদ্যত হয়। অতর্কিতে কুসুমের দাদা লোকজনসহ এসে তাকে উদ্ধার করে। কুসুম বাপের বাড়ি আসে। দেবেন্দ্রর মা মারা যান।

দেবেন্দ্র বসুমতীকে নিয়ে কলকাতায় এসে একটা প্রেস করল। একটি খবরের

১০. কণকপ্রতিমা, ১২৯৭ (১৮৯০) পৃ ২০৭।

কাগজ বার করে সে প্রচুর আয় করতে লাগল। বসুমতীকে নিয়ে সে পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। মদ এবং সঙ্গীত তাদের সুখমিলনের সাথী হল। এদিকে বসুমতী পাশের বাড়িব এক যুবককে দেখে লুব্ধ হল। ভৃত্য ভতুয়াকে কুঞ্জলাল নামে এক বাবু ভাল চাকুরী দেবে বলে, প্রলুব্ধ করল। ভতুয়ার সন্ধানে কুঞ্জলাল বাড়ি এলে, বসুমতীর মনে কুপ্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখা দিল। কুঞ্জলালের প্রতি সে আকৃষ্ট হল। কুঞ্জকে বাণবিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে ভতুয়ার সাহায্যে বসুমতী কুঞ্জলালকে পত্র দিল।

মানহানির দায়ে এক সাহেব দেবেন্দ্রর নামে মামলা রুজু করলে দেবেন্দ্র বিপন্নবোধ করে। কুসুমলতার কথা ভেবে তার চোখে জল আসে। কুঞ্জলালের সঙ্গে বসুমতীর সাক্ষাতের দৃশ্য দেবেন্দ্রব চোখে পড়লে সে বসুমতীর গলা টিপে ডানকাঁধে ছুরিকাঘাত করে। ঘটনাস্থলে দেবেন্দ্রের শ্যালক যোগেন্দ্রনাথ এসে দেবেন্দ্রকে রক্ষা করে। তারপর উভয়ে বিজয়পুরে ফিরে যায়। যোগেন্দ্রনাথদের বাড়ি গিয়ে দেবেন্দ্র জানল, কুসুম নিরুদ্দিষ্টা। অনুতপ্ত দেবেন্দ্র স্থির করল সন্ন্যাসী হবে। দেবেন্দ্র ও যোগেন্দ্র কলকাতায় ফিরল। এদিকে দেবেন্দ্রের প্রেস বিক্রি হয়ে গেছে।

কলকাতা ও বরানগরের পথে পাগলিনী বসুমতী ঘুরে বেড়ায়। পথের লোকেরা তাকে নিয়ে কৌতুক করে। তার কাটা ডান হাতে আঘাত করে রক্ত ঝরায়। গর্মীপাড়ায় আক্রান্ত সে। কুকুরের কামড়ে আহত মৃতপ্রায় বসুমতীকে দুজন মেথর আছাড় দিয়ে মেরে ফেলে।

শান্তির জন্য দেবেন্দ্রর মন আকুল। বিভিন্ন লোকের মুখে কুসুমের খবর পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রের প্রণয়প্রার্থিনী নলিনীকে দেবেন্দ্র ইন্দ্রিয়সংযমের উপদেশ দিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবার কালে নলিনীর পিতা কর্তৃক আহত হয়। অনুতপ্ত দেবেন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়ে। পাগলিনী কুসুমলতার সঙ্গে মুমূর্ষ দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ-অন্তে উভয়ের মৃত্যু হয়। তারপর এক চিতায় উভয়কে দাহ করা হয়।

নীতিশিক্ষা দানের উদ্দেশ্য নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হলেও কৃষ্ণকান্তের উইল-এর প্রতিপাদ্য বিষয় ঈষৎ পরিবর্তিত করে এই উপন্যাসে লেখক উপস্থাপিত করেছেন। এই উপন্যাসে দেবেন্দ্রনাথ ও কুসুম, গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের প্রতিচ্ছবি। বসুমতীর মধ্যে রোহিণীর নব-আবির্ভাব লক্ষ্য করি। ঘটনা-সংস্থাপনের ক্ষেত্রেও কৃষ্ণকান্তের উইলের অনুকরণ স্পষ্ট; বারুণীতটে জল থেকে

উদ্ধারকৃত রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের সাক্ষাৎ, পরিচর্যা এবং ক্রমে প্রণয়। সেও এক দুর্ঘটনা। এক্ষেত্রে ট্রেন-দুর্ঘটনায় বিপন্না বসুমতীকে রক্ষা, পরিচর্যা এবং পরে দেবেন্দ্রর সঙ্গে প্রণয়। রূপের মোহ, প্রতিবেশী ও পরিজনদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস গোবিন্দলালকে রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ভ্রমরের অভিমান ও কৃষ্ণকান্তের উইল এজন্য অংশত দায়ী ছিল। এক্ষেত্রে রূপজ মোহই দেবেন্দ্রর চরিত্রস্খলনের একমাত্র কারণ। রোহিণীকে পরপুরুষ প্রলুব্ধ করবার পন্থা বার করেছিল ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ বন্ধু নিশাকরের সাহায্যে। এই উপন্যাসে কুসুমের ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ ও বন্ধু কুঞ্জলালের সাহায্যে। কৃষ্ণকান্তের উইল-এ রূপার মাধ্যমে নিশাকরের সঙ্গে রোহিণীর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা ছিল। এই উপন্যাসেও ভৃত্য ভজুর সাহায্যে বসুমতীর সঙ্গে দুবের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা। কুসুম ও দেবেন্দ্রের পুনর্মিলন ও মৃত্যু উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য বিষয়। কৃষ্ণকান্তের উইল*-এর সাদৃশ্যবাহী চিত্র উদ্ধৃত করছি।

মন্থরগক্লান্ত অচেতনপ্রায় বসুমতীর মাথা দেবেন্দ্রনাথ উরুর উপরে স্থাপন করে পরিচর্যাকালে—(১) শেষে সেই পরাবর্ণবিনিন্দিত সুধাপরিপূর্ণ, মদন মদোন্মাদ, হলাহল কলসীতুল্য রক্তবর্ণ মধুর অধরে অধর দিয়া চুম্বন করিলেন।' কৃষ্ণকান্তের উইল-এ 'গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন'।

(২) 'সেই সময় বড়াপুরের বাড়িতে কুসুমলতা মাছ ভাজিতেছিল, হঠাৎ তাহার কটাহের তৈল ছিটকাইয়া কপালে পড়ায় কপালটা আংশিক দগ্ধ হইয়া গেল।

কৃষ্ণকান্তের উইল এ—'সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।

কুসুমের কপাল পুড়ে যাওয়া এবং ভ্রমরের কপালে আঘাতলাগা প্রায় সমার্থক ঘটনা।

কুসুমের চরিত্রে সতীত্ববোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমান। তার পাগল হওয়ার ঘটনা স্বাভাবিক। কুসুমের চরিত্রে ভ্রমরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। তবে ভ্রমর ছিল আরও অভিমানিনী। অভিমানভরে সে পিতৃগৃহে চলে গিয়েছিল।

* বঙ্কিম শতবার্ষিক সং।

কুসুমের মধ্যে এই জাতীয় আচরণ লক্ষিত হয় না। স্বামীর প্রতি তার আত্যন্তিক ভালবাসা অভিমানবর্জিত আশাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। দেবেন্দ্র কুসুমকে ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত জানালে, কুসুমের উক্তি সমরূপ ঘটনার প্রেক্ষিতে ভ্রমরের উক্তির সাদৃশ্যবাহী। গল্পের নায়ক দেবেন্দ্রনাথ রূপের মোহে সাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করে পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত। এই চরিত্রটি গোবিন্দলালের অনুরূপ। যদিও দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের মানসিক ভিত্তি গোবিন্দলাল অপেক্ষা অনেক দুর্বল। ভ্রমরপ্রেমিক গোবিন্দলালের স্খলনের পশ্চাতে অনেক কারণ বর্তমান। দেবেন্দ্রের ক্ষেত্রে তদনুরূপ কারণ পাওয়া যায় না। বসুমতীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের জীবনযাপনের মধ্যে সত্যকার সুখী সে নয়। গোবিন্দলালও প্রসাদপুরের জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

দেবেন্দ্রনাথের কুসুমকে ত্যাগ ও বসুমতীকে গ্রহণের ভাবনার সঙ্গে গোবিন্দলালের অনুরূপ ভাবনার সাদৃশ্য পাই। দ্বিচারিণী বসুমতীকে স্বহস্তে শিক্ষা তথা শাস্তিদানের মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রের চরিত্রে গোবিন্দলালের পুনর্জাগরণ ঘটেছে। বসুমতী লালসাময়ী। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হলেও সতীত্বের আদর্শে অবিশ্বাসিনী। সতীত্বের সংজ্ঞা তার কাছে ভিন্ন। তার বিশ্বাস 'সতীত্ব বজায় রাখা স্বামীর জন্য, তাহার নিজের জন্য নহে।' বসুমতীর আচার-আচরণ সবকিছুই রোহিণীর মত। বসুমতীর লালসা লজ্জার অপেক্ষা রাখে না। সে দেবেন্দ্রকে স্পষ্ট বলে, 'তুমি রাত্রে আমার নিকট থাক না। আমার প্রাণ কেমন করে।'

বসুমতীর মনে কু ও সু প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বঙ্কিম-অনুসৃত রীতি। বসুমতী ও রোহিণীর চিন্তা ও উক্তির সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। কয়েকটি উদাহরণ।

বসুমতী—অমন সুশ্রী যুবাটিকে যদি একবার বাণবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া না দিলাম তবে আর নারীজন্মের সার্থক হইল কি? শিকারী শিকার করে কিন্তু সব জন্তু কি খায়? অনেক লোক মাছ মারে কিন্তু খায় না—বিলাইয়া দেয় (কুঞ্জলাল সম্পর্কে বসুমতীর চিন্তা)।

রোহিণী—স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না বিলাইয়া দেয়—শিকার কেবল শিকারের জন্য, খাইবার জন্য নহে (নিশাকর সম্পর্কে রোহিণীর চিন্তা)।

বসুমতী—ইচ্ছা হয় পায়ে রাখ না হয় পরিত্যাগ কর (দেবেন্দ্রের প্রতি)।

রোহিণী—চরণে না রাখ বিদায় দাও (গোবিন্দলালের প্রতি)।

অন্যত্র,—বসুমতী কাঁদিয়া উঠিল। 'কাটিও না কাটিও না। সবে যৌবন-তরঙ্গে তরী সাজাইয়াছি, এ সময়ে এ সুখের সময়ে আমাকে কাটিও না। তুমি কাটিও না, কাটিও না।'

রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল 'মারিও না মারিও না! আমার নবীন বয়স নূতন সুখ—এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না।'

সুরেন্দ্রমোহনের এই উপন্যাসটি বিশেষত্ববর্জিত। বঙ্কিমকে অনুকরণ করতে গিয়ে তিনি চরম অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটিতে নূতন ঘটনা যোজনা করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে গিয়ে শুধু ব্যর্থতারই পরিচয় রেখেছেন। উপন্যাসটিতে লেখকের হিন্দু সংস্কারবাদী মনের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়।

'ভিখারিণী'[১১] উপন্যাসটির কাহিনীতে নূতনত্ব আছে। একটি দরিদ্র মেয়ের সঙ্গে এক ধনী পুত্রের প্রণয়ের ফলে বিবাহের পূর্বেই সন্তান হয়। প্রণয়ীর পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে নদীতে ঝাঁপ দেয়। তাকে রক্ষা করে এক ধনী ব্যক্তি। তারপর সেই ধনীর সহায়তায় কিভাবে মেয়েটি অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে বাড়ি ফিরে যায় এবং তার প্রণয়ীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তার চমকপ্রদ চিত্র পাই উপন্যাসটিতে।[১২] কাহিনীতে অভিনবত্ব থাকলেও চরিত্রসৃষ্টিতে ঘটনা-সংস্থাপনে ও বিশ্লেষণে কুশলী মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাক্-বিবাহ সন্তান-সমস্যাকে কেন্দ্র করে কাহিনীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার অবকাশ থাকলেও লেখক তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি।

সুরেন্দ্রমোহনের 'সুরসুন্দরী'[১৩] 'রমন্যাস' নামে চিহ্নিত। আসলে বইটি একটি কাল্পনিক উপাখ্যান। দুর্গাদাস নামে এক জলদস্যুর কাহিনী। রামরঞ্জণ ও দুর্গাদাস একই ব্যক্তি। ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত কারাবন্দী দুর্গাদাসকে মুক্ত করল তার নিগৃহীতা স্ত্রী, রাজার পালিতা কন্যা সুরসুন্দরী। সুরসুন্দরী আসলে সুবর্ণ-

১১. ভিখারিণী ১৮৯১, পৃ ১৪০।

১২. অনুরূপ কাহিনী পাই রাধানাথ মিত্রের লালকুঠী (নূতন সং ১৯০০) উপন্যাসে, রাধানাথ মিত্রের অপর উপন্যাস তারাতীর্থ (১৮৮৯), একটি অবৈধ সন্তানকে কেন্দ্র করে রচিত।

১৩. সুরসুন্দরী ১৮৯১, পৃ ৩৩২।

পুরের রাজা মুকুন্দনারায়ণ সিংহের কন্যা। যোদ্ধা রামরঙ্গণের সঙ্গে তার প্রণয় ও বিবাহ হয়। রামরঙ্গণ বিনা কারণে তাকে সন্দেহ করে এবং ছুরিকাহত করে দেশত্যাগ করে। তার পর দীর্ঘদিন পরে সাক্ষাৎ। রামরঙ্গণ আসলে স্বরজয়ের রাজা আদিত্যকিশোরের পুত্র। তার সেই পরিচয় শেষকালে ধরা পড়ে এবং দণ্ডদাতা রাজাই তার পিতা বলে জানা যায়। নিষ্পাপ রাণী যুবনেশ্বরীকে আনা হয়। তার পর সকলের সঙ্গে মিলন। কাহিনী-নিয়ন্ত্রণে অলৌকিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসটিতে লেখক কৌতূহল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বরসুন্দরী ও যুবনেশ্বরী সতীনারীর উদাহরণ। উপন্যাসটিতে চিত্রিত লোকচরিত্র—'লোক-শিক্ষার্থে'।

সুরেন্দ্রমোহনেব 'সরোজিনী'[১৪] পুণার রাজা প্রতাপের সঙ্গে মগধরাজ কন্যা সরোজিনীর বিবাহ ও বিবাহিত জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব পাঠিয়ে মগধরাজ অপমানিত হন। ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে প্রতাপ আহত হয়ে সরোজিনীর শুশ্রূষায় বেঁচে ওঠে, তারপব উভয়ের বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবনে ভুল-বুঝাবুঝিব ফলে সরোজিনী আত্মহত্যা করে। প্রতাপ সংসারবিবাগী হয়।

উপন্যাসটির কাহিনী, ভাষা, বীতি, চবিত্র উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। উপন্যাসটি শিল্পীর ব্যর্থতার স্বাক্ষরবাহী।

সুরেন্দ্রমোহনের 'কুলীনকুমারী নির্মলা'[১৫] কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে লেখা বিশেষত্বহীন রচনা।

উপন্যাস বচনায় সুরেন্দ্রমোহন বঙ্কিমচন্দ্রের মত ও পথ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। বিষয়, ভাষা, রীতি বঙ্কিমধারা অনুসৃত ও অনুকৃত হওয়ায় তাঁর উপন্যাসিগুলির অধিকাংশই বিশেষত্ববর্জিত। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের উপর দস্যুতা করে তিনি সাধারণ পাঠকের চিত্তজয়ে সক্ষম হয়েছিলেন, তথাপি এই সূত্রে বলা যায় যে, পরোক্ষভাবে তিনি সাধারণ পাঠককে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রসাস্বাদনেব প্রাথমিক পাঠ দিয়েছিলেন।

১৪. সরোজিনী ১৯০০, পৃ ১২৪।
১৫. কুলীনকুমারী নির্মলা (নূতন সং), ১৯০০, পৃ ১৪২।

সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আজ সাহিত্যসমাজে বিস্মৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের মধ্যে সারদাপ্রসাদের অবদান সামান্য হলেও তুচ্ছ নয়। আলোচ্যকালে তাঁর মাত্র দুখানি উপন্যাসের সন্ধান পাই।

সারদাপ্রসাদের 'রাধামতি'[১] রচনার প্রেরণার মূলে আছে, লেখকের সমাজ-চেতনা। সামাজিক দুর্দশা দেখে 'বহুদিবসাবধি' একখানি উপন্যাস জনসাধারণে প্রকাশের অভিলাষ ছিল, লেখকের সেই আশার ফসল, রাধামতি। রাধামতি উপন্যাসে লেখক একটি পরিবারের নৈতিক অধঃপতন ও তজ্জনিত বারবনিতায় রূপান্তরের কাহিনী গ্রথিত করেছেন। লোভী পুরুষের চক্রান্ত ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার আনুকূল্য কিভাবে নারীর পতনকে আসন্ন করে তুলে তাকে লজ্জাকর জীবনযাপনের পথে প্রেরণ করে সেই চিত্রই রাধামতিতে প্রতিফলিত। ব্রহ্ম-শাপের অনিবার্য পরিণতিও চিত্রিত হতে দেখি।

আট বছর বয়সে রাধামতি একটি তৃষ্ণার্ত ব্রাহ্মণকে জল না দেবার জন্য অভিশাপগ্রস্ত হয়। হুগলী জেলার বোদাই গ্রামের রজেশ্বরের কন্যা রাধামতি। প্রতিবেশী বন্ধু তারকানাথ রায়ের সাহায্যে তিনি কন্যা রাধামতির সঙ্গে খলসিনী গ্রামের চন্দ্রনাথবাবুর পুত্র ফণীন্দ্রের বিয়ে দিয়ে যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনাথ আইনের ছাত্র এবং আধুনিক প্রচলিত ব্রাহ্মধর্মের উপাসক। কনিষ্ঠ পুত্র হেমেন্দ্র অশিক্ষিত, দুশ্চরিত্র এবং রাধামতির প্রতি গভীরভাবে আসক্ত।

রজেশ্বরের স্ত্রীর শ্রাদ্ধের দিনে, রাধার স্বামী ফণীন্দ্রকে দেখে হেমেন্দ্র ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে। 'ফণীন্দ্র যে রাধাকে লইয়া শয্যাপ্রকোষ্ঠে নিশিযাপন করিবেন তাহা দুষ্টমতি হেমেন্দ্রের অসহ্য।' হেমেন্দ্র তার বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে ফণীন্দ্রকে তার উপপত্নী বিনোদিনীর কাছে নিয়ে গিয়ে, মদ খাইয়ে, অচৈতন্য করে আনন্দ করতে থাকে। সেই রাত্রির ঘটনার জন্য চন্দ্রনাথ রজেশ্বরকে দায়ী করলেন এবং পুত্রবধূকে নিজ বাড়ির অভিপ্রায় জানালেন। হেমেন্দ্রের প্রাপ্য সান্ত্বনা করল। রাধামতির স্বামী তাকে 'দুশ্চরিত্র' বলে মনে করলেও উভয়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে রাধামতি স্বামীর মতানুসারে বাপের বাড়ি চলে এল।

১৬ রাধামতি, ১৮৮৮, পৃ ৯৬।

ফণীন্দ্র নিরুদ্দিষ্ট হল। রাধামতি এখন স্বেচ্ছাবিহারিণী। স্বামীর প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য সে অনুতপ্ত। সহচরী দুষ্ট কামিনীর-চক্রান্তে রাধা শেষ পর্যন্ত হেমেন্দ্রের আলিঙ্গনে ধরা পড়ল। বন্ধু ললিত ও কামিনী সহ রাধামতিকে নিয়ে কলকাতায় এসে, রাধামতির দেহের উপর হেমেন্দ্র অধিকার স্থাপন করল। মুঙ্গেরে এক বন্ধুর অফিসে ১০।১২ বছর কাজ করার পর ফণীন্দ্রের ২০০ টাকা বেতন হল। এদিকে হেমেন্দ্রের বাবা এসে ছেলেকে কলকাতা থেকে নিয়ে গেলে, বাকি ভাড়ার দায়ে রাধামতি ও কামিনী উৎখাত হল। ললিত রাধার গহনাগুলি নিয়ে পালালে রাধামতি একেবারে পথে এসে দাঁড়াল। এক বৃদ্ধের কাছে কিছুদিন ধাত্রীর কাজ করার পর, রাধামতি আরও আশায় বারবিলাসিনী হল। বেশ কিছুকাল পরে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করে সে পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থভ্রমণে বার হল।

হুগলির জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখে ফণীন্দ্র জানল যে, তার বাবা কাশীতে বাস করছেন। কাশীতে ফণীন্দ্রের সঙ্গে তার বাপ-মার মিলন হল। জানল, স্ত্রী রাধামতি বিপথগামিনী হয়েছে। রাধার সহচরী নারী রাধার টাকা নিয়ে কাশী থেকে পালাল। রাধা কাশীর পথে ভিক্ষা করে বেড়াতে লাগল। তারপর গঙ্গার ঘাটে ফণীন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। উভয়ের নব-পরিচয়। মূর্ছিতা রাধার পাথরে মাথা লেগে মৃত্যু হল। পিতার ইচ্ছায় ফণীন্দ্র পুনর্বিবাহিত হয়ে কাশীতে বাস করতে লাগল। 'পরিশিষ্টে' জানা যায় যে হেমেন্দ্র যোগী হয়ে চলে গেছে। যথাকালে ফণীন্দ্র দুটি পুত্রের ও একটি কন্যার পিতা হয়েছে।

লেখক উপন্যাসটির স্থানে স্থানে বর্ণনাভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। কোথাও বা তার মন্তব্য জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাজাতীয়। ফলে, উপন্যাসটির গতি মন্থর। উপন্যাসটির কাহিনীভাগ আকর্ষণীয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির ফলে, স্ত্রীর মন যখন অনুতপ্ত ও স্বামীর সঙ্গলাভের জন্য ব্যগ্র এমনই এক সময়ে ঘটনা-চক্রে একটি ভ্রষ্টচরিত্র পুরুষের কবলে পড়ে তার অধঃপতন সহজেই পাঠকের সহানুভূতি-অর্জনে সক্ষম হয়। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর নির্দেশ ও সর্বস্বহীন নারীর সমাজের উপর ক্রোধ ও অভিমান তাকে অধঃপতনের নিম্নস্তরে ঠেলে দিয়েছে। কাশীকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের পরিণতি অনেকটা নাটকীয়। অলৌকিকতার স্পর্শ রয়েছে উপন্যাসটিতে। ব্রহ্মশাপ ও তজ্জনিত পরিণতির ঘটনাটি গৌণ হলেও উল্লেখযোগ্য।

ফণীন্দ্র চরিত্র-গৌরবে আদর্শস্থানীয়। স্ত্রীর প্রতি তীব্র অভিমান তার গৃহ-

ত্যাগের কারণ হলেও স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসা তার চরিত্রে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। রাধামতি যেন ঘটনাচক্রের বলি। হেমেন্দ্রের প্রতি তার দুর্বলতার বিন্দুমাত্র প্রবণতা না থাকা সত্ত্বেও দুশ্চরিত্র হেমেন্দ্রের কাছে অসহায়ভাবে তাকে আত্মদান করতে হয়েছে এবং তারই দুষ্কার্যের ফলে রাধামতিকে লজ্জাকর জীবন-যাপনে অনেকটা বাধ্য হতে হয়েছে।

তার পতিতাবৃত্তির পশ্চাতে আত্মসুখ অপেক্ষা আত্মক্ষোভই বর্তমান। সে যেন নিজের অদৃষ্ট-নির্দেশিত ভাগ্যের উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে[১৭]।

বিলাসিনীর তীর্থযাত্রা, মৃত্যুর পূর্বে স্বামীর সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত মিলন, জীবনব্যাপী অনুশোচনা, রাধামতির চরিত্রের সৎ-চেতনার উদাহরণ। রাধামতির মৃত্যুর দৃশ্য শিল্প-সম্মত নয়। এ যেন নীতিবিদের নির্দেশ অনুসারী। হেমেন্দ্রের পরিবর্তন তার সন্ন্যাসীত্ব-গ্রহণ—আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা আকস্মিক বলে মনে হয়। কিন্তু তার চারিত্রিক পরিবর্তনের বীজের আর একবার অঙ্কুরোদগম ঘটতে দেখা গিয়েছিল, তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর। দুষ্ট পরিবেশে সেই চাপাপড়া বীজের আবার অঙ্কুরোদগম ঘটেছে সৎসঙ্গে, অনুকূল পরিবেশে। চরিত্র-চিত্রনে লেখকের সচেতনতার পরিচয় পাই। দ্বারকানাথ রায়ের চরিত্র বিচিত্র। একদিকে মহানুভবতা ও বন্ধুপ্রীতি, অপরদিকে সন্তান-স্নেহের আধিক্য। শেষোক্ত কারণ সন্তানের পতনের দ্বার মুক্ত করেছে। অবশ্য উভয়ক্ষেত্রে তার স্নেহপ্রীতিপ্রবণতাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক।

সারদাপ্রসাদের অপর উপন্যাস 'শঙ্কর'[১৮] সিপাহী-যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা প্রতিশোধমূলক কাহিনী। উপন্যাসটি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে না।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে কানপুরে হত্যাকাণ্ডের কালে শঙ্করের স্ত্রী দুজন ইংরাজকে গৃহে লুকিয়ে রেখে তাদের বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু পরিণামে সে নিগৃহীতা হয় ও তার মৃত্যু ঘটে। শঙ্কর এই ইংরাজদ্বয়ের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করে, অযোধ্যায় বিদ্রোহে যোগ দেয়। সে নিজহাতে এই ইংরাজ দুটিকে হত্যা করে। তারপর বিদ্রোহীদল থেকে মুক্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

১৭. পতিতা-জীবনকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকজন ঔপন্যাসিকের রচনা পাওয়া যায়। ধীরেন্দ্রনাথ পাল: অসতী সন্ন্যাসিনী (১৮৮৫), স্বর্ণবাঈ (১৮৮৮); কালীপ্রসন্ন দত্ত: দলিত কুসুম (১৮৯৯); প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়: পাহাড়ে মেয়ে (১৮৮৯)।

১৮. শঙ্কর, ১৮৮৮, পৃ ১০৪।

শঙ্করের সিপাহী-বিদ্রোহে যোগদানের পশ্চাতে ব্যক্তিগত কারণ নিহিত। ইংরাজের প্রতি তার ক্রোধ ও বিদ্বেষের কারণ তার স্ত্রীর প্রতি আশ্রিত ইংরাজ-দ্বয়ের কৃতঘ্নতা। শঙ্করের ইংরাজবিদ্বেষের এই কারণ, অনেকটা চন্দ্রশেখরে প্রতাপের ইংরাজ-বিরুদ্ধতার কারণের মত।

সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সামাজিক প্রেরণায় উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করলেও শিল্পীসুলভ মানসিকতার অভাব তাঁর উপন্যাসের লক্ষণীয় ত্রুটি। তবে চরিত্র-সৃষ্টিতে সহানুভূতিশীলতা চরিত্রগুলিকে সপ্রাণ করে তুলেছে। রচনারীতি, ভাব ও ভাবনায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্পর্শমুক্ত হতে পারেন নি।

উপসংহার

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের আলোচনা শেষ হল। বঙ্কিমকালের গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের অনেকেই পরবর্তীকালে পূর্বের জের টেনে চলেছিলেন। অতিকথন, মন্তব্যের বাহুল্য, উপদেশাত্মক বর্ণনা প্রভৃতি তৎকালীন ঔপন্যাসিকবৃন্দের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বঙ্কিমোত্তর কালে বঙ্কিমকালের জের-টানা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শেষবারের মত দেখা গেল। তারপর নবযুগের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ভাসিয়ে কালের অতল গর্ভে প্রেরণ করল। বঙ্কিমচন্দ্রের ছত্রছায়ায় যে-সব ঔপন্যাসিক লালিত, বঙ্কিম-কালবৃত্তে তাঁদের রচনাধারায় বিষয়বস্তুর চর্বিতচর্বণ ও গঠনরীতিতে বৈচিত্র্যহীনতা সত্ত্বেও শিল্পের আদর্শ যেন একটি নির্দিষ্ট পরিধিতে এসে থেমে গেল। ঔপন্যাসিকবৃন্দ রচনার ক্ষেত্রে চরম সিদ্ধিলাভ করেছেন জেনে যেন কিছুটা পরিতৃপ্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। সঞ্চয়ের অচল ভাণ্ডারে এই শ্রেণী ঔপন্যাসিকদের রচনাবলী যে ক্রমশঃ রিক্ত হয়ে এল সেদিকে দৃষ্টি পড়ল না। পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে এই বেচাকেনার কালে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ নূতন দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখে পরিবর্তনের আসন্ন সম্ভাবনাকে ইঙ্গিতময় করে তুললেন।

বঙ্কিমযুগের সামান্য ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের রচনা যে অপরিণত সে কথা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের পুনর্জন্ম হল, 'চোখের বালি' রচনার সঙ্গে সঙ্গে। বঙ্গদর্শনের (নবপর্যায়) পাতায় যে পুরোনো পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না রবীন্দ্রনাথ সে কথা সজ্ঞানে জেনে, 'এ যুগের কারখানা ঘরে' উপন্যাসের নবজন্ম দিলেন। বঙ্কিমযুগের গৌণ ঔপন্যাসিকেরা মানবচরিত্র বিশ্লেষণ অপেক্ষা গল্পের জাল-বোনার দিকেই আগ্রহ দেখিয়েছেন বেশি। গল্পের স্রোতে মানুষের জীবনলীলা বিলসিত হয়েছে তাঁদের রচনায়। মানুষের জীবন-রহস্য চাপা পড়ে গেছে সেই স্রোতের ধারায়। রবীন্দ্রনাথের পুনরাবির্ভাব উপন্যাসের ধারায় নিশ্চিত পরিবর্তনের ভিত্তি রচনা করল। কারণ রবীন্দ্রনাথ জানতেন, 'সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই

দেখা দিল 'চোখের বালি'তে।[১] এই পরিবর্তন চমকপ্রদ হলেও একেবারে অভাবিত নয়। কালের ধর্মই এই পরিবর্তনের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। বিবর্তনের ধাপ ভেঙেই এর আবির্ভাব। এর সূত্র রয়েছে অতীতের সাহিত্য-সাধকদের সাধনপীঠে।

সূক্ষ্ম বাস্তবতার প্রবর্তন করে এব উপন্যাসকে বিশ্লেষণধর্মী করে তুলে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের জগতে যে পরিবর্তনের সূচনা করলেন, সেই ধারা অনুসৃত হল শরৎচন্দ্রের রচনায়। তারপর কালপ্রবাহে সে ধারা বিচিত্র ঢেউ তুলে এগিয়ে চলল। বঙ্কিমকালে রোমান্টিক উপন্যাসের পাশাপাশি বাস্তবভাবপুষ্ট উপন্যাসের পরিচয় আমরা ঔপন্যাসিকবৃন্দের আলোচনাকালে পেয়েছি। কোন কোন রচনায় বিশ্লেষণধর্মিতার চিহ্নও বর্তমান। কিন্তু সেগুলির পুনরুল্লেখের জের টেনে পুনরুক্তি দোষ ঘটাতে চাই না। শুধু বঙ্কিম-সমকালের গৌণ ঔপন্যাসিকদের রচনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারার উল্লেখ করে, পরবর্তী যুগের মধ্যে সেই ধারার অনুশীলনেব রেখাচিত্র তুলে ধরব। বিষয়বস্তু এবং গঠন-পরিকল্পনা উভয়দিক থেকেই এই আলোচনার অবকাশ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসরচনার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনারও যে একটা বিস্তৃত ধারার সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ধারাটি পরবর্তী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বঙ্কিম-সমকালে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্য দিয়ে অনেক ঔপন্যাসিকই পরোক্ষভাবে দেশাত্মবোধের প্রেরণা দান কবেছেন। এদের মধ্যে রমেশচন্দ্র, চণ্ডীচরণ সেন, দামোদর মুখোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতির একজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মানুষকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা পূর্বের তুলনায় কম ছিল। কারণ মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ ততদিনে জাগ্রত হয়েছে। তাই বঙ্কিম-পরবর্তী কালে ঔপন্যাসিকেরা আর পরোক্ষ পথ গ্রহণ না করে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিকে টেনে আনলেন সামাজিক উপন্যাসের গণ্ডিতে। স্বাধীনতালাভের উপায়, পদ্ধতি ও আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেন ঔপন্যাসিকেরা যাঁদের পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র।

১. সূচনা, চোখের বালি, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৫৮।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের লুপ্তপ্রায় স্রোতে আবার জোয়ার এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। তখন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েই লোকান্তরে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ও স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত কোন কোন লেখকের উপন্যাসে বিষয়বস্তু ও পটভূমির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বঙ্কিম-সমকালীন কোন কোন ঔপন্যাসিকের রচনার সঙ্গে।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ক্ষমতাহীন নবাবের আমলে বাংলা দেশে যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, বণিক কোম্পানির লুণ্ঠন-প্রবৃত্তির চাপে জনজীবনে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয় পেয়েছি বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ সেনের মহারাজা নন্দকুমার ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ উপন্যাসে। পরবর্তীকালে ঐ যুগের পরিচয় তুলে ধরেছেন শ্রীগোপাল হালদার ভূমিকায় ও শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু মণি বেগম উপন্যাসে।

সিপাহী-যুদ্ধের বিষয়বস্তু ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে যে কয়েকজন ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন, তাদের অধিকাংশের রচনায় সিপাহী-বিদ্রোহের বিপক্ষেই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে সিপাহী-বিদ্রোহকে অবলম্বন করে যেসব উপন্যাস রচিত হয়েছে, সেসব উপন্যাসে বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখকবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাই প্রকাশ পায়। এইকালে বিদ্রোহ সম্পর্কে সংগৃহীত নূতন তথ্য নির্ভর করে ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাস রচনা করেছেন। এঁদের মনোভাব সিপাহী-যুদ্ধের পক্ষেই ব্যক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে একমাত্র চণ্ডীচরণ সেনের (ঝান্সীর রাণী) প্রবণতার সঙ্গে এইকালের ঔপন্যাসিকদের ঈষৎ মিল লক্ষ্য করি। এই মিল ইতিহাসের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে নয়, এই মিল সিপাহী-বিদ্রোহ সমর্থনজনিত মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'বহ্নিবন্যা' এবং মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের 'নটী' সিপাহী-বিদ্রোহের ভিত্তিতে লেখা উপন্যাস। বিদ্রোহকালে কানপুর ও লক্ষ্ণৌয়ের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে বিদ্রোহী দলের অন্যতম নেতা নানা সাহেবকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনী বহ্নিবন্যা। উপন্যাসের নায়িকা হুসেনী বেগমের ইংরাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিহিংসাগ্রহণের প্রচেষ্টা মূল কাহিনীর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিদ্রোহের নেতৃমণ্ডলীর উপর প্রভাবজাল বিস্তার করে হুসেনী বেগম বিদ্রোহের

শক্তি ও বুদ্ধি জুগিয়েছেন। মহাশ্বেতার নটী ঝান্সীকে কেন্দ্র করে লেখা। সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিতে প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে হাবিলদার খুদাবক্সের আত্মদানের কাহিনী। প্রণয়িনীর তপ্ত আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, খুদাবক্স কিভাবে প্রাণ দিল এবং তার প্রণয়িনী ঝান্সীর দরবারের নর্তকী মোতি কিভাবে প্রেমিকের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে ইংরাজের গোলায় মৃত্যুবরণ করল, সেই কাহিনী স্থান পেয়েছে নটী উপন্যাসে।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশের কাহিনী নিয়ে বঙ্কিম-সমকালে তারকনাথ বিশ্বাস-রচিত উপন্যাস চন্দ্রপ্রভার বিষয়বস্তুর সঙ্গে আধুনিক কালে রমাপদ চৌধুরীর লালবাঈ-এর মিল লক্ষ্য করি। সভাসিংহ, রহিম খাঁ, চন্দ্রপ্রভা, লালবাঈ, রঘুনাথ প্রভৃতি চরিত্রের পুনরায় সাক্ষাৎ পাই রমাপদ চৌধুরীর লালবাঈ উপন্যাসে। তাছাড়া লালবাঈয়ের সঙ্গে রঘুনাথের অবৈধ প্রণয়, রাণীর আদেশে রঘুনাথের মৃত্যু রাণী চন্দ্রপ্রভার সহমরণ, প্রভৃতি ঘটনাও লালবাঈ-এ পাওয়া যায়। চরিত্র ও ঘটনার ক্ষেত্রে তারকনাথের উপন্যাসের সঙ্গে রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসটির আশ্চর্যরকম মিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও কাহিনী-গ্রন্থনে ও পরিবেশন-কৌশলে রমাপদর লালবাঈ উন্নততর রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে যেসব গৌণ ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনায় হাত দিয়েছিলেন, তারা সকলেই যে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনায় সক্ষম হয়েছিলেন, একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। এদের রচনার অজস্রতা একান্তভাবেই অপাংক্তেয় হয়ে জঞ্জালের স্তূপে পরিণত হয়েছে একথাও তেমনি বলা ভুল। 'এঁদের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে তাও বলতে পারি না। ইতিহাসের কোন কোন কাহিনীকে উপন্যাসের (এবং নাটকের) মধ্য দিয়ে সাধারণের কাছে সুপরিচিত করেছিলেন এঁরা, এবং তা আমাদের সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনাকে কিছু পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেকথা স্বীকার করতে হয়'।[২] এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনার প্রচেষ্টার যথার্থ মূল্য নিহিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে যেসব ঔপন্যাসিক সামাজিক উপন্যাসরচনায় বৈচিত্র্য এনেছেন, তাঁদের কারও কারও রচনার বিষয়বস্তু ও মানসিক প্রবণতার সঙ্গে পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের মিল দুর্লক্ষ্য নয়। বঙ্কিমোত্তর কালে ঔপন্যাসিকদের

২. ডঃ সুকুমার সেন, ইতিহাস, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮।

সামাজিক উপন্যাসে, সমাজ সম্পর্কে সংস্কাবমুক্ত চিন্তাব বিস্তৃতি ও বিভিন্ন সমস্যা-জনিত মানবচবিত্রেব জটিলতাব পবিচযেব অভিব্যক্তি ঘটতে দেখা যায়। মানব চবিত্র বিশ্লেষণেব ক্ষেত্রে, মনস্তত্ত্বেব প্রযোগ বঙ্কিমোত্তব ঔপন্যাসিকবৃন্দেব বচনাব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিম-সমকালীন কোন কোন ঔপন্যাসিক এমন সব বিষযবীতি ও প্রসঙ্গেব অবতাবণা কবেছেন যেগুলি বঙ্কিমোত্তব কালেব ঔপন্যাসিকদেব বচনাব উপাদানবূপে গৃহীত। সেগুলি মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

পাবিবাবিক উপন্যাসে সূক্ষ্ম বাস্তবতা।

বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ।

নাবীব প্রণয় (বিবাহেব পবে)।

পতিতা ও যৌন প্রসঙ্গ।

ভাগ্য ও ধর্ম।

উপন্যাসেব আঙ্গিক।

পাবিবাবিক উপন্যাসবচনায় শবৎচন্দ্রেব বিশেষত্বেব পূর্বসূত্র পাই উনিশ শতকে বঙ্কিম সমকালীন ঔপন্যাসিক তাবকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাযেব বচনায়। যৌথ পবিবাবেব সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষামণ্ডিত সূক্ষ্ম বাস্তব রূপেব যে পবিচয এঁদেব উপন্যাসে পেয়েছি তাব সঙ্গে শবৎচন্দ্রেব সমজাতীয বচনাব গভীব মিল লক্ষ্য কবা যায। অবশ্য তাবকনাথেব স্বর্ণলতাই এই জাতীয বচনাব পথপ্রদর্শক। বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহেব সমস্যাকে বঙ্কিমচন্দ্রেব সমকালীন ও অন্যান্য লেখকবৃন্দ উপন্যাসে স্থান দিযেছেন। প্রথমটিব বিপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র স্বমত ঘোষণা কবেছেন। দ্বিতীযটিব বিষয তাঁব উপন্যাসে অনুপস্থিত। বিধবা বিবাহেব পক্ষে বমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী দেবীপ্রসন্ন বাযচৌধুবী প্রমুখ লেখকবর্গেব অভিমত প্রকাশিত হযেছে তাঁদেব উপন্যাসে। ববীন্দ্রনাথেব চোখেব বালিতে বিধবা প্রণযেব চূড়ান্তরূপ প্রদর্শিত হলেও বিনোদিনীব প্রেম বিবাহে পাবর্ণতি লাভ কবেনি। শবৎচন্দ্রও বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে বক্ষণশীলতাব পবিচয দিযেছেন। তবে উভয লেখকই বিধবা-প্রণযেব স্বাভাবিকতাকে স্বীকাব কবে নিযে সহানুভূতিব সঙ্গে সমস্যাটি উপলব্ধি কবেছেন। বিধবা-বিবাহকে সমর্থন কবলেন ববীন্দ্রনাথ চতুবঙ্গ (১৯১৬) উপন্যাসে। প্রণযেব ক্ষেত্রে বর্তমানকালে বিধবা ও কুমাবী প্রায সমান ব্যবহাব-লাভ কবছেন ঔপন্যাসিকদেব কাছে। অসবর্ণ-বিবাহেব যৌক্তিকতা এখন সমাজ

কর্তৃক স্বীকৃত। ঔপন্যাসিকদের রচনায় বর্তমানকালে এই প্রসঙ্গ আর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না। আইনও এই বিবাহের বাধা অপসারিত করেছে। সধবা নারীর প্রণয়কে অবলম্বন করে বঙ্কিম-সমকালে যেসব ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন সেগুলিতে নীতিশিক্ষার প্রাধান্য লক্ষ করেছি। নারীর বিবাহ-উত্তরকালে, বিবাহ-পূর্বপ্রণয়ীর সঙ্গে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও পরিণতির চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তুলে ধরেছেন। বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিক বসন্তকুমার ভট্টাচার্যের 'রমণীহৃদয়' (১৮৮৯) উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরনের অনুসৃতি লক্ষ করি। সধবা নারীর বিবাহের পর সঞ্জাত-প্রণয়কে কেন্দ্র করে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য লিখেছিলেন 'কণকপ্রতিমা'। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মডেল ভগিনীতে বহু-বল্লভা বিলাসিনী সধবা কমলিনীর প্রেমলীলা উপহসিত হয়েছে। হারাণ শশীদের রাণী মৃণালিনীতে সধবা নারীব পুনর্বিবাহ স্বীকৃত। বঙ্কিমোত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের রচনায় বিবাহিতা নারীর বিবাহের পরে সঞ্জাত প্রণয়ের মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়, শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন, শেষপ্রশ্ন, শেষের পরিচয় তার উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকরা এইজাতীয় প্রণয়কে নীতিদণ্ডে শাসন করে তার ভয়ংকর পরিণতি তুলে ধরেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাছে এইজাতীয় প্রণয়নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গৃহীত হয়ে সহানুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমোত্তরকালে পতিতা-জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসরচনার একটি ধারার সূত্রপাত লক্ষ্য করেছি। যার উৎস রয়েছে বঙ্কিম-সমকালীন কোন কোন ঔপন্যাসিকের রচনায়। সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাধামতি, ধীরেন্দ্রনাথ পালের অসতী সন্ন্যাসিনী ও স্বর্ণবাঈ, কালীপ্রসন্ন দত্তের দলিত কুসুম, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়েব 'পাহাড়ে মেয়ে' প্রভৃতি রচনায় পতিতা-জীবন স্থান পেয়েছে। এইসব নারীদের প্রতি সমাজের অবহেলার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

শরৎচন্দ্র এইসব কুলত্যাগিনীদের যে ইতিহাস পেয়েছিলেন, তা থেকে হিসাব করে হতভাগিনীদের শতকরা সত্তরজনকে সধবা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। বাকি ত্রিশজন বিধবা। এদের পতনের কারণ দারিদ্র্য এবং স্বামীর উৎপীড়ন।[৩] পতিতা-জীবন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের কৌতূহল কেবলমাত্র কথার কথা ছিল না।

৩. নারীর মূল্য, শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ (নবম সম্ভার) পৃ. ৩৬৪।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পতিতা-চরিত্র লেখকের অসীম সহানুভূতি ও মমতার ধারায় নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পতিতা-চরিত্র নিয়ে গল্প-রচনা আজকের দিনে কোন অভিনব প্রয়াস নয়। যৌন-প্রসঙ্গেরও উত্থাপন ঘটতে দেখেছি বঙ্কিম-সমকালীন ঔপন্যাসিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তমস্বিনী উপন্যাসে। তমস্বিনী বাংলা উপন্যাসে যৌন-সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ। এর পরে বঙ্কিমোত্তর-কালে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত যৌনভাবাশ্রিত রচনায় সাহসিকতার স্বাক্ষর রাখলেন পাপের ছাপ (১৯২২)-এ। নরেশচন্দ্রের রচনায় নগেন্দ্র গুপ্ত অপেক্ষা সাহস ও বলিষ্ঠতার চিহ্ন বর্তমান। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী, কালিকানন্দ অবধূত, সমরেশ বসু প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বর্তমানকালে হাস্য ও ব্যঙ্গ রচনায় রাজশেখর বসু (পরশুরাম) যে ধারাকে পুষ্ট করে গেছেন সেই ধারার উদ্বোধক বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিক ত্রৈলোক্য-নাথ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিম-সমকালের ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের নাম এই প্রসঙ্গে নূতন করে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। এঁদের সূত্রেই পরশুরামের আবির্ভাব। তবে ইনি ত্রৈলোক্যনাথের নিকট-গোত্রীয়। হাস্য ও ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক রূপ দান করেছেন পরশুরাম। বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের প্রবণতার আর একটি ধারা বর্তমানকালেও অনুসৃত হতে দেখি। উপন্যাসের পরিশিষ্ট রচনার বা অনুবৃত্তির যে প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন কয়েকজন গৌণ ঔপন্যাসিকের রচনায় প্রত্যক্ষ করেছি তার জের বর্তমানকালেও [illegible] নয়। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের অনুবৃত্তি লক্ষ্য করি শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর শ্রীকান্তের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্বের মধ্যে।

আধুনিককালে সমাজের অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের নরনারীকে কোন কোন ঔপন্যাসিক উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও ড্রইংরুম-বিলাসী পাশ্চাত্যভাবাপন্ন অতি আধুনিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। বঙ্কিম-সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী (নয়নতারা) ও স্বর্ণকুমারী দেবী (কাহাকে)-র উপন্যাসে ইংরাজীজানা আধুনিক অভিজাত পরিবারের নরনারীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। বর্তমানকালে রবীন্দ্রনাথ বাদে এই ধরনের চরিত্র-সৃষ্টিতে যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য, ইনি মনীন্দ্রলাল বসু।

উপন্যাসের গঠন-পদ্ধতিতে বৈচিত্র্যসৃষ্টির যে প্রয়াস বঙ্কিম-সমকালীন ঔপন্যাসিকদের রচনায় লক্ষ্য করেছি সেই জাতীয় পদ্ধতির অনুশীলন বর্তমান-

কালেও লক্ষ্য করি। গঠন-প্রণালীতে বঙ্কিমচন্দ্র মূলত দুটি নতুন রীতির প্রবর্তন করেছেন। একটি উত্তমপুরুষে কাহিনী-বর্ণনা, অপরটি বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন। বঙ্কিম-সমকালের গৌণ ঔপন্যাসিক-গণকে এই দুটি রীতিই শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। প্রথম রীতিটির প্রয়োগ ঘটেছে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (অদৃষ্ট) ও স্বর্ণকুমারী দেবী (কাহাকে)-র উপন্যাসে। দ্বিতীয় রীতিটির প্রয়োগ হুবহু না ঘটলেও, দীনেন্দ্র রায়ের কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখিত উপন্যাস (হামিদা) এই রীতিরই রকমফের। এই দুই রীতিরই জের চলেছে বঙ্কিমোত্তরকালে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক, সজনীকান্ত দাসের অজয়, রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে, সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এই দুই রীতি ছাড়াও আর একটি গঠন-রীতি বঙ্কিমসমকালে উদ্ভাবিত হতে দেখি, সেটি পত্রের মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিবেষণের রীতি অর্থাৎ পত্রোপন্যাস। নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বসন্তকুমারের পত্র এই জাতীয় রীতিতে রচিত। এই রীতি যে বঙ্কিম-সমকালে অভিনব[৪] সেকথা বলা বাহুল্য। বিশশতকে ও পত্রোপন্যাসের প্রচলন লক্ষ্য করি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ক্রৌঞ্চমিথুন এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভালোকের অন্তরালে আত্মরক্ষাকারী এইসব গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের অধিকাংশই যদিও বঙ্কিমকালবৃত্তে আবৃত হয়ে পড়েছেন, তথাপি এঁদের সমবেত সাধনা বাংলা উপন্যাসের একটা বৃহৎ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছে। বঙ্কিমকালবৃত্তের আবরণ অপাবৃত করে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার-অন্তে শিল্পীমানসে ও উপন্যাসের ধারায় পরিবর্তন ঘটানর মত ক্ষমতা যে এঁদের ছিল না একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবু এঁদের অনেকের রচনার বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রবণতা আসন্ন পরিবর্তনের ধারাটিকে যে ইঙ্গিতময় করে তুলেছিল সেকথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এঁদের রচনাবৈচিত্র্য ও আদর্শের কোন কোন ধারা পরবর্তী-কালে যে আরও মার্জিত ও শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তার পরিচয় মেলে। এক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে শিল্পীদের মানসিকপ্রবণতার অভিন্নতা ও বিবর্তনের কথাই এসে পড়ে। তফাত বঙ্কিমসমকালে গৌণ ঔপন্যাসিকেরা যেসব সমস্যাকে

৪. রামদুলাল বসু: বঙ্কিম-সমকালীন তিনটি অভিনব উপন্যাস, জয়শ্রী, মাঘ, ১৩৬৬।

উপন্যাসে স্থান দিয়েছিলেন সেগুলির উপস্থাপন ও সমাধানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নীতিকেই প্রায়শ আশ্রয় করেছিলেন। আর, পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকবৃন্দ এই নীতির আবরণ অপসৃত করে, নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সহানুভূতি ও বুদ্ধির আলোকে সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ কবতে প্রয়াসী হযেছেন। বঙ্কিমসমকালীন গৌণ ঔপ-ন্যাসিকবৃন্দ, গতানুগতিকতাব আবর্তের গভীরে সার্থকতার সন্ধানপর হয়ে যে পথে যাত্রাব গতি রুদ্ধপ্রায় কবেছেন, বঙ্কিমকালোত্তর ঔপন্যাসিকবৃন্দ সেই পথে যাত্রাকে অবারিত করে, মহাপার্থিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

পরিশিষ্ট

[অনালোচিত গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দের গ্রন্থাবলীর যথাসম্ভব বর্ণনামূলক তালিকা দেওয়া হল। লেখক, গ্রন্থনাম, বন্ধনীমধ্যে গ্রন্থশ্রেণী, প্রকাশস্থল, প্রকাশকাল, পৃষ্ঠাসংখ্যা ও গ্রন্থপরিচয় দেওয়া হল। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অথচ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গ্রন্থও এই তালিকাভুক্ত।]

অজ্ঞাত : গোস্বামীর সাগরযাত্রা (সা) কলিকাতা, ২৮শে অক্টোবর ১৮৮৪, পৃঃ ৫৮। গল্প ও গ্রন্থ সমালোচনা এই দুইয়ের সমাবেশে উপন্যাসটি বৈচিত্র্য-পূর্ণ। নবদ্বীপের দীপচাঁদ গোস্বামী পরিবারবর্গসহ সাগরযাত্রার পথে নৌকাডুবির দৃশ্য দেখে তত্ত্বজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম পাঠে কোন ফল হয় না। পরে ঘটনাচক্রে গোস্বামীর পুত্র সুশীলচন্দ্র গৃহত্যাগ করলে, তার মা আত্মহত্যা করেন এবং গোস্বামী সন্ন্যাসী হন। আজমীঢের পুষ্করতীর্থে সন্ন্যাসীবেশী গোস্বামীকে আত্মার গতি নিরূপণে বাংলা বইকে ধিক্কৃত করতে দেখা যায়। লেখকের শেষ কথা, 'বাংলা বই দুর্নামগ্রস্ত কিজন্য আমরা তাহার যৎকিঞ্চিৎ কারণ নির্দেশ করিলাম। যাঁহাদিগের সম্পত্তি তাঁহারা গুণগ্রাহী হইয়া যত্নপূর্বক দেশীয় ও জাতীয় কলঙ্কমোচনে অগ্রবর্তী হন ইহাই প্রার্থনা।'

নবদুর্গা (সা), ২৮ অক্টোবর ১৮৮৪, পৃ ১০৩।

আশালতা (ঐ), কলিকাতা, ১৫ অক্টোবর ১৮৮৬, পৃ ২৮৫। মোগলগণ কর্তৃক পূর্ববঙ্গবিজয় সম্পূর্ণ না হওয়ার কালে রচিত একটি প্রেমের কাহিনী।

মাল্যবিনিময় (সা), কলিকাতা, মাঘ ১২৯৩, পৃ ৮০। একটি প্রণয়কাহিনী।

সোনার সংসার (সা), কলিকাতা, ২৫ অক্টোবর ১৮৮৭, পৃ ২২৮। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী, নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত।

নিনাজ মোহিনী (ঐ), কলিকাতা, ৩ জানুয়ারি ১৮৮৮, পৃ ৮৭। পশ্চিমবঙ্গে মারাঠা-আক্রমণকালে স্বামীর সন্ধানরত সতী নারীর গল্প।

ললনা মুকুর (সা), কলিকাতা, ৩০ আগস্ট ১৮৮৮, পৃ ২৩৩

তাপসতনয় 'কলিকাতা, ১৫ আগস্ট ১৮৮৮, পৃ ২৭৪।

অমরসিংহ (ঐ), কলিকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯, পৃ ১৭৫।

বাঙ্গালী মেয়ে (সা), কলিকাতা, ২৫ এপ্রিল ১৮৮৯, পৃ ৭২।

স্বর্ণকুমারী (কা), কলিকাতা, ১৬ জুন ১৮৯০, পৃ ৮৩। গল্পের নায়িকা'র নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ। বঙ্গদেশ যখন দস্যুপ্রধান ছিল সেই সময়কার কাহিনী। স্বর্ণকুমারী ও যোগেন্দ্রনাথের প্রণয় ও যোগেন্দ্রর সন্ন্যাসী পিতার হস্তক্ষেপে বিবাহের কাহিনী।

লীলা বা অদ্ভুত নিরুদ্দেশ (সা), কলিকাতা, ২২ জুলাই ১৮৯১, পৃ ৬৫।

বাবা (সা), কলিকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ পৃ ৭২।

নতন বউ (সা), ১৮৯২, যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের চিত্র।

নবগ্রাম (সা), ৩ মার্চ ১৮৯২, পৃ ২৩৬। নব্যবঙ্গের আশা ও ভরসা স্বরূপ যতান ইংলণ্ডে গিয়ে শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে দেশে ফিরে শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করে। কাপড়ের কল খোলে এব সততার উদাহরণ রাখে। গ্রন্থটির শিল্পরীতি সুখপাঠ্যের অন্তরায়।

মড়েলকাকা বা বসন্তকুমারী (সা), ২৩ জন ১৮৯৩ পৃ ২৪৮। গৃহকর্ত্রার স্বার্থপরতার জন্য যৌথ পরিবারের 'ভাঙ্গনের' চিত্র। স্ত্রীর প্রতি গৃহকর্তার অত্যাসক্তির ফল।

সরলা ও চতুরা (সা), কলিকাতা, ১৮ জুলাই ১৮৯৩, পৃ ১৮৯। একটি প্রবঞ্চনার কাহিনী। একজন বিত্তশালী জমিদারের প্রধান কর্মচারী কতৃক জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি নিজের অধীনে এনে জমিদারকে পথে বসানর কাহিনী।

সেজদিদি (সা), কলিকাতা, ৫ জুলাই ১৮৯১, পৃ ১০৯। ইংরেজীয়ানা ও স্ত্রী-স্বাধীনতাকে উপহাস করে লেখা কাহিনী।

শরৎকুমারী অথবা আদর্শ বঙ্গমহিলা (সা) কলিকাতা, ১৮৮৫। ভারতী (ফাল্গুন ১২৯১, পৃ ৫২২)-তে সমালোচিত।

সৎমা (সা), আলোচনা (শ্রাবণ ১৩০৬, পৃ ৬১) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

প্রমোদিনী (ঐ), বান্ধব (পৌষ—মাঘ ১২৮৩, পৃ ৩২০)-এ প্রকাশিত।

অবিনাশচন্দ্র দাস, এম. এ. বি. এল. : পলাশবন (কা-গা), কলিকাতা, ১৩০৩, (১৮৯৬), পৃ ২৩৪। 'পলাশবন ঠিক উপন্যাসগ্রন্থ নহে। উপন্যাসের অধিকাংশ লক্ষণই ইহাতে বিদ্যমান নাই। ইহাকে একটি কাল্পনিক গার্হস্থ্য চিত্রমাত্র বলা যাইতে পারে'। (বিজ্ঞাপন) প্রাচীন আদর্শের প্রতি নারীর গভীর আস্থার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

অটলবিহারী দত্ত : প্রতিবিম্ব, কলিকাতা, ১০ই মার্চ ১৮৯৮, পৃ. ১৭৬। কাহিনীটি বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিজয় এক জমিদারকন্যা বিভাবতীকে বিবাহ করে। পিতার সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কে মতান্তর হলে সে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কাশী ও মধ্যভারত পরিক্রমা করে। পরে সে রাশিয়ার সামরিক অধিকর্তার কমারফ-এর কাছে আবেদন করে সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করে কর্নেল হয়। ইংলণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধান্তে সে বরাবরের জন্য দেশে আসে এবং বিভাবতীর সঙ্গে সুখে দিন কাটাতে থাকে।

অতুলচন্দ্র : বরদা (সা), ২৫শে অক্টোবর ১৮৯৫, পৃঃ ১৬২।

অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় : চেতমতী (ঐ), কাশীপুর, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৬, পৃঃ ১০৮। নেপালের রাজা জয়কুমার প্রজাদের প্রিয় ছিল। তিনি রাজ্যকে চারভাগে ভাগ করে তিনভাগ তিন ছেলে ও একভাগ মেয়ে চেতমতীকে দেন। প্রজাদের পরে উৎপীড়ন শুরু করলে উদয়পুরের রাজার সহায়তায় চেতমতী ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাভূত করে এবং উদয়পুরের রাজা জিৎ সিং কে বিবাহ করে।

অক্ষয়কুমার বসু : তারাবিজয় (ঐ), ১১ই মে ১৮৮৫, পৃ. ১২২। দিল্লী ও রাজবারাসংক্রান্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ভারতী (মাঘ, ১২৯২)-তে গ্রন্থটির সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'ইহার বর্ণনাগুলি, ইহার গল্পটি যেমন হইয়াছে, চরিত্র তেমন পরিস্ফুট হয় নাই'।

অক্রুরচন্দ্র সেন : জলাঞ্জলি (সা), ঢাকা, ১১ জুন ১৮৮৮, পৃ. ২৬৭। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতি প্রচলিত হবার পূর্বেকার পারিবারিক চিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত। লেখক সমাজ তথা পরিবারের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রীতিপ্রচলনের বিরোধী।

অমরেশ দত্ত : স্বর্ণকুমারী (ঐ), ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৭, পৃ ১১৯। মহারাণা-প্রতাপ সিংহের পুত্র অমর সিংহের রাজত্বকালের পটভূমিতে কাহিনী বিস্তৃত। স্বর্ণকুমারীর কিভাবে মহারানার অনুমোদিত পাত্র ভীমসিংহের বদলে প্রেমাস্পদ সমর সিংহের সঙ্গে বিবাহ হয়, সেই কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

অধরচন্দ্র দাস : ত্রিবেণী, (ধ), ২ আগস্ট ১৯০০ পৃ ৫১০। যোগমায়ার বাবা ছিলেন শৈব, দাদা ছিলেন বৈষ্ণব, এবং শ্বশুর ছিলেন নৈয়ায়িক। এই তিনজনের ধর্মপ্রভাবই যোগমায়ার উপর পড়ে। নবদ্বীপে চৈতন্যের ধর্ম যখন প্রতিষ্ঠিত তখন দুটি ব্রাহ্মণ পরিবারের উত্থান-পতনের কাহিনী। তবে চৈতন্যবাদ তখন কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে। সিদ্ধেশ্বর ও বিশ্বরূপ শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের সুন্দর উদাহরণ। সত্যবতী হিন্দুধর্মাদর্শের প্রতীক। 'প্রদীপ' এ গ্রন্থটি সমালোচনাকালে বলা হয়েছে যে, 'লেখক—উপন্যাসচ্ছলে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের ছবি পাঠকের মনে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে' (কার্তিক, ১৩০৭, পৃ ৩৭০)।

অবতারাচরণ লাহা : আনন্দলহরী, (স), কলিকাতা ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৯, পৃ ১৪৩। অর্ধশিক্ষিত বঙ্গসমাজের রূপ চিত্রিত।

অতুলানন্দ ভট্টাচার্য : বাণা হেমাঙ্গিনী, কলিকাতা, ২৯ মার্চ ১৮৯৪, পৃ ৬৪।

অতুলানন্দ গুপ্ত : যোগিন (সা), কলিকাতা, ১১ জুলাই ১৮৯৪, পৃ ৫৫। একটি বালিকার স্বামীর প্রতি আনুগত্যবোধে পিতৃগৃহ-ত্যাগের কাহিনী।

আজ্জামান্দ আলী : প্রেমদর্পণ (সা), ১০ এপ্রিল ১৮৯১। একটি হিন্দু-মেয়ের সঙ্গে মুসলমান যুবকের প্রণয় কাহিনী। মেয়েদের বিদ্যালয় পরিদর্শন-কালে মুসলমান ভদ্রলোক মেয়েটিকে দেখে। মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব করলে সে প্রথমে রাজী হয় না। পরে, মায়ের মৃত্যুর পর রাজী হলে, মেয়েটি মুসলমানধর্মগ্রহণান্তে উভয়ের বিবাহ হয়।

আনন্দচন্দ্র মিত্র : রাজকুমারী অথবা বিক্রমপুরের পুরাবৃত্ত (এ), ১৮৭৯, পৃ ১৯০। ভক্তহরি (সা) ১২ নভেম্বর ১৮৮৬, ১০। বর্তমান সামাজিক সমস্যা নিয়ে লিখিত উপন্যাস।

ইন্দ্রনারায়ণ পাল : কুসুমারিন্দম (সা) কলিকাতা, ১ জানুয়ারি ১৮৮১, পৃ ১৪৭।

কুসুম এবং আরিন্দমের প্রণয়ের পথে শত্রুতা করল একজন জমিদার। এবং

তারই চক্রান্তে অরিন্দমের জেল হল। পার্শ্বকাহিনী—বিধবা যামিনী ও বরেন্দ্রের প্রণয়। 'আর্যদর্শন' (পৌষ ১২৮৮) পত্রিকায় উপন্যাসটি সমালোচিত হয়। সমালোচক বলেন,—'গ্রন্থকারের কল্পনাশক্তি ভাল, কিন্তু তাহার পরিস্ফুটনে তিনি তত পটু নহেন। এই দোষনিবন্ধন তাঁহার উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র কতক অপরিস্ফুট ও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।'…

নীলিমা (সা), কলিকাতা, ৩ জুলাই ১৮৮৩, পৃ. ১১৯। দৈহিক প্রণয়ের ফল দুঃখজনক এবং আন্তরিক প্রণয় পবিত্র ও চিরসুখের কারণ, এই মত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা আছে উপন্যাসটিতে।

উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়: রাজেন্দ্রমল্লিকা (সা), ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪। হতাশ প্রণয়ের গল্প।

বনপুত্র, (ঐ) বান্ধব (দ্বাদশ সংখ্যা, ১২৯১ পৃ ৫৩৫)-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

উপেন্দ্র মিত্র: প্রতাপ-সংহার (ঐ), কলিকাতা, ১৮৭৯, পৃ ২১৬, দ্বি. সং. ১৮৮৪। যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধ।•প্রতাপাদিত্যের পরাজয়-কাহিনী।

পৃথ্বীরাজ (ঐ), কলিকাতা ১২৮৭, পৃ. ১৮০।

নানাসাহেব (ঐ), কলিকাতা, ১২৯০ দ্বি সং. সিপাহী-যুদ্ধের কাহিনী।

উমেশচন্দ্র বিশ্বাস: কুটির কুসুম (সা), মানিকগঞ্জ (ঢাকা), ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯, পৃ. ১১৮। উচ্চপদস্থ অসৎ কর্মচারীরা কিভাবে নিম্নপদস্থ কর্মচারিবৃন্দের উপর সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এবং সুবিধা পেলে নিম্নপদস্থ কর্মচারীর স্ত্রীর উপর অধিকার স্থাপন করতে চায় তারই চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক উপন্যাসটিতে। কুমুদকান্ত ও কুসুমের বিবাহিত জীবনে অশান্তির সৃষ্টি করে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জনৈক কাজী। কুসুম লুণ্ঠিতা হয়। কাজীর মৃত্যু হয়। নির্যাতিত কুমুদের মৃত্যুর খবর শুনে কুসুম মৃত্যু বরণ করে। বান্ধব (৯ম সংখ্যা ১২৮৭, পৃ ৪৩১—৩২)-এ উপন্যাসটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'লেখকের গল্প রচনা করিবার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু তিনি চরিত্রবিন্যাসের কিছুই ধার ধারেন না।… বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ ও দুর্গেশনন্দিনী হইতে লেখক দুই হস্তে ভাব ভাষা প্রভৃতি চরি করিয়াছেন'।

একজন পরিব্রাজক প্রণীত : শৈলবালা (সা), কলিকাতা ১৮৮১।...'অসম্পূর্ণ সত্ত্বেও শৈলবালা যে একখানি সুপাঠ্য উপন্যাস তাহাতে সংশয় করি না' (প্রবাহ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০, পৃ. ৯৪—৯৬)। 'যে ভাষা-বৈচিত্র্য, ভাব-বৈচিত্র্য এবং বর্ণনাচাতুর্য উপন্যাসের জীবন শৈলবালায় তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে' (আর্যদর্শন, আষাঢ়, ১২৮৮)।

কালীপদ মুখোপাধ্যায় : মধুমালতী, (সা), ১ নভেম্বর ১৮৯৫, পৃ. ২৬৬। মধুমালতীর বিবাহ-প্রসঙ্গ উপন্যাসটির মূল বিষয়। মধুমালতীর দিদি স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্তা। তার স্বামীর উপপত্নীই এজন্য দায়ী। একদল বদমায়েস লীলা ও মধুমালতীকে পাপকর্মে নিয়ুক্ত করবার জন্য হরণ করার কালে তারা এক ভিখারিনী কর্তৃক রক্ষা পায়। এই ভিখারিনী লীলার স্বামীর উপপত্নী। তার চেষ্টায় বদমায়েসদল সংশিক্ষা পায়। লীলার সঙ্গে স্বামীর পুনর্মিলন হয় এবং মধুমালতীর বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

কফিলুদ্দিন আহমেদ : নিষাদকুমারী (ঐ), ১০ নভেম্বর ১৮৯৩, পৃ. ৬৩। আকবরের সময়ে, মানসিংহ যখন বাংলার শাসক, সেইকালের পটভূমিতে লেখা কাহিনী। হিন্দু সমাজ সম্পর্কে লেখকের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসটিতে।

কুমুদবিহারী মল্লিক : সৌদামিনী বা হিন্দুসতী সৌদামিনী (সা), কলিকাতা, ১৭ অক্টোবর ১৮৯৩, পৃ ২১৪। পলাশির যুদ্ধের পর একজন ইংরাজ কর্তৃক একটি হিন্দু মহিলা অপহরণের কাহিনী। মহিলাটি অলৌকিক উপায়ে সতীত্ব রক্ষা করেন এবং লাঞ্ছনার হাত থেকে অব্যাহতি পান।

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : ভবানী ঠাকুর (ঐ), ১৬ মার্চ ১৮৯১, পৃ. ৪৩০। ঠগী দমনের জন্য বাঙ্গালী কর্মচারীরা কর্নেল শ্লীম্যানকে কিভাবে সাহায্য করেছিল তার কাহিনী।

কালীমোহন ভট্টাচার্য : দেবীরাণী (সা), ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, পৃ. ১১২ দ্বি. সং. ১৯০০, পৃ. ১১৮।

দেবীবালা (সা), ১৫ আগস্ট ১৯০০। দেবীবালার জীবনের বিপর্যয়ের কাহিনী।

কৃষ্ণধন চক্রবর্তী : শরৎকামিনী (সা), ১৮৮৪। একটি ছুতার যুবকের বি. এ. পাস এবং পরিচয়হীনা বালিকাকে বিবাহের কাহিনী।

কালীপ্রসন্ন দত্ত: বিজয় (ঐ), কলিকাতা, ১০ জানুয়ারি ১৮৮৫, পৃ. ১৮৬। সিপাহী-যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা বিজয় ও মালতীর প্রণয়-কাহিনী। বিদ্রোহ-সংক্রান্ত মনোভাব উপন্যাসটিতে সুব্যক্ত। তান্তিয়া টোপীর বীরত্বের চিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত।

দলিত কুসুম (সা), কলিকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৯, পৃ. ১৮০। একটি অসহায় কুলীন কন্যা কিভাবে দুষ্ট পুরুষের চক্রান্তে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করল তার কাহিনী। পতিতা-জীবনের দুঃখ ও গ্লানিময় অধ্যায়ের বাস্তব রূপ উদ্‌ঘাটিত। 'মাসী'দের অত্যাচার ও উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের পতিতাদের প্রতি আচরণ বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন: বসন্তলতা (সা) ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪, পৃ. ১৭৮।

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী: রশিনারা (ঐ), কলিকাতা ১২৭৬। রশিনারা-শিবজী প্রেমের আলেখ্য চিত্রিত।

কালীবর ভট্টাচার্য: অকালকুসুম অথবা আজমীর রাজতনয়া (ঐ), কলিকাতা ১৮৬৯, পৃ. ৯৩। আজমীর গেহলোট রাজকুমারী ইন্দুমতীকে বলপ্রয়োগে বিবাহের ইচ্ছায় রাঠোর অজয় সিংহের আজমীর আক্রমণ। ইন্দুমতীর পিতার মৃত্যু। ইন্দুমতীর অগ্নিতে আত্মাহুতি।

কেদারনাথ চক্রবর্তী: চন্দ্রকেতু (ঐ), কলিকাতা, ২ ডিসেম্বর ১৮৭৮, পৃ. ১৫১। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্যবিদগণের সভায় ম্যাক্সমুলর বলেছিলেন, যে জাতি তার অতীত জানে না সে জাতি বড় হতে পারে না। ম্যাক্সমুলরের এই উক্তি থেকে লেখক প্রেরণা লাভ করেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্তৃক লক্ষ্মণ সেন রাজ্যচ্যুত হবার পরে, এক ফকিরের ছদ্মবেশে গোরাচাঁদের বাংলার একাংশ আক্রমণের কাহিনী। বালণ্ডার রাজা চন্দ্রকেতুর সঙ্গে গোরাচাঁদের যুদ্ধে চন্দ্রকেতু পরাস্ত হন। বিজয়কেতু সাময়িক ভাবে আক্রমণকারীদের পরাভূত করেন। চন্দ্রকেতু পরে পত্নীশোকে মৃত্যুবরণ করেন। বিজয়-মালতীর প্রেমকাহিনী এই পটভূমিতে বর্ণিত। কয়েকটি চরিত্রে বঙ্কিম-প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কিশোরীমোহন রায়: হামির (ঐ), ১২৯৮। রাজপুত বীর হামিরের কাহিনী।

কৃষ্ণদাস সুর: বিদ্যুন্মালিনী (কা), কলিকাতা, ২৮ অক্টোবর ১৮৭৮, পৃ. ১১০। রাজকুমার বিজয়কেতু বাক্‌দত্তা বিদ্যুন্মালিনীকে উপেক্ষা করে

ইন্দুমালিনীকে ভালবাসল। তারপর ঘটনাচক্রে উভয়কেই বিবাহ করল।

কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়: একাকিনী (ঐ), কলিকাতা ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০, পৃ. ১১৯। জয়পুরের জয় সিংহের সঙ্গে সম্রাট শাহ্ আলমের যুদ্ধ-কাহিনী। জয় সিংহ মারা যান। যোধপুরের রাজকুমার অজিত সিংহের সঙ্গে জয় সিংহের কন্যা শৈলবালার প্রণয় হয়। অজিত সিংহ এবং জয়পুরের রাজপরিবারের সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। শৈলবালা একমাত্র জীবিত থাকে।

কেদারনাথ দত্ত: প্রেম প্রদীপ (ধ), কলিকাতা ৩০ জুন ১৮৮৫, পৃ. ৬৯। বৈষ্ণবধর্মনীতি ব্যাখ্যাত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়: যোগিনী-জীবন (ধ), ৮ আগস্ট ১৮৮১, পৃ. ১৩১। স্বামী যোগসাধনার জন্য স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। স্ত্রী ও স্বামীর অজ্ঞাতসারে তারই পন্থা গ্রহণ করেন এবং গৃহত্যাগ করেন। তারপর বহুবিধ বাধা-বিপত্তির পর স্বামী ও স্ত্রী ধর্মজীবনে মিলিত হন এবং সিদ্ধিলাভ করেন।

কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী: চারুবালা (সা). বেউলিয়া, ১৮ আগস্ট ১৮৮৭, পৃ ১৪৪।

কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়: চিরদিন কি দুঃখে যায়? (সা), ২১ জানুয়ারি ১৮৮৮, পৃ ৭২।

কুলী-কাহিনী, (সা), কলিকাতা, ৬ মার্চ ১৮৮৮, পৃ ১২৬। আসামের চা-বাগানের কুলীদের দুঃখ-দশার কাহিনী।

কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়: কুমুদিনী (সা), কলিকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯, পৃ ২০৩। বিলাসপুরের জমিদার ললিতমোহন, রজনীকান্তকে গঙ্গা থেকে উদ্ধার করে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। তাঁর দত্তককন্যা কুমুদিনীর সঙ্গে রজনীর বিবাহ হয়। পরে ঘটনাচক্রে জানা যায়, রজনীকান্ত ললিতমোহনের আসল পুত্র। দেবী ভবানীর নির্দেশে ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখি।

কালীপ্রসন্ন বাগচী: আনন্দকানন (ঐ), বোগড়া, ১৮৯১, পৃ. ১১৩। শের শাহের কালের পটভূমিতে রচিত কাহিনী।

কুসুমেষু কুমার মিত্র: বসন্তসুন্দরী (ঐ), ২৮ ডিসেম্বর ১৮৯৯, পৃ. ১২০। মুসলমান রাজত্বের শেষধাপে বর্ধমানের পটভূমিতে লেখা দুটি বালিকা হরণ ও উদ্ধারের কাহিনী।

কাদম্বিনী (সা), ২ জানুয়ারি ১৯০০, পৃ ১২০।

সরোজিনী (ঐ), ৪ জানুয়ারি ১৯০০, পৃ. ১২০।

অমরেশ দত্ত রচিত 'স্বর্ণকুমারী' উপন্যাসটির হুবহু অনুকরণ। কেবল চরিত্রের নাম পরিবর্তিত।

কেদারেশ্বর সেন : স্মৃতিমন্দির (সা), ১৪ এপ্রিল ১৯০০, পৃ. ২১৮।

হরিনাথ তার স্ত্রীকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করলে গৃহে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং বধূর উপর নির্যাতন শুরু হয়। স্ত্রী সর্বাণী গৃহত্যাগ করে। শাশুড়ীর চোখ খোলে এবং তাঁর ভুলের কথা স্মরণ করে মারা যান। হরিনাথ স্ত্রীকে উদ্ধার করে।

কেদারনাথ বিশ্বাস : ভবানী পাঠক (ঐ), কলিকাতা, ২ আগস্ট ১৯০০ পৃ. ৩২২। দেবী চৌধুরাণীর পরিশিষ্ট। দেবী চৌধুরাণী চলে যাবার পর ভবানী পাঠক ডাকাতদল ভেঙ্গে দেন এবং সাধনরত থাকেন। পরে আবার ডাকাতদল করে তার প্রতিপক্ষ বিশ্বনাথকে বন্দী করেন। কিন্তু দলের কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, তিনি দলত্যাগ করে কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। গুরু উদ্ধার করলে, গঙ্গাতীরে অনশনে মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রী বা বঙ্গ সাহিত্যাকাশের পূর্ণচন্দ্র (ঐ), কলিকাতা, ১৯০২ বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম-এর উপসংহার। 'মহম্মদপুর শত্রুর করতলগত হইলে অদ্বিতীয় প্রতাপশালী মহারাজ সীতারাম যেরূপ ভাবে, যেরূপ অবস্থায় জীবনযাপন করিয়াছিলেন, যে প্রকার কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে অদৃষ্টদোষে ও গ্রহফেরে অভাগিনী শ্রী একদিনের জন্য পার্থিব সুখের মুখ দেখিতে পাইল না, পতিসেবা করা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। (ভূমিকা)

খগেন্দ্রলাল রায় : শ্রী (সা), ৩০ জুন ১৮৯৩, পৃ ১০৬। জীবন একটি বিধবাকে বিয়ে করে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কন্যাকে ভৃত্যের হাতে সমর্পণ করে সে সন্ন্যাস নেয়। মেয়েটি গান শেখে। জীবনের দাদা শ্রীকে নিয়ে যায়। এক জমিদার তাকে লুণ্ঠন করে। শ্রী পালিয়ে পিতার সাক্ষাৎ পায়। তারপর পিতাপুত্রী ধর্মজীবন যাপন করতে থাকে।

শান্তি দেবী (সা), ২৬ জানুয়ারি ১৮৯৩ পৃ ৮৪। রায়তের উত্থানের ফলে একটি জমিদারের পতনকাহিনী।

ক্ষেত্রনাথ সেন : শবতের চিঠি (সা) কলিকাতা, ২৬ আগস্ট ১৮৯৭, পৃ ১০৮, দ্বি সং।

ক্ষেত্রমোহন ঘোষ : আদরিণী (সা), ২২ ডিসেম্বর ১৮৯৪, পৃ ১৯৮।

ফিরোজা বিবি (ব), কলিকাতা, ২৮ জুলাই ১৯০০, পৃ ১৩০।

ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত : মদনমোহন (সা), কলিকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০, পৃ ১১৯। সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত। মদনমোহন দরিদ্র প্রজাদের পক্ষ নিলে নায়েব রামনিধি ঘোষ তাকে হত্যা করার জন্য লোক নিযুক্ত করে। মদনের বদলে জনৈক গোসাই নিহত হয়। নায়েব, দারোগা ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্থে বশীভূত করে গোসাঁই হত্যার জন্য মদনকে দায়ী করে এবং বিচারে মদনের ফাঁসি হয়।

ক্ষেত্রগোপাল রায় : ইন্দ্রকুমারী (ঐ), কলিকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১, পৃ ২৫। বঙ্গে মারাঠা আক্রমণের কাহিনী নিয়ে রচিত।

ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় : নীলিমা (সা), ১২৯। বঙ্গদর্শনে গ্রন্থটি সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে 'নীলিমা' এককথায় সাধারণীর 'চানাচুর' 'ইসমে প্রাডবিবাক হ্যায় মলিয়্যচ হ্যায়, ধুষ্টত্যমুরি হ্যায়।' 'ভরসা করি গ্রন্থকার বিজ্ঞাপন দিতে হইলে লিখিবেন—নীতি এবং দুর্নীতি, সামাজিকতা এবং অসামাজিকতা, বিরহ এবং মিলনের খিচুড়িতে যার দরকার, নীলিমা তাহার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।' (অগ্রহায়ণ, ১২৯০)।

গোষ্ঠবিহারী দে : সিন্ধুবালা (সা), ২২ আগস্ট ১৮১৪, পৃ ১ ৩।

একজন ঈর্ষাপরায়ণা শাশুড়ী, পুত্রবধূর উপর ঈর্ষাপরবশ হয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং ছেলের উপর পৃথকত্ব করবার জন্য তাকে অধঃপতনের পথে ঠেলে দেয়। পরিণামে সে ছেলে ও নিজের অর্থসম্পদ হারায়।

গঙ্গাচরণ দত্ত : বীরাঙ্গনা (ঐ), ঢাকা, ২৫ জুন ১৮৮৪, পৃ ১১৯।

গৌড়ের রাজা গণেশের কালে, মোগলসম্রাট ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে মোগল সৈন্যের গৌড় আক্রমণের কাহিনী। নায়িকা গোলাবকুমারী

বা বীরাঙ্গনা যুদ্ধকালে অসামান্য সাহসিকতার পরিচয় দেয় এবং দুবার রাজা গণেশের জীবন রক্ষা করে। যুদ্ধান্তে গণেশের সঙ্গে তার বিবাহ হয়।

গোবিন্দচন্দ্র আচার্য: নগেন্দ্রনন্দিনী, পাণ্ডুয়া, ৪ জুলাই ১৮৮৮, (দ্বি. সং.) পৃ. ১১২।

গদাধর শর্মা: গোবর্ধন লীলা (সা), কলিকাতা ১০ ডিসেম্বর ১৮৮৭, পৃ. ৭০। উপন্যাসটি অনেকটা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর মডেল ভগিনীর প্রত্যুত্তর। হিন্দুধর্মের প্রচারক এক শ্রেণীর হিন্দুর অহিন্দুসুলভ আচরণের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মিত্র: অপূর্ব প্রণয়, ২৬ নভেম্বর, ১৮৯৪, পৃ. ১৮৪।

জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী: ইন্দুপ্রভা (সা), কলিকাতা ২৬ অক্টোবর ১৮৮৪, পৃ. ১০৯। মা ও মামার চক্রান্তে পিতৃ-সম্পত্তি থেকে এক ব্যক্তির বঞ্চিত হওয়া ও পুনঃপ্রাপ্তির কাহিনী। ভারতী (মাঘ, ১২৯২, পৃ. ৪৯৪)-তে সমালোচিত।

গজপতি রায়: ঐতিহাসিক নবন্যাস (অঙ্গখণ্ড) মাধবমোহিনী (ঐ), ১২৭৯, পৃ. ৩০২।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২): চন্দ্রা (ঐ), কলিকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭, পৃ ১৬৪।

জনার্দন একটি পাঞ্জাবী মেয়ের প্রেম-মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করে এবং একটি তালুক কিনে লক্ষ্ণৌ-এ বসবাস করতে থাকে। একদিন তার স্ত্রীর সঙ্গে একজন ইংরাজ ভদ্রলোককে দেখে সে সন্ন্যাসী হয় এবং ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করে। তারা বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। জনার্দনের স্ত্রী জেনারেল হ্যাভলককে খবর দিলে পাণ্ডু নদীর তীরে সিপাহীদের বিপর্যয় ঘটে। তার মেয়ে চন্দ্রা বেথুন স্কুলে পড়ত। সে সন্ন্যাসীদলে জনৈক নেতার প্রেমে পড়ে। বিদ্রোহান্তে সে লর্ড ক্যানিং-এর ক্ষমা পায়। নবজীবন-এ সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'ইহার দোষ চটক চমকের অনবরত প্রদর্শন, অঘটন ঘটনার নিয়ত ঘটঘটানি, ইহাতে ঘটনার বিপ্লবে মানসিক বিপ্লব ঢাকিয়া রাখিয়াছে।... দেশভক্তির বীজ সংসারবৈরাগ্যে বপন করিয়া নিঃস্বার্থ দেশভক্তির অনুপপত্তির অসাধু সংকেত করিয়াছেন এবং চন্দ্রার প্রগাঢ় প্রণয়ে

দারুণ অভিমান আরোপ করিয়া চন্দ্রার হিন্দু-রমণীত্ব নষ্ট করিয়াছেন। হিন্দু নারী ক্ষমা, চন্দ্রা নহে (১২শ সংখ্যা, আষাঢ় ১২৯৫, পৃ. ৭৫০)।

গোপালচন্দ্র দত্ত: সুলোচনা অথবা আদর্শ ভার্যা (পা), কলিকাতা ১৮৮২। প্রবাহ (১ম ভাগ ১০ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৮৯, পৃ ২২৩—২৪) পত্রিকায় শিবনাথ শাস্ত্রীর নয়নতারার সঙ্গে তুলনায় গ্রন্থটিকে শ্রেষ্ঠতর বলা হয়েছে।

গোবিন্দ ঘোষ: চিত্তবিনোদিনী (ঐ), ১৬৯৬ শক (১৮৭৪) দ্বি. সং ১৮৮৪। সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিতে আখ্যানবস্তু পরিকল্পিত।

মেহের আলি, আর্যদর্শন। মাঘ ১২৮১ -এ, প্রকাশিত।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়: বীরবরণ (ঐ), (.২৯০), পৃ ২৩২। বৌদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করে, বীরসেনের আদিশূর নাম গ্রহণান্তর গৌড়ের সিংহাসন আরোহণের কাহিনী।

মাসাবিনী (ঐ), ১৮৭৭। মামুদের ভারত আক্রমণের কাহিনী।

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়: গঙ্গাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা (সা), ১২ ডিসেম্বর ১৮৮৩, প ২৮১। পল্লী-জীবনকেন্দ্রিক কাহিনী।

চন্দ্রনাথ বসু: পশুপতি সংবাদ (ঐ), কলিকাতা, ২৫ মার্চ ১৮৮৪, পৃ ৬২।

চন্দ্রশেখর কর: অনাথ বালক (সা), কলিকাতা, ১ অক্টোবর ১৮৯১, পৃ. ১৬৪।

চারুচন্দ্র জ্যোতিষী ভট্টাচার্য: বসন্তলতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩, (দ্বি সং) পৃ ৮৮।

চুনীলাল মিত্র: আঙুর ফকির (সা) ১২ জানুয়ারি ১৮৯১, পৃ ১৪০। সর্পদষ্ট একটি বালিকার জীবনের আশা না থাকায় নদীতে তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এক সন্ন্যাসী তাকে পুনরুজ্জীবিত করে। অনেক ঘটনার ধাপ পার হয়ে শেষে তার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং ভালবাসার জনের সঙ্গে বিবাহ হয়।

স্বর্ণলতা (সা), ২৫ নভেম্বর ১৮৮০, পৃ ২৫৮। একজন জমিদারের গল্প।

চিরঞ্জীব শর্মা: গরলে অমৃত (ঐ , কলিকাতা, ১৮১১ শক, পৃ. ২৪৩। বিংশ শতাব্দী, কলিকাতা ৩০ জুলাই ১৮৯১, পৃ ১৯৪। বিশ শতকের শেষে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কি অবস্থা হবে এবং হিন্দুসমাজ কি কি পর্যায়ে এসে পৌছবে তার কল্পিত ভবিষ্যৎ-চিত্র লেখক উপন্যাসটিতে দিয়েছেন।

রাশিয়া ভারত আক্রমণ করে ব্যর্থ হবে। ব্রাহ্ম ও হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ থাকবে। কিছুসংখ্যক দয়ালু বৃটিশ কর্মচারী দেশীয় আন্দোলনকারীদের আন্দোলন পরিহার করতে বলবে। তারা ভারতবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে থেকে বৈষয়িক উন্নতি ঘটাবে। জনসংখ্যার সমাধান হবে মারাত্মক প্লেগের আক্রমণে।

জানকীনাথ দে : রানী বারুণী (সা), ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩, পৃ. ৭৯।

জয়গোপাল গোস্বামী : শৈবলিনা (সা), কলিকাতা ১৮৬৯, দ্বি. সং. ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৪, পৃ ১৪৬।

জগবন্ধু ভট্টাচার্য : কুসুমকুমারী (ধ), কলিকাতা, ১৭ই জুলাই ১৮৮৩, পৃঃ ৯৮, দ্বি. সং. ১৮৮৫।

জয়ন্তকুমার বর্মন রায় : সতীর হাট (সা), 'অনুসন্ধান' (৫ ফাল্গুন ১৩০৪ পৃ. ৫২৬)-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস : মায়া (সা), কলিকাতা, ১০ জানুয়ারি ১৯০০, পৃ ৫০।

তারণকৃষ্ণ নস্কর : অপূর্ব মিলন, কলিকাতা, ২ জুলাই ১৮৮৩, পৃ ১০৬।

তারকেশ্বর চৌধুরী : শাক্যসিংহ (ঐ), কলিকাতা, ১৮৮০। 'বান্ধব' পত্রিকায় (১০ম সংখ্যা, ১২২৭, পৃ ৪৭৩ – ৪৮০) সমালোচিত।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় : সুরুচির কুটীর (সা), ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮০ (দ্বি. সং) পৃ ৭৪। ব্রাহ্মধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা কাহিনী।

দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী : গায়ত্রী (সা), ময়মনসিংহ, ৬ জুলাই ১৮৯২ পৃ. ২১৬। মহৎ-হৃদয় জমিদারের বিরুদ্ধে আমলাবর্গের হৃদয়হীন আচরণের কাহিনী। ঘটনার পটভূমি পূর্ববঙ্গ। ইংরাজী শিক্ষার সুফল প্রদর্শিত হয়েছে।

অহল্যা (ঐ), ময়মনসিংহ, ১২ জুন ১৮৯১। হুমায়ুনের উদ্ধারকারী হরির গল্প। হরির মেয়ে অহল্যা ধর্মান্তরিতা হলে সম্রাটের সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

দ্বারকানাথ মুন্সী : সৌদামিনী (সা), ২ মার্চ ১৮৮৫, পৃ. ১১৭।

দুর্গানারায়ণ ঘোষ : শৈলেশনাথ উপন্যাস বা শৈলেশনাথ (পা), কলিকাতা। ১১ ডিসেম্বর ১৮৭৮, পৃ. ১৬৯। কাশীর এক জমিদারপুত্র নরেশনাথ সন্ন্যাসী হবার পর, একটি মেয়ের রূপমুগ্ধ হয়ে ব্রত ভঙ্গ করে তাকে বিয়ে

করে। পিতার মৃত্যুর পর জমিদারির অংশগ্রহণের জন্য স্ত্রীকে রেখে কাশী যায়। তার দাদা তাকে পাগল প্রতিপন্ন করে পাগলা গারদে পাঠায়। কিছুকাল পরে নরেশ সব সম্পত্তি পায়। তার স্ত্রী তাকে অন্বেষণ করেও পায় না। ইতিমধ্যে তার একটি পুত্র হয় এবং স্ত্রী মারা যায়। পুত্রটি পরিচারিকার কাছে মানুষ হতে থাকে। অনেক ঘটনার পর নরেশনাথ পুত্র শৈলেশনাথকে পায়। শৈলেশ যে জমিদারের কাছে মানুষ হচ্ছিল, তার মেয়ের সঙ্গে নরেশনাথ পুত্রের বিবাহ দেয়।

দ্বিজরাজ ঘোষ: বিভাবরী (সা), কলিকাতা ৪ জুন ১৮৯১, পৃ ১৮১। জগৎকুমার এক পতিতার সংসর্গে তার প্রভূত ধনসম্পত্তি নষ্ট করে। ধার্মিকা স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেয় শেষে পতিতা কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়ে জগৎকুমার অনেক ঘটনার ধাপ পার হয়ে, স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়।

দীননাথ সান্যাল: নালুখুড়ো (সা), ১০মে ১৮৯৩, পৃ ২১৮। অভিজাত পরিবারে জন্ম একটি দুষ্ট লোকের কাহিনী।

দীনেন্দ্রকুমার রায়: হামিদা (ঐ, কলিকাতা, ১৮৯৯, পৃ ৭৮। দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস। কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা।

অজয় সিংহের কুঠি, 'দাসী' পত্রিকায় (জানুয়ারি ১৮৯৭) প্রকাশিত।

দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়: স্বর্ণচর কুটীর (সা), ১৮৮০ প্রথম ভাগ, ১৮৮৪ দ্বিতীয় ভাগ।

দুর্গাচরণ রায়: বিপ্লব (উপন্যাস, 'অনুসন্ধান' (২৪ ফাল্গুন ১৩০১, প ১১১৮) এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

ধীরেন্দ্রনাথ পাল: অসতী সন্ন্যাসিনী (সা), কলিকাতা ২৯ মার্চ ১৮৮৫, পৃ ৬৩ দ্বি স ১৮৮৬। লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালের একটি নর্তকীর কাহিনী। একটি মেয়ে ঘটনাচক্রে নর্তকীর জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পতিতা নারীদের সংসর্গে থেকেও সে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ঘৃণিত জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে সে পতিতা নারীদের উদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

কলির ভূষণ্ডি (সা), কলিকাতা, ১০ মে ১৮৮, পৃ ৫৩।

তৎকালীন বঙ্গসমাজের ব্যঙ্গ-চিত্র।

স্বর্ণবাঈ (সা), কলিকাতা, ৩ অক্টোবর ১৮৮৮, পৃ ১০০।

একটি পতিতার জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী।

ধরণীধর সরকার : জীবন প্রদীপ, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫, পৃ ১০৭।

ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রণয়বিকার (সা), কলিকাতা, ১৬ আগস্ট ৮৮১, পৃ ০০

নারায়ণ দাস মৌলিক : দলিত কুসুম (সা), কলিকাতা, ২৩ অক্টোবর, ১৮৯৫, পৃ ১৩২। সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসে স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিতা ও নির্যাতিতা একটি সতী নারীর প্রাণপণে স্বামীর ভালোবাসা ফিরে পাবার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'অনুসন্ধান' (২৪এ চৈত্র, ১৩০৪, পৃ ৬৪১)-এ সমালোচনায় উপন্যাসটির ঘটনাবৈচিত্র্যজনিত কৌতূহল ও আখ্যানাংশের চমৎকারিত্বের কথা বলা হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : শিখরবাসিনী (সা), ১২ নভেম্বর ১৮৯০, পৃ ১১৯।

নলিনীকান্তের ছোট ভাই তার ভাবী বধূ কুসুমকে হরণ করে একটি গুহায় আবদ্ধ রাখে। নলিনী সন্ন্যাসী হয় এবং মেয়েটির গুহার কাছেই বাস করতে থাকে। নলিনার ভাইকে হত্যা করে প্রতিহিংসাপরায়ণা এক নষ্ট নারী। তারপর কুসুমের সঙ্গে নলিনার মিলন হয়।

ননাগোপাল মুখোপাধ্যায় : আনন্দ আশ্রম (ধ), ১ আগস্ট ১৮৯৩, পৃ ১৩৫।

একজন মাংগলা-সন্ন্যাসিনীর নেতৃত্বে হিন্দুসম্প্রদায় গঠনের কাহিনী।

সতী না কলঙ্কী (কা , ১ আগস্ট ৮৯৩, পৃ ৬৬। একজন হিন্দু মহিলার সঙ্গে রাজকুমার প্রসঙ্গ প্রণয়কাহিনী।

নীলমণি কাব্যতীর্থ : রাজপুত কন্যা, কলিকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮।

নৃপেন্দ্রকুমার রায় : কুসুমিকা পরে দেখুন আমার পাগলামি (১ম—ঐ), ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯, পৃ ১২৮। মারাঠাগণ কর্তৃক দিল্লীর অধীনতামুক্ত হবার চেষ্টার পটভূমিতে একটি প্রণয়কাহিনী। রণজয় তার প্রণয়িনী কুসুমিকার কথামত মারাঠাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামলিপ্ত হয়ে বন্দী হয়। তারপর কুসুমিকা কৌশলে তাকে মুক্ত করে। প্রথম খণ্ড এই পর্যন্ত।

নবীনকালী দেবী : কামিনীকলঙ্ক (সা), কলিকাতা ১৮৭০, ২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬, (দ্বি সং) প ১৯০।

নিশিকুমার ঘোষ : শরৎশশী (১ম খণ্ড সা), কলিকাতা, ১৪ মে ১৮৮১। বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী। গল্পের নায়ক একজন ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী

যুবক, যে জাতিভেদ-প্রথা ও কুসংস্কারবিরোধী, দেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক, শাসনব্যবস্থার গলদের প্রতিবাদী। এককথায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শস্থানীয়।

নন্দলাল দাস: সরোজশায়িনী (কা), কলিকাতা, ২৪ জুলাই ১৮৮১, পৃ ১১০।

শৈলবালা (সা), কলিকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ পৃ ১৮৬

নীলরতন রায়চৌধুরী: যাবনিক পরাক্রম (কা), কলিকাতা, ২২ আগস্ট ১৮৮১ পৃ ১০৮। উপন্যাসটির ঘটনাস্থল পেশোয়ার। একটি প্রণয়-কাহিনী। প্রধান চরিত্রগুলি হিন্দু ও মুসলমান। আর্যদর্শন (১২৮৮)-এ সমালোচনায় গ্রন্থটি প্রশংসিত।

নগেন্দ্রনাথ বসু: রামকুমার (সা), কলিকাতা, ৮ অক্টোবর ১৮৮৬, পৃ ৬০। জমিদারতনয় রামকুমারের প্রণয় ও বিষয়প্রাপ্তির কাহিনীর পাশে নীলকরদের অত্যাচারের সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যায়।

একটি চিত্র (সা), কলিকাতা, ২১ নভেম্বর ১৮৮৬, পৃ ৪৩। কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে লেখা।

ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়: পরেশপ্রসাদ (সা) কলিকাতা, ২৫ জুন ১৮৮৫।

অমৃত পুলিন (ঐ) কলিকাতা, ১০ আগস্ট ১৮৮৮, পৃ ১৬৩, দ্বি সং ১৮৯৮। আকবর উদয়পুরের রানা প্রতাপের পুত্র অজয়কে প্রেরণ করেন আহম্মদনগরের চাঁদ সুলতানার বিরুদ্ধে। অজয়ের অনুপস্থিতিকালে সেলিম অজয়ের প্রণয়িনী হিরণ্ময়ীকে অপহরণ করে। আকবর তাকে উদ্ধার করে অজয়ের হাতে সমর্পণ করেন। প্রতাপ কলঙ্কিতা হিরণ্ময়ীকে ত্যাগ করতে বলে এবং দু'বছরের মধ্যে তাকে ভুলতে না পারলে অজয়কে আত্মহত্যা করতে বলে। অজয় গৃহত্যাগ করলে হিরণ্ময়ী ছদ্মবেশে তাকে অনুসরণ করে। ঘটনাচক্রে অজয় পার্বত্য দুর্গের এক রানীকে সেলিমের হাত থেকে রক্ষা করলে, আকবর রানীর সঙ্গে অজয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করে। কিন্তু যখন জানা যায় যে, সে চাঁদসুলতানার কন্যা, তখন অজয় হিরণ্ময়ীর সঙ্গে জলে ডুবে মরে।

কোহিনুর (ঐ), কলিকাতা, ১৯ জুন ১৮৯৩, পৃ. ৩০। তৃ সং ১৩১৪।

আবঙ্গজেবের রাজ্য-পরিচালনার দুর্বলতাজনিত মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী স্থান পেয়েছে। অম্বরেব রাজকন্যা অম্বালিকার সঙ্গে এক কৃষকপুত্রের প্রণয় হয়। সম্রাটের বিরুদ্ধে রাজপুত-বিদ্রোহে দুর্গাদাস ও কৃষকপুত্রের চেষ্টায় মুসলমানদের অধীনতা-পাশমুক্ত হয়। তারপর অম্বালিকার সঙ্গে কৃষকপুত্রের বিবাহ হয়।

যুগল প্রদীপ, ১৩০৫।

প্রশান্তকুমার ঘোষ : হাবাণী ওরফে চারুহাসিনী (সা), ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬, পৃ. ১২২।

পঞ্চানন রায়চৌধুরী : কাপ্তেন গোবিন্দরামেব দপ্তর (ঐ), ২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬, পৃ. ১৭৪। সম্রাট জাহাঙ্গীরেব বাজত্বের শেষভাগে, পর্তুগীজদের সাহায্যকারী সাতগাঁর জমিদাব ক্যাপ্টেন গোবিন্দরামের কাহিনী। রাজকুমার শাজাহান জয়ী হন। গোবিন্দবাম বন্দী হয়। গোবিন্দরাম ক্ষমা পায়। গৃহে ফেরার পথে সে নিহত হয়।

প্রবোধচন্দ্র সরকাব : শালফুল (ঐ), ২৮ ডিসেম্বর ১৮৯৭, পৃ ১৭০।

স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস। মেদিনীপুর জেলায় পরগনা বগড়ি-অঞ্চলে অচল সিংহের নেতৃত্বে উনিশ শতকেব শুরুতে নায়েক-বিদ্রোহের কাহিনী। মেদিনীপুবের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হ্যারিসনকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ (২০৭। ১৮৭২-৭৩)-কে কেন্দ্র করে কাহিনী গ্রন্থিত। বিদ্রোহী নায়েকদের মধ্যে লেখক স্বদেশ-প্রেরণাকে লক্ষ্য করেছেন। ধৃত অচল সিংহের বিচারে ফাঁসি হয়। ঘটনাচক্রে অচল সিংহের কন্যা চামেলীর সঙ্গে তার স্বামী সন্ন্যাসী শশিশেখরের মিলন হয়। চামেলী, সখি কমলার সঙ্গে শালফুল সম্বন্ধ পাতায়। স্বদেশানুরাগ উপন্যাসটির রচনার প্রেরণা। 'অনুসন্ধান' (২৪এ চৈত্র ১৩০৪, পৃ. ৬৪১)-এ সমালোচিত।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় : অভয়া (পা), কলিকাতা, ২০ জুন ১৮৯৫, পৃ. ১৭৬।

পাহাড়ে মেয়ে (সা), কলিকাতা, ২৬ এপ্রিল, ১৮৮৯, পৃ ২০২।

পতিতা-জীবনকাহিনী। ত্রৈলোক্য নামে জনৈকা গণিকা অপর একজন গণিকাকে হত্যা করে এবং বিচারে বিচারক মরিস কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

দারোগার দপ্তর (র), ১৫ মে ১৯০০, পৃ. ৪৮।

একটি হত্যাকে কেন্দ্র করে রচিত।

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ : যামিনী (সা), কলিকাতা, ৪ মে ১৮৯৪, পৃ ১৭৮।

পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত : ছায়া (পা), কলিকাতা, ২২ এপ্রিল, ১৮৯০, পৃ. ২০৭।

যৌথ হিন্দু পরিবারের চিত্র। পরিবারের কর্তার স্বার্থপরতার জন্য পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও পতনের কাহিনী।

চিরসঙ্গিনী, (সা), কলিকাতা, ১২ মার্চ ১৮৮৫, পৃ. ৮৬।

মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের কুফল প্রদর্শিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

রাধানাথের কন্যাদায় (সা), কলিকাতা, ১০ জুলাই ১৯০০, পৃ. ১২০।

অর্থহীন পিতার মনোমত পাত্রের অভাবে অপাত্রে কন্যাদানের কাহিনী।

পূর্ণচন্দ্র সরকার : হেমচন্দ্র (পা), ১ ডিসেম্বর ১৮৮৪, পৃ ১০৩। সৎমায়ের ষড়যন্ত্রে নায়ক হেমচন্দ্রের পিতৃ-সম্পত্তিতে বঞ্চিত হওয়ার অশ্রুসজল কাহিনী।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় : আনন্দকানন (পা), কলিকাতা ২ এপ্রিল ১৮৮৮, পৃ ৯৬। যৌথপরিবার-প্রথার বিরুদ্ধে লেখা কাহিনী।

পিয়ারীমোহন হালদার : জীবনরহস্য (সা), কলিকাতা, ১১ জুন ১৮৮৮, পৃ ২২২। বীরনগরের রাজা বীরনারায়ণ রায় কানপুরে ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। তাঁর কন্যা মোহিনীকে একজন নারী মানুষ করে। রাজার আত্মীয় বিজয়, সম্পত্তি পায়। ঘটনাচক্রে শেষ পর্যন্ত মোহিনী পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। বিজয় পাগল হয়ে যায়।

প্রেমদাস কুণ্ডু : প্রেমরহস্য (সা), কলিকাতা, ১১ জুলাই ১৮৮৮, পৃ ১৪৮।

প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : নিঃসহায় উমেদার (সা), কলিকাতা, ২২ আগস্ট ১৮৮৪, পৃ ৯৭। চাকুরির উমেদারের দুরবস্থার কাহিনী।

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য : কুলবালা (সা), ফরিদপুর, ২৫ জুন ১৮৮৫, পৃ. ৭৮।

কুলপ্রথার বিরুদ্ধে লেখা। একটি বিবাহিতা কুলীনকন্যার পুনর্বিবাহের কাহিনী।

প্রিয়নাথ চক্রবর্তী : জীবনকুমার (সা), কলিকাতা, ২৯ নভেম্বর ১৮৮৮, পৃ. ১৫৬। ব্রাহ্মণের শক্তির কথাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ. : নবীনা জননী (সা), কলিকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ১৮৯১, পৃ ১৭০। কৃপণ পিতা শিক্ষিত পুত্রের জনহিতার্থ কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হলে কলকাতায় আসে। তার প্রণয়িনী বিরহে শুকিয়ে যেতে

থাকে। মায়ের মৃত্যুর পর কলকাতায় এলে তার দাদামশায়ের নিষেধের ফলে প্রতিভা পরে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলতে পারে না। সে যোগিনী হয়। একজন যোগীর চেষ্টায় উভয়ের পুনর্মিলন ঘটে। বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর পর কৃপণের কন্যা জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করার জন্য নাম হয় 'নবীনা জননী'। 'ভারতী' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯, পৃ. ১.৮)-তে সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখক ভবিষ্যতে সুলেখক হতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

রাজপুতবালা (ঐ), কলিকাতা, ৩০৪, পৃ. ১০৬।

প্রমথনাথ মিত্র : যোগী (ঐ), কলিকাতা, ১৮৮৬, পৃ ২৫৯। এক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী কর্তৃক রাজপুতদিগের মোগলদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কাহিনী।

পশুপতি মিত্র : উন্মাদিনা (১ম খণ্ড, সা), কলিকাতা, ১৪ জানুয়ারি ১৮৯২, পৃ ১৯৬। স্বার্থপর এক বধূর আচরণে যৌথপরিবারের ভাঙ্গনের কাহিনী। ভারতী ও বালক (বৈশাখ ১২৯৯, পৃ ৫৯)-এ সমালোচিত।

পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় : সুষমা (সা), ২৯ নভেম্বর ১৮৯৯, ১৪৪।

দাবানল (পা), ২৪ আগস্ট ১৯০০, পৃ ৯৮। গৃহকর্তার দ্বিতীয় বিবাহের পর পরিবারের ভাঙ্গনের কাহিনী।

পঞ্চানন রায়চৌধুরী : ক্যাপ্টেন গোবিন্দরামের দপ্তর (ঐ), ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬, পৃ. ১৭৪। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে সাতগাঁর জমিদার গোবিন্দ-রামের কাহিনী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ঠকিয়ে তার জমিদারি হস্তগত করে গোবিন্দরাম। সাজাহানের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁর পক্ষে পর্তুগীজরা যোগ দেয় এবং তারা গোবিন্দরামকে ক্যাপ্টেন উপাধি দান করে। গোবিন্দরাম সাজাহান কর্তৃক ধৃত হয় এবং শেষ পর্যন্ত যুবরাজের ক্ষমা পায়। শেষে তার এক শত্রু কর্তৃক সে নিহত হয়।

কুলকলঙ্কিনী বা কলিকাতার গুপ্তকথা (সা), কলিকাতা, ১০ আগস্ট ১৯০০, পৃ. ২৬৬। একটি পতিতার আত্মকাহিনী।

প্রসন্নময়ী দেবী (৮৫৭—১৯.৭) : অশোকা (ঐ), কলিকাতা, ১৮৯০, পৃ ৬২। সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস। বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় জাগরণের কাহিনী।

ফকিরচাঁদ বর্মন : উজিরপুত্র (সা), কলিকাতা, ৬ অক্টোবর ১৮৭৩, পৃ. ২৯৬। নূরজঙ্গ নামে একজন মোগল, জবা নাম্নী এক পারসী রমণীর প্রেমে পড়ে

এবং জাহাজ থেকে তাকে লুণ্ঠন করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত এবং নিগৃহীত হয়।

ফৈজুন্নেসা চৌধুরানী : রূপজালাল (প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা) ঢাকা, ১৮৭৬।

বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায় : মতিয়া (সা), ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭, পৃ. ৮৪।

প্রবোধচন্দ্র মতিয়াকে ভালবাসত। ঘটনাচক্রে ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপে হিংস্র জীবদের হাত থেকে সে মতিয়াকে উদ্ধার করে। প্রবোধ কায়স্থ ও মতিয়া ব্রাহ্মণ হওয়ায় বিবাহে বিপত্তি ঘটে। উভয়ে খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করে বিবাহিত হয়।

বিধুভূষণ বসু : লক্ষ্মী মেয়ে (সা), ২৫ নভেম্বর ১৮৯৭, পৃ ৮৩।

নকুলেশ্বরের স্ত্রী ইন্দুমতীর সতীত্বের গল্প।

বৈষ্ণবচরণ বসাক : পাঁচটি মেয়ে, কলিকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮, (দ্বি. সং) পৃ. ১৩৭।

ইন্দ্রচন্দ্র (সা), কলিকাতা, ১৫ জুন ১৮৯০, পৃ ১৩৬। একটি পালিত পুত্রের অপকীর্তির কাহিনী।

অসীম ও মাধবীলতা (সা), কলিকাতা, ৪ মে ১৮৯৪, পৃ ৭০।

দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ ও সুন্দরবন অঞ্চলের পটভূমিতে লেখা কাহিনী।

গোলাপসুন্দরী (সা), ৪ মে ১৮৯৪, পৃ. ৭২।

কামিনীকলঙ্ক ও শ্মশানলতা (ঐ), ১ মে ১৯০০, পৃ ১৩২।

দুটি কাহিনী। প্রথমটি, সাহাবুদ্দিন কর্তৃক জয়চন্দ্রের নিধন-কাহিনী। দ্বিতীয়টি বঙ্গের বিজয় সিংহ কর্তৃক সিংহলজয়ের কাহিনী।

পাষাণময়ী (সা), কলিকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫, পৃ. ১৩৪। একটি নারীর প্রণয়ীর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণতার কাহিনী।

বাসুদেব ভট্টাচার্য : প্রেমপাগলিনী (সা), ২৮ আগস্ট ১৮৯৩, পৃ ১৮৮।

ব্রজনাথ গোস্বামী : ক্ষেমঙ্করী (ঐ), ডিসেম্বর ১৮৯০, পৃ ১৬৪।

ব্রিটিশ কর্তৃক বঙ্গদেশবিজয়ের কাহিনী। একটি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা। দলের কয়েকজনের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যর্থতা।

বেচারাম বসু :—বিমলা (সা), কলিকাতা, ১৫ নভেম্বর ১৮৮৭, পৃ. ৮৭।

বিপিনমোহন সেনগুপ্ত : চাঁদরাণী (ঐ), কলিকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, পৃ. ১১১। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কাহিনী।

বরদাকান্ত সেনগুপ্ত : প্রতিভা (সা), ১২ এপ্রিল ১৮৮৫, পৃ. ৬৪।

হেমপ্রভা (ঐ , ১৬ অক্টোবর ১৮৯৪ পৃ. ১৪০। সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা প্রেমের কাহিনী। গল্পের নায়ক তাত্তিয়া তোপীর কন্যাকে বিয়ে করে। লেখক তাত্তিয়া তোপী ও তার ভাইকে শহীদ রূপে চিত্রিত করেছেন।

ব্রজনাথ ভট্টাচার্য : সরোজবাসিনী (সা), কলিকাতা, ১৩ এপ্রিল ১৮৮৩, পৃ. ১৮৮। গদ্যে ও পদ্যে লেখা।

তরুণ তাপসী, কলিকাতা, ৩০ নভেম্বর, ১৮৮৪, পৃ ১৯৬।

প্রণয়-কানন (সা), কলিকাতা, ১০ অক্টোবর ১৮৮, পৃ. ৩১২।

একটি দুষ্ট অসচ্চরিত্র জমিদারকে দমনের কাহিনী।

বিনোদাবহারী গোস্বামী : পূণশশী (ঐ), ১৮৭৫, পৃ. ১২০।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের পটভূমিতে কাশ্মীরেব যুবরাজেব সঙ্গে উদাসিনী রাজকন্যার বিবাহ-কাহিন।।

বীরেশ্বর পাণ্ডে : অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব (সা), কলিকাতা, ১০ মে ১৮৮৮, পৃ ১০৮। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিপক্ষে লেখা ব্যঙ্গ-রচনা।

বামাচরণ বসু : নবমল্লিকা (সা), কলিকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৮২, পৃ. ৭৮।

এক যুবকের প্রণয়িণা কলিকাতা নিবাসিনী হওয়ায় পরিণয়ে বাধা দেখা দেয়। মেয়েটি শহরে মেয়েদের মত নির্লজ্জ উদ্ধত ও আবনয়ী নয় বলে প্রমাণিত হলে যুবকটি মেয়েটিকে বিয়ে করতে সক্ষম হয়। 'প্রবাহ' (অগ্রহায়ণ ১২৮৯, পৃ. ২২৩-২৪) পাত্রকায সমালোচিত।

জয়চাঁদের চিঠি (সা), কলিকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩, পৃ. ১৭৩। ভারতের রেলকর্মচারীদের চরিত্র ও স্বভাব সম্পর্কে লেখা। এই প্রসঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ও রাজপুতানার অধিবাসীদের আচাব-আচরণ-প্রথার বিষয় গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

বসন্তকুমার মিত্র : রণোন্মাদিনী, ১ম (ঐ), কলিকাতা, ২ অক্টোবর ১৮৮৪, পৃ. ১০৭। রাজপুতদের শৌর্যের কাহিনী।

বিষ্ণুচরণ চটোপাধ্যায় : জীবন-প্রদীপ (সা), কলিকাতা, ১৮৮৭ 'ভারতী ও বালক' (অগ্রহায়ণ ১২৯৪, পৃ. ৪৮০-৪৮৫) পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে সমালোচিত।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আয়েষা (ঐ), কলিকাতা, ১৮৯৭।
দুর্গেশনন্দিনীর পরিশিষ্ট।

বসন্তকুমারী মিত্রঃ রূপোন্মাদিনী (ঐ), প্র-খ. ১২৯১, পৃ. ১০৭।
আকবর ও উদয় সিংহের যুদ্ধের কাহিনী।

বসন্তকুমার ভটাচার্যঃ রমণী-হৃদয় (সা), কলিকাতা, ৮ আগস্ট ১৮৮৯, পৃ. ১০৪। নিরুপমা প্রমথকে ভালবাসত। কিন্তু তার বাপ মা বিত্তবান চল্লিশ বৎসর বয়স্ক প্রবোধের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। নিরুপমা স্বামীকে ত্যাগ করে প্রমথর সঙ্গ পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে স্বামীর কাছে। তার অসচ্চরিত্রতার জন্য অবরুদ্ধ রেখে তাকে শাস্তি দান করা হয়।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ঃ তুমি কি আমার! (১ম-(র), কলিকাতা, ৩১ আগস্ট ১৮৭৩ পৃ. ১২০। ঐ (২য়) টালিগঞ্জ, ২৪ পরগনা, ১১ নভেম্বর, ১৮৭৮, পৃ. ১২০।
কঙ্কবালা (সা), কলিকাতা, ২৯ জুলাই ১৮৯০, পৃ. ২০৭।
অগ্নিকুমারী (সা), কলিকাতা, ২৯ জানুয়ারি ১৮৯৩, পৃ. ১৯৬। ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে একধরনের ব্যবসায়ী ছিল, যারা বহুসংখ্যক মেয়ে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের কাছে বিক্রি করত। ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হবার পর এই ব্যবসা বন্ধ হয়। এই ব্যবসার হানিকর চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন।
পারুল (সা), কলিকাতা, ১৭ জুলাই ১৮৯৩, পৃ. ২০। পারুল শিশুকালে তার মা-বাবাকে হারায়। তার মামা পারুলের পিতৃ-সম্পত্তি গ্রাস করে। তার দাদা সেই সম্পত্তি উদ্ধার করতে গেলে পারুলের সামনে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এই দৃশ্যদর্শনে পারুলের স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। তারপর তার বিবাহান্তে পারুলের স্বামী তার স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। উপন্যাসটির কাহিনী উপভোগ্য।
আনন্দলহরী (সা), কলিকাতা, ২৯ আগস্ট ১৮৯৪, পৃ. ১৩৯।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ঃ যোচ্চরের বাড়ী ফলার (সা), কলিকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯। একজন যোচ্চরের কাহিনী। চলিত ভাষায় লেখা।
কমলকুমারী (ঐ), কলিকাতা, ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৯১, পৃ. ১৫০।
মহম্মদ গজনীর আক্রমণের পটভূমিতে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ভূধর চট্টোপাধ্যায়ঃ জটাধারী, কর্ণধার (১ম খণ্ড ১২৯৪, পৃ. ১৫)-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭—১৯১২)ঃ রত্নবতী (সা), ২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯।

উদাসীন পথিকের মনের কথা (সা), ২৯ আগস্ট ১৮৯০, পৃ. ১৯৮। 'ভারতী ও বালক' (বৈশাখ ১২৯৮, পৃ. ৬০)-এ সমালোচিত।

গাজী মিয়াঁর বস্তানী (প্রথম অংশ) ১৮৯৯, পৃ. ৪০০।

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ঃ অনাথবন্ধু (সা) কলিকাতা, ১৮৯৭।

··'মুকুন্দবাবু ··উপন্যাস প্রণয়ন করিয়া হিন্দু-গার্হস্থ্য-প্রণালী বজায় রাখিবার পথ প্রশস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।' (অনুসন্ধান ২১ মাঘ ১৩০৪, পৃ. ৪৯৫-৯৭)

মধুসূদন পালঃ সংসার-লীলা (ঐ), কলিকাতা, ১৩০৫, পৃ. খণ্ডিত।

'১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ দিল্লির সম্রাটের সৈনাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হইয়া যখন পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন,' তখনকার একটি ঘটনা।

মহামায়াঃ সতীত্ব সরোজ, প্রথমভাগ (সা), কলিকাতা, ১২৯৩ পৃ. ১২৪।

নারী একজন পুরুষকেই শুধু ভালোবাসে এবং প্রেমিকজনকে স্বামী মনে করে। কাহিনীটিতে নারীর প্রণয়-নিষ্ঠা স্বাক্ষরিত।

মনীন্দ্রলাল ঘোষঃ কমলে কণ্টক (ঐ), ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৭, পৃ. ২০৪।

অলাতীর রাজকন্যা প্রভাবতীকে কয়েকজন সন্ন্যাসী অপহরণ করে দেওঘরে নিয়ে যায়। তীর্থিক হেমন্তকুমার প্রভাকে উদ্ধার করে। প্রভার সখী তিলোত্তমা কৃষ্ণচন্দ্র নামে এক যবকের বাক্‌দত্তা, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভবানীপুরের রাজপুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণ-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক ভূপেন্দ্র আক্রান্ত হলে, ঘটনাচক্রে হেমন্ত তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। হেমন্ত তার প্রণয়িনী কুসুমকে বিবাহ করতে না পারায় অবিবাহিত থাকে। কুসুমকে কুতুবউদ্দীনের বেগমরূপে দেখা যায়। কুতুব সম্রাটের জন্য শের আফগানের পত্নীকে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বর্ধমান যায়। কুসুম, তার পূর্বপ্রণয়ী হেমন্তকে কৃষ্ণচন্দ্রের হাত থেকে রক্ষা করে। হেমন্ত প্রভাবতীকে বিয়ে করে। ভূপেন্দ্র এবং হেমন্ত শের আফগানের বিরুদ্ধে কুতুবের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে প্রশংসা অর্জন করে। তারপর তারা সুখে বাস করতে থাকে।

মাণিকলাল চট্টোপাধ্যায় : ভবের হাট (সা), অক্টোবর ১৮৯৪, পৃ, ১২৮।

মহেন্দ্রনাথ কবিরত্ন : বিষকুসুম (সা), কলিকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬, পৃ ১৬০। একটি বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর কাহিনী।

মতিলাল বসু : দুঃখকাহিনী (সা), কলিকাতা, ১ আগস্ট ১৮৮৮, পৃ ৬০। নবগঙ্গা (সা), কলিকাতা, ২৫ আগস্ট ১০৮৮, পৃ ৬০।

মনমোহন বসু : দুলীন (ঐ), কলিকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯১, পৃ ৪৪০। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে রচিত। বৃটিশ সেনাধ্যক্ষ মেজর ডার্উলিংয়ের পালিত পুত্র দুলীন। দুলীন ফৌজে প্রবেশ করে মেজর হয়। ডার্উলিংয়ের মৃত্যুর পর সে রণজিৎ সিংহের অধীনে কর্ম গ্রহণ করে এবং কাংড়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। মেজর দুলীন শেষ পর্যন্ত তার বিশ্বস্ততার জন্য পৈতৃক জায়গির লাভ করে এবং কাংড়ার রাজকন্যা লীলাকে বিবাহ করে।

মাখনলাল সিংহ : জলদবরণী (ঐ), কলিকাতা, ২৬ এপ্রিল, ১৯০০, পৃ ১৬৭। বঙ্গের শেষ হিন্দু নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পটভূমিতে লেখা।

মদনমোহন মিত্র : সমরশায়িনী (ঐ) কলিকাতা, ১৮৭৩, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৮৩, দ্বি সং। 'প্রবাহ' (ভাদ্র, ১২৯০, পৃ ২৩৯) পত্রিকায় সমালোচিত।

মহেশচন্দ্র লাহিড়ী বি এল : সুকুমারী (সা), কলিকাতা, ১৮৯৭। 'অনুসন্ধান' (৩১ ভাদ্র, ৩ ৪, পৃ ২২৫) এ প্রশংসিত।

যতীন্দ্রনাথ দে : সংসার-বান্ধব (সা), কলিকাতা, ২৬ জানুয়ারি, ১৮৯৮, পৃ ৫৪। জীবনবীমার উপযোগিতা সম্পর্কে লেখা।

যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : বঙ্গের বৈঠকী রহস্য (সা), কলিকাতা, ২০ নভেম্বর, ১৮৯৫, পৃ ১৩০। ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজসংস্কারের নামে তৎকালীন সমাজে ভণ্ডামির চিত্র।

যাদবচন্দ্র রায় : পটল দাস মহাপ্রভুর লীলা-সম্বর্ধন (ধ), কলিকাতা, ১ আগস্ট ১৮৯২, পৃ ৭৫। বৈষ্ণবধর্মের ভণ্ডামি ও দুর্নীতিকে অবলম্বন করে লেখা। লেখক বলতে চেয়েছেন যে, অধিকাংশ বৈষ্ণবই অশিক্ষিত ও নষ্টচরিত্র। আখড়ার বৈরাগীর চাপে একটি মুসলমান সিপাহী বৈষ্ণব হয় এবং অবৈষ্ণব-সুলভ আচরণ করে। শেষ পর্যন্ত সে বৈষ্ণবধর্ম ত্যাগ করে এবং আবার মুসলমান হয়।

যতুলাল কাঞ্জিলাল : নির্মলা (সা), কলিকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ পৃ. ২২৭।

ব্রাহ্মণ-বিধবা নির্মলার সতীত্বের ও ধর্মজীবনের কাহিনী।

যশোদালাল তালুকদার : ইন্দুমতী (সা), ১৮৯৪, পৃ. ২৪৩।

রাজেন্দ্রলাল রায় : ইন্দুভূষণ (ধ), কলিকাতা, ১ ডিসেম্বর ১৮৯৭, পৃ. ৯৫।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি বিস্তৃত জমিদারির অধিকর্তা যুবক ইন্দুভূষণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়। গৃহভৃত্য হলধর নলহাটের ললাটেশ্বরীর মন্দিরে ইন্দুভূষণকে খুঁজে পায় এবং তাকে গৃহে নিযে যেতে ব্যর্থ হয়। ইন্দু বনমালী-স্বামীর কাছে দীক্ষা নেয়। ইন্দুর স্ত্রী হিন্দোললতা স্বামীকে বৃন্দাবনে দেখে গৃহে ফেরার অনুনয় জানিয়ে ব্যর্থ হয়। বৃন্দাবনে ইন্দুভূষণ মহাসমাধি লাভ করে। হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা শিক্ষামূলক কাহিনী।

রাজেন্দ্রলাল সিংহ : নির্মলা (সা), কলিকাতা, ৭ জুলাই ১৮৯৫, পৃ. ৫৭।

হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়েছে।

চন্দ্রলেখা (ঐ), কলিকাতা, ২ নভেম্বর ১৮৮৮ পৃ ১৯২। আরংজেবের সময়ে সত্নরামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা। আরংজেবের হাত থেকে একটি রাজপুত বালিকার আত্মরক্ষার্থে অগ্নিতে আত্মাহুতিদানের কাহিনী।

রাধিকাপ্রসাদ হালদার : বিরাজমোহিনী (সা), ১৮৯৫।

রাধাবিনোদ হালদার : সরোজ-প্রতিমা (সা) ২৫ মার্চ ১৮৮৯, পৃ ১৯৭।

রামকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় : প্রভাবতী (সা), ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫, পৃ ১৩৮।

রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ : রণলতা (ঐ), ১৮৮৪, পৃ ৩৫৬। সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণের কাহিনী।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : রাজবালা (ঐ), কলিকাতা, ১৮৭০, পৃ. ১৮০।

লেখকের স্বগ্রাম গোস্বামী দুর্গাপুরের পুরাকাহিনী।

রসিকলাল হালদার : বসন্তকৌমুদী (সা), কলিকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩, পৃ. ২০০।

রামচন্দ্র চৌধুরী : বিষাদ-প্রতিমা (সা), ময়মনসিংহ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮, পৃ. ১৩৮। সাতারশ শতকের সামাজিক পটভূমিতে লেখা কাহিনী। অশ্বিনীকুমারের বাগ্‌দত্তা নলিনীর বিবাহের কালে নলিনী একদল দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিতা হয়। কাশীর এক ধনীর উত্তরাধিকারিণী হেমলতাকে অশ্বিনীকুমার

রাজবালা।

ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা)

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

নানান দেশে নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর, কিবা বল চাতকীর?
ধারাজল বিনা কভু ঘুচে কি তৃষা?

নিধু।
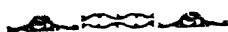
কালিকাতা
আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট, ১১৫ সংখ্যক ভবনে
শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির
যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৭ সাল।

(নামপত্র

বিয়ে করে। দীর্ঘদিন পরে নলিনী অশ্বিনীকুমারকে দেখে তার স্বামী বলে দাবি করে। কিন্তু অশ্বিনী তাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করায় সে পাগল হয়ে যায়। এরপরে অশ্বিনী নলিনীকে কাশীতে মাত্র একবার দেখে। তখন নলিনীর চরম দারিদ্র্য-দুর্দশা। গল্পটি মর্মস্পর্শী।

রাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়ঃ পাষাণময়ী (ঐ), কলিকাতা, ২৯ জুন ১৮৭৯ পৃ. ১৩২। আলিবর্দি খাঁর রাজত্বকালে মারাঠাদের আক্রমণের পটভূমিতে লেখা। প্রসঙ্গত, চৈতন্যধর্মের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়েছে। নিরাশ প্রণয়ের সর্বশেষ সান্ত্বনারূপে ধর্মই প্রাধান্য পেয়েছে উপন্যাসটিতে। 'আর্য-দর্শন' (পৌষ ১২৮৭) পত্রিকায় সমালোচিত।

রণজিৎনারায়ণ সাহেব (কুমার)ঃ অনিমা (ঐ) কলিকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ১৮৮২ পৃ. ১৫১। শাজাহানের রাজত্বকালের পটভূমিতে লেখা।

রামনৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়ঃ সুরেন্দ্রনলিনী (সা), আন্দুলবাড়িয়া, ৪ আগস্ট ১৮৮৫, পৃ. ৬০। কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে লেখা।

রাধারমণ মাহাতঃ শরতের চিঠি (সা), বহরমপুর, ১৬ আগস্ট ১৮৮৭, পৃ. ১১১। পত্রের মধ্য দিয়ে লিখিত উপন্যাস।

রোহিণীকুমার সেনগুপ্তঃ চণ্ডবিক্রম (ঐ), কীর্তিপাশা, ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭, পৃ. ৩৪৬। চণ্ড কর্তৃক সেওয়ারের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের কাহিনী।

প্রমোদবালা (সা), কীর্তিপাশা, ৫ জুন ১৮৮৮, পৃ. ৩৮।

মায়াবিনী (সা) ১৮৯৪। 'অনুসন্ধান' (৪ঠা শ্রাবণ ১৩০১, পৃ. ৩৫৮—৫৯)-এ সমালোচিত।

রোহিণীকুমার রায়চৌধুরীঃ কিরণ সিংহ (ঐ), কলিকাতা ১৮৯৪।

সুধামুখী (সা), 'অনুসন্ধান' (১৩ পৌষ ১৩০১, পৃ. ৮৭৬)-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। সুধামুখীর সঙ্গে অবিনাশের প্রেম। অবিনাশের সঙ্গে বিবাহ না হলেও সুধা তাকে স্বামীরূপে গণ্য করে এবং শেষে আত্মহত্যা করে অন্তর্জ্বালা নিবারণ করে। অবিনাশও আত্মহত্যা করে। তারপর উভয়কে এক চিতায় দাহ করা হয়।

রাধাবিনোদ হালদারঃ প্রেমের হাট (সা), কলিকাতা, ২১ জানুয়ারি ১৮৮৯, পৃ. ১৬৭।

রসিকচন্দ্র গ্রহরায়ঃ শবাসনা (সা), মানিকগঞ্জ ঢাকা, ৪ আগস্ট ১৯০০, পৃ. ১৮০। স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় স্ত্রীর জীবনবিনাশের কাহিনী।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীঃ দেওয়ান গোবিন্দরাম (সা), কলিকাতা, ৩০ নভেম্বর ১৮৯৪, পৃ. ৩৪৫। বৃটিশ রাজত্বের সূচনাকালে কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চলের একদল ডাকাতের কাহিনী।

শ্যামলাল মজুমদারঃ শকদুহিতা (ঐ), কলিকাতা, ১৩০৬, পৃ ২৩৬। হূণ-সম্রাট মিহিরকুল ও বিক্রমাদিত্যের কাহিনী।

দেবী না মানবী (সা), কলিকাতা, ১০ অক্টোবর ১৮৯৪। হিন্দু-বিধবাকে দেবীত্বদানের প্রচেষ্টা।

প্রভা (সা) কলিকাতা, ৩ মার্চ ১৮৯৬, পৃ. ৬১। কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে ও স্ত্রীশিক্ষামূলক রচনা।

বসন্ত (সা), ১ মার্চ ১৮৯৮, পৃ ২৬৭। স্বর্ণপুরের তিলকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মাধবীর সঙ্গে বসন্তের প্রণয় থাকা সত্ত্বেও তিলকচন্দ্র বসন্তের বদলে হেমন্তের সঙ্গে কন্যার বিবাহ স্থির করেন। বসন্ত সাগরযাত্রা করে এবং সাগরিকাকে উদ্ধার করে বিবাহ করে। সাগরিকার পিতা নয়নচাঁদের গৃহে বসন্ত বাস করতে থাকে। সাগরিকা বসন্তের পূর্ব-প্রণয়ের কথা জেনে মাধবীর সঙ্গে বসন্তের বিবাহের চেষ্টা করে। শেষে জানা যায় যে, মাধবী ঈশ্বরের পায়ে নিবেদিতা। মাধবী বসন্তকে স্মরণ করে কাশীতে ধর্মকর্মে জীবন অতিবাহিত করে।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষঃ রামপাল (ঐ) কলিকাতা, ১৮৯১। চ-স ১৩২০। বল্লালসেনের রাজত্বকালের কাহিনী।

বঙ্গেশ্বর (ঐ), কলিকাতা, ১৪ জুন ১৮৯৫. পৃ. ৯১। চতুর্দশ রাজা গণেশ কর্তৃক বঙ্গদেশে হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের ইতিহাস ও তার মৃত্যুর পর পুত্রের সিংহাসন-লাভ ও মুসলমানধর্ম গ্রহণের বিষয় নিয়ে লেখা।

শরৎচন্দ্র দাসঃ সচিত্র মধুমালতী (সা), ১৫ নভেম্বর ১৮৮৫, পৃ. ১৮৬।

হিরণ (সা), কলিকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪, পৃ. ৮৪। এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে হিরণের বিবাহ। সন্ন্যাসী আসলে নৈহাটির একজন ধনীর পুত্র।

শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যঃ কমলে কীট (সা), ১ নভেম্বর ১৮৯২, পৃ ১৩৪। নায়কের

তিনটি বিবাহ। প্রথম স্ত্রীদ্বয় মারা যায়। তৃতীয়, স্বামীকে ত্যাগ করে চাকরের সঙ্গ নেয়।

শ্যামাচরণ হর: সাতরাজার ধন (সা), ১ জুন ১৮৯৩, পৃ. ৮৮। শান্ত গ্রাম্য-জীবনকথা। গৃহকর্তার মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির জন্য পারিবারিক পতন দেখান হয়েছে।

শরৎচন্দ্র সরকার: প্রেমের সন্ন্যাসী (সা), কলিকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ পৃ. ১৬২। বিজয় সরোজিনীকে ভালবাসলেও বিবাহে পিতার আপত্তি থাকায় সে সন্ন্যাসী হয় এবং নারীর সম্মানরক্ষার্থে একটি সম্প্রদায় গঠন করে। সরোজিনী সংসার ত্যাগ করার পর উভয়ের মিলন ও বিবাহ।

বসন্তকুমার (পা), কলিকাতা, ১৬ মে ১৮৮৯, পৃ. ২১৭।

লীলাময়ী (ঐ), কলিকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১, পৃ ২০০। শিবাজীকে কেন্দ্র করে একটি কাল্পনিক কাহিনী।

শ্রীকৃষ্ণ সেন: আদর্শ পারবার (পা), কলিকাতা, ১৫ জানুয়ারি ১৮৯৪, পৃ. ৪১। ব্রাহ্ম-আদর্শপুষ্ট পারিবারিক কাহিনী।

শিচরণ চক্রবর্তী: শরৎকুমারী (সা), কলিকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৪, পৃ ১০৬। তৎকালীন প্রগতিশীল বঙ্গসমাজের একটি আদর্শ নারীকে কেন্দ্র করে মহিলাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়: কাঞ্চনমালা (কা), কলিকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯, পৃ ১২০। রাজকুমারী কাঞ্চনমালার সঙ্গে দিল্লীর রাজকুমারের বিবাহ এবং কাঞ্চনমালার সন্তান না হওয়ায় অরণ্যে গমন।

ললিতলবঙ্গলতা (সা), কালকাতা (ভবানীপুর), ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯। ভালোবাসা ও পারিবারিক ষড়যন্ত্রের গল্প।

শশিভূষণ পাল: কমলমঞ্জরী (কা), জয়নগর (বর্ধমান), ১৫ অক্টোবর ১৮৮৪ পৃ. ৩১৯।

শতদলবাসিনী দেবী: বিধবা বঙ্গবালা (সা), টালা, ১৬ অক্টোবর ১৮৮৪, পৃ. ৯৬। অসম্পূর্ণ কাহিনী।

শ্রীশচন্দ্র সান্যাল: কাঞ্চনবালা (সা), কলিকাতা, ২৯ অক্টোবর ১৮৮৮, পৃ. ১০৪।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: কালাপাহাড় (ঐ), কলিকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯। ব্রাহ্মণ যুবক নিরঞ্জনের ধর্মত্যাগ ও মুসলমান হয়ে কালাপাহাড় নাম-গ্রহণান্তর

হিন্দুধর্মদ্রোহী হয়ে হিন্দুদেবদেবী-বিনাশ, বঙ্গেশ্বরের সৈন্যাপত্যলাভ, উড়িষ্যা আক্রমণ ও তথায় ভ্রাতা প্রভাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মৃত্যুকাহিনী বিধৃত হয়েছে।

প্রতিমা (সা), 'অনুসন্ধান' (২২ আষাঢ় ১৩০১ সাল)-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

নিরুপমা (সা), 'অনুসন্ধান' (৯ই কার্তিক ১৩০১, পৃ. ৬৪৮)-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

শশিভূষণ চৌধুরী : অজবালা (পা), ভবানীপুর, ১২ জুন ১৮৯১, পৃ. ৯৫। যৌথ পরিবারের ভাঙনের কাহিনী। গৃহকর্তা ছিলেন স্ত্রীর ক্রীতদাসের মত। কর্তার দুর্বলতার সুযোগে গৃহিণী সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালে।

সতীশচন্দ্র দত্ত : তিন ভগ্নী (কা), কলিকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। সেকসপীয়রের কিং লিয়র-এর কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে।

সচিত্র চিত্তহর উপন্যাস (সা), ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮।

রামপাল (ঐ), কলিকাতা, ৮ জুন ১৮৯৩, পৃ. ৮২। বঙ্গদেশের সর্বশেষ হিন্দু নৃপতির কালের কাহিনী।

সুরেন্দ্রনাথ রায় : সরলা (সা), কলিকাতা, ২৫ নভেম্বর ১৮৯০, পৃ. ১৮০। সরলার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের এবং ইন্দুমতীর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রণয় এবং বহু বাধা-বিপত্তির অন্তে বিবাহের কাহিনী।

সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তী : নিরাশ প্রণয় (সা), কলিকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ পৃ. ২৮৭। কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত।

বিমাতা না রাক্ষসী (পা), কলিকাতা, ২৬ জানুয়ারি ১৮৯০, পৃ. ১৪৪। বিমাতা কর্তৃক সৎ-সন্তানকে নির্যাতনের কাহিনী।

পদ্মিনী (ঐ), কলিকাতা ২৭ আগস্ট ১৮৯৪, পৃ. ১৮১। চিতোর আক্রমণের পটভূমিতে লেখা।

সাবিত্রী (পা), ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮, পৃ. ৩০১। গোপাল মায়ের প্ররোচনায় সাধ্বী স্ত্রী সাবিত্রীকে ত্যাগ করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। দীর্ঘ কয়েকবছর পরে সাবিত্রী তার শাশুড়ীর কাছে আবেদন জানায় তাকে গৃহে স্থান দেবার, কিন্তু সে ভর্ৎসিত হয়ে ফিরে আসে। গোপালের দ্বিতীয় স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করার জন্য বিষপ্রয়োগ করে কিন্তু সন্ন্যাসীর ওষুধের গুণে গোপাল পুনর্জীবন

লাভ করে। এই সন্ন্যাসীর হস্তক্ষেপের ফলে স্বামিপ্রেম-পাগলিনী সন্ন্যাসিনী সাবিত্রীর সঙ্গে গোপালের পুনর্মিলন ঘটে।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী: রায়পরিবার (পা), কলিকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫, পৃ.২৬৪। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গনের কাহিনী। কালীকান্ত রায়ের তিনটি পুত্রের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র স্বার্থপর ও অসৎ। স্ত্রীদের দুষ্ট প্ররোচনায় ঈর্ষাবশে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হেয় প্রতিপন্ন করে পরিবারের সুনামে আঘাত হানে। এক বন্ধুর প্রচেষ্টায় সে পূবমর্যাদা ফিরে পায় কিন্তু অকালমৃত্যু বরণ করে।

সীতারাম দে: প্রভাত-প্রসূন (সা), কলিকাতা, ১০ আগস্ট ১৮৯৫, পৃ. ২২৫। মধুমতী নাম্নী একটি মেয়ে বিবাহের দিনে অপহৃতা হয়। শেষে পিতার বন্ধুর সাহায্যে সে উদ্ধার লাভ করে।

সি. সি. বসাক: শৈবলিনী (সা), কলিকাতা, ২০ নভেম্বর ১৮৯৫, পৃ. ১১৫।

সরোজবাসিনী দেবী: বনবালা (সা), কলিকাতা, ২৪ জুন ১৮৯২, পৃ. ১৪৮।

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: প্রেমময়ী (সা), কলিকাতা, ৬ জুলাই ১৮৯২, পৃ. ৮৯। রানী দুর্গাবতী (ঐ), কলিকাতা, ২ অক্টোবর ১৮৯২, পৃ. ৮৬। মুসলমানের হাত থেকে সম্মানরক্ষার জন্য একটি রাজপুত নারীর মরণপণ-সংগ্রামের কাহিনী। আরংজেবের রাজত্বকালের ঘটনা।

সতীশচন্দ্র বসু: দস্যুদুহিতা (সা), কলিকাতা, ২৮ মে ১৮৯০, পৃ. ১৫৮। পল্লীগ্রাম (সা), কলিকাতা, ১৫ অক্টোবর ১৮৯২, পৃ. ১৬৮। আধুনিক হিন্দুসমাজের সজীব চিত্র। পল্লীর নিস্তরঙ্গ পরিবেশে অঙ্কিত। 'বইখানি এতই ভাল, যে নবীন লেখনী-প্রসূত বলিয়া মনে হয় না।' (ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৯, পৃ. ৭৩৮)।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়: সফল স্বপ্ন (সা), কলিকাতা, ১২ ডিসেম্বর ১৮৮৪ পৃ. ১৬৯।

সত্যচরণ গুপ্ত: রানী চৌধুরাণী (সা), কলিকাতা, ১৫ অক্টোবর ১৮৮৮, পৃ. ২৫৬, গোবিন্দ গোলদার নামে একজন বিত্তশালী ব্যক্তির গৃহে তার কন্যা স্বর্ণর সঙ্গে মোহন পালিত হয়। তার পিতৃ-পরিচয় জানা যায় না। ঘনশ্যাম নামে এক ব্যক্তি চক্রান্ত করে। স্বর্ণর উপর করক্ষেপ করতে চাইলে, মোহনের সঙ্গে স্বর্ণের বিবাহে বিপত্তি ঘটে। পরে মোহনের সঙ্গে স্বর্ণের বিবাহ হয় এবং জানা যায় যে মোহন কলকাতার এক রাজপুত্র।

সীতানাথ নন্দী বি. এ.ঃ বঙ্গগৃহ (সা), কলিকাতা, ২৫ আগস্ট ১৮৮৪, পৃ. ৮৪। ব্রাহ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। লেখক হিন্দু-বিবাহ-প্রথাকে আক্রমণ করেছেন। পুত্র ও কন্যার ইচ্ছা ও অভিমতকে অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী বিবাহের অশান্তিকর পরিণতি চিত্রিত হয়েছে। 'ভারতী' (অগ্রহায়ণ ১২৯১, পৃ. ৩৭৬)-তে সমালোচিত।

সুরদাসঃ মাতাজী আশ্রম (ধ), কলিকাতা, ২১ অক্টোবর ১৮৮৮, পৃ. ১৩৯। লেখক অন্ধ ছিলেন। বৈষ্ণব ভিখারী ও ভিখারিনীদের নিয়ে লেখা কাহিনী। বৈষ্ণবসমাজের আভ্যন্তরীণ চিত্র নিষ্ঠাপূর্ণভাবে অঙ্কিত।

সত্যেন্দ্রনাথ পাইনঃ কণ্ঠহার (ঐ), কলিকাতা, ১ জানুয়ারি ১৮৯০, পৃ. ১৫১। মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধকালে পশ্চিমবঙ্গের এক অংশে এই কাহিনীর শুরু। জগদীশ রায়ের স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্যালিকা বসন্তকে বিবাহের প্রস্তাব করে, কিন্তু বসন্তর পিতা দেবেন্দ্রর সঙ্গে তার বিবাহ দেয়। দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে জগদীশ বসন্তকে হরণ করে। অবশেষে বহু ঘটনার উত্থান-পতনের পর বসন্তের সঙ্গে পুনর্মিলন হয়। ইতিহাসের পটভূমিকায় সামাজিক কাহিনী।

সুরেন্দ্রচন্দ্র বকসীঃ নির্মলা (সা), কলিকাতা, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৯, পৃ. ১০১। মানুষের কর্মই ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে এই কথা প্রমাণ করা হয়েছে। উপন্যাসটিতে নায়ক অতুলচন্দ্রের স্ত্রীর নামানুসারে উপন্যাসটির নাম।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ঃ বাসন্তী (সা), কলিকাতা, ১৮৮১। কল্পনা (দ্বিতীয় বৎসর, আশ্বিন ১২৮৮—ভাদ্র ১২৮৯ পৃ. ১৬৮) পত্রিকায় সমালোচিত।

সুরেন্দ্রচন্দ্র বসুঃ যুগলচিত্র (সা), কলিকাতা, ১৮৯২। 'ভারতী ও বালক' (আশ্বিন ১২৯৯, পৃ. ৩৫৬—৫৭)-এ সমালোচিত।

হরিনাথ চক্রবর্তীঃ অমৃতপ্রভা (সা), কলিকাতা, ৩০ আগস্ট ১৮৯৫, পৃ. ১৩৪। বিজয়কুমার (সা), প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৪ মার্চ ১৮৯৭, পৃ. ২০৮।

হারাণশশী দেঃ লবঙ্গলতা (পা), কলিকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬, পৃ. ৮২। রাণী মৃণালিনী (সা), কলিকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০০, পৃ. ৯১। সধবা নারীর পুনর্বিবাহের কাহিনী। রমণচন্দ্রের সঙ্গে মৃণালিনীর প্রণয় সত্ত্বেও বিবাহ ঘটেনি। মৃণালিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চল্লিশোর্ধ্ব এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহ হয় এবং নির্যাতিতা হয়ে গৃহত্যাগ করে যে ব্রাহ্মযুবকের আশ্রয়

গ্রহণ করে, তার সঙ্গে পুনর্বিবাহিত হয়। তারপর ডাক্তারিশিক্ষার জন্য মৃণালিনীর বিলাতযাত্রা ইত্যাদি।

হাফিজ আমিনুদ্দিন আহম্মদ : চন্দ্রমুখী (সা), ১৭ অক্টোবর ১৮৯৩, পৃ. ৫৭।

হেমচন্দ্র দাস : নবীন সোহাগিনী (সা), কলিকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ১৮৯০. পৃ. ৯৪।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : রানী সুধামুখী (সা), কলিকাতা, ২৮ মে ১৮৯৪, পৃ. ১৫২। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির পরবর্তীকালীন কলকাতার সামাজিক পটে লেখা।

শৈলেশনন্দিনী (সা), কলিকাতা, ৪ জানুয়ারি ১৯০০, পৃ. ৮০।

হেমচন্দ্র বসু : মিলনকানন (এ), কলিকাতা, ১৮৮২। বন্দিরাজ্যের রাজকন্যার প্রতি জাহাঙ্গীরের প্রণয় ও তৎসম্পর্কিত কাহিনী।

হরকুমার ঠাকুরের সহধর্মিনী : তারাবতী, ১৮৭৩।

হরেন্দ্রনাথ গুহ : হেমপ্রভা (এ), কলিকাতা, ১৬ অক্টোবর ১৮৯৪ পৃ. ১৪০। সিপাহী-যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা। রচনায় তাঁতিয়া তোপীর প্রতি লেখকের সহানুভূতি স্পষ্ট।

হারানচন্দ্র রাহা : রণচণ্ডী (ঐ) কলিকাতা, ১৮৭৬, পৃ. ২৪১। নবদ্বীপের রাজা কর্তৃক কাছাড় আক্রমণের কাহিনী।

বালাসখী (ধা), কলিকাতা, ২৩ অক্টোবর ১৮৮৩, পৃ. ১১৫। খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। 'বঙ্গবন্ধু' (ডিসেম্বর ১৮৮৩, পৃ. ৭১—৭২)-তে সমালোচিত।

পদ্মমাসি (সা), কলিকাতা, ৭ মার্চ ১৮৮৫, পৃ ৮৪।

নাড়ুগোপাল (ধ), কলিকাতা, ২৪ আগস্ট ১৮৮৫, পৃ. ৫০। খ্রীষ্টধর্মের গুণকীর্তিত।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় : আধারমাণিক (সা), কলিকাতা, ২২ নভেম্বর ১৮৮৭ পৃ ১৫৮। ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে লেখা। সামাজিকদের কাপট্য ও লাম্পট্যের চিত্র দিয়েছেন লেখক।

হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় : অনাথিনী (সা), কলিকাতা, ৪ অক্টোবর ১৮৭৯, পৃ. ৬৮।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় : যোগিনী (সা), কলিকাতা, ২৮ অক্টোবর ১৮৭৯, পৃ ১২৩।

কমলা দেবী (ঐ), কলিকাতা, ১৮৮৩। কল্পনা (চতুর্থ বর্ষ, ১২৯০ ৯২, পৃ. ৩৩৪--৩৫) পত্রিকায় সমালোচনাকালে বলা হয়েছে যে, 'ইহাতে ঘটনার শৃঙ্খলা নাই, চরিত্রগঠনের পারিপাট্য নাই, বর্ণনার তেমন লিপি-চাতুর্য নাই।' ইত্যাদি।

জীবনতারা (সা), কলিকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৯, পৃ. ২৩৩। জীবনতারার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহবিভ্রাট ও পুনর্মিলন নায়কের চরিত্রে অলৌকিক প্রভাব।

হরিনাথ মজুমদার : বিজয়বসন্ত (সা), কলিকাতা, ১২ জুলাই ১৮৮৪, (১১ সং) পৃ. ১৪৭, (১২ সং) ১৮৮৯, পৃ ১৪৮।

হরিমোহন বসু : সধবা দিদি (সা), কলিকাতা. ১৮৮৩। 'হরিমোহনবাবু নিজে পাতিয়ালা কলেজের হেডমাস্টার। তিনি আঁকিয়াছেন একজন হেড-মাস্টারের চিত্র। সুতরাং তাহা যথোপযুক্ত বর্ণ ফলিত হওয়াই সম্ভব হইয়াছে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস।' (কল্পনা, ১২৯০--৯১, পৃ. ৪৪৮)।

হরিদাস বসাক : অপূর্ব স্বপ্ন (সা), কলিকাতা, ১২৯৯।

বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা

প